কালিদাস।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল,—এই ছয়খানি কাব্যের সমালোচনা।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও 'লেকচরর,' 'দত্তক-বিধি-বিচার' 'কালিদাস ও ভবভূতি' প্রভৃতি গ্রন্থ-কারক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও অধ্যাপক, বিবিধ-ভাষাবিৎ, সুপ্রসিদ্ধ—

হরিনাথ দে এম্, এ, (ক্যাণ্টাব এবং কলিকাতা)

মহোদয়-লিখিত-ভূমিকা-সংবলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট্ হইতে

এস, সি, বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৭

এই পুস্তক, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, এস, সি, বসুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় বিচারপতি

ডাক্তার

শ্রীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী,

সি. এস. আই, এম. এ, ডি. এল., ডি. এস. সি., এফ. আর. এ. এস.,

এফ. আর. এস. ই. মহোদয়েষু—

বিশ্বোদ্ভাসি-যশঃ-সুধাকর ! কৃপা-সৌজন্য-পাথো-নিধে !

বাগ্‌দেবী-বর পুত্র ! ভারত-মহী-সৌভাগ্য-গর্ব্বৈক-ভূঃ !

ভাষা-কৈরবিণী-প্রবোধন-বিধো ! বিদ্বজ্জনৈকাশ্রয় !

বিন্যস্তা ভবতঃ সরোজকরয়োর্দীনা মমেয়ং কৃতিঃ ।

গ্রন্থকার ।

চিত্র-সূচিকা

—o—

নিবেদন।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাবলীর সমালোচনা বড়ই দুষ্কর কার্য্য। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই, এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব'-শীর্ষক একখানি অতি উপাদেয় পুস্তিকা প্রণয়ন-পূর্ব্বক সংস্কৃতামোদী বিদ্যার্থিগণের কাব্য-সমালোচনা-শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহল-বৃদ্ধি এবং সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, সংস্কৃত কাব্যের তাদৃশ সমালোচনা ঐ-ই প্রথম। বঙ্গের সাহিত্য-রাজ্যের সম্রাট্ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি, আই, ই, বাহাদুর মহোদয়ও, বহুদিন পূর্ব্বে, তদীয় 'বঙ্গদর্শন'-নামক মাসিক পত্রে, মহাকবি ভবভূতি প্রণীত, 'উত্তরচরিত' নাটকের এক অতি চমৎকারিণী ও হৃদয়-গ্রাহিণী সমালোচনা করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের ঐ সমালোচনার পর, ওরূপ প্রবন্ধ আর বাহির হয় নাই। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, মহোদয়, অতি দক্ষতার সহিত, উত্তরচরিত, রত্নাবলী ও মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি কয়েক খানি সংস্কৃত নাটকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া, বঙ্গ-ভাষার অশেষ গৌরব-বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়, 'ভবভূতি' সম্বন্ধে একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া, বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান চিন্তাশীল লেখকগণের অন্যতম, মনস্বী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এবং নিপুণ-দৃষ্টি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়, যথাক্রমে, 'শকুন্তলাতত্ত্ব' ও 'শকুন্তলারহস্য' নামে, মহাকবি কালিদাসের 'সর্ব্বস্ব' অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অতি সুন্দর সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ-পূর্ব্বক বঙ্গভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, আরও কতিপয় কাব্যামোদী ব্যক্তি, প্রসঙ্গক্রমে, দুই একখানি সংস্কৃত কাব্যের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যই এখনও অসমালোচিত রহিয়াছে। ভারতের সর্ব্বপ্রধান কবির কাব্যাবলী-সম্বন্ধে এই প্রকার ঔদাসীন্য-প্রকাশ, ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভারতবাসীর যে একান্ত লজ্জার বিষয়, সে পক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যদিও বর্ত্তমান কালে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি, অতি আগ্রহ-সহকারে সংস্কৃতভাষার আলোচনা করেন, সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সে সমস্তই যেন সাময়িক আত্ম-প্রসাদের জন্য। তাঁহারা ভারতের প্রাচীন কবিগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-দর্শনে, নিজে নিজে, অতুল আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়েন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিভালোকে ঐ সমুদয় নিসর্গ-রমণীয় প্রতিমা, তাঁহারা অন্যের নয়নে প্রদীপিত করেন না, বা করিবার যেন আবশ্যকতাও বোধ করেন না।

ইউরোপের গৌরবকেতন, মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়র, কতকাল পূর্ব্বে, তাঁহার অনুপম কাব্যাবলী নির্ম্মিত করিয়া গিয়াছেন, আর অদ্যাবধিও সেই সকল কাব্যের সমালোচনা, অপ্রতিহত-ভাবে আবির্ভূত হইয়া, পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমাজের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। উক্ত মহাকবি-নির্ম্মিত চরিত্র সমূহের কত প্রকার সমালোচনা কত মনস্বীই করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন! এমন বৎসর নাই, অথবা এমন মাস নাই, যখন, সেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যাবলী সম্বন্ধে কিছু না কিছু নূতন সমালোচনা না হইতেছে। টেইন, ডাউডেন, জারভিনুস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ, সেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যাবলীর যে সমুদয় অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সমালোচনা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সমুদয়কে পাশ্চাত্য সাহিত্য-ক্ষেত্রের, এক একটী অভ্রভেদী 'মনুমেণ্ট' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও 'সেক্‌স্‌পীয়র সোসাইটী' নামিকা সমিতি, অদম্য

উৎসাহের সহিত, উক্ত মহাকবির কাব্য-সমালোচনায় তৎপর রহিয়াছেন! কেবল সেক্স্‌পীয়রের নহে, পাশ্চাত্য অপরাপর কবিগণের কাব্যাবলীও ঐ প্রকারে সমালোচিত হইতেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, স্বদেশের মহাকবির আলোচনা করা, স্ব স্ব জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু হায়, আমাদের মহাকবি কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতির অমৃত-নিস্যন্দিনী কবিতাবলী ঐ ভাবে আলোচনা করিতে আমরা কয়জনে তৎপর? যে কালিদাসের কবিতারসের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদনে, বা তদীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির যৎকিঞ্চিৎ অবধারণে, আমরা জীবন সার্থক মনে করি, যে কালিদাসের কাব্যাবলীর আলোচনা-কালে, আমরা সংসার ভুলিয়া যাই, আপনাকে ভুলিয়া যাই, তন্ময় হইয়া পড়ি,—সেই কালিদাসের কবিতার আলোচনা আমরা কয়জনে করিতে উৎসুক?

যে দিন মাহেন্দ্র-ক্ষণে, মহামতি স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্‌স্‌, কালিদাসের কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, যে দিন মণিয়র উইলিয়ম, উইল্‌সন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য গুণজ্ঞ পণ্ডিতগণ, আমাদের উপেক্ষিত মহাকবিকে আদর করিয়া তাঁহাদের স্বদেশের সম্মুখে পরিচিত করিয়াছিলেন, তদবধি আজ পর্য্যন্ত, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্‌স্ প্রভৃতি দেশের বিদ্বৎ-সমাজে, কালিদাসের কবিতা, কত ভাবে, কত নিপুণতার সহিতই না আলোচিত হইতেছে! কিন্তু আমরা উদাসীন! আমরা এমনই 'গম্ভীর-বেদী'[১] হইয়া পড়িয়াছি, যে, কিছুতেই যেন চৈতন্য নাই!

আমি সংস্কৃত সাহিত্যের যতটুক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি যে প্রকৃত প্রস্তাবে, কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতির অনুপম কবিত্বের যথার্থ পরিচয়-লাভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ভূরি ভূরি পাঠ্যপুস্তকের দুর্ব্বহ ভারে, সুকুমার-

---

১—ত্বক্‌ছেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি।
আত্মানং যো ন জানাতি, স বৈ গম্ভীরবেদিতা।

মতি ছাত্রগণের সহজ-নম্য অন্তঃকরণ অতিশয় দমিয়া পড়ে, তাই অধ্যাপনাকালে, তাঁহাদের স্কন্ধে, আরও উপরিচাপ দিতে, হয়ত, অনেক অধ্যাপকেরই প্রাণে ব্যথা লাগে। সেই জন্য, বোধ হয় অধ্যাপকগণও ঐ বিষয়ে, তাদৃশ প্রয়াস করেন না।

বর্তমান সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, যাহাতে ছাত্রগণ, মাত্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ না করিয়া, সেই সেই গ্রন্থের প্রকৃত তত্ত্ব, কবির প্রকৃত অভিপ্রায়, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তদনুযায়িনী শিক্ষার বিস্তার-সাধন। সুচারুরূপে একখানি গ্রন্থের অধ্যয়নও বরং উত্তম, কিন্তু অপ্রবুদ্ধভাবে বহু গ্রন্থের অধ্যয়নও বাঞ্ছনীয় নহে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু উদ্দেশ্য সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা-দ্বারা অধ্যয়নার্থিগণের কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবার জন্য, এবং সাধারণ্যে কালিদাসের কবিত্বের, আমার অত্যল্প সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব, আভাস দেওয়ার জন্য, এবং পরিশেষে, স্বদেশের মহাকবিগণের কাব্যাবলীর আলোচনা করিয়া, আপনাকে ধন্য ও পবিত্র করিবার জন্য, আমি এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। সৎকাব্যাবলীর যত অধিক আলোচনা হয়, সমাজ এবং সাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। সৎকাব্যের আলোচনায় দেহ-মন পবিত্র হয়, চিত্তে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ জন্মে, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্তি জন্মে। সৎকাব্যের আলোচনায় অপরিমেয় পরিতৃপ্তি। তাই আমার এই দুঃসাহস।

স্বর্গগত, দয়ার সাগর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদীয় 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব'—নামক গ্রন্থে সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই পথেই যাত্রা করিয়াছি। কতিপয় স্থলে, তাঁহার বাক্য অবিকল উল্লেখ করিয়া, আমার গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছি। আমি অনেক স্থলে, কবি-ব্যবহৃত শব্দের ' ' এইরূপ চিহ্ন দিয়া, যথাযথ-ভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, অশেষ ভাষাবিৎ, ভুবন-বিখ্যাত, মাননীয় মনস্বী শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে, এম্, এ, মহোদয়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক, আমার এই নিষ্কিঞ্চন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া, আমাকে গৌর-বিত ও অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কঠিন পর্ব্বত-গাত্রে কুসু-মিত লতিকার ন্যায়, আমার এই নীরস গ্রন্থের পক্ষে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দে মহোদয়ের লিখিত এই ভূমিকা, সুন্দর অলঙ্কার-স্বরূপ। শ্রীযুক্ত দে মহোদয়, তদীয় প্রকৃতি-সিদ্ধ মহানুভবতা-গুণে, আমার ধন্যবাদটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে লজ্জিত। তথাপি আমি তাঁহার নিকটে আমার অন্তরের নির্ব্বাক্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সংস্কৃত কালেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, আমার অগ্রজকল্প, সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় বহুবিধ গ্রন্থের রচয়িতা, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়, অনুকম্পাপূর্ব্বক, এই পুস্তকের অনেক স্থল সংশোধন করিয়া দিয়া, আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও, আমি মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে ত্রাণ পাই নাই। হয়ত, দেখিয়া দিয়াছি একরূপ, মুদ্রিত হইয়াছে অন্যরূপ। যাহা হউক, পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট, পৃথগ্‌ভাবে, আমার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা—

অযুক্তমস্মিন্ যদি কিঞ্চিদুক্তং অজ্ঞানতো বা মতিবিভ্রমাদ্বা
ঔদার্য্য-কারুণ্য-বিশুদ্ধ-ধীভি র্মনীষিভিস্তৎ পরিশোধনীয়ম্ ॥

কলিকাতা,
সংস্কৃত কালেজ,
১৫ই চৈত্র,
১৩১৫।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

—০—

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'কালিদাস' গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে গ্রন্থের কতিপয় স্থান বিশেষ ভাবে সংশোধিত ও একখানি চিত্র পরিত্যক্ত হইল। গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য, পুস্তকের মূল্যও হ্রাস করা গেল। এইক্ষণে প্রার্থনা—পাঠকবৃন্দ, পূর্ব্ব বারে, কালিদাসের প্রতি যে প্রকার স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কালিদাস এবারেও যেন সেইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হয়। ইতি—

কলিকাতা,
সংস্কৃত কালেজ,
১৫ই চৈত্র,
১৩১৫

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

সূচিকা।

অধ্যায়		বিষয়	পত্রাঙ্ক
৫৮শ	অধ্যায়	বিদায়,	৪৪৮
৫৯ম	অধ্যায়	অপরিচিতা,	৪৫৪
৬০ম	অধ্যায়	সতীত্বের জয়,	৪৬২
৬১ম	অধ্যায়	দুষ্যন্ত,	৪৭০
৬২ম	অধ্যায়	ধর্ম্মের জয়,	৪৮১
৬৩ম	অধ্যায়	পুনর্মিলন,	৪৯৬
৬৪ম	অধ্যায়	উপসংহার,	৫০০

—o—

INTRODUCTION.

A new book on Kalidasa and his poetry would now-a-days be considered a work of supererogation, unless the writer has something new to say about the poet and his productions. The date of Kalidasa has been at last conclusively settled by the industry of two eminent scholars, viz., Dr. T. Bloch and Pandit Ramavatara Sharma *Sahityacharya*, the results of whose researches, carried on independently of each other, happily agree in almost every detail. They have succeeded in satisfactorily proving from evidence, both internal and external, that the author of *Raghuvamsham* and *Kumarasambhavam* flourished during the reign of Chandragupta II, Vikramaditya, and that of his son Kumaragupta. Obvious references to the Gupta kings are to be found in lines like—

"आसमुद्रक्षितीशानाम् etc."[1]

—which contains a covert allusion to the line of kings beginning with Samudragupta,—

"तस्मै सभ्याः सभार्य्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः ।"[2]

"अन्वास्य गोप्ता गृहिणी-सहायः ।"[3]

---

(1) Raghuvamsham, 1—5. (2) Raghuvamsham, 1—55.
(3) Raghuvamsham, 2—24.

—both of which contain a direct reference to the Gupta dynasty.

Moreover Chandragupta II is plainly alluded to in the well-known simile :—

"तनु-प्रकाशेन विचेय-तारका
प्रभातकल्पा शशिनेव शर्व्वरी ।"[1]

Again allusions to Kumaragupta are to be found in passages like—

"इक्षुच्छाय-निषादिन्यः तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्
आकुमार-कथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ।"[2]

Lastly, it must be remembered that there is a remarkable coincidence of details between the conquests of Samudragupta which are mentioned in the Allahabad pillar inscription which goes after his name, and the victories of Raghu which are ushered in by the famous lines—

"स गुप्त-मूल-प्रत्यन्तः शुद्ध-पार्ष्णिरयान्वितः ।
षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्-जिगीषया ॥"[3]

About the works of Kalidasa we have but little to say. The *Meghaduta* seems to have been his earliest work. The idea of the cloud being employed as a messenger has been imitated in German poetry by Schiller, who, in his drama

(1) Raghuvamsham, 3—2. (2) Raghuvamsham, 4—20.
(3) Raghuvamsham, 4—26.

Maria Stuart, puts the following appeal in the mouth of the captive Scottish Queen :—

"Eilende Wolken ! Segler der Luefte !
Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte !
Gruesset mir freundlich mein Jugendland !"

("Hurrying clouds ! Ye sailors of the air !
O that one could wander and sail with you !
Greet kindly on my behalf—the land of my youth".)

Kalidasa, however, was not the first to treat the cloud as a messenger. A Chinese poet of the 2nd century A.D. named *Hsiu Kan*, who, according to professor H. Giles (see his Chinese Literature, p. 119), translated the famous work of Nagarjuna, entitled "Pranyamula-shastra-tika", had sung 200 years before Kalidasa in the following strain :—

"O floating clouds that swim in heaven above,
Bear on your wings these words to him I love...
Alas ! You float along nor heed my pain
And leave me here to love and long in vain."

Of the numerous pithy remarks imbedded in the Cloud Messenger, perhaps the best known is :—

"याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।"[1]

(1) Meghaduta.

which occurs in the famous stanza which may be translated as follows :—

"Scion of the Clouds Diluvian whose renown
the world doth fill,
I know the, Minister-Chief of Indra, changer
of thy shapes at will,
So to thee I pray now, severed from my spouse
by cruel fate,
Better far than base-born favour were refusal
from one great."

This thought finds a remarkable parallel in a quartrain of Omar Khayyam which Whinfield has thus translated :—

"To wise and worthy men your time devote,
But from the worthless keep your walk remote ;
Dare to take poison from a sage's hand,
But from a fool refuse an antidote."

It is difficult to avoid the temptation of quoting the half-sensuous half-pathetic lines in which the love-lorn Yaksha describes his wife from whom he has been parted—

"Slender, fair, her teeth are pointed, and her lips
with *bimba* vie,
Deep her navel, thin her waist is, like the timid
fawn's her eye,

"Heavy hips her gait retarding, slightly bent by bosom's weight,
Like Creator's first-framed woman—such is she, my beauteous mate.'

The best translations of *Meghaduta* in any European language are a metrical German version by the late Prof. Max Müller and the German prose-rendering by the scholar Schuetz, both of which unfortunately are out of print. The version of Schuetz was dedicated to our great countryman, Raja Radhakanta Deb, who had financially helped the poor German scholar when the latter had fallen on evil days owing to blindness and old age.

The *Kumarasambhavam* was probably the next great work of Kalidasa. In its present shape it consists of 17 cantos ; but out of these only the first eight were written by Kalidasa himself,—a fact recognised by Mallinatha who commented on these cantos only. The rest is the work of an inferior hand, for it is inconceivable that Kalidasa could ever have been guilty of errors of style and diction with which the last nine cantos of *Kumarasambhavam* abound. The *Kumarasambhavam*, as written by Kalidasa, ends with the nuptials of Hara and Parvati, and the birth o

Kartikeya. It was in all probability composed by the poet with a view to celebrate the birth of Kumaragupta, the son of his patron Chandragupta II. The personal name of Kumaragupta, was Chandraprakasha,—a fact alluded to in the stanzas—

"राजापि लेभे सुतमाशु तस्मात्
आलोकमर्कादिव जीवलोकः।"
"ब्राह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी
कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्।"
"रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यं
तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम्।
न कारणात् स्वाद् विभिदे कुमारः
प्रवर्त्तितो दीप इव प्रदीपात्॥"[1]

The *Raghuvamsham* is the last and the greatest of the poet's epics. Its concluding portions are pervaded by a tone of sadness, a fact which would seem to indicate that the last days of the great poet were not happy. The scenes described in the later cantos of this poem are at once characterised by melancholy and pathos. For instance the description of the abandoned city of Ayodhya—

(1) Raghuvamsham, 5—35, 36, 37.

its broken hearths and terraces, its ruined ramparts, its streets frequented by jackals, its bathing-places infested by tigers, its homesteads haunted by serpents, its gardens ravaged by wild monkeys, its walls covered with cobwebs,—powerfully reminds us of Tennyson's famous picture of desolation in *Demeter and Persephone* :—

"By many a waste forlorn of man,

* * * * * * *

The jungle rooted in his shattered hearth
The serpent coil'd about his broken shaft,
The scorpion crawling over naked skulls :—
I saw the tiger in the ruined fane
Spring from his fallen God."

Of the dramas of Kalidasa it is needless to say anything here. Sakuntala has hitherto been a favourite with Europeans, and may it long remain so ! Goethe's appreciative quartrain is already too well known to require a reference. A fuller appreciation of Sakuntala by him appears in a letter which he wrote towards the end of his life to the French Sanskritist Chézy, thanking the latter for his very kind gift of a copy of his edition of Sakuntala. This letter, which ought to be better known, is to be found in Hirzel's introduction to his German translation of Sakuntala.

I cannot conclude this introduction without paying a tribute to the memory of the late Prof. A. Stenzler, to whose Latin translation of *Raghuvamsham* and *Kumarasambharam* the late Dr. K. M. Banerjea owes whatever is excellent in his edition of the two epics, and to that of the late Prof. Pischel, himself one of the most distinguished pupils of Prof. Stenzler, whose revised edition of the Bengali recension of Sakuntala, which is now being brought out by Prof. Lanman in America, will settle once for all the priority of the Bengali recension of the text of that drama.

It may also interest the reader to know that Dr. H. Beckh, a learned scholar of Tibetan and Sanskrit, has lately brought out an edition of the Tibetan version of the *Meghaduta*, a work which will prove of great use to learners of classical Tibetan. With this prefatory note I beg leave to introduce to the public Pandit Rajendra Nath Vidyabhushan's original appreciation of Kalidasa which I myself have read with much interest and enjoyment.

IMPERIAL LIBRARY,
Calcutta, 15*th March* 1909.

HARINATH DE.

কালিদাস

প্রথম অধ্যায়।

সংস্কৃত কাব্য।

আমরা যখনই কোন সংস্কৃত কাব্যে অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি-পাত করি, তখনই দেখিতে পাই যে,—জগতে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নূতন, নিষ্পাপ, নির্ম্মল ও মনোহর,—সে সমস্তই যেন একত্র সঙ্কলন করিয়া,—যে স্থানে যেটির সন্নিবেশ করিলে, তাহার সুন্দরতা ও নির্ম্মলতা আরও পরিস্ফুট হয়, তথায় তাহা ঠিক সেই ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া, ভারতের কবিতাময়ী চিত্র-শালিকার অমর ভাস্করগণ—স্বপ্ন এবং মনেরও অগোচর, অনির্ব্বচনীয় চিত্রাবলী অঙ্কন করিয়াছেন। সেই হৃদয়োন্মাদিনী আলেখ্যমালা দর্শন করিতে করিতে, দর্শকবৃন্দ যখন, সৌন্দর্য্যে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, হৃদয়প্লাবী ভাব-রসে নিমগ্ন হইতে থাকেন, মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে থাকেন, সেই সময়ে, তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে—তদীয় অন্তঃকরণও যেন সাধুতা-ময় হইয়া উঠে। নির্ম্মল ও সুন্দর আলেখ্য-মালার সংসর্গে তাঁহাদের হৃদয়ও ক্রমে নির্ম্মল ও সুন্দর হইয়া উঠে। তখন—সেই চিত্রাবলীর পরিদর্শন-কালে, তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে, যাহা-কিছু অসুন্দর, যাহা-কিছু অধর্ম্ম, যাহা-কিছু নীচ, তাহার চিন্তা পর্য্যন্তও তিরোহিত হয়; তখন সদ্ভাবের আবেশে দর্শকগণের মনঃপ্রাণ পুলকিত হয়। নির্ম্মল আদর্শতলে,

যেমন প্রতিকৃতি সুপরিস্ফুটরূপে প্রতিভাসিত হয়, তদ্রূপ, তখন দর্শকগণের নির্ম্মল হৃদয়াদর্শে, কাব্যোল্লিখিত পূত-চরিত্র ব্যক্তি-সমূহের সাধুত্বের ও নির্ম্মলত্বের প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। তাঁহাদের মতি গতি প্রবৃত্তিও সাধু হইয়া উঠে। তখন, তাঁহারা রামাদির ন্যায় জগৎ-পূজ্য-চরিত্র-সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, রাবণাদির ন্যায় হইতে চাহেন না। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন,—সৎকাব্য যশস্কর, অর্থকর, ব্যবহার-জ্ঞান-প্রদ ও অমঙ্গল-হর; সৎকবিতা, সাধ্বী বনিতার ন্যায় পরম-শান্তিদায়িনী ও হিতোপদেশিনী। যাঁহারা পরিণত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, যাঁহারা একান্ত সুকুমার-মতি, তাঁহারাও সৎকাব্যের আলোচনায়—কবি-নির্ম্মিত আদর্শ চরিত্রের আলোচনায় অশেষ শুভ-ফল প্রাপ্ত হয়েন[১]।

পাঠকগণ নির্ম্মল আনন্দ-লাভের জন্য কাব্য-পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন বটে, কিন্তু কাব্যের করুণাময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বকীয় দিব্য-প্রভাবে তাঁহাদিগকেও নির্ম্মল করিয়া তুলেন। পাঠকের অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়ের উপর এই প্রকার আধিপত্য-বিস্তারে, ভারতীয় মহা কবিগণ এক প্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে, নিজের অলৌকিক কবিতালোকে, পাঠকের অন্তঃকরণ আলোকিত ও বশীভূত করিতে যে সমুদয় মহাকবিগণ সমর্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে 'কালিদাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং তাঁহারই কথা আমাদের প্রথম আলোচ্য।

১—'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তা-সম্মিততয়োপদেশযুজে॥' কাব্যপ্রকাশ।
চতুর্বর্গ-ফল-প্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি
কাব্যাদেব'— সাহিত্যদর্পণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালিদাস।

'ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্য-শাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন যে, কালিদাস কিরূপ কবিত্ব-শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবি, কালিদাসের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না[১]।'

মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী কাব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সর্ব্বপ্রথমে একটি ব্যাপারে আমরা মুগ্ধ হই। দেখি, পৃথিবীর মধ্যে যাহা সুন্দর—হৃদয়ের উন্মাদকর, যাহা অপাপবিদ্ধ—প্রকাণ্ড, যাহা অনুপম, তাহাই কালিদাসের কাব্যের প্রধান উপজীব্য বা জীবন।

জগতে কবিগণের বর্ণনীয় বিষয় দুইটি,—অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ। নীরেন্দ্র-প্রতিম সুনীল প্রশান্ত আকাশ, নীল-নীরদ-প্রভ অনন্ত জলরাশি, 'পূর্ব্বাপর'-সমুদ্রাবগাহিনী অভ্র-ভেদিনী পর্ব্বতমালা[২], 'বসন্তোদার-রমণীয়' প্রকৃতির লীলাময়ী 'শ্যামায়মান' বনভূমি[৩], 'সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা' কলবাহিনী স্রোতস্বিনী[৪] প্রভৃতি বহির্জ্জগতের সুন্দর সুন্দর বস্তু; আর,

১—বিদ্যাসাগর।

২—কুমারসম্ভব।

৩—শকুন্তলা।

৪—ঐ।

প্রীতি, স্নেহ, দয়া, সৌন্দর্য্য, প্রেম, আত্মোৎসর্গ, সমবেদনা প্রভৃতি অন্তর্জগতের সুন্দর সুন্দর বস্তু ;—এই সমস্তই যেন মহাকবি কালিদাসের নিজের সম্পত্তি। তিনি, এই সমুদয়ের—যেটির যে স্থানে ইচ্ছা, 'বিনিয়োগ' করিয়াছেন। সব যেন বেতের মত নুয়িয়া তাঁহার বর্ণনার অনুকূল হইয়া আসিয়াছে। যে স্থানে যে কথাটি বলিলে, যে স্থানে যে ভাবটি প্রকাশ করিলে, তাঁহার নিসর্গ-সুন্দর আলেখ্য গুলির সৌন্দর্য্য—চারুতা, আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়, তথায়, তাহা ঠিক সেইভাবে বসাইয়াছেন। যে ছবিতে প্রাণে উন্মাদ জন্মে না, যে কথায় কর্ণে অমৃত বর্ষণ হয় না, যে হাসিতে হৃদয় পবিত্র ও লঘু হয় না,—অথবা অধিক কি,—যে রসে হৃদয় বিধৌত হইয়া স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল এবং ভাবগ্রহণের সম্যক্ উপযোগী হয় না, তাদৃশ ছবি-কথা-হাসি বা রস কালিদাসের কাব্যে নাই। সুন্দর পদার্থ ব্যতিরিক্ত তিনি স্পর্শও করেন নাই।

পর্ব্বতের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, সেইটিই তাঁহার; নদীর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেইটিই তাঁহার; ঋতুর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেইটিই তাঁহার। তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা, স্বর্গের অলকা হইতে মর্ত্ত্যের—ভারতের—তথা কালিদাসের বড় আদরের স্থল উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে[১]।

মুগ্ধ-জীব সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, কত সময়ে, কত প্রকারে, কাঁদিয়া, বিলাপ করিয়া কাটায়, দুর্ব্বহ জীবনের ভার কথঞ্চিৎ লঘু করে! সেই সকল কান্নার বা বিলাপের মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে দারুণ, সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, যে কান্না বা যে বিলাপ শুনিলে মনে হয়, প্রাণ দিলেও যদি ইহার উপশম হয়, তবে তাহাও দিই,—সেই কান্না, সেই বিলাপ, কালিদাস তাঁহার করুণাময়ী কল্পনা-বীণায় ঝঙ্কার

করিয়াছেন[১]। যে সমুদয় গুণ থাকিলে মানুষ দেবতা হয়, সংসার স্বর্গ হয়, পৃথিবীর সব সুন্দর দেখায়, কালিদাস সেই সকল গুণের আধার করিয়া তাঁহার কাব্যাবলীর প্রিয় নায়ক-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার সকল গুণের শ্রেষ্ঠ, সকল ধর্ম্মের বরেণ্য—যে আত্ম-ত্যাগ, তাহা দিয়া তদীয় নায়কের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনীয় সমস্তই সুন্দর। বসন্তের কোকিলা তাঁহার কল্পনার দূতী, মধুমাসের কুসুমগুচ্ছ তাঁহার কল্পনার অলঙ্কার, শরতের নির্ম্মল কৌমুদী তাঁহার কল্পনার বসন, ভাগীরথীর নির্ঝর-শীকর তাঁহার কল্পনার পাদ্য, হিমালয়ের গুহামুখ-জাত নির্ঝর-শীকর-সিক্ত শ্যামল দূর্ব্বারাজি তাঁহার কল্পনার অর্ঘ্য।

তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা কখন আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে 'লবণাম্বুরাশির' 'তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা' বেলা ভূমির লাবণ্য দর্শন করিতেছে[২]। কখন বা, অভ্রংভেদী পর্ব্বতের নিতম্বদেশে সঞ্চরণ-শীল, চঞ্চল, ঘন-কৃষ্ণ মেঘমালার ক্রীড়া দেখিয়া, তাঁহার কল্পনা-সুন্দরী আপনাকে আপনিই ভুলিয়া যাইতেছে[৩]। আবার কখনও বা, উন্মাদিনী নিজেই মেঘময়ী হইয়া, বুকের উপরে কবিকে বসাইয়া, আকাশ-পথে উধাও হইয়া, কোথায়—কোন্ অজ্ঞেয় জগতে ছুটিয়াছে[৪]। কখন দেখি, শান্ত তপোবনের জীবন্ত শান্তি-প্রতিমা ঋষি-কন্যাদিগের সহিত তাঁহার কল্পনা, বালিকার ন্যায় কুসুম-চয়নে বা আলবাল-পরিপূরণে মাতিয়া রহিয়াছে, ভ্রমরের সহিত খেলা করিতেছে, হরিণের সহিত ছুটাছুটি করিতেছে[৫]। আবার কখন হয়ত, রাজাধিরাজের অন্তঃপুরে উপেক্ষিতা অভিমানিনী মহিষীর করুণকণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া কতই না ক্রন্দন করিতেছে। পরক্ষণেই

১—রঘু—৮ম সর্গ, অজ-বিলাপ; ১৪শ সর্গ, নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ। কুমার—৪র্থ সর্গ, রতিবিলাপ প্রভৃতি।

২—রঘু, ১৩শ সর্গ শ্লোক—১৫শ। ৩—কুমার, ১ম সর্গ, শ্লোক ৫ম। ৪—বিক্রমো, ৪র্থ অঙ্ক, শেষ শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোক। ৫—অভিজ্ঞান-শকুন্তল, প্রথম অঙ্ক

আবার 'অভিনবমধু-লোলুপ' রাজার মনের মধ্যে যে মন—তাহার মধ্যে ঢুকিয়া, জন্মান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, বিমুগ্ধ নরপতিকে 'পর্য্যুৎসুক' করিয়া তুলিতেছে[১]। রাজরাজেশ্বরের বড় আদরের কন্যাকে, জনক-জননীর স্নেহের পুত্তলিকাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া, জটাবল্কল পরাইয়া, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, লইয়া বেড়াইতে তাঁহার কল্পনার কতই না আনন্দ[২]।

'উদাসিনী' রাজ-নন্দিনীকে কখন, নিজহস্তে পদ্ম-রাগ-বিনিন্দী অশোক-কুসুমের অলঙ্কার দিয়া তাঁহার কল্পনা সাজাইতেছে, কখন কাঞ্চন-কান্তি কর্ণিকার পুষ্পে রাজকন্যার বেশ-বিন্যাস করিতেছে, দুগ্ধ-ধবল সিন্ধুবার প্রসূনের মালা রচনা করিয়া, মুক্তার মালার ন্যায় তাঁহার 'বন্ধুর' কণ্ঠে দোলাইয়া দিতেছে। রাশি রাশি বসন্ত কুসুমের—বসন্ত পল্লবের আভরণে সাজসজ্জা করিয়া সেই উদাসিনী রাজকন্যা যখন মন্থর-পদে চলিয়া যান, তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, বুঝি 'পুষ্পস্তবকাবনম্রা' 'পল্লবিনী' কোন বাসন্তী লতিকা, কমনীয়-কন্যা-শরীর-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক ধীরপদ-সঞ্চারে চলিয়া যাইতেছে[৩]। তাঁহার কল্পনা-বীণার মোহনতানে, মৃগের শৃঙ্গস্পর্শে মৃগী অবশ হইতে হইতে, ক্রমে ভাবাবেশে 'নিমীলিতাক্ষী' হইতেছে। তাঁহার প্রগল্‌ভা কল্পনা, বংশবদ ভ্রমরকে ভ্রমরীর পীতাবশিষ্ট মধু আগ্রহ-সহকারে পান করাইতেছে[৪]। তাই আবার বলি—পৃথিবীর মধ্যে যেটি সুন্দর, যেটি নিষ্পাপ, যেটি অনিন্দনীয়, সে সব তাঁহার কল্পনার অধিকৃত। যাহা মহান্, যাহা অপরূপ, তাহা তদীয় কল্পনাদেবীর আয়ত্ত।

যে ছবি দেখাইলে দর্শকের মনঃপ্রাণ জুড়াইবে—উদার হইবে, যে ছবি দেখাইলে সংসারে শান্তির প্রস্রবণ ছুটিবে—আনন্দের প্রবাহ বহিবে,

১—অভিজ্ঞানশকুন্তল,—৫ম অঙ্ক, হংস-পদিকার গীত এবং তচ্ছ্রবণে দুষ্যন্তের ঔৎসুক্য। ২—কুমার ৫ম সর্গ, শ্লোক ৯ম। ৩—কুমার—৩য় সর্গ, শ্লোক ৫৩, ৫৪। ৪—কুমার, ৩য়, ৩৬।

যে ছবি দেখাইলে মানব-হৃদয় দেবভাবময় হইবে,—দর্শক আত্মবিস্মৃত হইয়া জগৎকে ভাল বাসিতে শিখিবে, তাদৃশ ছবি ব্যতীত কালিদাস অঙ্কিত করিতেন না। যাহাতে মাধুরী নাই, যাহাতে উন্মাদকতা নাই,—তাহা তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল। অসুন্দর পদার্থের দিকে তিনি ভ্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না।

পুত্রলাভের জন্য, গুরুদেবের আদেশে স-সাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর 'লতা-প্রতান'-দ্বারা জটা-সংযমন-পূর্ব্বক, অ-সূর্য্যম্পশ্যা মহিষীর সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছেন, পয়স্বিনী ধেনুর সেবা করিতেছেন, হিন্দু-ধর্ম্মের এ একটা প্রধান আদর্শ। আমাদের কবি এ'টি লইয়াছেন[১]।

ফুলের মালার আঘাতে কুসুম-কোমলা রাজমহিষীর মূর্চ্ছা হইয়াছে, তাঁহার হেমকান্তি কলেবর ক্রমে নিষ্প্রভ হইতেছে,—তদ্দর্শনে, পত্নীময়-জীবিত ধরণীর ঈশ্বর, নিজের 'সহজ-ধীরতায়' জলাঞ্জলি দিয়া, 'সংসার-কর্ম্মে তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রণায় তুমি আমার সচিব, রহস্যে তুমি আমার সখী, ললিত-কলা-বিষয়ে তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা, অথবা তুমি আমার সর্ব্বস্ব,'—বলিয়া তারস্বরে, কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছেন; সে ক্রন্দনে পাষাণও বিগলিত হয়, বজ্রেরও বুঝি হৃদয় বিদীর্ণ হয়;—আমাদের কবি এ'টি লইয়াছেন[২]।

স্বয়ংবর-সভায় সমবেত, 'উজ্জ্বল-নেপথ্য', নরপতি-বৃন্দের মধ্যে লজ্জা-বনতমুখী রাজ-কন্যা, বরমাল্য হস্তে করিয়া পরিচারিকার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সেই 'কন্যাললাম-লিপ্সু' আগন্তুক রাজন্য-বৃন্দের হৃদয়ে, রাজ-নন্দিনীর প্রতি-পাদ-বিক্ষেপের সহিত কত আশার বিদ্যুৎ, নৈরাশ্যের মেঘ—উঠিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ডুবিতেছে! আমাদের কবি এ'টি লইয়াছেন[৩]।

১—রঘু, ১ম,—দিলীপ-সুদক্ষিণার 'নন্দিনী'-সেবা।

২—রঘু, ৮ম, ৪২, ৪৩, ৬৭। ৩—রঘু, ৬ষ্ঠ, ৬৭।

ভুবন-মোহন, অনন্তরূপের আধার, সৌন্দর্য্যে, বিলাসে, রঙ্গ-ভঙ্গিমায় বিশ্ব-বিজয়ী—জীবিতেশ্বরের তাদৃশ অদ্ভুত মরণে অনন্ত-শরণা বালিকার 'অয়ি জীবিতনাথ জীবসি' বলিয়া সেই পাষাণভেদী রোদন[১]!—

নিরপরাধা, অগ্নি-পরীক্ষিতা, সাধ্বী দেবী-প্রতিমার পতিকর্ত্তৃক প্রজা-রঞ্জনের নিমিত্ত নির্ব্বাসন, আবার সেই পতি-গত-প্রাণা, গর্ভ-ভরালসা, ভয়াতুরা অবলার গহন বনে,—

'নিশাচরোপপ্লুত-ভর্ত্তৃকাণাং
তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যম্
কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে॥
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রযোগঃ[২]।

প্রভৃতি মর্ম্ম-বিদারিণী বিলাপ-গাথা ;—

যে প্রাণাধিক স্বামী, বিনাদোষে, চিরজন্মের মত, উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই উদ্দেশে, সেই নির্ব্বাসিতা, আলুলায়িতকেশী, সতী প্রতিমার 'তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া' বলিয়া শরবিদ্ধ 'কুররীর' মত মুক্তকণ্ঠে রোদন[৩] ;—

১—কুমার, ৪র্থ—৩।

২—রঘু, ১৪শ, ৬৪, ৬৬। "বলিও, যখন তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলাম, তখন, তপস্বি-গণ নিশাচর-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাপস-কামিনীরা আমার শরণাগত হইতেন, আর তুমি, আমার অনুরোধে তাঁহাদের বিপদ নিবারণ করিতে। আর এক্ষণে, অযোধ্যার অধীশ্বর তুমি বিদ্যমান থাকিতে, সেই আমি, গহনবনে কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব? কে আমাকে রক্ষা করিবে? তুমি ত্যাগ করিয়াছ, কর, কিন্তু আমি জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই, তোমার সহিত আর যেন বিচ্ছেদ না হয়।"

৩—রঘু, ১৪শ, ৬৭।

কত কষ্টে—কত প্রয়াসে, দুস্তর-জলধি-বন্ধন-পূর্ব্বক, অপহৃত ভার্য্যার উদ্ধার-সাধন করিয়া, উৎফুল্লহৃদয়ে, সেই পত্নীর সহিত পতির আকাশ-পথে পুষ্পক-বিমানে বিচরণ, বিরহকালের সঞ্চিত আশা-রাশি আজ উভয়েরই হৃদয় ছাপাইয়া উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি যেমন উদ্বেল হয়, তদ্রূপ, আজ বহুকাল পরে, বাঞ্ছিত-সন্দর্শনে পরস্পরের হৃদয় সমুদ্রও যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, দুই জনে এক-প্রাণ হইয়া—এক হইয়া, শান্ত আকাশ-পথ বাহিয়া যাইতেছেন! 'তোমাকে হারাইয়া যখন আমি পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছিলাম, তখন যে লতা—তাহার কচি কচি শাখা দোলাইয়া আমাকে তোমার পথ দেখাইয়াছিল, ঐ দেখ, ঐ সেই লতা'[১]; তোমার বিয়োগে যখন আমি উন্মত্তপ্রায়, তখন যে পর্ব্বতের বন্ধুর-গাত্রে ঘন-নীল মেঘের নর্ত্তন দেখিয়া আমি কতই না কাঁদিয়াছিলাম, ঐ দেখ, ঐ সেই পর্ব্বত'[২]; 'কোথায় তুমি, কোথায় তুমি - বলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, যখন আমি কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতেছিলাম, তখন যে স্থানে, সরল-নয়নমৃগীগণ আমার দুঃখে মুখের তৃণ-কবল ফেলিয়া দিয়া, করুণ-দৃষ্টিতে ইঙ্গিত করিয়া, আমাকে তোমার হরণ-পথ বুঝাইয়া দিয়াছিল—ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান'[৩]—প্রভৃতি উক্তি-শ্রবণে, পতিরতার সেই নির্ব্বাক্ দৃষ্টি, নীরবে অশ্রুবর্ষণ;—ইত্যাদি যত কিছু মনোহর ছবি কল্পনার তূলিকায় যতদূর সুন্দর করা যাইতে পারে, তদপেক্ষাও যেন সুন্দরতর—সুন্দরতম করিয়া, সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস্ তাঁহার অমর ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন।

অকালে বসন্তের আবির্ভাব হওয়ায়, তরুলতা-বল্লবীর সহিত সমস্ত বনভূমি অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে। মৃগ-মৃগী, করি-করিণী, ভ্রমর-ভ্রমরী, কোকিল-কোকিলা, চক্রবাক-চক্রবাকী, সব যেন, পরস্পর মন্ত্রণা-পূর্ব্বক

১—রঘু, ১৩ শ, ২৪।

২—রঘু, ১৩ শ, ২৬। ৩—ঐ ২৫।

এক-যোগে আনন্দে মাতিয়াছে, এবং বনস্থলীকেও মাতাইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখই যাহাদের জীবন, সেই অপ্সরোমণ্ডলী বনের কুঞ্জে কুঞ্জে কত রঙ্গে বেড়াইতেছে।—কালিদাস অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে, তাঁহার অমানুষিক কল্পনার সাহায্যে ঐ বনের প্রতিকৃতি তুলিয়াছেন[১]।

বিলাসী যক্ষ,—যে, জীবনে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরহ কাহাকে বলে, জানে না,—সেই যক্ষ, আজ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে দূর পাহাড়ে নির্ব্বাসিত হইয়া একাকী পড়িয়া কাঁদিতেছে। বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেই নির্জ্জন গহন-বনে, তাহাকে একটি কথা বলিয়া সান্ত্বনা করে—এমন একটি প্রাণীও নাই। হতভাগা কখন জলে পড়িতেছে, কখন স্থলে উঠিতেছে, কখন বা হৃদয়ের বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার আশায়, পাষাণে বক্ষঃ চাপিয়া শয়ন করিতেছে, পরক্ষণেই আবার বসিতেছে, কত কি করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রাণ শীতল হইতেছে না; বরং হৃদয়ের অগ্নি-শিখা দাউ দাউ করিয়া ক্রমে প্রজ্বলিতই হইতেছে,—এমন সময়ে প্রণয়ীর সখা কালিদাস তথায় উপস্থিত। তিনি কল্পনার মোহন-মন্ত্রে মেঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যক্ষের দূত করিয়া দিলেন। যক্ষ সেই দূতের নিকটে প্রাণের কথাগুলি বলিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিল[২]।

ওদিকে অলকায়, বিষাদিনী চিন্তা-কৃশা যক্ষ-বধূ,—যাহার বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয়, সেই নিরাশ্রয়া যক্ষবধূর গত-প্রায় প্রাণ, কালিদাস, ভবিষ্যৎ-মিলনাশারূপ মৃগনাভি দিয়া কোন মতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

নিশীথ-সময়ে, প্রবাস-গত নরপতির 'স্তিমিত-প্রদীপ' জনহীন শয়ন-কক্ষে, অকস্মাৎ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা 'অদৃষ্টপূর্ব্বা' বনিতার,—তড়িন্ময়ী দিব্য ললনার আবির্ভাবে চমকিত হইয়া, শয়ান নর-নাথ যখন, 'পূর্ব্বার্দ্ধ-

১—কুমার, ৩য় ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৭।

২—মেঘদূত।

বিসৃষ্ট-তল্প' হইয়া, সেই সহসোপনতা কামিনীকে, 'তুমি কে, কি করিয়া আমার এই অর্গলবদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিলে ?—

'যোগ-প্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে,—
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাম্,
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্'—

বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, এবং সেই অনাথা আবার যখন,

'তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীত-নাথাং
জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাং'—

বলিয়া, সজল-নয়নে ও গদ-গদ-বচনে, আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন,—করুণ-হৃদয় কালিদাস তখন তথায় বর্ত্তমান[১]।

জ্যোৎস্নাময়ী ননীর পুতলী, রাজা ও রাণীর ঘর-আলো-করা, প্রাণ-আলো-করা কন্যা, ছোট ছোট সখীগণের সঙ্গে মন্দাকিনী-সৈকতে বালির ঘর বাঁধিতেছে, পুতুলের বিবাহ দিতেছে, ঘুঁটি খেলিতেছে—কালিদাস তথায় উপস্থিত[২]।

অপুত্রক নরপতির কত সাধ্য-সাধনার ধন, কত দুষ্কর তপস্যার ধন, কত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সিংহের মুখে আত্ম-সমর্পণ করিয়া,—পাওয়া পুত্ররত্ন, তাহার ধাত্রীর কথা শুনিয়া আধো আধো কথা কহিতেছে, ধাইমার আঙ্গুল ধরিয়া সবে হাটিতে শিখিতেছে, 'নমো কর' বলিলেই সরল শিশু মস্তক নত করিতেছে। স্নেহের পুত্তলির এই ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপার-দর্শনে পিতা কি-জানি-কি আনন্দ-তন্দ্রায় অবশ হইয়া বালককে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, বুকের মধ্যে যে বুক, তাহার মধ্যে

১—রঘু, ১৬শ ৪, ৬, ৭, ৯ "তোমার ত কোন যোগপ্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না; শিশিরমথিতা মৃণালিনীর ন্যায় তোমার আকৃতি বিষাদময়ী কেন ?

"রাজন্! আমি হতভাগিনী সেই জনহীন অযোধ্যার অনাথা অধিদেবতা।"

২—কুমার, ১৯২৯।

চাপিয়া ধরিতেছেন। সুখে, মোহে, জড়তায় সন্তান-বৎসল জনকের নয়ন আপনিই নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কালিদাসের অনুগ্রহে, নিত্যানুভূত হইলেও যেন অননুভূত-পূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর এই চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি[১]।

পুত্র-হীন সংসার-বিরক্ত শূন্য-হৃদয় নরপতি, দূর হইতে কা'র যেন একটি শিশুর অকারণ-হাস্য-পরিপূর্ণ, কুন্দ-কুট্মল-নিভ-ক্ষুদ্র-দশন-মুক্তা-সমুজ্জ্বল, অব্যক্ত মধুর-বচন, মুগ্ধ-সুন্দর মুখ দেখিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন যে,—এজগতে এতাদৃশ দুর্লভ রত্নে যে বঞ্চিত, তাহার জীবন বৃথা, এই প্রকার ধূলি-ধূসর বালকের অঙ্গের ধূলিতে যাহাদের দেহ পবিত্র নহে, এই রূপ সংসার-ললাম যাহারা অঙ্কে স্থান দিতে পায় না, তাদৃশ পিতামাতার জীবন বিড়ম্বনা-ময়, তাহারা হতভাগ্য; হায়! আমি অপুত্রক, এ রত্নে বঞ্চিত, আমি হতভাগ্য, আমি অধন্য! ক্ষিতীশ্বর আজ অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে নিজের পুত্রকে চিনিতে না পারিয়া, পরের পুত্রভ্রমে, এই ভাবে মনে মনে কত আন্দোলন করিতেছেন। এ বড় সুন্দর চিত্র! কালিদাস এক এক খানি করিয়া, এ সব ছবিই আমাদিগের জন্য, অতি স্পষ্ট-ভাবে, চিত্রিত করিয়াছেন[২]।

রাজার কন্যা, রাজার ভগিনী, অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকা—অদৃষ্টদোষে দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া, ভিখারিণীর বেশে নানা দেশে পর্য্যটন করিতেছেন, অন্য এক নরপতির অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া পরিচারিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। বয়ঃক্রম অতি অল্প। তাঁহার বেদনার পরিসীমা নাই। কালিদাস তাঁহার সহায় হইয়াছেন[৩]।

১—রঘু ৩য়, ২৫ ২৬।

২—শকুন্তলা, ৭ম, আলক্ষ্য-দন্ত-মুকুলাননিমিত্ত-হাসৈরব্যক্তবর্ণরমণীয়-বচঃ-প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়-প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি॥

৩—মালবিকাগ্নিমিত্র।

অথবা একটি একটি করিয়া কত দেখাইব? এইরূপ যত প্রকার সুন্দর ছবি কল্পনায় আসিতে পারে, তোমার আমার কষ্টকল্পনায় নহে, কালিদাসের কল্পনায়—বাণীর বরপুত্রের কল্পনায় উদিত হইতে পারে, কল্পনা-রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বর কালিদাস, তাহা বাছিয়া বাছিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কল্পনাদেবীর বিমল প্রভা পৃথিবীর—অথবা পৃথিবীর কেন, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলের, ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমানের, সকল মনোরম পদার্থের উপরেই সমভাবে বিরাজমান। সমগ্র ভারতবর্ষ তদীয় কল্পনা-সুন্দরীর লীলাক্ষেত্র। বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যখন ভারতের তাবৎ রাজন্যবর্গকে সমবেত করিয়া, প্রগল্‌ভা পরিচারিকা সুনন্দার দ্বারা, কালিদাস, প্রত্যেক নৃপতির নিজ নিজ রাজত্বের বর্ণনা করাইতেছেন, বংশের বর্ণনা করাইতেছেন,—

'কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে
রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্।' ১

বলিয়া, কল্পনাবলে, মগধেশ্বরের লুপ্ত-গৌরবের স্মৃতি, সমবেত, নবাভ্যুদিত, তরুণ নরপতিগণের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতেছেন, যাঁহার রাজ্যে যাহা কিছু সুন্দর, উল্লেখ-যোগ্য, তাহাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার প্রভাব-দর্শনে সত্য সত্যই অবাক্—স্তম্ভিত হইতে হয়। যুবরাজ রঘুর দিগ্বিজয়-কালে, যে ভাবে তিনি, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মানচিত্র, পৃথক্ পৃথক্ রূপে, পাঠকের নয়নের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

✓অতি অল্প কথায়, সুন্দর পদার্থ বর্ণন করিবার, সম্পূর্ণ-রূপে চিত্রিত

৩—রঘু, ৬ষ্ঠ, ২২। অন্য সহস্র সহস্র নৃপতি থাকুন, কিন্তু পৃথিবীতে 'প্রকৃত রাজা কে' বলিলে ইঁহাকেই বুঝায়। ইঁহার দ্বারাই ধরণী 'রাজন্বতী' অর্থাৎ শোভন রাজ-বিশিষ্টা।

করিবার, এবং সেই চিত্রে দর্শকগণের মনঃপ্রাণ বিমোহিত ও পরিপূরিত করিবার ক্ষমতা, কালিদাসের তুল্য, অন্য কোন কবির ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কালিদাসের এই ক্ষমতার নিদান হইল তাঁহার মাত্রা-জ্ঞান-নৈপুণ্য ও পর-হৃদয়-জ্ঞান-নৈপুণ্য।, কীদৃশ বিষয়ে পাঠক বা দর্শকের কিয়ৎ পরিমিত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহারা কতটুকু চান, তাহা সুদক্ষ মহাকবি বিশেষ ভাবে বিদিত ছিলেন। তিনি তুলাদণ্ডে যেন তাহা মাপিয়া লইতে জানিতেন। এই অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই কালিদাস 'কালিদাস', তিনি 'ভারবি' বা 'মাঘ' নহেন, তিনি 'বাণ' বা 'শ্রীহর্ষ' নহেন।

সুদক্ষ মণিকার যেমন, আকর-লব্ধ, অসংস্কৃত মণি, শাণোল্লিখিত করিয়া তাহার নৈসর্গিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত করিয়া লয়, আমাদের সুদক্ষ কবিও, তদ্রূপ, স্বকীয় প্রতিভাযন্ত্রের সাহায্যে, বর্ণনীয় পদার্থের অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক, তাহার স্বাভাবিক কান্তির স্ফুরণ করিয়া লইতেন। কোন্ স্থানে কোন্ পদার্থের কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনার প্রয়োজন, কোথায় কোন্ পদার্থের বিন্যাস করিলে রচনীয় বস্তু সুসমঞ্জস, চমৎকারী ও হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা তিনি যেন দিব্য-নয়নে দেখিতে পাইতেন। জগতের যাবতীয় পদার্থই কল্পনার রঞ্জনে রঞ্জিত করিব, বর্ণনার চাতুর্য্যে অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তুলিব, কবিজন-সুলভ এ দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। যাহা চিরদিনের মত, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সকল সময়ে সকল দেশের সকল সমাজবাসী মানুষের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে, যাহার সংস্কার পাষাণের রেখার ন্যায় মানবের হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত থাকিবে, তাদৃশ বিশুদ্ধ পদার্থ-নির্ব্বাচনে তিনি 'বৃহস্পতি' ছিলেন। যাহা ইহার পরিপন্থী, তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না। পর-হৃদয়-জ্ঞানে তাঁহার এতাদৃশী অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই, অন্যান্য কবির কাব্যের ন্যায় তাঁহার কাব্য পাঠে আমরা ক্লান্ত হই না।

একবার তাঁহার কাব্যে মনঃসংযোগ করিলে, তাহা এ জীবনে আর ছাড়িতে পারি না। তাঁহার কবিতার প্রকাণ্ডত্বে, নূতনত্বে ও সুন্দরত্বে আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া তুলে।

যখন দেখি, প্রজার অযথা-সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য, অযোধ্যার 'নূতন রাজা' রাম, তাঁহার সেই ধনুর্ভঙ্গ-পণ-লব্ধা, রাবণদর্প-নিকষোপল, প্রিয়তমা, সাধ্বী, সহধর্ম্মচারিণীকে, পাষাণে বুক বাঁধিয়া নির্ব্বাসিত করিতেছেন[১] ;—যখন দেখি, পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য, রাম অযাচিতোপনত রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যবদনে জটাবল্কল পরিধান করিতেছেন[২] ;—যখন দেখি, 'মাভূত্ পরীবাদ-নবাবতারঃ' বলিয়া, সজল-নয়নে ও গদ গদ-বচনে, 'মৃৎপাত্র-শেষ-বিভূতি' রাজা রঘু, 'গুরুদক্ষিণার্থী' ব্রহ্মচারীর আতিথ্য করিতেছেন[৩] ;—তখন, তাঁহার বর্ণনার প্রকাণ্ডত্বে, নূতনত্বে ও সুন্দরত্বে, কেমন যেন অবাক্ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি! আনন্দে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে মনঃপ্রাণ নত হইয়া আইসে! সংসার ভুলিয়া যাই! তন্ময় হইয়া পড়ি!

কালিদাসের রামের কাছে ভারবির অর্জ্জুন বা মাঘের শ্রীকৃষ্ণ নিষ্প্রভ, কালিদাসের দিলীপের কাছে নৈষধের নল অকিঞ্চিৎকর, কালিদাসের কুশের নিকটে বাণভট্টের চন্দ্রাপীড় বা শ্রীহর্ষ উল্লেখযোগ্যই নহে। কালিদাসের সীতা, শকুন্তলা, মালবিকা, ধারিণী, ঔশীনরী, উর্ব্বশী—ইঁহাদের প্রত্যেকেই যেন এক একটী নিরুপম সৃষ্টি। সর্ব্বোপরি কালিদাসের 'পর্ব্বতরাজ-পুত্রী উমা,' যাঁহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই।

যখন কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীতে দেখি যে, কামরূপিণী উর্ব্বশী নব-জল-সম্ভৃত মেঘের আকার ধারণ করিয়াছেন, আর রাজা পুরূরবা সেই মেঘময়ীর আশ্রয়ে আকাশপথে স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে চলিয়াছেন ;— যখন রঘুবংশে দেখি যে, দূর আকাশপৃষ্ঠে বিমানে বসিয়া রাম,—

১—রঘু, ১৪শ ৪৫। ২—রঘু, ১২শ ৭, ৮, ৯। ৩—রঘু, ৫ম ২৪।

বৈদেহী পশ্যামলয়াদ্‌বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্‌।
ছায়াপথেনেব শরৎ-প্রসন্নং আকাশমাবিষ্কৃত-চারুতারম্‌[১] ॥

বলিয়া, যাঁহার উদ্ধারের জন্য দুস্তর সমুদ্রকেও বন্ধন করিতে হইয়াছিল, সেই শান্তমূর্ত্তি সীতাকে, সে-ই সমুদ্র এবং সমুদ্রসেতু দেখাইতেছেন;— যখন দেখি, তিনি তাঁহার আদরিণী সীতাকে, আকাশে বসাইয়া, দূরে—অতিদূরে, ভূকণ্ঠে দোদুল্যমান একছড়া মুক্তার মালার ন্যায় প্রতিভাত মন্দাকিনীর ক্ষীণতনু দেখাইতেছেন;—

পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ[২]।

বলিয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গম দেখাইতেছেন;—তখন, কালিদাসের বিরাট কল্পনার বিচিত্র-প্রভাব-দর্শনে, আনন্দে, বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ি। মর্ত্তধাম ছাড়িয়া প্রাণ এক অচিন্তিতপূর্ব্ব অমৃতময় রাজ্যে উপস্থিত হয়। এ প্রকার কত দেখাইব?

মহাকবি কালিদাস, তদীয় অসাধারণ-ক্ষমতা-বলে এবং অলৌকিক প্রতিভালোকে, স্থল-বিশেষে, ব্যাস-বাল্মীকিকেও যেন কিয়ৎপরিমাণে নিষ্প্রভ করিয়াছেন। রামায়ণ বা মহাভারতে, যে যে বিষয় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হওয়ায়, পাঠকের ঈষৎ ধৈর্য্য-চ্যুতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থলে, কালিদাস অতি সতর্কহস্তে তাহার সংশোধন করিয়াছেন। যতটুকু বর্ণনা পাঠকের আকাঙ্ক্ষা-বারিণী সুতরাং হৃদয়-গ্রাহিণী হইতে পারে, অথবা যতটুকু বর্ণনায় পাঠকের আকাঙ্ক্ষার শেষ না হইয়া, সৌন্দর্য্য-দর্শন-লালসা আরও প্রবল হইয়া উঠে, তথায় মাত্র

১—রঘু, ১৩শ ২। বৈদেহি! ঐ দেখ, মলয় পর্ব্বত হইতে মদীয় সেতুর দ্বারা সমুদ্র বিভক্ত হইয়াছে, ফেনপুঞ্জে অম্বুরাশির কি শোভাই জন্মিয়াছে! দেখিলে মনে হয়, যেন শরতের নির্ম্মল, নক্ষত্র-ভূষিত আকাশ ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে!

২—রঘু, ৫৭। হে অনবদ্যাঙ্গি! ঐ দেখ, যমুনার কৃষ্ণতরঙ্গে গঙ্গার প্রবাহ মিশ্রিত হওয়ায় গঙ্গাযমুনার সঙ্গম কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে!

তৎ-পরিমিত বর্ণনা করিয়াই কালিদাস বিরত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যাস-বাল্মীকি অপেক্ষা তদীয় বর্ণনা পাঠকের অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছে। ঐ তাদৃশ সামর্থ্য, আত্ম-সত্তায় এত অধিক বিশ্বাস যদি তাঁহার না থাকিবে, তবে, যে দেশের প্রতি গৃহে, দীর্ঘকাল হইতে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পঠিত, গীত এবং ভক্তির সহিত শ্রুত হইয়া আসিতেছে, সেই দেশের সেই সমাজে, সেই রামায়ণ মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের তিনি পুনর্ব্বর্ণনা করিতে গেলেন কেন? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যে প্রকার দীর্ঘ, স্থলবিশেষে যে প্রকার উৎকট কল্পনায় অতিরঞ্জিত, তাহাতে, ঐ সমুদয় কাব্যের দ্বারা সহৃদয়গণের সম্পূর্ণ আনন্দরসানুভূতির কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে। তবে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যাস-বাল্মীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণন-প্রয়াস এক প্রকার বাতুলের কার্য্য। তাই পরম সারস্বত মহাকবি এক অতি সমীচীন পন্থা আশ্রয় করিয়াছেন। ব্যাস-বাল্মীকি, তাঁহাদের অমৃত-নিঃস্যন্দিনী কবিতায় যে সমুদয় বিষয়ের চমৎকারিণী বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস তাহার সবিস্তর বর্ণন করেন নাই। অতি অল্প কথায়, দুই একটী শ্লোকে, যেটুকু না বলিলে নয়, মাত্র সেইটুকু বলিয়াই তাহার শেষ করিয়াছেন। আর যে সমুদয় বিষয়ের বর্ণনা ব্যাস-বাল্মীকি কর্ত্তৃক অতি সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, বা যে সমুদয় স্থল তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন, নিপুণ কবি কালিদাস, সেই সমুদয়ের অতিবিস্তৃত, সম্পূর্ণ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন, সহৃদয়-নয়নে এক অদৃষ্টচর দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়াছেন। কালিদাসের সমগ্র গ্রন্থাবলীই এই ধ্রুব সত্যের উপর—এই মহাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই রামায়ণ মহাভারতে যাহা সবিস্তর বর্ণিত, কালিদাসের কাব্যে তাহার অতি সামান্য ভাবে নির্দ্দেশ এবং ঐ ঐ গ্রন্থে যাহা সংক্ষেপে লিখিত, কালিদাস-গ্রন্থে তাহার সবিস্তর বর্ণন দেখিতে পাই। সুতরাং ব্যাস-বাল্মীকির সহিত বা অপরাপর পুরাণ-

কর্ত্তৃগণের সহিত, কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া, কালিদাসের কখনও কোন রূপ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। তুলনার অবসর ঘটে নাই। দুরদর্শী মহাকবি নিজেই সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, এই কারণেই তদীয় রচনা, সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বা পরে, সংস্কৃত ভাষায়, যিনি যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন খানিও চমৎকারিতায় বা হৃদয়-গ্রাহিতায়, কালিদাস-রচনার ত্রি-সীমায়ও পৌঁছিতে পারে নাই। তাহার রচনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই সুমধুর। তদীয় রচনার প্রতিবর্ণে প্রসাদ এবং মাধুর্য্য-গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার উপমার তুলনা নাই। অপর কোন দেশের কোন কবি উপমা-সম্পদে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ কি না, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ভারতের অন্য কোন কবিই যে, অতি সংক্ষেপে, সর্ব্বলোক-বিদিত বিষয়ের উপমা-প্রদানে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তাঁহার উপমা-প্রয়োগের এমনই কৌশল যে, উপমান ও উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য-বোধে কাহারও কোন প্রকার প্রয়াস করিতে হয় না। অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রচলিত বিষয়ের সহিত তিনি কদাচ কোন পদার্থের উপমা দেন নাই। তাঁহার শব্দ-বিন্যাস-নৈপুণ্য এত অধিক ছিল যে, তদীয় কাব্যাবলীর কোন স্থানের কোন একটী শব্দ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা যায় না। তাহার এক একটী শ্লোক যেন এক একখানি ছবি। শ্লোকাবৃত্তির পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মানস-পটে যেন একখানি মনোহারিণী প্রতিকৃতি আপনিই আসিয়া উদিত হয়। যখন তাঁহার—

> কার্য্যা সৈকত-লীন-হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
> পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণ-হরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।

শাখা-লম্বিত-বল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণ-মৃগস্য বাম-নয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥[১]
স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥[২]

প্রভৃতি কবিতা পাঠ করি, তখন, বহির্নয়নে কবিতাক্ষর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, অন্তর্নয়নে যেন এক এক খানি অনুপম আলেখ্য দর্শন করি। চিরদিনের মত, সে আলেখ্য হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই, কোন কবির হয়ত রচনাশক্তি অতীব মনোহারিণী কিন্তু কল্পনাশক্তি তাদৃশ চমৎকারিণী নহে; কাহারও বা কল্পনাশক্তি নিরতিশয় হৃদয়-গ্রাহিণী, পরন্তু রচনাশক্তি প্রশংসনীয়া নহে। কিন্তু কালিদাস, কি রচনা-শক্তি, কি কল্পনা-শক্তি, উভয় সম্পদেই সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তদীয় কল্পনা এবং রচনা—উভয়ে সমবেতভাবে, ভাগীরথীর স্রোতের ন্যায়, অক্লিষ্ট ও অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ প্রয়োগের জন্য, বা কোন স্থলে প্রকৃতোপযোগী কোন

১—এ চিত্রের এখনও অনেক বাকী। এখনও মালিনী নদী অঙ্কিত হয় নাই, তাহার সৈকতে হংস-মিথুনশ্রেণি দলে দলে খেলা করিতেছে—অঙ্কিত হয় নাই। মালিনীর উভয়তীরে হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বত, আর সেই পর্ব্বতসমূহে হরিণগণ নির্ভয়ে নিমগ্ন—অঙ্কিত হয় নাই। আমার বাসনা যে, আশ্রমতরুরাজির শাখায় তাপসগণের বল্কল বিলম্বিত রহিয়াছে, আর সেই তরুতলে, কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গে মৃগী তাহার বামনয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে—এইটী অঙ্কিত করি। শকুন্তলা ৬ষ্ঠ।

২—তিনি দেখিলেন, কামদেব তাঁহার প্রতি বাণ প্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ধনুর্গুণ-ধারী তাঁহার মুষ্টি দক্ষিণ চক্ষুর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সমানীত হইয়াছে, দুই স্কন্ধ অবনত, বাম চরণ কিঞ্চিৎ বক্রীকৃত এবং ধনুক যতদূর সম্ভব আকৃষ্ট হওয়াতে মণ্ডলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। কুমার-৩য়-৭ম। (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য)।

ভাব প্রকাশের জন্য, তাঁহাকে অণুমাত্রও চিন্তা করিতে হয় নাই। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমে ত্রিবেণী যেমন পবিত্র ও সর্ব্বজন-কাম্য, ভাব, কবিত্ব এবং রচনার সমাবেশে কালিদাসের গ্রন্থও তদ্রূপ পবিত্র ও সর্ব্বজন-সেব্য। তিনি মাহেন্দ্রক্ষণে, তাঁহার ইহলোক এবং পরলোকের উপাস্য দেবতাকে—

বীণা-রঞ্জিত-পুস্তক-হস্তে !
ভগবতি ! ভারতি ! দেবি ! নমস্তে,

বলিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণাম ও আরাধনা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার পূজার পবিত্র নির্ম্মাল্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতবর্ষের অধিবাসী—সকলেই পবিত্র ও কৃতকৃত্য হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কুমারসম্ভব।

যদ্যপি সংস্কৃত সাহিত্যের নাম করিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে কালিদাসের রঘুবংশের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে, তথাপি কতিপয় কারণে, তৎপ্রণীত 'কুমারসম্ভব'-নামধেয় মহাকাব্য তদীয় রঘুবংশের পূর্ব্ব-বিরচিত, সুতরাং তাঁহার প্রথম মহাকাব্য বলিয়া অনুমিত হওয়ায়, কুমারসম্ভবের আলোচনাই প্রথমতঃ কর্ত্তব্য।

কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশের রচনা-প্রণালী ও ঘটনার সমাবেশ বিচার করিয়া দেখিলেই কুমার যে রঘুর পূর্ব্ববর্ত্তী, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কুমারের যে সমুদয় অংশ অতীব হৃদয়-গ্রাহী, যে সমুদয় ভাব চিত্তের একান্ত আহ্লাদ-জনক, রঘুবংশে সে সমুদয়ের অধিকাংশকেই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কুমার অপেক্ষা রঘুতে বিশেষ এই যে, কুমারের যে সৃষ্টি সুচারু, রঘুতে তাহা সুচারুতর। পক্ষান্তরে, কুমারের যে সকল স্থলে ঈষৎ অপরিপক্কতার উপলব্ধি হয়, কালিদাসোচিত রচণা-নৈপুণ্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়, রঘুতে সে সমুদয় স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। রতিবিলাপ এবং অজবিলাপ, পার্ব্বতীর বিবাহ ও ইন্দুমতীর বিবাহ, হিমালয়গৃহে জামাতা চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ও বিদর্ভ-পতিগৃহে কুমার অজের শোভাযাত্রা—একত্র মিলাইয়া পাঠ করিলেই এ কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। কুমারের উক্ত-স্থান-সমূহে যে সকল বিষয় বর্ণিত, রঘুতে প্রায় সে সমস্তই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, কোন কোন স্থলে কুমারের অনেক শ্লোক পর্য্যন্ত অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, কোন স্থলে বা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সেই ভাবেরই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। ফলতঃ কুমারসম্ভবে কালিদাস যে সকল হিরণ্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন, রঘুবংশে তাহাদের অধিকাংশকেই যেন হীরক-মুক্তা-খচিত অনবদ্য

আভরণে সজ্জিত করিয়াছেন। তাই বলিতে ইচ্ছা করে যে, কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ব্ব-রচিত।

আর এক কথা। কুমারের নায়ক-নায়িকা হর-পার্ব্বতী, উভয়েই স্বর্গের দেবতা, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলের উপাস্য। আর রঘুবংশের প্রতিপাদ্য পুরুষগণ, মর্ত্তের—ভারতের সর্ব্বপ্রধান নরপতির বংশীয়, বৈবস্বত মনুর বংশধর। একের লীলাস্থল স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল, অন্যের লীলাস্থল কেবল মর্ত্তধাম। ইহাও ভাবিবার একটি প্রধান বিষয়। নবীন কল্পনায়—প্রথম কল্পনায়, এমন পদার্থ বর্ণন করাই সঙ্গত, যাহাতে কবির অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা (unbounded imagination) যথেষ্ট প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রায়শঃ ইহাই হইয়া থাকে। মর্ত্তবাসীর নয়নে, সুকবির অঙ্কিত, অদৃশ্য-জগতের চিত্র মনোজ্ঞ হইবারই কথা। কিন্তু মর্ত্তবাসীর নয়নে, মর্ত্তলোকের বর্ণনা,—নিয়ত পরিদৃষ্ট চিরপরিচিত পদার্থের বর্ণনা চমত্কারিণী করিয়া তুলা বড়ই কঠিন। অতীন্দ্রিয় পদার্থের বর্ণনে কবির পর্য্যাপ্ত প্রভুত্ব আছে, সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নিত্যানুভূত পদার্থের বর্ণনে কবিকল্পনা অনেকটা সংযত, পাঠকের অভ্যাসানুগত। উহাতে অতিরঞ্জনের প্রভাবকে খর্ব্ব করিতে হয়। তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীর বর্ণনকালে তাহাতে সোণার কমল ফুটাইতে পার[১], তাহার সিকতা কাঞ্চনময়ী করিতে পার[২],—সমস্তই

১—কুমার, ২য় সর্গ, শ্লোক ৪৪ :—

মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃ শেষং দিগ্‌বারণমদাবিলম্।
হেমাম্ভোরুহশস্যানাং তদ্বাপ্যো ধাম কেবলম্॥

২—মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক ৪ :—

মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনক-সিকতা-মুষ্টি-নিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥

সম্ভব ; কিন্তু মর্ত্তের ভাগীরথীর বর্ণন-সময়ে, তোমাকে, বিশেষ সতর্কতার সহিত, মর্ত্ত্য-হৃদয়ের বশে চলিতে হইবে। যাহা দেখি নাই, তাহা তুমি আমাকে তোমার কল্পনাবলে দেখাইতে পার, দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পার ; কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, যাহার সৌন্দর্য্য-দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি, সেই সকল অনুভূত পদার্থের প্রতিকৃতি-প্রদর্শন করিয়া তুমি আমাকে যে কতদূর বিস্মিত করিতে পারিবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। তাই প্রথমাবস্থায়, কালিদাস, লোক-নয়নের অতীত জগতের পদার্থ লইয়া, আরাধ্য ও ধ্যানগম্য দেব-দেবীর বৃত্তান্ত লইয়া, কাব্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হিন্দু আমরা যাঁহাদের নামোল্লেখেই দেহমন পবিত্র মনে করি, সে দিন সার্থক মনে করি, ভক্তিভরে যাঁহাদের নাম করিয়া প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি, এবং দিনান্তে দিনগত পাপক্ষয় করি, তাঁহাদের সম্বন্ধে যিনি যতই অতিরঞ্জন করুন, তাহা আমাদের আর্য্যহৃদয়ের অনুকূল বই প্রতিকূল হইবে না। সুতরাং তাদৃশ আরাধ্য দেবদেবীর বর্ণনে কবির অধিকারভূমি অতীব বিস্তীর্ণ। তাঁহাদের প্রভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া, কবি অকালে বসন্তের আবির্ভাব করাইতে পারেন[১], অকস্মাৎ 'আকাশভবা সরস্বতীর' সৃষ্টি করিতে পারেন[২]। তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য, কার্য্য, বিভূতি প্রভৃতি, কবি, যত ইচ্ছা, রমণীয়, অলৌকিক ও বিশাল করিতে পারেন। তাদৃশ স্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কবির কল্পনাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। কিন্তু ঐহিক পদার্থের বর্ণনকালে, কবিকে নিয়ত, ইহলোকের কল্পনার অধীন থাকিতে হয়। শরতের চন্দ্র তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিয়াছি। সেই শরচ্চন্দ্রের তুমি যদি বর্ণন করিতে যাও, তবে তোমাকে এমন কথা বলিতে হইবে, এমন সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইবে, যাহা আমার প্রাকৃত নয়নে প্রতিফলিত হয় নাই, অথবা প্রতিফলিত হইলেও যেমন করিয়া

১—কুমার, ৩।৩৪।

২—কুমার, ৪।৩৯।

দেখিতে হয়, সে ভাবে দেখি নাই, তবেই ত তোমার শরচ্চন্দ্র-বর্ণনা চমৎকারিণী হইবে। সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখ, অতীন্দ্রিয় পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বর্ণন করা বড়ই কঠিন কার্য্য। সাধারণে যাহা দেখেন, তাহা ত তোমাকে দেখাইতে হইবেই, পরন্তু তদতিরিক্ত কিছু যদি তুমি দেখাইতে না পার, তবে মর্ত্তের পদার্থ লইয়া কবিত্ব প্রকাশ করিতে কদাচ সাহসী হইও না। তাই কালিদাস, অতিমর্ত্ত্য চরিত্র উপজীব্য করিয়া কুমারসম্ভব বিরচন করিয়াছেন। তবে, হরপার্ব্বতীকে বর্ণন করিতে যাইয়া, কালিদাস অনেক স্থলে তাঁহাদিগের চরিত্র মর্ত্তের ধর্ম্মে আবিষ্ট করিয়াছেন। উদার মানব-প্রকৃতির অতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণে দেবদম্পতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দেবদেবীর আদর্শকল্প নির্ম্মল চরিত্রে অতি বিশুদ্ধ পার্থিব ধর্ম্মের ছায়াপাত করিয়া পার্থিব দর্শকের নয়ন রঞ্জন করিয়াছেন। সেই জন্যই হরপার্ব্বতীর চরিত্রের কোথাও কোথাও গৌণভাবে, বিশুদ্ধ মানব-প্রকৃতির বিশুদ্ধতম অংশের স্ফুরণ দেখিতে পাই। অনেক স্থলে মনে হয়, বুঝি কোন দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবদম্পতির অপার্থিব প্রেমের চিত্র দেখিতেছি। কিন্তু তাহাতেও আবার বৈচিত্র্য এই যে, সে মর্ত্ত্যধর্ম্মা প্রকৃতির কোথাও কোন প্রকার পার্থিব ভাবনার—ভোগলালসার লেশও নাই। তাই হরপার্ব্বতীর চরিত্র পার্থিবচ্ছায়া-সম্পন্ন হইয়াও অপার্থিব ও অনুপম।

অতিমর্ত্ত্য-চরিত-কুমারসম্ভব রচনার পর, কালিদাস এমন চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে মর্ত্ত্য ও অতিমর্ত্ত্য—উভয়েরই সন্নিবেশ আছে। সে চরিত্র মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষবধূর। তাঁহারা স্বর্গের দেবযোনি হইয়াও মর্ত্তের ভাবনার ও লালসার অধীন। তাঁহাদের বর্ণনায় স্বর্গমর্ত্ত উভয়ের সম্মিলিত চিত্র আছে। তাহাতে যেমন জড় মেঘের দৌত্য আছে, 'কনক সিকতা-মুষ্টির' ক্রীড়া আছে, তেমনই আবার কাঞ্চন-নির্ম্মিত 'বাস-যষ্টির' উপরে ময়ূরের তালে তালে নর্ত্তন আছে, মুগ্ধা যক্ষবধূর স্বর্ণবলয়ের রুণু রুণু শিঞ্জিত আছে, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মিশ্রণ আছে। কিন্তু

তাহাতে একটি পদার্থ নাই—আদর্শ নাই। যে আদর্শে সমাজের উপকার হইবে, কাব্য-প্রণয়নের মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে, সে নিরবদ্য আদর্শ নাই। তাহাতে চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রাপ্তি-রূপ প্রতিজ্ঞা সাধিত হয় নাই।

তাই পরে, যখন নিজের ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন কবি, রঘুবংশে নিরবচ্ছিন্ন মর্ত্তের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সমাজ-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, মর্ত্তের বরেণ্য রাজবংশের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। সে চরিত্র ভারতবাসীর নিত্য পরিচিত, নিত্য পূজিত। রঘুবংশে অতিমানুষিক বর্ণন অতি কম। অধিকাংশই স্বাভাবিক। তবে সে সমুদয় চিত্র মহাকবির বিদ্যুৎ-প্রতিম-প্রতিভালোকে এমনি আলোকিত, যে, চির পুরাতন হইলেও, নূতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল কারণেই মনে হয়, কালিদাস প্রথমে কুমারসম্ভব, পরে মেঘদূত, তার পর রঘুবংশ নিম্মাণ করেন। কুমারে দেবদেবীর বিষয়, প্রধানতঃ স্বর্গের বিষয়, মেঘদূতে ঠিক দেবতা নয়, মাঝামাঝি—দেবযোনির বিষয়, স্বর্গ ও মর্ত্তের বিষয়, আর রঘুবংশে কেবল মর্ত্তের বিষয়, ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের বিষয়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দেবতা, পরে দেবযোনি, তারপর মানুষ—এই ত্রিবিধ স্তরে কালিদাসের বর্ণনা বিভক্ত।

কালিদাসের নাটকাবলীরও এই প্রকার ক্রম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—প্রথমে বিক্রমোর্ব্বশী, তাহাতে মর্ত্ত্য-অতিমর্ত্ত্য—উভয়বিধ বিষয়ের সন্নিবেশ আছে। কিন্তু মেঘদূতের ন্যায় তাহাতেও সমাজ শিক্ষার উপযোগী, উজ্জ্বল আদর্শ নাই। পরে মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল। এই গ্রন্থদ্বয়ে মর্ত্তের বিষয় অতিমর্ত্ত্য পদার্থ অপেক্ষাও সুচারুতর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ককেও, কালিদাস, আদর্শ-চরিত্র-সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তাই বোধ হয়, সর্ব্বশেষে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলা উভয়কেই অনিন্দ্য-চরিত্রের আধার

করিয়া, উজ্জ্বল-আদর্শ-চরিত্র-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমার, মেঘদূত এবং রঘুবংশের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই রূপই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু নিম্নোক্ত যুক্ত্যনুসারে ইহার বৈলক্ষণ্যও উপলব্ধ হয়।"

কালিদাস অসামান্য কল্পন-শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে, যখন মানব নিজের জন্যই ব্যগ্র থাকে, আপনার চিন্তা ব্যতীত পরের চিন্তা করিতে ততদূর সমর্থ হয় না, সেই সময়ে, জীবনের সেই প্রভাতকালে, নবীন কবি বোধ হয়, মেঘদূতের সৃষ্টি করেন। মিলন অপেক্ষা বিয়োগে প্রণয়ের চিত্র সমধিক পরিস্ফুট হয়, উহার বাস্তব স্বরূপ এবং দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়; তাই কবি, চিরবিলাসমগ্ন বিরহীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এত বড় বিশাল ভারতবর্ষে তিনি তাঁহার মনের মত নায়ক নায়িকা খুঁজিয়া পাইলেন না, মনের মত ভোগের ভূমি খুঁজিয়া পাইলেন না, তাই কবি, তাঁহার সেই নবীন, অবারিত প্রতিভার প্রখর আলোকে, ভারতবাসীর সম্মুখে, মানব-কল্পনার অতীত, স্বর্গের ভোগময়ী ভূমির চিত্র উদ্‌ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও কবির পরিতৃপ্তি হইল না। তিনি ক্রমে বুঝিলেন যে, ভোগের চিত্র অনুপম হইয়াছে সত্য, কিন্তু জগতে ভোগই ত আর্য্য-হৃদয়ের চরম প্রার্থনীয় নহে, ভোগ অপেক্ষাও ত সাধুতর উচ্চতর বস্তু আছে, একবার সেই দিকটা দেখিতে হইবে। মেঘদূতের নায়কের দৃষ্টান্তে যদি লোক-শিক্ষা হয়, তাহা হইলে, সমাজে হিত অপেক্ষা অহিতের আশঙ্কাই অধিক। তাই কবি আরও উচ্চে উঠিলেন। স্বর্গের নটরূপ যক্ষের চরিত্র ছাড়িয়া, এবার তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের নাটের যিনি প্রধান গুরু, সেই নিষ্কাম, শ্মশান-চারী, বিভূতি-ভূষণ, নীলকণ্ঠের পবিত্র আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। যেমন শঙ্কর, তাঁহার তেমনই অনুরূপিণী শঙ্করীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। সে শঙ্কর শঙ্করীর প্রেম অদ্ভুত, অনুপম। তাহাতে ভোগের গন্ধ নাই। বাসনার লেশ নাই।

অমন আদর্শ প্রেম আর হয় না। ওরূপ মহান্ আদর্শ মানবের পরিমিত-হৃদয়ের ধারণার অতীত। অতবড় বিরাট মূর্ত্তি, ক্ষুদ্রশক্তি মানব-নয়নের প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ীভূতই হইতে পারে না। তাই কবি, শেষে মর্ত্তের দিকে অবতরণ করিলেন। দেবতার দৃষ্টান্ত অপেক্ষা মানবের দৃষ্টান্তে মানব-হৃদয় সহজেই বশীভূত ও গঠিত করা যায়—এই জন্যই রঘুবংশের সৃষ্টি করিলেন। পুরুষোত্তম রাম এবং মানবী দেবী সীতার আদর্শ চিত্রিত করিলেন। এই কারণে মেঘদূতকে কুমারের পূর্ব্ববর্ত্তীও বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কুমারের বৃত্তান্ত।

কুমারসম্ভবের "স্থূলবৃত্তান্ত এই—তারক নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দ্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে, পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ-সংহার করিয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন; তদনুসারে দেবতারা উদ্‌যোগী হইয়া হরগৌরীর" প্রণয়-সম্পাদনার্থে কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সমাধিস্থ বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গে উদ্যত হইলে, বিষম-নেত্রের রোষ-কষায়িত-ললাট-নয়ন-নির্গত অগ্নি-শিখা, তাহাকে ভস্মীভূত করে। পরে হরগৌরীর পরিণয় সম্পাদন হয় এবং "কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্যের সমভিব্যাহারে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইয়া দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃস্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারুরূপে কুমারসম্ভবে, সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।"

"কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একেবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও এক প্রকার অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, বোধ হয়, তাহার হেতু এই,—অষ্টম সর্গে হর-গৌরীর বিহার-বর্ণনা আছে, তাহাও সামান্য নায়ক-নায়িকার বিহারের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হরগৌরীর কৈলাস গমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের

জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হরগৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতার সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীর বিহার বর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্য গ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম নবম এবং দশম এই তিন সর্গের দোষে ইহারাও একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে[১]।”

কুমারসম্ভব সম্বন্ধে, বহুশাস্ত্রবিৎ, মনস্বী ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অভিমত। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে তদীয় ‘কাব্য-প্রকাশ’ গ্রন্থে, এবং বিশ্বনাথ ‘সাহিত্য-দর্পণে’ রসদোষ-প্রসঙ্গে কালিদাস-কৃত হরপার্ব্বতীর সম্ভোগ বর্ণনার অনৌচিত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুমারসম্ভব বিষয়ক উক্ত অভিমত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে।

কুমারসম্ভবের অন্য অংশ না হউক, অষ্টম সর্গ, যাহা বর্ত্তমানে কালিদাস-প্রণীত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহা যে প্রকৃতই কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রথম রচনা একেবারে নির্দ্দোষ হওয়া অসম্ভব। তাই কালিদাস, কুমারের যে যে স্থল কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন, তৎসদৃশ স্থল সমূহ রঘুবংশে সংশোধিত করিয়াছেন। হরপার্ব্বতীর বিবাহ ও অজ ইন্দুমতীর বিবাহ এবং রতিবিলাপ ও অজবিলাপ মিলাইয়া পড়িলে,

১—বিদ্যাসাগর।

এ সিদ্ধান্ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কুমারের অষ্টম ও রঘুর ত্রয়োদশ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নগেন্দ্রনন্দিনী উমা প্রথমবারে, সৌন্দর্য্যে বিরূপাক্ষের হৃদয় জয় করিতে যাইয়া, মদন-ভস্মের পর অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি চন্দ্রশেখরের প্রসাদ লাভ করিলেন। আজ পার্ব্বতী সেই বহু-তপস্যা-লব্ধ ধনের সহিত—সেই চির-বাঞ্ছিত দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। যাঁহার জন্য পার্ব্বতীর সেই জীবন-পাতিনী তপস্যা, অত কষ্ট, পরিণয়ের পর, সেই হৃদয়েশ্বরের সহিত পিতৃগৃহে কিয়দ্দিন বাস করিয়া উভয়ে একসঙ্গে কিছুকাল নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মেরুপর্ব্বতে যাইয়া মহাদেব কত আদরে কত সন্তর্পণে গৌরীকে স্বভাবের কত শোভা দেখাইলেন। কখন সোণার পল্লবের সুখশয্যায় তাঁহারা ফুলশয্যা করিতেন। কখন চন্দ্রকান্ত-মণিময় শিলাতলে তাঁহারা উপবেশন করিতেন। কখন কৈলাস পর্ব্বতে, বিমল চন্দ্রালোকে, দুইজনে দুইজনের অন্তঃকরণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া আনন্দ-নিমীলিতাক্ষ হইতেন। মলয় পর্ব্বতে যখন তাঁহারা বিচরণ করেন, তখন চন্দনবনের ধীর দক্ষিণ সমীর, লবঙ্গ কেশর উড়াইয়া আনিয়া, সেই দেবদম্পতির গাত্র-মার্জ্জন করিয়া দিত। একদিন অপরাহ্নে, যখন দিনমণি অস্তগমনোন্মুখ, সেই সময়ে শঙ্কর শঙ্করীর সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত। উভয়েই একখণ্ড কাঞ্চন শিলাতলে উপবেশন করিলেন। শঙ্কর, বাম-বাহুদ্বারা নগেন্দ্রনন্দিনীকে বেষ্টন পূর্ব্বক অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী করিয়া, অস্তাচলগামী তপনের শোভা দেখাইতে লাগিলেন। ক্রমে মহাদেব একটি একটি করিয়া—কখনো ভূধর শোভা, কখনো পৃথিবীর শোভা, কখনো আকাশের কান্তি, কখনো মন্দাকিনীর কান্তি, কত-কি-ই না পার্ব্বতীকে দেখাইলেন। তৎকালে হরপার্ব্বতীর প্রসন্ন হৃদয়ের ন্যায়, পৃথিবীর যাবৎ পদার্থই যেন অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। যাবৎ পদার্থই যেন

তাঁহাদের সেবায় রত। মহাদেব, ইতস্ততঃ যাহা দেখেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে সমস্তই তদীয় তপঃক্লশা হৃদয়েশ্বরীর পরিচর্য্যার জন্য উৎসুক। কুমারের অষ্টমের সেই সকল বর্ণনা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে, রামচন্দ্র যখন জানকীর সহিত আকাশ পথে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, তখন সেই স্থলে আমরা যে সকল নিরুপম চিত্র দেখিতে পাই, কুমারের অষ্টমে, যেন সেই সকল চিত্রেরই প্রথম রেখাপাত করা হইয়াছে। কুমারের ঐ অংশে, কোন কোন স্থলে ঈষৎ ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু রঘুর ত্রয়োদশে, তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা পরিপক্কভাব ধারণপূর্ব্বক, গিরিনির্ঝরের ন্যায় অপ্রতিহত গমনে চলিয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পাঠ করিলেই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। কুমারের অষ্টম সর্গের ২, ৭, ১০, ১৬, ৩২, ৩৪, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিলে, এই কল্পনার কর্ত্তা যে কালিদাস এ বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। তাদৃশ হৃদয়োন্মাদিনী প্রতিমা, কালিদাস ব্যতিরিক্ত আর কে নির্ম্মাণ করিতে পারেন?

মানুষ অভ্রান্ত নহে, সুতরাং কুমারের অষ্টম সম্বন্ধে হয়ত আমারও ভ্রম ঘটিতে পারে। নবমাদি সর্গ সম্বন্ধে মনস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমতই সর্ব্বথা আদরণীয়। ঐ অংশ যে কালিদাসের রচিত নহে, তাহার প্রামাণ্য পক্ষে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোকই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে।

> গঙ্গা-বারিণি কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি।
> স মগ্নো নির্বৃতিং প্রাপ পুণ্যভারিণি তারিণি॥ ১১-৩৬.

এই শ্লোকে প্রক্ষেপ-কর্ত্তা, মাত্র 'রিণি' অংশের সহিত অনুপ্রাস ও যমক রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্থের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। তাই 'রিণির' অনুরোধে 'গঙ্গা-বারিণির' পুণ্যভারিণি প্রভৃতি অদ্ভুত বিশেষণ দিয়াছেন। এই প্রকার—

সৌভাগ্যৈঃ খলু সুপ্রাপাং মোক্ষ-প্রতিভুবং সতীম্।
ভক্ত্যাত্র তুষ্টবুস্তাং তাঃ শ্রদ্দধানা দিবো ধুনীম্॥ ১১-৫১
মুক্তি-স্ত্রী-সঙ্গ-দূত্যৈস্তৈস্তত্র তা বিমলৈর্জলৈঃ।
প্রক্ষালিত-মলাঃ সস্নুঃ সুস্নাতাস্তপসান্বিতাঃ॥ ১১-৫২
স্নাত্বা তত্র সুলভ্যায়াং ভাগ্যৈঃ পরিপচেলিমৈঃ।
চরিতার্থং স্বমাত্মানং বহু তা মেনিরে মুদা॥ ১১-৫৩

প্রভৃতি কবিতাও যে কদাচ কালিদাসের কল্পনা-প্রসূত নহে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ঐ সমুদয় শ্লোক যেমনই কষ্ট-কল্পিত, তেমনই অপ্রাসঙ্গিক ও স্থলবিশেষে প্রস্তুতবিরোধী। কিন্তু এসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

কুমারের অষ্টম পর্যন্ত যে কালিদাস প্রণীত তাহা স্থির হইল। বিদ্যাসাগরের মতে সপ্তম পর্য্যন্ত কালিদাসের রচিত। তদতিরিক্ত অন্যের, কালিদাসের নহে। কালিদাসের রচিত অষ্টমাদি সর্গ বিলুপ্ত। সুতরাং কেবল অষ্টম সর্গ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তবে তিনি যে বলিয়াছেন, কালিদাসপ্রণীত নবমাদি সর্গ জগৎ-পিতা ও জগন্মাতার বিহার-বর্ণনাত্মক বলিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে,—এ সম্বন্ধে আমাদের অন্য প্রকার মনে হয়।

জগতের মাতা-পিতৃস্থানীয় উমা-মহেশ্বরের বিহার প্রভৃতি বর্ণিত হওয়াতেই যে কালিদাসের কবিতার একেবারে বিলোপ ঘটিয়াছে, ভারতের মনস্বি-হৃদয় হইতে কালিদাস-কবিতার স্মৃতিমাত্রও অন্তর্হিত হইয়াছে—ইহা স্বীকার করিতে প্রাণে ব্যথা লাগে। নবমাদি সর্গ-বিলোপের কারণ যদি ঐ-ই হয়, তবে, অন্যান্য বহু সংস্কৃত কাব্যের বহু স্থানের বহু কবিতা, বহু অংশও ত বিলুপ্ত হইবার কথা। তাহাদের অস্তিত্বের কারণ কি? যে সংস্কৃত সাহিত্যে—

'ত্রসন্তু যারাত্রি-সুতা-স-সম্ভ্রম-স্বয়ং-গ্রহাশ্লেষ-সুখেন নিষ্ক্রয়ম্[১]।

প্রভৃতি অনাবৃত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতে কালিদাসের সতর্ক কল্পনা-প্রসূত-চিত্রাবলী যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? বরং পুরাণাদিতে হর-গৌরীর বিহারাদির চিত্র যেরূপ মূর্ত্তিতে স্থান পাইয়াছে, কালিদাসের মার্জ্জিত-হস্তের পরিচ্ছন্ন চিত্রাবলী যে তদ্রূপ হইতেই পারেনা, ইহা সহজেই স্বীকার্য্য। মনে হয়, কালিদাস অষ্টম সর্গের অধিক আর রচনাই করেন নাই। মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হইলেই ত কুমারের 'সম্ভব' অর্থাৎ সম্ভাবনা হইল। তবে আর কেন? চতুর্ম্মুখ দেবতাদিগকে বলিয়াছেন—

উমা-রূপেণ তে যূয়ং সংযম-স্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টু ময়স্কান্তেন লৌহবৎ[২] ॥
তস্যাত্মা শিতি-কণ্ঠস্য সৈনাপত্যমুপেত্য বঃ।
মোক্ষ্যতে সুর-বন্দীনাং বেণীর্বীর্য্য-বিভূতিভিঃ[৩]॥

চতুর্ম্মুখের কথা তথা কালিদাসের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়াছে। উমা-মহেশ্বরের মিলন হইয়াছে। সুতরাং সেনাপতির 'সম্ভব' অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য শেষ হইয়াছে। তবে আর কেন? গ্রন্থবাহুল্যের প্রয়োজন কি? তাই কালিদাস বিরত হইয়াছেন।

১—মাঘ, ১ম সর্গ।

২—কুমার, ২-৫৯ :—মহাদেবের মন তপস্যাতে আসক্ত আছে, অতএব—পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্য দ্বারা, চুম্বক দ্বারা লৌহাকর্ষণের ন্যায়, তাঁহার চিত্ত তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতে হইবে।

৩—কুমার ২-৬১ :—সেই নীলকণ্ঠের পুত্র তোমাদিগের সেনাপতিপদ গ্রহণপূর্ব্বক, অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, বন্দীভূত দেব-মহিলাদিগের বেণীবন্ধ মোচনপূর্ব্বক বিরহিণীর বেশ দূর করিবেন।

বিশেষতঃ, তিনি দেখিলেন যে কুমারের নায়ক-নায়িকারূপে, জগৎ-পিতা ও জগন্মাতার যে অনুপম মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের যে অবাঙ্‌মনস-গোচর, অদ্ভুত, নিষ্কাম, পবিত্র প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে চিত্রের কোথাও যেন করস্পর্শ হয় নাই, সে চিত্রের কোথাও বাসনার লেশ নাই, লালসার গন্ধ নাই, ভোগের নামও নাই। সে চিত্রে আত্মসমর্পণ আছে, কিন্তু তাহা মুক্তির জন্য, ভোগের জন্য নহে; সে অগাধ-প্রেমে অদম্য আবেগ আছে, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তির উন্মেষণাও নাই, বরং তাহাতে নিবৃত্তিই বলবতী। এতাদৃশ যে বিরাট, বিশুদ্ধ, নিষ্কাম প্রেমের মূর্ত্তি, তাহার সম্বন্ধে যদি, ভোগ-ভূমি পৃথিবীর প্রবৃত্তিময় ভোগ-ক্লান্ত জীবের বিহারাদির ন্যায় বিহারাদির বর্ণনা করেন,—বর্ণনা ত দূরের কথা,—যদি তাঁহাদের উপর তাদৃশ জীবধর্ম্মের আরোপও করেন, তবে, হর-পার্ব্বতীর সেই অবাঙ্‌মনস-গোচর বিরাট্‌ প্রেমের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিল কৈ? সে অতুল মূর্ত্তির অতুলত্ব রহিল কৈ? তাই কালিদাস সংসারী জীবের যে বিচক্ষণ ক্ষেত্র, তাহার অনেক ঊর্দ্ধে হরপার্ব্বতীর স্থান দিয়াছেন। সামান্য জনের ন্যায়, তাঁহাদের বিহারাদির বর্ণনা করিয়া অঙ্গহানি করেন নাই। পরিণয়ের পর নবদম্পতির—না—না, কেবল পরিণয় নহে, অত তপস্যার, অত সাধ্য-সাধনার পর, মিলিত হর পার্ব্বতীর কাল যে ভাবে অতিবাহিত হইতে পারে, আর তাহার চিত্র আবার যত সুন্দর হইতে পারে, তাহা কালিদাস মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। তবে অত সুন্দর একটা ভাব কালিদাস উপেক্ষা করিতেও পারেন নাই। রঘুর ত্রয়োদশে, অপহৃত জানকীর উদ্ধারের পর, তাঁহার সহিত রামের মিলন করাইয়া, কালিদাস, হরপার্ব্বতীর বিহার-বর্ণনার আক্ষেপ মিটাইয়াছেন। তিনি কুমারে, দেবদেবীর দেবত্বে পাছে মানুষত্ব আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় হরপার্ব্বতীর সম্বন্ধে বর্ণনায় যে বিরত হইয়াছেন, রঘুতে রামসীতার সম্বন্ধে সেই বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদিগকে দেবত্বময় করিয়া তুলিয়াছেন।

এই কারণেই বোধ হয়, কালিদাস কুমারের অষ্টমের অধিক আর রচনা করেন নাই।

তিনি কুমার লিখিবার সময়েই বুঝিয়াছিলেন যে, দেবতার আদর্শে মানব-সমাজ গঠন করা যায় না, লোক-শিক্ষা দেওয়া চলে না। মানব-সমাজ শিক্ষিত করিতে হইলে মানবেরই উচ্চ আদর্শ চাই। তাই তিনি তখন হইতেই বোধ হয়, মানব-দেব রাম ও মানবী-দেবী সীতার চরিত্র বর্ণন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং কুমারের দেব-দেবীর সম্বন্ধে বর্ণনীয় বিহারাদি বিষয়ের সঙ্কল্পিত উপকরণরাজি, রঘুবংশের রাম-সীতার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হর-পার্ব্বতীর পবিত্র প্রেমের কথা তিনি ইষ্টমন্ত্রের মত হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি, যখন যে কোন উচ্চ আদর্শ গঠন করিতে গিয়াছেন, তখনই, সর্ব্বাগ্রে হর-পার্ব্বতীর পবিত্র চরিত তাঁহার মনে পড়িয়াছে। মানবের চরিত্র তিনি ঐ আদর্শে গঠন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। তাই, তাঁহার প্রধান প্রধান পুস্তকে, যে কয়খানিতে তিনি উৎকৃষ্ট নরনারীর আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমুদয়ের প্রারম্ভেই, ‘পার্ব্বতীপরমেশ্বরকে’ প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। রঘুবংশ, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা—সমস্ত কাব্যেই এই সত্য বিদ্যমান।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুমার ও পুরাণ।

কুমার-সম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতিতেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে রামায়ণের বর্ণিত বৃত্তান্ত এবং কুমার-বর্ণিত-বৃত্তান্তে প্রভেদ এই যে, রামায়ণে পার্ব্বতীর সহিত পরিণয়ের পর মদন-ভস্মের কথা বর্ণিত[১], আর কুমারে পরিণয়ের পূর্ব্বেই মদনকে ভস্মীভূত-করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর বড় বেশী প্রভেদ নাই। কিন্তু অন্যান্য পুরাণাদিতে ঠিক কুমারের বর্ণনার ন্যায়, হরগৌরীর বিবাহের পূর্ব্বেই মদনকে ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, ঐ সকল পুরাণের সহিত, কুমারসম্ভবের ইতিবৃত্তের যেরূপ সাদৃশ্য আছে, অনেক স্থলে, শ্লোকেরও সেই প্রকার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এমন কি, কুমারের অনেক শ্লোকও পুরাণাদিতে অবিকল পরিদৃষ্ট হয়[২]। এইক্ষণে প্রশ্ন এই

১—"কন্দর্পো মূর্ত্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। তপস্যন্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্॥ ১০ কৃতোদ্বাহং তু দেবেশং গচ্ছন্তং স-মরুদ্‌গণম্। ধর্ষয়ামাস দুর্ম্মেধাঃ হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা॥ ১১ অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন। ব্যশীর্য্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্ব্ব-গাত্রাণি দুর্ম্মতেঃ॥ ১২ তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দ্দগ্ধস্য মহাত্মনা। অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ॥ ১৩ রামায়ণ, বাল, আদি, ২৩শ সর্গ।

২—কুমার, ১ম ২৬ শ্লোক এবং ব্রহ্মপুরাণ, অধ্যায় ৩৪, শ্লোক ৮৫, ৮৬। কুমার, ৩য় ৬৩ শ্লোক এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ড, অধ্যায় ৩৯, শ্লোক ২৫। কুমার, ২য় ৬৩ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, অধ্যায় ৩৯, শ্লোক ৪০। কুমার, ৫ম—২০, ২৬ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৪০, শ্লোক ১৫, ১৭ প্রভৃতি। কুমার,—৫ম, ৭০, মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,—শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, অধ্যায় ৪১, শ্লোক ২৩—"মহাজনঃ স্মের-মুখঃ প্রতিমাত্রাত্ত-বিষ্যতি। তদিচ্ছামি বিভো দ্রষ্টুং সেনাঙ্কং তস্য শাম্ভবে। কর্ম্মবকাচ্ছিদং ধর্ম্মং জবক্তেব

যে, কালিদাস কি তবে, পুরাণাদির বৃত্তান্ত অবিকল ভাবে অবলম্বন করিয়া, এমন কি স্থল-বিশেষে পুরাণাদির শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া, কুমার-সম্ভব প্রণয়ন করিয়াছেন? ইহাত কিছুতেই মনে হয় না। কালিদাস যদি কাহারও নিকট ঋণী থাকেন, তবে সে যে, ব্যাস-বাল্মীকির নিকট, ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহাদের বর্ণিত শ্লোক পর্য্যন্তও যে আত্মসাৎ করিবেন, এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"কালিদাস অলৌকিক কবিত্ব শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, যে আপন কাব্যে অন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের রচনার সহিত সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে, কিন্তু উক্ত পুরাণাদির কোনও অংশের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।" বিশেষতঃ ঐ সমুদয় পুরাণ, অথবা উহাদের ঐ সমুদয় স্থান, "কুমার-সম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদ-ব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা-প্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া কোনও ক্রমে প্রতীতি হয় না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতর-বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন, যে, এই সকল এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক

মুমুক্ষবঃ। যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা॥ বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥ শিবপুরাণ, উত্তর খণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়। কুমার-সম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

'আকাশ-ভবা সরস্বতী। শফরীং হ্রদ-শোষ-বিক্লবাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥' যোগ-বাশিষ্ঠ, ভুশুকৈলাস, পৃ ১২৩। কুমার, ৪র্থ সর্গ। এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও আছে।

পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয় এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয় পুরাণ-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সমুদয়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে।” উহাদের কতিপয় বেদব্যাস রচিত, এবং অবশিষ্টগুলি, হয়ত; পরবর্ত্তিত-কালের যশোলিপ্সু গ্রন্থকারগণ প্রণয়ন পূর্ব্বক, বেদ-ব্যাস-রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নতুবা বেদব্যাস-রচিত বলিয়া এমন পুরাণও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে, সম্রাট আকবরের নামোল্লেখ আছে, লণ্ডন শব্দের নির্দ্দেশ আছে, আর সেই লণ্ডনের অধীশ্বরী “বিকটাবতী” বা ভিক্টোরিয়ার পর্য্যন্ত কীর্ত্তন আছে। সুতরাং বেদব্যাস-নামের সংযোগ থাকাতেই যে তাবৎ পুরাণ “বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্ব্বে রচিত, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, ও তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে, এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন। বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগ-বাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবে শ্লোকের ঐক্য আছে। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষি-প্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও অংশে সংশয় হইতে পারে না[১]।”

মনে হয়, কুমারসম্ভবের ইতিবৃত্তাংশটি, কালিদাস রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছেন। রামায়ণে হরগৌরীর বিবাহের বহুকাল পরে, তপস্যারত বিরূপাক্ষ কর্ত্তৃক মদন ভস্মীকৃত হইয়াছেন। কালিদাস দেখিলেন, ইহাতে লোকশিক্ষার আনুকূল্য হইতে পারে, কিন্তু চমৎ-কারিতার বিকাশ হয় না; তাই তিনি বিবাহের পূর্ব্বে মদনকে ভস্মীভূত করিয়া, পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যাভিমানের মূলচ্ছেদ-পূর্ব্বক, পরে আবার পার্ব্বতীরই অনুরোধে, বিবাহিত আনন্দমগ্ন আশুতোষের দ্বারা মদনের পুনরুজ্জীবন করাইয়াছেন। এই প্রকারে ইতিবৃত্তের কিয়ৎপরিবর্ত্তনে, রামায়ণের ঐ অংশ অপেক্ষা কালিদাসের ঐ অংশ সমধিক সুন্দরতর ও মনোহর হইয়াছে।

১ [illegible] বিদ্যাসাগর।

ব্যাস-বাল্মীকির বর্ণিত ইতিবৃত্তের এইরূপে ঈষৎ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা প্রয়োজনানুসারে পরিবর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতেও সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যেমন লোকশিক্ষা সমাজ-শিক্ষা এবং সর্ব্বজন-মনোরঞ্জনের জন্য রামায়ণাদি লিখিত হইয়াছে, তদ্রূপ কলা-শিক্ষার জন্য, সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনের জন্য, কেবল শিক্ষিত সামাজিকগণ ও কবিতারসামোদীদিগের জন্যও কাব্য প্রণীত হওয়া উচিত। তাই তিনি শেষোক্ত ভাবে কাব্য-প্রণয়ন করিয়াছেন। এই কারণেই রামায়ণ-বর্ণিত অংশের সহিত কুমারসম্ভবের বর্ণিতাংশের, এবং মহাভারত-বর্ণিতাংশের সহিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-বৃত্তান্তের ঈষৎ প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যে সমুদয় পুরাণাদিতে হর-পার্ব্বতীর বিবাহের পূর্ব্বে মদনকে ভস্মীভূত করা হইয়াছে, মনে হয় ঐ সকল পুরাণপ্রণেতারা কবি কালিদাসেরই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। কেননা, ঐ সকল গ্রন্থের হর-গৌরীর বিবাহ-বিষয়িণী বর্ণনার অধিকাংশই কুমারসম্ভবের ঐ অংশের অনুরূপ।

কালিদাস কুমার-সম্ভবের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া অতীব দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপর বাগ্‌দেবীর অপার করুণা ছিল, তাই তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; নতুবা, বোধ হয়, অন্য কোনও কবিই কুমারসম্ভবে হস্তক্ষেপ করিলে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

তাঁহার কুমারের প্রধান ব্যক্তি তিনজন,—পার্ব্বতী, মহাদেব ও মদন। কাব্যের যিনি নায়িকা তিনি দেবীর দেবী আদ্যা শক্তি, ত্রিজগতের পরমারাধ্যা, মাতৃস্থানীয়া। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কবিকে, সর্ব্বদাই অতি সতর্কতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। মাতার কথা সন্তানের যে ভাবে বলা সঙ্গত, সেই ভাবে বলিতে হইবে। কাব্যের যিনি নায়ক তিনি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ সমস্ত দেবগণের বন্দনীয়, ত্রিসংসারে পূজনীয়, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম-নির্লিপ্ত, শ্মশান-চারী, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের পিতৃস্থানীয়। আর কাব্যের যিনি প্রতিনায়ক, তিনি আবার, অনন্ত-

ক্ষমতাশালী, জগতের সম্মোহন ; ব্রহ্মার উপরও তাঁহার অপরিমিত আধিপত্য, আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন। তিনি নামে মদন, কার্য্যেও মদন। এতাদৃশী ত্রি-মূর্ত্তির ত্রিবিধ অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টি-ব্যাপারে কালিদাস হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জগদারাধ্যা আদ্যা শক্তির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে ; জগদারাধ্য, জিতেন্দ্রিয়, মহাদেবের জিতেন্দ্রিয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে ; আবার জগদুন্মাদক মদন,

"কুর্য্যাং হরস্যাঽপি পিনাক-পাণেঃ
ধৈর্য্য-চ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে ?"

বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাও পালন করাইতে হইবে। এ বড় কঠিন সমস্যা। দেখা যাউক, এই কঠিন সমস্যার পূরণে আমাদের মহাকবি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী-চরিত্র লইয়াই কুমারসম্ভব। কুমারে অন্যান্য যত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই গৌণ। মুখ্য চরিত্রই পার্ব্বতীর। সুতরাং পার্ব্বতীচরিত্রই আলোচনা করা যাউক। তাহা হইলে, সেই সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রেরও আভাস পাওয়া যাইবে।

পার্ব্বতীচরিত্রে আবার, বিরূপাক্ষের প্রতি পার্ব্বতীর অনুরাগই প্রধান ব্যাপার। সে অনুরাগ এত অদ্ভুত, অসাধারণ, গম্ভীর ও অপরিমিত যে, দেবী ব্যতীত মানবীতে তাহার স্ফুরণ হইতেই পারে না। মানুষের সকলই স-সীম। মানুষের অনুরাগ যত গম্ভীর, যত অসাধারণই হউক না কেন, কিন্তু তাহা পরিমেয়। অথবা কেবল মানুষ কেন, যক্ষাদি দেব-যোনিদিগের অনুরাগেরও একটা ইয়ত্তা আছে। কিন্তু শ্মশান-চারী ভূতনাথ, বিরূপাক্ষের প্রতি 'পর্ব্বত-রাজ-পুত্রী' উমার যে অনুরাগ, তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহা অনন্ত, অপরিমিত। মানবে অত অনুরাগ সম্ভাবিত নহে, তাই বুঝি কালিদাস, ঐ অনুরাগ-প্রবাহের যিনি প্রস্রবিণী তাঁহাকে দেবীর দেবী আদ্যা শক্তি করিয়াছেন। যে সে দেবীতে হইবে না, ইন্দ্রাণী বা বরুণানীতে অত অনুরাগ, অমন প্রণয় দেখান যায় না, তাই মহাকবি মহামায়ার শরণ লইয়াছেন। নিজের কল্পনার উপর তাঁহার এত অধিক বিশ্বাস ছিল যে, তিনি, তদীয় সর্ব্বপ্রথম কাব্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব-দেবীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার অপরাপর কাব্যে প্রণয়চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত, কুমার-সম্ভবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাঁহার মেঘদূতে, বিলাসী যক্ষ তাহার বিরহিণী বিলাসিনীর জন্য একেবারে উন্মত্ত। যক্ষের যত কিছু ব্যাপার, সব যেন ইন্দ্রিয়বিকারেরই ফল। তাহার প্রতিকথায় বলবতী ভোগ-লালসার পরিচয় প্রকটরূপে বিদ্যমান।

"নির্ব্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু"[১] বলিয়া যক্ষ তাহার লালসা-বহ্নির প্রদীপ্ত-শিখা আবরণ উন্মোচন করিয়াছে।

তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তল, যদিও অপার্থিব, পবিত্র, প্রণয়রত্নের আকর, কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রিয়-লালসার ছায়াপাত হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া যে কথা[২], তাহাও ইন্দ্রিয়-বিকারেরই পূর্ব্বাভাস। তাঁহার—

'যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ[৩]।

এবং—'বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ

ব্যাপার-রোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্[৪] ॥'

প্রভৃতি প্রশ্নও, তদীয় হৃদয়ের প্রবল ইন্দ্রিয়-তরঙ্গাভিঘাতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে শকুন্তলায়, সে ইন্দ্রিয়-বিকার অতিশয় প্রচ্ছন্ন।

তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশী ত ইন্দ্রিয়-বিকার-গ্রস্তেরই প্রতিকৃতি। নায়িকা অপ্সরা, তিনি আবার স্বর্গের রাজ-সভার প্রধান নর্ত্তকী। সুতরাং তাহাতে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য না থাকিলেই একান্ত অস্বাভাবিক হইত। এই সমস্ত কাব্যেই প্রণয় ইন্দ্রিয়-বিকারের সহিত মিশ্রিত। ইন্দ্রিয়-বিকার-শূন্য, কাম-গন্ধ-বর্জ্জিত, স্বর্গীয় প্রণয়ের চিত্র এই সকল কাব্যে নাই। কিন্তু কালিদাস, কুমারে পার্ব্বতীর যে প্রণয়-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রিয়-বিকারের লেশ নাই, কামের গন্ধ নাই। ভোগ-লালসা সে গভীর পার্ব্বতী-

---

১—মেঘদূত, উত্তর মেঘ শ্লোক—৪৭।

২—'অহো মধুরমাসাং দর্শনম্'—শকুন্তলা, ১ম অঙ্ক। আহা! ইহাদের কি সুন্দর রূপ।

৩—যেহেতু আমার আর্য্য হৃদয় ইহাতে অভিলাষী হইয়াছে।

৪—যতদিন ইঁহার বিবাহ না হইবে, কেবল ততদিন কি ইনি এই মদন ব্যাপার বিরোধী বৈখানস-ব্রত ধারণ করিয়া থাকিবেন?

প্রণয়ের ত্রি-সীমাতেও স্থান পায় নাই। সে প্রণয় জগদানন্দ-দায়িনী আদ্যা শক্তিরই অনুরূপ, কেবল তাঁহাতেই সম্ভবপর।

পার্ব্বতীর মাতা মেনা, তিনি পিতৃ-গণের মানসী কন্যা। পিতা হিমালয়, তিনি পর্ব্বতকুলের রাজা। যখন প্রজাপতি, গিরিরাজ হিমালয়ের পৃথিবী ধারণের যোগ্যতা দেখিলেন, জগতে যত প্রকার যাগযজ্ঞ হয়, সে সমুদয়ের সমস্ত উপকরণ একমাত্র হিমালয়ে আছে—ইহা জানিলেন, তখন তিনি স্বয়ং হিমালয়কে পর্ব্বত-কুলের রাজা করিয়া দিলেন, দেবতাদিগের ন্যায়, যাগ-যজ্ঞের অংশ-ভাগী করিয়া দিলেন, চূড়ান্ত সম্মান করিলেন[১]। অতবড় সম্মানী রাজার অনুরূপ সহধর্ম্মিণী কোথায় মিলিবে? পূর্ব্বাপর-সমুদ্রাবগাহী বিরাট্ হিমালয়, পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বত-কুলের 'অধিরাজ' প্রকাণ্ড হিমালয়, স্বর্গের দেবতাবৃন্দের লীলা-নিকেতন বিশাল হিমালয়,—তাঁহার পত্নী,—বড় কঠিন কথা। হিমালয় নিজে যেমন অসামান্য, তাঁহার পত্নীও তেমনই অসামান্যা না হইলে মানাইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টিতে তাঁহার অনুরূপ ভার্য্যা দুর্লভ। পৃথিবীর সমস্তই ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ; সুতরাং কোনও পার্থিব নারী-সৃষ্টিই বিরাট্ হিমালয়ের পত্নীর যোগ্য হইতে পারে না। তাই পিতৃগণ, তাঁহাদের এক মানসী কন্যা সৃষ্টি করিলেন। সে কন্যা যোগ-ব্রহ্ম-বাদিনী, সে কন্যা সম্মানিত মুনিগণেরও বহু মাননীয়া। স্থিরতায় এবং ধীরতায় সে কন্যা হিমালয়েরই অনুরূপ। সে কন্যা স্বর্গের পিতৃ-গণের যেমন আদরণীয়া, মর্ত্ত্যের ঋষিগণেরও তেমনই পূজনীয়া[২]। এতাদৃশ স্বর্গ-মর্ত্ত-পূজিত কন্যার সহিত, স্বর্গমর্ত্তব্যাপী পরমসম্মানী গিরিরাজের পরিণয় হইল। এবম্ভূত স্বর্গমর্ত্তপূজিত, স্বর্গমর্ত্তব্যাপ্ত পিতা-মাতার কন্যার হৃদয়, এবং সেই হৃদয়ের প্রণয়, যে প্রকার হওয়া উচিত, পার্ব্বতীরও ঠিক তাহাই হইল। অথবা

১—কুমার—১ম—১৭।

২—কুমার—১ম—১৮।

স্থৈর্য্যে, ধৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, পার্ব্বতীর হৃদয় এবং সে হৃদয়ের প্রণয়, যেন স্থির-ধীর-গম্ভীর মেনা-হিমালয়কেও অতিক্রম করিল।

দৃঢ়-সঙ্কল্পা পার্ব্বতী মদন ভস্মের পর, আবার যখন তপোবলে চন্দ্রশেখরের করুণা লাভের জন্য যাত্রা করেন, তখন দেবগণের মানসী কন্যা মেনাও পার্ব্বতীর অলৌকিক প্রণয়-গতি-দর্শনে অবাক্ হইয়াছিলেন। 'এ অসাধ্য সাধন কেন'—বলিয়া মাতা মেনা দুহিতা পার্ব্বতীকে কতই না বুঝাইয়াছিলেন। কন্যার সেই অসাধারণ হৃদয়-গতি, জননী মেনা নিজ-মনে ধারণা করিতেই পারিয়াছিলেন না। তাই তিনি, যখন শুনিলেন যে তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা উমা, একবার যাঁহার অত সেবা শুশ্রূষা করিয়াও, প্রাণপাতী সন্তর্পণ করিয়াও মন পায় নাই, আবার সেই বৃষধ্বজের প্রতি আসক্তিমতী হইয়াছে; সৌন্দর্য্য যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, তপোবলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে আবার পণ করিয়াছে, তখন মেনা পার্ব্বতীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—'মা, এমন কোন্ দেবতা আছেন, যাঁহাকে, ইচ্ছামাত্রেই, তোর পিতৃগৃহে বসিয়া না পাই? তবে কেন এ তপস্যা? তোর এ কোমল-দেহ কি কঠোর তপস্যার ভার সহিতে পারিবে? কাজ নাই তোর তপস্যায়[১]।' মাতা মেনা মাতৃ-ধর্ম্মে ভুলিয়া, পার্ব্বতীকে ঐ প্রকার কত কথাই বলিয়াছিলেন কত উপদেশই না দিয়াছিলেন! স্নেহময়ী জননী কন্যার শারীরিক কোমলতাই মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কন্যার হৃদয়ের দৃঢ়তা যে কত অধিক, মনের বল যে কত বিপুল, কত অসীম, তাহা গিরীন্দ্র-মহিষী

১—কুমার, ৫ম—

"নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং সুতাং গিরীশ-প্রতিসক্তমানসাম্।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা নিবারয়ন্তী মহতো মুনি-ব্রতাৎ ॥" ৩।

"মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা তপঃ ক বৎসে! ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ-পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥" ৪।

বুঝিতে পারেন নাই। তাই বলিতেছিলাম,—যে, প্রকাণ্ড মেনা-হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী, কালে, স্বীয় হৃদয়ের প্রকাণ্ডত্বে, তাঁহার মাতা পিতাকেও যেন অতিক্রম করিয়াছিলেন।

বালিকা পার্ব্বতী পিতা-মাতার পরম আদরের ধন। অপরাপর পুত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিমালয়ের স্নেহ কিন্তু কন্যা পার্ব্বতীর উপরই সমধিক। তিনি কন্যাকে নিরন্তর নিকটে রাখেন; অতৃপ্ত-নয়নে ও স্নেহ-পূর্ণ মনে কন্যার দিকে যত চাহিয়া থাকেন, তত তাঁহার আরও চাহিয়া থাকিতে বাসনা জন্মে[১]। পাষাণ হিমালয়ের অমৃতোপম স্নেহনির্ঝরে সেই লাবণ্য-লতিকা, এই ভাবে, দিনে দিনে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বৈবাহিক কাল উপস্থিত হইল। এমন সময়ে একদিন, সেই কুমারীকে পিতার সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া, নারদ কেবল বলিয়া গেলেন যে, এই কন্যা প্রেমবলে একদিন মহাদেবের দেহার্দ্ধভাগিনী হইবেন, মৃত্যুঞ্জয়েরও হৃদয়-জয় করিতে পারিবেন[২]। পিতৃ-পার্শ্ব-বর্ত্তিনী পার্ব্বতী নিবিষ্ট-হৃদয়ে, স্থিরভাবে দেবর্ষি নারদের এই আদেশবাণী শুনিলেন। এ বাণী যেন তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল। তাঁহার প্রশান্ত, নির্ম্মল, আকাশকল্প বিশাল হৃদয়ে যেন একটা স্বপ্নের সৌদামিনী চকিতে খেলা করিয়া গেল।

ক্রমে কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেবর্ষি নারদের মুখে মহাদেবের নাম শ্রবণ করা অবধি, পিতা হিমালয়, কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শশাঙ্ক-শেখর ব্যতীত অন্য বরে, কন্যা-সম্প্রদানের তাঁহার আর বাসনাই নাই। কিন্তু অদ্রিনাথ নিজে উপযাচক হইয়া ভিখারী

১—কুমার, ১ম—"মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্ত-পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফমালা সবিশেষ-সঙ্গা।" ২৭।

২—কুমার, ১ম—৫০।

ভোলানাথকে এ প্রস্তাব জানাইতে সাহসী হইলেন না[১]। তিনি নীরবে কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আর এক কথা,—পশুপতির নিকটে কন্যা-দানের প্রস্তাব করেনই বা কোন্ সাহসে? দক্ষ-মুখে পতির নিন্দা শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া যে দিন সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে যে সতী-কান্ত হৃদয়ের সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, দারান্তর পরিগ্রহ না করিয়া, শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান্[২], তাঁহার কাছে—অমন অগাধ প্রেম-পারাবারের কাছে, পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিতে কারই বা সাহসে কুলায়? চরিত্রের বল বড় বল। সে বলের নিকট রাজাধিরাজ মহারাজকেও অবনত হইতে হয়, দৃপ্ত সিংহকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। নগাধিরাজ হিমালয় তাই উৎসুক-হৃদয়ে কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, শ্মশান-চারী শম্ভু তপস্যার জন্য হিমালয়ের এক সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। সে স্থান অতি মনোরম। সে স্থানে, ঊর্দ্ধদেশ হইতে পতিত, কল-নাদিনী গঙ্গার পূত-প্রবাহে দেবদারু বন নিত্য অভিষিক্ত[৩]। সেই সত্ত্ব-প্রধান স্থানে, মৃগগণ নির্ভয়ে ইতস্ততঃ ক্রীড়ারত; মৃগ-নাভি-সৌরভে সমগ্র সানুদেশ আমোদিত। কিন্নর-কিন্নরীগণ মধুর-কণ্ঠে গান ধরিয়া সে সানুর সমস্ত বন-ভূমি উন্মাদিত ও মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন। এবংবিধ স্থানে নির্ব্বিকার শঙ্কর সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার অনুচর প্রমথগণ, সেই স্থানে, পুন্নাগকুসুমের অবতংস করিয়া কাণে পরিত। শীতল মসৃণ ভূর্জ্জপত্র পরিধান-পূর্ব্বক শরীর জুড়াইত। সুগন্ধি গৈরিক চূর্ণে দেহ বিলিপ্ত করিত[৪]। এই ভাবে, পরম সুখে, তাহারা তথায় বাস করিতে লাগিল। আর সেই গঙ্গাধর, যাঁহার তপস্যায় ভক্তের কোনও

১—কুমার, ১ম—"অযাচিতারং নহি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে॥" ৫২।

২—কুমার, ১ম—৫৩। ৩—কুমার, ১ম ৫৪॥ ৪—কুমার, ১ম—৫৪—৫৫।

অভীষ্টই অপূর্ণ থাকে না, যাহার যাহা অভিপ্রেত, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, তিনি—সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু গঙ্গাধর, জানি না, কি কামনা সিদ্ধির জন্য আজ সম্মুখে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক তপস্যায় নিমগ্ন[১]! কাহার সাধ্য তাঁহার নিকটে যায়? হিমালয় এতদিন সময়ের দিকে চাহিয়াছিলেন, আজ বুঝিলেন যে, সময় আসিয়াছে। তখন—

অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং সমাদিদেশ প্রযতাং তনূজাম্[২] ॥

কন্যার উপর, কন্যার উদার চরিত্রের উপর, হিমাদ্রির অগাধ বিশ্বাস ছিল। চিত্তসংযমের ক্ষমতা যে সে কন্যার কত গরীয়সী, তাহা তিনি জানিতেন। তবুও তিনি, ধ্যানমগ্ন শিবের শুশ্রূষার জন্য যখন পার্ব্বতীকে প্রেরণ করেন, তখন তাহার সঙ্গে, দুই জন সখীও দিয়াছিলেন। ধীর হিমালয়, অনেক চিন্তা করিয়া পার্ব্বতীকে বিদায় দিলেন।

দেবর্ষি নারদ যাহার কথা বলিয়াছিলেন, আর কিছু না হউক, কেবল নীরবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াই এ জীবন সার্থক করিব—ভাবিয়া সেই লাবণ্যতরঙ্গিণী গৌরী ধ্যানমগ্ন গিরীশের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। গৌরীর আর কিছুই আকাঙ্ক্ষিত নহে। কেবল সেবা করিবেন। তাহাতেই তাঁহার কত আনন্দ! কামিনী-কাঞ্চন সাধনার পরিপন্থী হইলেও, নির্ব্বিকার মহাদেব পার্ব্বতীকে সেবা করিবার অনুমতি দিলেন[৩]। ইহাতেই—সেবা করিবার এই অনুমতি টুকুতেই, পার্ব্বতীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

১। কুমার ১ম—৫৭।

২—কুমার, ১ম—৫৮। দেবতাদিগের পূজনীয় অতুলিত মহিমশালী সেই প্রভুকে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া পর্ব্বতরাজ আপন কন্যাকে আদেশ করিলেন যে যাও তোমার দুই সখীর সহিত পবিত্র মনে দেবদেবের সেবা কর গিয়া। (কৃষ্ণকমল)

৩—কুমার, ১ম—"প্রত্যর্থী-ভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" ॥ ৫৯।

তাঁহার গভীর হৃদয়ের গভীর প্রণয়, যেন আরও গম্ভীর-ভাব ধারণ করিল। সে প্রণয়, সরস্বতীর পুণ্য-প্রবাহের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়—তাহার মধ্যে লুকাইল। তিনি তাঁহার বাঞ্ছিত দেবতার সেবা করিতে পাইবেন, এই আনন্দে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমার অতুল রূপ-রাশি যেন আরও হাসিয়া উঠিল। গৌরী তাঁহার সেই, ঘন-কৃষ্ণ মেঘ-বিনিন্দী কেশ-পাশ পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া, যখন বনের ইতস্ততঃ কুসুম-চয়ন করিতেন, তখন বন-দেবীরাও বিস্মিত-নয়নে সেই অনিন্দ্য-কান্তির দিকে চাহিয়া থাকিতেন! পার্ব্বতী অনন্য-হৃদয়ে মহাদেবের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি শিবের অর্চ্চনার জন্য পুষ্প-চয়ন করিয়া আনেন, শিবের সমাধিবেদি অতি যত্ন-সহকারে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করেন, শিবের স্নানের জল আনিয়া দেন্, বাছিয়া বাছিয়া অক্ষত কুশ আহরণ করেন,—এই ভাবে, ক্রমে, তিনি যেন একেবারে শিবময়ী হইয়া পড়িলেন[১]। মহাদেবের যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে পারে, সে সমস্ত, পার্ব্বতী পূর্ব্বাহ্নেই সংগৃহীত করিয়া রাখিতেন। মহাদেব কেবল শুশ্রূষার অনুমতি দিয়াছেন, পার্ব্বতী কি করেন না করেন, তাহার প্রতি লক্ষ্যও করেন না। যখন শৈলেন্দ্র-পুত্রীর শরীর ক্লান্ত হয়, বা হৃদয় অবসন্ন হয়, তখন কেবল তিনি ধ্যান-মগ্ন চন্দ্র-শেখরের সেই ললাট-চন্দ্রের স্নিগ্ধ-কিরণে বসিয়া, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্তি-ও অবসাদ দূর করেন[২]। ইহাতেই তাঁহার কত সুখ কত আনন্দ! সে হৃদয়ের প্রণয় যে কত গভীর, কত অচল—অটল, তাহা ত্রি-জগতের অন্য কেহই জানিত না। অথবা অন্যে জানিবে কি প্রকারে? পার্ব্বতী নিজেই জানিতেন না যে, তাঁহার সে স্বর্গীয় হৃদয়ের যে স্বর্গীয় সম্পদ্ তাহার পরিমাণ কত! তিনি যে অতুল ধনের অধিকারিণী, সে ধনের—সে অমূল্য প্রণয়রত্নের—পরিমাণ কত!

১—কুমার, ১ম—৬০।

২—কুমার, ১ম—৬০।

তিনি, এইভাবে সমাধি-মগ্ন শঙ্করের সেবা করেন, ও অবসর ক্রমে বন-দেবতা-রূপিণী সখী দুইটীর সহিত কখন বা খেলা করেন। কখন কখন সখীদ্বয়, সুন্দর সুন্দর ফুল ও কচি কচি পল্লব দিয়া, তাঁহাকে সাজাইয়া দেন। বাসন্তী প্রতিমার ন্যায় তিনি সেই নিস্তব্ধ বনস্থলী উদ্ভাসিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার স্থির দৃষ্টি। তিনি যাহাই করুন না কেন, যে দিকেই চান না কেন, দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকার ন্যায়, কিন্তু তিনি কদাচ লক্ষ্যচ্যুত হইতেন না। শিবের শুশ্রূষায় তাঁহার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ঘটিত না।

অঞ্চলের রত্ন বনে প্রেরণ করে অবধি মাতা মেনা ও পিতা হিমালয় ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইয়া গৃহে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাকিয়া কন্যার অবস্থা ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কখন কি সংঘটিত হয়—এই ভাবনায় তাঁহারা নিয়ত উৎসুক নয়নে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। গৌরীর যোগিজন অবস্থা দর্শনে—সেই নবীন বয়সে বনবাসিনীর ক্রিয়া-কলাপ-দর্শনে, মেনা হিমালয় মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিতেন, কিন্তু আবার পরক্ষণেই সে বালিকা-হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রণয়, বিচিত্র প্রেম ও অদ্ভুত আত্মসমর্পণ দর্শনে, ভাবিতেন, ধন্য পার্ব্বতী, আর এতাদৃশী কন্যার পিতামাতা বলিয়া আমরাও ধন্য!

পার্ব্বতী শিবার্চ্চনার জন্য কুসুমচয়ন করেন, মাল্যরচনা করেন, মন্দাকিনী হইতে পদ্মবীজ আহরণ-পূর্ব্বক আতপে বিশুষ্ক করিয়া সুন্দর সুন্দর জপ-মালা গাঁথিয়া রাখেন; বাসনা, যদি অবসর ক্রমে কখনও চন্দ্রশেখরের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন। এই ভাবে রাজ-নন্দিনীর দিন কাটিতে লাগিল। সে বড় সুখের দিন! এ জগতে, অথবা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে, কয় জনের ভাগ্যে অমন দিন আসিয়াছে? অমন অপ্রতিম রূপ, অতুল গুণ, অনিন্দ্য যৌবন যাঁর—অমন বিশ্ব-পূজিত, পরম-সম্মানী, অনন্ত-রত্নের প্রভব পিতা যাঁর—আর অযোনিসম্ভব, দেব-ঋষি-পূজ্য, দেবী জননী

যাঁর—তাঁহার অভাব কিসের? তবুও তিনি আজ ভিখারিণী, গহন-বনবাসিনী। পার্ব্বতী যাঁহার জন্য ভিখারিণী বনবাসিনী, সেই শিব কিন্তু কোন সংবাদই রাখেন না। তিনি ধ্যানস্থ। তিনি নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায়, স্থির 'অনুত্তরঙ্গ' জলনিধির ন্যায়, প্রশান্ত ও অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায় গম্ভীর-ভাবাপন্ন[১]। এতাদৃশ মহাযোগীর সেবায় পার্ব্বতী রত। পার্ব্বতীর হৃদয় প্রতিদান-নিরপেক্ষ। সুতরাং সে মহাযোগী পার্ব্বতীর এই প্রাণপাতিনী শুশ্রূষার বিষয় বিদিত হউন আর না-ই হউন, তাহাতে পার্ব্বতীর কি? পার্ব্বতীর যে কেবল সেবাতেই সুখ, অজ্ঞাত আত্ম-সমর্পণেই পরম আনন্দ। কি সুন্দর চিত্র! কালিদাস যদি তাঁহার অন্য কোন কাব্য প্রণয়ন না করিয়া, কেবল কুমারসম্ভবের এই প্রথম সর্গ লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও মহাকবির রত্নময় কিরীট সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই মস্তকে স্থান পাইত।

১—কুমার, ২য়—৪৮।

সপ্তম অধ্যায়।

মদন।

এই ভাবে পার্ব্বতীর দিন কাটিতে লাগিল। এ দিকে বড় এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। অসুর-নাশের প্রয়োজন। অসুর-ভয়ার্ত্ত দেবতাদিগকে ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছেন যে, হরপার্ব্বতীর পুত্র জন্মিলে, সেই পুত্র তোমাদের সেনাপতি হইয়া সংগ্রামে অসুর-নাশ করিবেন[১]। মহাদেব ধ্যান-মগ্ন। কবে—কত দিনে হর-পার্ব্বতীর মিলন হইবে, কত দিনে তাঁহাদের পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। অথচ অসুরের অত্যাচারে, উপদ্রবে, দেব-দল স্বর্গ-রাজ্য হইতে বিতাড়িত, নিপ্পেষিত। সুতরাং দেবগণ একটু ক্ষিপ্রতা করিলেন। যাহাতে সত্বর মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর পরিণয় সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থায় তৎপর হইলেন। সমবেত দেবগণ স্থির করিলেন যে, ধ্যান-মগ্ন বিরূপাক্ষের অচিরাৎ ধ্যান-ভঙ্গ করিতে হইবে। অন্যথা সত্বর পরিণয়ের সম্ভাবনা নাই।

কোন কার্য্যই ক্ষিপ্র-কারিতা প্রশংসনীয় নহে। তুমি মনুষ্যই হও, আর দেবতাই হও, বিশ্বপতির জগৎ-পরিচালনার যে সমুদয় রীতি-নীতি আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে তোমার সুফল হইবে না। দেবতাদিগকেও এই ক্ষিপ্রকারিতার সমুচিত ফলভোগ করিতে হইবে। আর এক কথা, তুমি নিজের জন্য ব্যাকুল হইও না। নিজের জন্য ব্যাকুল হইলে অনেক সময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘিত হয়। ঘোর অনর্থ-সংঘটন হয়। স্বার্থ-প্রণোদিত চিত্ত অনেক সময়ে সদসদ্‌-বিবেক-বিমূঢ় হয়। তাই আজ দেবতারাও সমাধিমগ্ন পরমেশ্বরের সমাধিভঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। ফলও তদনুরূপ হইল। কবি কালিদাস অতি নিপুণ ভাবে

১—কুমার, ২য়—৬১।

দেখাইলেন যে মনুষ্যের ত কথাই নাই, স্বার্থপ্রিয়তা দেবতাদের পর্য্যন্ত কদাচ ক্ষেমঙ্করী হইতে পারে না।

ব্যাপার অতি ভীষণ। পরব্রহ্ম ধ্যান-মগ্ন, তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে হইবে, এ কল্পনাতেও দেবগণের হৃদয় দুরু-দুরু কম্পিত হইল। যেরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য, দেবগণ তাহার আয়োজনও তদনুরূপ করিলেন। ইহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কালে কোন মুনিঋষি যদি উৎকট তপস্যা করিতেন, তবে সে তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ দুই একটি অপ্সরা প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের তপোভঙ্গ করিতেন। কিন্তু এবার দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং তপস্যারত, সমাধিস্থ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে অপ্সরা প্রেরণে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, তাই বৃহস্পতি-প্রমুখ দেববৃন্দ এবার অপ্সরাদের যিনি নাটের গুরু, সেই নটরাজ মদনকে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

স্মরণ-মাত্রে মদন উপস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, 'মদন, একটি অসাধ্য সাধন করিতে হইবে।' মদন চিরদিন জগৎ উন্মাদিত করিয়া বেড়ান্, কখনও কোন স্থানে তাঁহার উন্মাদিকা শক্তি প্রতিহত হয় নাই; তিনি ভাবিলেন যে, আমার আবার 'অসাধ্য' কি? নবীন মদন পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়াই গর্ব্বভরে আস্ফালন-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে বলিলেন,—

তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাক-পাণেধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে[১]?

ইন্দ্র যে বিষয়ের অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন, মদন তাহা অগ্রেই বলিয়া বসিলেন। ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অধস্তনের দ্বারা কোন দুষ্কর কার্য্য সাধিত করিবার সময়ে, প্রভুগণ যেরূপ অতিরিক্ত

১—কুমার, ৩য় ১০। যদিও পুষ্পই আমার অস্ত্র, তথাপি আপনার প্রসাদে এই বসন্তকে একমাত্র সহায় পাইলে, মনে করিলে সেই পিনাক-পাণি মহাদেবের পর্য্যন্ত চিত্ত চঞ্চল করিতে পারি, অন্যান্য বীরের কথা আর কি বলিব?—(কৃষ্ণকমল)

আদর—'অতিভক্তি' দেখাইয়া অধীনের মন ভুলাইতে প্রয়াস করেন, ইন্দ্রও সেইরূপ করিলেন। মদনকে কত আদর করিলেন, কত প্রশংসা করিলেন[১]। মদন একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অঙ্গীকৃত ব্যাপারের গুরু-লাঘব বিবেচনা না করিয়া, মদন শিবের ধ্যানভঙ্গের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। বসন্ত সত্য-সত্যই মদনের 'অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ' তাই মদনের সঙ্গে বসন্তও আসিয়াছিলেন। ইন্দ্র ভাবিলেন, মদন ত যাইতেছেন, কিন্তু কার্য্য যেরূপ গুরুতর, তাহাতে শুধু মদনে হয়ত কুলাইবে না,—তাই প্রকাশ্যে বসন্তেরও কিঞ্চিৎ প্রশংসাবাদ করিয়া, তাহাকেও মদনের সহায় হইতে অনুরোধ করিলেন[২]। বসন্ত মদনের অগ্রসর হইলেন। এদিকে রতি,—মদনের পঞ্চবাণের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মদনের জগদুন্মাদনার যিনি প্রধান সাধন, অথবা এক কথায়, মদনের যিনি যথা-সর্ব্বস্ব,—সেই মদনময়-জীবিতা রতিও পতির সহগামিনী হইলেন। ইন্দ্র ভাবিলেন, মদন, বসন্ত, রতি—তিন জনে যখন যাইতেছেন, তখন আর ভাবনা কি? বসন্ত বহির্জগতের সম্রাট, পৃথিবীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর; মদন অন্তর্জগতের বিলাস-মগ্ন অধিপতি, সৌরকুলের রাজা 'অগ্নিবর্ণের' ন্যায় সুখৈক-শরণ, তিনি বসন্তের সৈনাপত্যে জগদ্‌বিজয় করেন; আর রতি, তিনি ত বহিরন্তর্—উভয় জগতের যাবতীয়-সৌন্দর্য্যের সম্পদের একমাত্র ভাণ্ডার, ঋতুরাজ বসন্ত ও হৃদয়রাজ মদনের জীবনী শক্তি;—এবংবিধ ব্যক্তি-ত্রয়ের যখন সমবায় ঘটিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি?

বিশ্ববিমোহন পতি মদন, বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাত্রা করিলেন ভাবিয়া, কোমল-হৃদয়া রতির প্রাণ সহসা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভয়ে ভয়ে পতির সঙ্গে চলিলেন[৩]। মদন এবং রতি তপোমগ্ন পিনাক-পাণির

১—কুমার, ৩য়—১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২০।

২ কুমার, ৩য়—২১। ৩। কুমার, ৩য়—২৩।

আশ্রমে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তথায় বসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। অকালে, অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত বন-ভূমি যেন রোমাঞ্চিত —স্ফূর্ত্তিময়ী হইয়া উঠিল। তরুলতা কুসুমাভরণে সজ্জিত হইল। সে বনস্থলী যেন, কচি কচি পত্র-পল্লব-রূপ অরুণ-বসনে দেহ সাজাইয়া ঋতুরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল। ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ঝঙ্কারে, কোকিলের কুহুকুহু-রবে বনস্থলী মুখরিত হইল। কিন্নরী-গণ মধুর-কণ্ঠে তান ধরিল। প্রকৃতি-চঞ্চল কিম্পুরুষ-গণ যেন আরও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বনের পশু-পক্ষি-গণ পর্য্যন্ত উন্মত্ত। সে বনে, যে সমস্ত তপস্বি-বৃন্দ দীর্ঘকাল হইতে তপস্যারত, তাঁহাদেরও মন যেন কেমন একটু উদ্বেল হইবার উপক্রম করিল। তাঁহারা অতিপ্রয়াসে, সহসা-বিকৃত অন্তঃকরণের ভাব-সংবরণ করিলেন। ভূত-নাথের অনুচর-গণ স্বভাবতই একটু উচ্ছৃঙ্খল, তাহাতে আবার নব-বসন্ত সমাগম, তাহাদের মত্ততা আরও বর্দ্ধিত হইল[১]। নন্দী বামহস্তে এক গাছি স্বর্ণবেত্রে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, ধ্যান-মগ্ন ত্রিলোচনের লতাগৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। বনস্থলীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। প্রমথ-গণের চিত্ত-বিকার দর্শনে তাঁহার বড়ই বিরক্তি জন্মিল। পাছে যোগেশ্বরের যোগ-ভঙ্গ হয়, তাই তিনি একটি কথাও কহিলেন না। কেবল একবার নিজের তর্জ্জনী ঈষৎ কম্পিত করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন— 'চুপ্'[২]। তাঁহার এমনই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ যে, ঐ ইঙ্গিত-মাত্রেই সব থামিয়া গেল। কেবল প্রমথগণ নয়, সমগ্র বনভূমি হঠাৎ নীরব-নিস্পন্দ হইল। বসন্তের সে মৃদু-মধুর সমীর-হিল্লোল কোথায় লুকাইল! তরু-রাজি, ভ্রমর-পঙ্ক্তি, পক্ষিকুল, মৃগ-কদম্ব, সব নীরব, সব নিস্পন্দ! এক নন্দিকেশ্বরের তর্জ্জনী-কম্পনে সমগ্র বনভূমি যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় স্পন্দন-শূন্য[৩]!

১—কুমার, ৩য়, ২৫—৩৪। ২—কুমার, ৩য়—৪১। ৩—কুমার, ৩য়,—৪২

বসন্তের এত আস্ফালন, এত প্রতাপ, সব বৃথা হইল। মদনের সহায়তা করিবার জন্য বসন্তের যত আয়োজন, উদ্‌যোগ,—সব ব্যর্থ হইল। রতি-সহচর মদন দেখিলেন, বসন্ত বিধ্বস্তপ্রায়, তিনি অমনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বসন্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নন্দীর নয়ন-পথের পথিক হইতে মন্মথের আর সাহস হইল না। তখন—

দৃষ্টি-প্রপাতং পরিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্ত-নমেরু-শাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ[১] ॥

মদন তস্করের ন্যায়, নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে, ক্রোধারক্তনেত্র নন্দীর পশ্চাৎদিক দিয়া, ধূর্জ্জটির ধ্যানস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী শাখা-ঘন নমেরু বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। মনে ভাবিলেন যে,—খুব লুকাইয়াছি। কুসুম-শায়ক এই ভাবে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাঁহার অঙ্গীকৃত শরব্য, ধ্যান-মগ্ন, সেই বিরূপাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। তিনি তখন, তাঁহার সেই—

কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাক-পাণেঃ
ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোহন্যে ?

প্রতিজ্ঞার কথা একবার স্মরণ করিতে লাগিলেন, আর এক এক বার সেই—

অবৃষ্টি-সংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্ নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্[২] ॥

১—কুমার, ৩য়,—৪৩।

২—কুমার, ৩য়—৪৮। শম্ভু 'তখন শরীর-মধ্যবর্ত্তী বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহাকে জ্ঞান হইতেছিল যে, বৃষ্টির আড়ম্বর নাই এতাদৃশ একখানি মেঘ, অথবা তরঙ্গ উদয় হয় নাই ঐরূপ জলনিধি, অথবা বায়ুশূন্য স্থানবর্ত্তী নিশ্চল-শিখা-ধারী একটা প্রদীপ।' (কৃষ্ণকমল)

ত্রিপুরারির দিকে চাহিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে, চঞ্চল চিত্ত কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া, মদন, সেই বিষমাক্ষের প্রতি বাণ-ক্ষেপ করিবার আশায়, কুসুম-নির্ম্মিত ধনুক খানি উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইলেন না। ভয়ে, আশঙ্কায়, মদন যেন জড়ীভূত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হস্ত ক্রমে অসাড় ও অবসন্ন হইয়া আসিল। সে হস্ত হইতে কুসুমের ধনু, কুসুমের বাণ স্খলিত হইল, তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না।[১] তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায়, প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায়, বজ্রাহতের ন্যায়, নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু বসন্তের মত, তাঁহারও তাবৎ আয়োজন-উদ্‌যোগ ব্যর্থ হইল। সেই প্রতিজ্ঞা কালীন আস্ফালন, দর্প, একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল।

বড় দর্প করিয়া বসন্ত আসিয়াছিলেন, তিনি অবসন্ন হইয়া, সে-ই হর-তপোবনের বহির্দ্দেশে পড়িয়া আছেন। নন্দীর তর্জ্জনী-কম্পন স্মরণ করিয়া আর উঠিবারও সাহস হইতেছে না। বড় দর্প করিয়া কন্দর্প আসিয়াছিলেন, তিনিও অবসন্ন-দেহে, পিনাক-পাণির ধ্যান-গৃহে 'দারুভূতো মুরারিঃ' হইয়া রহিয়াছেন। বিষমাক্ষের সমাধি ভঙ্গ করে— কাহার সাধ্য ?

১– কুমার, ৩য়—৫১।

অষ্টম অধ্যায়।

হর-সমাধি-ভঙ্গ।

নব-জল-সম্ভৃত, নিবিড়-মেঘাবৃত গগনের ন্যায়, সেই তপোবনস্থলী নীরব, নিস্পন্দ, প্রশান্ত। একটি পত্র কম্পনের শব্দ পর্য্যন্তও শ্রুত হয় না। এমন সময়ে, গিরিরাজ-কন্যা গৌরী, প্রাত্যহিক শুশ্রূষার জন্য, তাঁহার দুইটি সঙ্গিনী বনদেবতা-সখীর সহিত তথায় দর্শন দিলেন[১]। সে সৌন্দর্য্য-প্রতিমার লাবণ্য-তরঙ্গে অকস্মাৎ সমগ্র তপোবন সমুদ্ভাসিত ও আলোকিত হইল। পার্ব্বতী বসন্তের ফুলে, বসন্তের পল্লবে, বিচিত্র সাজ-সজ্জা করিয়াছেন। বকুল ফুলের চন্দ্রহার গাঁথিয়া নিতম্বে পরিয়াছেন। সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য ত্রিজগতে অতুল। কালিদাসের কল্পনা ব্যতীত সে প্রতিমা অন্যে অঙ্কিত করিতে পারে না। তখন সেই—

'অশোক-নির্ভৎর্সিত-পদ্ম-রাগং আকৃষ্ট-হেম-দ্যুতি-কর্ণিকারম্।
মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধু-বারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী॥
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥
স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেসর-দাম-কাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থান-বিদা স্মরেণ মৌর্ব্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য॥
সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্ন-চরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রম-লোল-দৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী[২]॥

১—কুমার, ৩য়—৫২।

২—কুমার, ৩য়, ৫৩—৫৬।—'পার্ব্বতী তৎকালে বাসন্তিক পুষ্পদ্বারা কতকগুলি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরিয়াছিলেন, অশোক পুষ্পে পদ্মরাগ মণির কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, কর্ণিকার সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছিল, আর সিন্ধুবার পুষ্পই মুক্তার মালার ন্যায় হইয়াছিল।' ৫৩।

কন্যা দেখিয়া, মদনের অবসন্ন হৃদয় পুনরায় আশ্বস্ত হইল। মদন ভাবিলেন যে, এবার পারিব, এমন অস্ত্র যখন সম্মুখে, তখন আর ভাবনা কি ? মদন এবার বাণ-প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ও-দিকে, তপোবনের বহির্দ্দেশে বসন্ত অবসন্ন দেহে পড়িয়া ছিলেন, তিনিও পুনরায় সন্নদ্ধ হইলেন। নন্দিকেশ্বরের তর্জ্জনী কম্পনের পর, বসন্তের আর একাকী বিরূপাক্ষের সম্মুখীন হইবার সাহস হইতেছিল না। এতক্ষণে তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, এবার আর একাকী যাইব না, কিংবা পূর্ব্ববৎ, নন্দী বা মহাদেবের সাক্ষাত্ প্রত্যক্ষীভূত হইব না, এবার পরোক্ষভাবে তাহাদের সম্মুখীন হইব। তাই সেই কন্যা-কুল-ললাম-রূপিণী শৈলেন্দ্র-নন্দিনীকে পাইয়া, বসন্ত তাঁহারই দেহ আশ্রয় করিয়া, পুনরায় শিব-সমীপে উপনীত হইলেন। এই তাৎপর্য্যটুকু বুঝাইবার জন্য কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, নানা-বিধ বসন্ত-পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া, পার্ব্বতীকে ধ্যানস্থ ত্রিলোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী করিলেন। কৃশাঙ্গী গৌরী আতাম্র নব-বসন্ত পল্লবাদি সজ্জার ভারে, যেন ঈষদবনত-দেহে শঙ্কর সম্মুখীন হইলেন।

'তিনি স্তন-ভরে ঈষৎ অবনত ছিলেন, প্রভাত-কালীন আতপের ন্যায় আরক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, অতএব জ্ঞান হইতেছিল যে, স্থূল স্থূল পুষ্প-স্তবকের ভারপ্রযুক্ত নম্রীভূত একটি লতাই যেন চলিয়া যাইতেছে।' ৫৪।

'বকুল-মালাকে তিনি চন্দ্রহার করিয়া পরিয়াছিলেন, তাহা নিতম্বদেশ হইতে মুহুর্মুহু খসিয়া পড়িতেছিল এবং মুহুর্মুহু হস্তদ্বারা ধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার নিতম্ব-বর্ত্তিনী সেই বকুল-মালা দর্শন করিলে জ্ঞান হইত যেন, কামদেব আপন ধনুকের আর একটি গুণ (ছিলা), ঐ স্থানে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।' ৫৫।

'একটি ভ্রমর তাঁহার সুরভি নিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া, বিম্ব-ফল-তুল্য অধরের সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার দংশন-ভয়ে তিনি চঞ্চল-দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে করিতে হস্তস্থিত পদ্ম-দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতেছিলেন।' ৫৬। (কুমারসম্ভব).

মদন, হর-সমাধি-ভঙ্গের সেই অকস্মাদুপনত শাণিত অস্ত্রের দিকে অনিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। রতির পতি বলিয়া কন্দর্প বড়ই গর্ব্বিত। যখন রতিকে সঙ্গে আনেন, তখন হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, আমার রতি যখন স্বয়ং যাইতেছেন, তখন আর ভাবনা কি? অন্য কোন বিশেষ অস্ত্রের বোধ হয় আর প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু মহাদেব পর্য্যন্ত উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার অনুচর নন্দীকে দেখিয়াই কন্দর্প বুঝিলেন যে, না, এতাদৃশ অস্ত্রের সাহায্যে ত্রিপুরারি-বিজয় একপ্রকার অসম্ভব। তা'র পর, সেই ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া তিনি চমকিত হইলেন। তখন আরও বুঝিলেন যে, এ শত্রু জয় করিতে হইলে, এ দুর্জ্জয় দুর্গ ভগ্ন করিতে হইলে, আমার যে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আছে, তাহাতে হইবে না, তদপেক্ষা দৃঢ়তর অস্ত্রের প্রয়োজন। এইরূপ সময়ে পার্ব্বতী উপস্থিত। কালিদাস, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায়, বড় সময় বুঝিয়া, পার্ব্বতীরূপ কস্তূরী-প্রয়োগে মদনের অবসন্ন হৃদয় সবল করিলেন। তখন কুসুমেষু—

'তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রী-পদমাদধানাম্।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্প-চাপঃ স্বকার্য্য-সিদ্ধিং পুনরাশশংসে' ॥[১]

মন্মথ, সেই বসন্ত-পুষ্পাভরণ-নমিতাঙ্গী প্রতিমার দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সময়ে যদি একটা বাণক্ষেপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, জিতেন্দ্রিয় শূলী শম্ভু নিশ্চয়ই বিদ্ধ হইতেন।

১—কুমার, ৩য়—৫৭। 'তাঁহাকে দেখিলে নিজ-কান্তা রতি পর্য্যন্ত লজ্জা পান, এরূপ দোষস্পর্শ-শূন্যা সৌন্দর্য্যশালিনী সেই বালাকে দর্শন করিয়া কামদেবের মনে এই আশার সঞ্চার হইল যে, মহাদেব যতই জিতেন্দ্রিয় হউন, ইহার সাহায্যে তাঁহার প্রতি বাণ-প্রয়োগ-পূর্ব্বক নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিলেও করিতে পারেন।' (কৃষ্ণকমল)

যোগস্থ শূল-পাণির পুরোভাগে গৌরী যখন দণ্ডায়মানা, তখন তাঁহার সেই বনদেবতা সখী-দ্বয়, তাঁহাদের স্বহস্তাবচিত, বসন্তের কুসুম, বসন্তের পল্লব রাশীকৃত করিয়া মহাদেবের চরণে অঞ্জলি দিলেন ও প্রণাম করিলেন[১]। এ দিকে পার্ব্বতীও তাঁহার চিরবাঞ্ছিত চন্দ্র-শেখরকে প্রণাম করিলেন। 'প্রণামকালে, তাঁহার অবনত মস্তক হইতে, নীল-বর্ণ কেশ-কলাপের মধ্যে শোভমান নবীন কর্ণিকার কুসুম এবং কর্ণের অবতংসরূপী নব পল্লব,—যুগপৎ ভূমি-তলে পতিত হইল[২]। কন্দর্প দেখিলেন, এই প্রকৃষ্ট অবসর,—তিনি অমনি তাঁহার কুসুম ধনুক খানি উত্তোলন-পূর্ব্বক, শরব্য বিরূপাক্ষকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।' আশা, যেমন গৌরী আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবেন, অমনি কুসুমধন্বাও তাঁহার কুসুমের বাণটি নিক্ষেপ করিবেন। উমা ধীরে চন্দ্রশেখরের আরও নিকট-বর্ত্তিনী হইলেন ;—এ দিকে—

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমা-সমক্ষং হর-বদ্ধ-লক্ষ্যঃ শরাসন-জ্যাং মুহুরামমর্শ[৩] ॥

মদনও ধনুকের ছিলা বার বার স্পর্শ করিতে লাগিলেন, যেন বাণক্ষেপ করেন আর কি ; কিন্তু বিরূপাক্ষের সেই ভীষণ-মূর্ত্তি-দর্শনে, কোন ক্রমেই সাহসে ভর করিয়া বাণত্যাগ করিতে পারিলেন না।

পার্ব্বতী মন্দাকিনী হইতে স্বহস্তে পদ্ম-চয়ন-পূর্ব্বক, উহার বীজ সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া, সেই সকল ভ্রমর-কৃষ্ণ পদ্ম-বীজ দিয়া এক ছড়া

১—কুমার, ৩য়—৬১। ২—কুমার, ৩য়—৬২।

৩—কুমার, ৩য়—৬৪—'কামদেবের নিতান্ত আগ্রহ যে শিবের লোচন-বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হয়েন, অতএব, যখন মহাদেব পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেই সময়ে কাম, কখন বাণ মারি, ইহাই ভাবিতেছিলেন, এবং শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধনুকের ছিলা বারংবার স্পর্শ করিতেছিলেন।' (কৃষ্ণকমল)

অতি সুন্দর জপমালা গাঁথিয়াছিলেন, আজ সেই মালা, স্বীয় পল্লব প্রতিম করে লইয়া, ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে, শশাঙ্ক-শেখরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন[১]। ভক্তবৎসল, 'প্রণয়ি-প্রিয়' আশুতোষ, যেমন সেই মালা গৌরীর আতাম্র করকিসলয় হইতে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলনের উপক্রম করিলেন, অমনি পুষ্পধন্বাও তাঁহার ত্রি-ভুবন-মোহন, সকল বাণের শ্রেষ্ঠ, 'অমোঘ' 'সম্মোহন'বাণ কুসুমধনুতে যোজন করিলেন। বাণ আর নিক্ষেপ করিতে হইলনা, কেবল—

সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা,
ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্[২]।

কেবল ধনুকে বাণটি সন্ধান করিলেন মাত্র। মদনের ভরসা যে,—পার্ব্বতী যখন সম্মুখবর্ত্তিনী, তখন সন্ধান অব্যর্থ।

যে দ্রব্যের যে গুণ, যে শক্তি, তাহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে। কোনও স্থলেই তাহার একেবারে বিলোপ হয় না। তবে স্থল-ভেদে, সেই শক্তির কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে মাত্র। বিষপানে অন্যের প্রাণনাশ নিশ্চিত, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণ নাশ হইয়াছিল না বটে, কিন্তু বিষের জ্বালায় তাঁহারও কণ্ঠ নীল হইয়াছিল!

মন্মথ যেমন, সম্মোহন বাণটি শিঞ্জিনীতে সন্ধান করিলেন, অমনি মহাদেবেরও হৃদয় যেন একটু কেমন হইয়া উঠিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কেহ হইলে হয়ত, ঐ বাণের সন্ধানমাত্রেই তিনি মদনের নিকট পরাজয়-স্বীকার করিতেন। জিতেন্দ্রিয় শূলপাণির তত দূর হইল না সত্য, কিন্তু তাঁহার মনটা একটু 'খট্' করিয়া উঠিল।

চন্দ্রোদয়ের পর নহে, চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভকালে, অম্বুরাশি যেমন ঈষৎ

১—কুমার, ৩য়—৬৫।
২—কুমার, ৩য়,—৬৬।

চঞ্চল হইবার মত হয়, মহাদেবেরও ধৈর্য্য সেইরূপ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। বিম্বোষ্ঠী উমার বদন-পঙ্কজের দিকে তাঁহার নয়নত্রয় যেন, যুগপৎ পতিত হইবার উপক্রম করিল[১]। কিন্তু নিমেষমধ্যেই, তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্থির হইলেন।

এদিকে 'শৈল-সুতারও' কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল। তাঁহার দেহ-যষ্টি 'স্ফুরদ্-বাল-কদম্বের' ন্যায় কণ্টকিত হইল। তিনি তখন আর ব্রীড়া-প্রযুক্ত গঙ্গাধরের দিকে চাহিতে পারিলেন না, আনত-নয়নে মুখখানি ফিরাইয়া ত্রিলোচনের সম্মুখে চিত্রার্পিতার ন্যায় নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন[২]।

রতি বসন্ত ও মদন—তিনজনে সমবেত হইয়া বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন। অন্যের পক্ষে এ তিনের প্রয়োজন নাই, একই যথেষ্ট। দেবাদিদেব মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে হইবে, তাই এই ত্র্যহস্পর্শ। এই ত্র্যহস্পর্শের প্রভাব সম্পূর্ণ বিফল হইবার নহে। আর হইতেও পারে না! হইলে যে, স্বভাবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই দেবাদিদেব মহাদেবেরও ধৈর্য্য 'কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত' অর্থাৎ চঞ্চল হইল। দেবীর দেবী পার্ব্বতীরও কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল। আর রতি-বসন্ত-মদনের প্রয়াসও কথঞ্চিৎ সফল হইল। স্বর্গের অন্য ললনার ন্যায়, পার্ব্বতীর কোনরূপ উল্লেখ-যোগ্য বিকার ঘটিল না বটে, তবে বস্তুধর্ম্মে অঙ্গ-লতিকা অকস্মাৎ রোমাঞ্চিত হইল মাত্র। তিনি অমনিই, ঈষদ্-বিবৃত্ত-বদনে ও অধোনয়নে আত্ম-সংযম করিয়া লইলেন। আর মহাদেব নিমেষমধ্যেই পূর্ব্ববৎ স্থির ধীর হইয়া পুনরায় অপ্রকম্প্যভাব ধারণ করিলেন।

১—কুমার, ৩য়, ৬৭—'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্ব-ফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥

২—কুমার, ৩য়, ৬৮—বিবৃণ্বতী শৈল-সুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্-বাল-কদম্ব-কল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্ত-বিলোচনেন॥

হর-সমাধি-ভঙ্গ

কবি, অতি কৌশলের সহিত, সকল চরিত্রেরই অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিলেন। রতি-বসন্ত-মদনের শক্তি, মহাদেবের মহামহিমশক্তি, আর, পার্ব্বতীর অপূর্ব্ব আত্ম-ধারণ-শক্তি—সমস্তই অতি সুপরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিলেন।

যদিও জিতেন্দ্রিয় পিনাক-পাণির চিত্তে প্রকৃতপক্ষে বড় কোনো বিকার জন্মিয়াছিল না, কিন্তু তবুও, অকস্মাৎ তিন নয়নই পার্ব্বতীর বিম্বাধরের প্রতি দৃষ্টি-দানে ব্যগ্র হইল কেন? ইহার কারণ কি? কৈ—এতদিন পার্ব্বতী আছেন, আজ নূতন নহে, অদ্যকার ন্যায় প্রত্যহই ত মহাদেবের শুশ্রূষা করেন, আর কখন ত শিবের চিত্তে এ প্রকার ক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই, আজ হইল কেন? ইহার হেতু কি?—তাই বশিশ্রেষ্ঠ অযুগ্ম-নেত্র, তদীয় চিত্ত বিকারের কারণ-দিদৃক্ষু হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন[১]। তিনি অদূরে, 'চক্রীকৃত-চারুচাপ', 'দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টি,' 'নতাংস,' আকুঞ্চিত-সব্য-পাদ,' বাণ-নিক্ষেপোদ্যত মদনকে দেখিতে পাইলেন। তপস্যার প্রতি আক্রমণ-নিবন্ধন, রুদ্রের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাঁহার নয়নত্রয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল[২]। তখন সে নয়নের দিকে, সে মুখের দিকে, দৃষ্টিপাত করে কাহার সাধ্য? অকস্মাৎ বিরূপাক্ষের সেই রোষ-কষায়িত ললাট-নয়ন হইতে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা বিনির্গত হইল[৩]। আকাশে দেবগণ, মদনের ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই সমবেত ছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে বিরূপাক্ষের ধ্যান-ভঙ্গ, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যদি হঠাৎ কোন বিপত্তি উপস্থিত হয়, তবে আমরা সকলে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় অবতরণ করিব, যতদূর পারি একটা প্রতিবিধান করিব। কিন্তু এরূপ যে হইবে, তাহা তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন নাই। যেমন ত্রিলোচনের তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নিশিখা নিষ্ক্রান্ত হইল, অমনি ভীত দেবগণও,—

১।২।৩—কুমার, ৩য়—৬৯, ৭০, ৭১।

'ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহর'

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সেই নিবারণ-ধ্বনি রুদ্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই,—যখন সেই দেববাণী আকাশে বায়ুভরের কোলে ভাসিতেছিল, তখন, নিমেষমধ্যে, সেই অনল-শিখায় মদন ভস্মীভূত হইলেন[১]।

সব ফুরাইল! দেবতাদের এত আয়োজন, এত আড়ম্বর—সমস্তই এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল! স্বর্গরাজ্যের পুন-রুদ্ধার-বাসনার বুঝি মূলোচ্ছেদ হইল! এ দিকে, পতির অকস্মাৎ তাদৃশ অচিন্তিত-পূর্ব্ব অবস্থা-দর্শনে, মদন নয়-জীবিতা রতিও মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্ন-ব্রততীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। আজ তাঁহার যে কি হইল, তাহা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই হতভাগিনীর সংজ্ঞা-লোপ হইল[২]। ব্যথিত-হৃদয়ের পরমোপকারিণি মূর্চ্ছে! তুমি দুঃখিনী রতিকে আর পরিত্যাগ করিও না, তাঁহার জ্ঞান আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিও না।

অকস্মাৎ পতিত বজ্র যেমন বনের প্রকাণ্ড 'বনস্পতিকে' ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিয়া অদৃশ্য হয়, 'তদ্রূপ তপোনিষ্ঠ মহাদেব, তপস্যার বিঘ্নভূত সেই কামদেবের নিপাত-সাধন করিয়া স্থির করিলেন যে, নারী-জাতির নিকটে আর থাকা নয়, তাই তৎক্ষণাৎ প্রমথ-গণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন[৩]।' এ দিকে, আলেখ্য-লিখিতার ন্যায় নিস্পন্দ-ভাবে দণ্ডায়মানা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পার্ব্বতীও দেখিলেন যে, সমস্তই বৃথা হইল। তাঁহার অত বড় সম্মানী উন্নত পিতার যে সমুন্নত অভিলাষ, তাহা সিদ্ধ হইল না। তাঁহার যে অনিন্দ্যসুন্দর কলেবর, ললিত কান্তি, তাহাও ব্যর্থ হইল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্য অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহার কোনই শক্তি নাই। সখীদ্বয়ের সম্মুখে বাঞ্ছিত চন্দ্র-শেখর-কর্ত্তৃক তাঁহার যে অদ্ভুত আতিথ্য সাধিত হইল, তাহাতে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া

১—কুমার, ৩য়—৭২। ২—কুমার, ৩য়—৭৩। ৩—কুমার, ৩য়—৭৪।

গেলেন। তিনি তখন, শূন্যহৃদয়ে, অবনত-মস্তকে, অতি কষ্টে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুদ্রের সেই বিশ্ব-বিকম্পিনী নয়নাকৃতির মুহুর্মুহুঃ স্মরণে, তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে লাগিল। নয়ন মুকুলিত হইয়া আসিল। হিমালয় পূর্ব্ব হইতেই কন্যার গতিবিধি, কন্যার অবস্থা সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি এই আসন্ন বিপদে অধীর হইয়া, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত, 'ভবনাভিমুখী' শূন্য-হৃদয়া দুহিতাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন[১]। পার্ব্বতীর প্রথম পরীক্ষার শেষ হইল। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, ইন্দ্রাদি-দেবগণ-রচিত শিব-সমাধি-ভঙ্গ-নাটকের যবনিকা পতিত হইল।

১—কুমার, ৩য়—৭৫, ৭৬।

নবম অধ্যায়।

তাৎপর্য্য।

মদন রতি ও বসন্ত—তিনজনে একযোগে, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন; মদন হর-নয়নানলে ভস্মীভূত,—রতি মূর্চ্ছিত,—বসন্ত পার্ব্বতীর দেহ আশ্রয় করিয়া ছিলেন—সুতরাং পার্ব্বতীর তিরোধানের সহিত তিনিও তিরোহিত হইলেন। মহাদেব বিরক্ত হইয়া সদল-বলে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে তপোবন, রতি-মদন-বসন্ত ও গৌরীর উপস্থিতিতে বিলাসের তরঙ্গে, আনন্দের প্রবাহে ভাসমান হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহা ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। দগ্ধীভূত কন্দর্পের ভস্মময় কঙ্কাল, সে শ্মশানের রৌদ্রমূর্ত্তি যেন আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। কালিদাসের অতুল কল্পনার বলে, অকস্মাৎ মধুর প্রভাতকালে, যেন গভীর নিশীথিনীর আবির্ভাব হইল। বিষাদের 'সূচি-ভেদ্য' অন্ধকার, অকস্মাৎ প্রফুল্ল বনস্থলীকে গাঢ়ভাবে আবৃত করিল! কালিদাস, তপোবনের এই মধুর মূর্ত্তিকে হঠাৎ এমন ভয়ঙ্করী করিলেন কেন? বিষয়টি একটু নিবিষ্ট-হৃদয়ে বুঝিতে প্রয়াস করা যাউক:

প্রথমেই বলিয়াছি যে, কবিগণের বর্ণনীয় বিষয় মাত্র দুইটি,—বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ। কবিগণ কখনও বহির্জ্জগতের সাহায্যে অন্তর্জ্জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, কখনও বা অন্তর্জ্জগতের সাহায্যে বহির্জ্জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, সৃষ্টি করেন! কখনও আবার, উভয় জগতের এমন সংমিশ্রণ করেন যে, বহিরন্তর্ব্বিচারে বিমূঢ় হইতে হয়। এই মদন-ভস্ম-ব্যাপারেও, কালিদাস, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের প্রাধান্য-প্রদর্শন-পূর্ব্বক, পরিশেষে উভয়ের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। প্রথম বহির্জ্জগতের অন্যতম প্রধান বসন্ত ও অন্তর্জ্জগতের প্রধান রতি-মদনের সৃষ্টি করিয়া, পরে উভয় জগতের সংমিশ্রণ-পূর্ব্বক, প্রমাণ

করিয়াছেন, যে, তোমার উদ্দেশ্য যদি সাধু না হয়, তবে বহিরন্তর্ উভয় জগৎ যুগপৎ সহায় হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে না। অসাধু-বাসনার সিদ্ধি সুদূর-পরাহত। তাই দেবগণ, বহির্জগতের প্রধান উদ্দীপনরূপী বসন্তের ও অন্তর্জগতের প্রধান উন্মাদক-রূপী মদনের সাহায্য পাইয়াও, অভিপ্রেত হরসমাধি-ভঙ্গ-রূপ অবৈধ কার্য্য সু-সাধিত করিতে পারিলেন না। যে যে কারণের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়াছিলেন, কার্য্যসিদ্ধি ত দূরের কথা, সেই সেই কারণ-কলাপের পর্য্যন্ত ধ্বংস হইল। ইহাই হইল মদন-ভস্মের প্রথম তাৎপর্য্য।

জগতে সকলেই সৌন্দর্য্যানুভবের জন্য, সৌন্দর্য্য-প্রীতি-সাধনার জন্য উৎসুক। যাঁহারা বলেন, 'আমি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহি' আমি তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। মানুষের হৃদয় কদাচ নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। তুমি যদি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী না-ই হও, তবে তোমাকে কিসের পক্ষপাতী বলিব? তোমার হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে বলিব? গুণের দিকে? তাই যদি হয়, তুমি যদি গুণেরই পক্ষপাতী হও, তাহা হইলেই তুমি সৌন্দর্য্যের সেবক হইলে। রূপ বস্তুর বহিঃস্থ অস্থায়ি সৌন্দর্য্য, আর গুণ তাহার অন্তঃস্থ স্থায়ি সৌন্দর্য্য। যাহাতে এই উভয় সৌন্দর্য্যের সম্মিলন আছে, তাহাই জগতে অধিকতর কমনীয়। হিমালয়ের নিতম্বদেশে ঘন-কৃষ্ণ মেঘমালার নৃত্য আছে, সেই নৃত্যে আবার বিদ্যুতের বিলাস আছে, মেঘ-প্রিয় শিখীর 'ষড়্জ সংবাদিনী' কেকা আছে, ইহা হিমাদ্রির বহিঃ-সৌন্দর্য্য। তথায় বিদ্যাধর-সুন্দরীগণ, মসৃণ ভূর্জ্জপত্রে 'ধাতুরসের' দ্বারা লেখা-রচনা করিয়া থাকে, গুহা-মুখোত্থিত সমীরণে তথায় কীচক-রন্ধ্র পরিপূর্ণ হইয়া বংশীর স্বরের ন্যায় মধুরস্বর-সংযোগে কিন্নর-কিন্নরীগণের বিলাস-সঙ্গীতে তান-প্রদান করিয়া থাকে, তথায় গজেন্দ্র-গণের কপোল ঘর্ষণে ছিন্নত্বক্ হইয়া সরলদ্রুম-নিচয় সুরভি নির্য্যাস বর্ষণ করে, তাহাতে সমগ্র

সানুদেশ সৌরভে আমোদিত হয়,—এ সমুদয় হিমালয়ের বহিঃ-সৌন্দর্য্য। তথায় চমরীগণ তাহাদের 'চন্দ্র-মরীচি-গৌর' চামর-পঙ্‌ক্তি আনর্ত্তিত করিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন মনে হয়, বুঝি শত-সহস্র চামর-ধারিণী কিঙ্করী নগাধিরাজের পরিচর্য্যা করিতেছে,—ইহা হিমালয়ের বহিঃ-সৌন্দর্য্য[১]। আর হিমালয়ের যে অপ্রতিম স্থৈর্য্য, অনন্য-সুলভ গাম্ভীর্য্য, চিরতুষার-ময়ত্ব, এই সকল তাঁহার অন্তঃ-সৌন্দর্য্য। হিমালয়ে এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের অনুপম সমাবেশ আছে বলিয়াই, তিনি নগ-কুলের অদ্বিতীয় অধিরাজ। তিনি আকারে যেমন পূর্ব্বাপর-সমুদ্রাবগাহী—বিরাট্, স্থিরতা-গম্ভীরতা প্রভৃতি গুণ-সম্পদেও তদ্রূপ প্রকাণ্ড—অসাধারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, যাহাতে বহিরন্তর্ উভয় সৌন্দর্য্যের সম্মিলন আছে, তাহা অধিকতর কমনীয়।

ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন দেখিলেন যে, শ্মশানচারী, বিভূতি-ভূষণ, মহাযোগী, ভূত-নাথের ধ্যান-ভঙ্গ করিতে হইবে, বহির্জগতের অলীক সৌন্দর্য্যে যিনি স্পৃহাশূন্য, তাদৃশ সংসার-বিরক্ত মহান্ সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-ভঙ্গ করিতে হইবে, পতিনিন্দা-শ্রবণে যেদিন দাক্ষায়ণী সতী দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যে সতী-কান্ত সাধ্বী দক্ষ-দুহিতার অন্তঃ-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, বহির্জগতের সমস্ত বাসনা-পরিহার-পূর্ব্বক, পর্ব্বতে পর্ব্বতে শ্মশানে শ্মশানে, সতীর অস্থি-ভস্ম-প্রভৃতি লইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান,[২] তাদৃশ প্রেম-সিন্ধুকে সংক্ষোভিত করিতে হইবে, যাহার কল্পনাতেও হৃদয় আশঙ্কিত হয়, তাদৃশ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তখন দেবতারা স্থির করিলেন যে, এবংবিধ প্রশান্ত হৃদয়ে বহির্জগতের প্রভাব বিস্তার অসম্ভব, প্রয়াস করিলে হয়ত, অন্তর্জগতের কথঞ্চিৎ ছায়াপাত করা যাইলেও যাইতে পারে। তবে অন্তর্জগৎ

১—কুমার, ১ম সর্গ—৫-১১।

২—কুমার, ১ম—২১, ৫৩, ৫৪।

একেবারে বহির্জ্জগন্‌নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যে কতদূর সমর্থ, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাই দেবগণ, বসন্ত ও রতি-মদনের সম্মিলন করিয়া, বহিরন্তর্—উভয় জগতের বিচিত্র সমাবেশ-সাধন-পূর্ব্বক, অধিকতর মনোহর উপায়ে, শিব-সমাধি-ভঙ্গের চেষ্টা করিলেন।

আলঙ্কারিকের মতে বলিলে বলিতে হয় যে,—রতি অনুরক্ত হৃদয়ের স্থায়ী ভাব, আর সেই রতি-বিষয়ে যে অভিলাষ বা কাম, তাহা ব্যভিচারী ভাব, এবং বসন্ত-বর্ষা-প্রভৃতি হৃদয়ের উল্লাসকর পদার্থসমূহ উদ্দীপন বিভাব। বসন্তাদি হৃদয়োন্মাদক পদার্থে চিত্ত প্রথমতঃ উল্লসিত ও উদ্দীপিত হয়, তখন সেই উল্লাসময় চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, ক্রমে নানাবিধ অভিলাষ বা ব্যভিচারী ভাবের উদয়ে হৃদয়ের সেই ভোগাকাঙ্ক্ষা নিরতিশয় বলবতী হইয়া উঠে, সে হৃদয় একান্ত উৎসুক, উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। পরে, প্রীতি বা ভোগে সে হৃদয়ের ঔৎসুক্য-উৎকণ্ঠার কথঞ্চিৎ উপশম হয়। কবি, দেবতাদের দ্বারা সেই জন্যই, উদ্দীপন বসন্ত, অভিলাষ বা বাসনারূপী কাম এবং ভোগ বা প্রীতিরূপিণী রতি—এই তিনজনকে প্রেরণ করাইলেন। বসন্ত-রূপী বহির্জ্জগৎ এবং রতি-কাম-রূপী অন্তর্জ্জগৎ—এই উভয়ের সহায়তায়, এই ভাবে দেববৃন্দ শিবের সর্ব্বনাশ-সাধনে তৎপর হইলেন। কিন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে যাহাকে সুন্দর পদার্থ বলা যায়, তদপেক্ষা সুন্দরতর পদার্থও এ জগতে আছে। লোকে সংসারের নানাবিধ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, যেমন ঘোর সংসারী সাজিয়া সৌন্দর্য্যের উপভোগ করে, তেমনই আবার, এই আপাততঃ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান সংসার ব্যাপারে একান্ত ভীত ও কাতর হইয়া, অনেক বিবেক-সম্পন্ন মনস্বী মহাজনও নিত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সুন্দরতম পদার্থের অন্বেষণে গহন অরণ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। সংসার-সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অলীক—অকিঞ্চিৎকর। তাই রতি, মদন ও বসন্ত—তিন জনকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া, তাঁহাদের সম্পূর্ণ

প্রভাবের দ্বারা সৌন্দর্য্য-তরঙ্গিণী উমার হৃদয় আবেগযুক্ত করিয়া, কবি, লাবণ্যময়ী উমাকে যখন ত্রিলোচনের নয়ন-পথবর্ত্তিনী করিলেন, তখন শঙ্কর সে বসন্ত-কুসুম-ভূষিতা গৌরীর প্রতি প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। যদিও নৈসর্গিক শাসনানুসারে শম্ভুর নয়নত্রয় একবার নিমেষের জন্য, উমার মুখের দিকে পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু বশী মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ হৃদয় স্থির করিয়া লইলেন। পার্ব্বতীর সেই অপার্থিবরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অবিনীত মদনের যথোচিত শাস্তি বিধান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কবি দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি একবার যথার্থরূপে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, নশ্বর ভোগের আপাত-রম্যত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক যে মহাত্মা, অবিনশ্বর, উচ্চতম, চিরানন্দ পদার্থের ভাবনায় চিত্ত সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট সকল প্রলোভনই ব্যর্থ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমবেতশক্তি-প্রয়োগেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করা যায় না; সে চেষ্টায় সুফল না হইয়া কু-ফলই হইয়া থাকে। বহিঃ-সৌন্দর্য্য নিতান্ত অলীক, নিতান্ত ভঙ্গুর; তাই, এক নিমেষের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের নিদান মদন ভস্মীভূত, রতি মূর্চ্ছিত, বসন্ত পলায়িত ও পার্ব্বতী পিতায় আশ্রিত হইলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে বন সৌন্দর্য্যের নন্দন কানন ছিল, মুহূর্ত্ত পরেই, তাহা ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইল। সৌন্দর্য্য এতই অকিঞ্চিৎকর! ইহাই মদন-ভস্মের দ্বিতীয় তাৎপর্য্য।

রাজ-নন্দিনী পার্ব্বতী, নারদ-মুখে চন্দ্রশেখরের নাম শ্রবণ মাত্রেই, উদ্দেশে তাঁহাকে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দিগম্বর পঞ্চাননের রূপ বা গুণ—কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অথবা তাঁহার কোন অনুসন্ধানই না করিয়া, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য-পূর্ব্বক, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াই তদীয় চরণোদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রণয়ের এবংবিধ বিচিত্র স্ফুরণ এ-ই নূতন। 'বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ

সমাধি-মগ্ন স্থাণুর সেবা করিয়াই পার্ব্বতীর কত তৃপ্তি। শুশ্রূষা করিতে করিতে যদি কোন সময়ে গৌরীর ক্লান্তি-বোধ হয়, তবে তখন তিনি, ধ্যানস্থ নিমীলিত-নেত্র চন্দ্রশেখরের পুরোভাগে উপবেশন পূর্ব্বক মুগ্ধ-নয়নে, তাঁহার ললাট-চন্দ্রের দিকে অনিমেষ চাহিয়া থাকেন, ইহাতেই গৌরীর কত আনন্দ! এইভাবে পার্ব্বতীর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন, তাঁহার সখীরূপিণী বন-দেবতারা তাঁহাকে বসন্তের ফুল, পত্র-পল্লবে কতই না সাজ-সজ্জা করিয়া দিলেন। গ্রহের এমনই বিপাক, যে, বাছিয়া বাছিয়া সেই দিনটিতেই ব্যোমকেশের সমাধি-ভঙ্গের জন্য, দেবগণ-প্রেরিত রতি, মদন ও বসন্ত তথায় উপস্থিত। রতি, মদন ও বসন্তের প্রভাবে পার্ব্বতী-চিত্তে একটু বিকৃত-ভাব ঘটিবার উপক্রম হইল। এতদিন সরস্বতীর প্রবাহের ন্যায় যে প্রণয় পার্ব্বতীর হৃদয়ের অতি-নিগূঢ়-প্রদেশে লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহার ঈষদ্ বহিরুন্মেষ হইল। অমনি, এত দিনের এত পরিচর্য্যা, এত-আত্মসমর্পণ, সমস্তই পণ্ড হইল। পার্ব্বতী-হৃদয়ের সেই অতুল নিঃস্বার্থ প্রেমে কামের কলঙ্কিনী ছায়ার প্রতিবিম্বনে উমার এত সাধ্য-সাধনা সব ব্যর্থ হইল। অমন প্রণয়ের ত্রিসীমাতেও যদি মদনের মলিন করস্পর্শ হয়, তবে তাহা বড়ই শোচনীয়, তৎপরো-নাস্তি বেদনা-জনক। তাই কৃত্তিবাস বিরক্ত হইয়া পার্ব্বতী-সন্নিধান পরিত্যাগ করিলেন, আর সেই সঙ্গে, অমন নির্ম্মল শারদ চন্দ্রমাকে গ্রাস করিবার জন্য যে করাল রাহু মুখ-ব্যাদান করিতেছিল, সেই মদনকেও ভস্মীভূত করিয়া গেলেন। পার্ব্বতীর ওরূপ নির্ম্মল-নিঃস্বার্থ প্রেমে—যাহাতে উত্তর কালেও আর, মদনের আধিপত্য না পৌঁছিতে পারে, তজ্জন্যই মদনের এই ভস্মে পরিণতি। কবি দেখাইলেন যে, সুবিশুদ্ধ প্রেম পঞ্চবাণের অধিকার-বহির্ভূত হওয়াই উচিত। বিশুদ্ধ প্রেমে মদনের নাম গন্ধও একান্ত অসহ্য। আত্মোৎসর্গে কাপট্য

থাকিলে চলিবে কেন? তাহাতে কামের গন্ধ থাকিলেও তাহা তোমার আত্মোৎসর্গ হইল না; তাহা তোমার আত্ম-নাশেরই রূপান্তর মাত্র। তোমার জন্মান্তর-সঞ্চিত শুভাদৃষ্ট-ফলে, যদি কখনো তুমি বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের অধিকারী হও, এবং যদিও কোনক্রমে তোমারই দুরদৃষ্ট-বশতঃ, সেই বিশুদ্ধ-রত্নে বাসনা-রূপ কীট প্রবেশ করে, তবে অচিরাৎ তাহার সংস্কার করিয়া লইও। নতুবা মনে রাখিও, ভাগ্য-ক্রমে তুমি যে অনাবিদ্ধ-রত্নের অধিকারী হইয়াছ, তোমার সে অমূল্য-রত্ন অচিরেই ঐ কীট-দংশনে, জীর্ণ-শীর্ণ-শতচ্ছিদ্র হইবে। সুতরাং দুষ্ট কীটের বিনাশ করিয়া ফেল। তাই কবি-কুল-কেশরী কালিদাস, পরম যোগী বিরূপাক্ষের দ্বারা মদনকে বলিদান দিয়া, পার্ব্বতীর হৃদয়াসীনা প্রেম-প্রতিমার অর্চ্চনা করাইলেন। পার্ব্বতীকে মদন-পীড়া-শূন্য বিশুদ্ধতম প্রেমের অদ্বিতীয় অধিকারিণী করিলেন।

বিশুদ্ধ প্রেম পণ্য-চর্চ্চার সামগ্রী নহে। উহাতে সাজ-সজ্জার কোনই প্রয়োজন নাই। যাঁহাকে অজ্ঞাতসারে তুমি মনে মনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, যাঁহার নিকট তোমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই, কিন্তু যিনি তোমার ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র প্রার্থনীয়, তাঁহার সম্মুখে আবার সাজ-সজ্জা কেন? কি প্রলোভনে মা, আজ অকস্মাৎ তোমার এমন সুন্দর বেশ-ভূষায় বাসনা জন্মিল? জননি! অমন নির্ম্মল রত্নে আবার শিল্প-চাতুর্য্য কেন? তুমি তোমার অন্তরের মহার্ঘ রত্নকে বাহ্য আবরণে সাজাও কেন? মা! উহা যে তোমার দেবী-হৃদয়ের একান্ত বিসদৃশ। সাজ-সজ্জায়, তোমার সেই ভস্মাবৃত-কায়, শ্মশান-চারী, উপাস্য-দেবতার কি প্রীতি হইবে? উহাও যে তোমার হৃদয়ের পূর্ব্বাপর-বিরোধী।

অহেতুক আত্মোৎসর্গে ভূষান্তরের প্রয়োজন নাই। সে নিজেই নিজের ভূষণ। অন্তরের পদার্থ বাহিরে আনিতে নাই। উহাতে তাহার মহিমা খর্ব্ব

হয়। নিঃস্বার্থ আত্ম-সমর্পণের সংসর্গে অন্যে ভূষিত হয়, তাহার নিজের বেশভূষা অনাবশ্যক। 'তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ'। যাহার প্ররোচনায় তোমার এই বুদ্ধি-মান্দ্য ঘটিয়াছে, তোমার নিজের হৃদয়কে তুমি নিজেই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছ, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে—সেই মদনকে উন্মূলিত কর। তা'র পর, তোমার উপাস্য দেবতার সম্মুখীন হইও। ইহাই হইল মদন-ভস্মের তৃতীয় তাৎপর্য্য।

দশম অধ্যায়।

সাধনা ও সিদ্ধি।

মদন ভস্ম হইল। পার্ব্বতীর প্রথম পরীক্ষা (trial) নিষ্ফল হইল। তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইলেন। তাঁহার মর্ম্মের গ্রন্থিগুলি যেন শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি শ্লথ-হৃদয়ের দুঃসহ যাতনায় একেবারে যেন মরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত আত্মনির্ভর, অসাধারণ ধৈর্য্য। তিনি অভীষ্ট-দেবতার প্রসাদ-লাভের জন্য এবার প্রাণান্ত পণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সৌন্দর্য্যের শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকরী, উহার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। শরীর-পাতিনী সেবায় যাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে প্রাণপাতিনী তপস্যায় যদি তাঁহার কৃপালেশও প্রাপ্ত হয়েন, জীবন সার্থক হইবে। অন্যথা সেই চির-অভীষ্ট-দেবতার উদ্দেশে ব্যর্থ জীবনের অবসান করিবেন। তিনি বুঝিলেন যে, তপস্বি-হৃদয় জয় করিতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন। তাই মনস্বিনী উমা, পিতার অনুমতিক্রমে, শিখণ্ডি-কুল-মণ্ডিত গৌরি-শিখর-পর্ব্বতে তপশ্চরণের নিমিত্ত গমন করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন[১]।

সৌন্দর্য্যের উপর তাঁহার এমনই বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল যে, প্রিয়-মণ্ডনা পার্ব্বতী কণ্ঠের হার-যষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 'বালারুণ-বভ্রু'' বল্কল পরিধান করিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ-চিক্কণ কেশপাশ জটায় পরিণত হইল। নিতম্বে রসনার পরিবর্ত্তে 'ত্রিগুণমৌঞ্জী' বন্ধন করিলেন। ব্রতের নিমিত্ত নিয়ত কুশচ্ছেদন করায়, তাঁহার চম্পকাভ অঙ্গুলিনিচয় ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি প্রসূনমালার পরিবর্ত্তে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন। সুকুমারী উমা এখন, বাহুলতিকায় মস্তক-সংস্থাপন-পূর্ব্বক, অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন করেন। তাঁহার নয়ন-পঙ্কজের সেই 'বিলাস-চেষ্টিত' ও

১—কুমার, ৫ম—২, ৭।

'বিলোল-দর্শন' বিলুপ্ত হইল। তপস্বিনী, প্রতিদিন স্নানান্তে, বল্কলের উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন, বিহিত অধ্যয়নাদি করেন। তাঁহার তপস্যা এবং সদাচারের কথা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া, বয়োবৃদ্ধ ঋষিগণও তাঁহার দর্শনার্থি-রূপে সমাগত হইতেন[১]। তাঁহার তপঃপ্রভাবে সমস্ত বনস্থলীও যেন সাত্ত্বিক-ভাবময় হইয়া উঠিল[২]। এই ভাবে বহুদিন তপস্যার পর, যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ইষ্ট-সিদ্ধির কোনই লক্ষণ অনুভূত হয় না, তখন দৃঢ়সঙ্কল্পা পার্ব্বতী স্বীয় সুকুমার শরীরের সামর্থ্য-বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আরও কঠিনতর দুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দুঃসহ নিদাঘকালে, চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্বিধ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তাহার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, সহাস্যবদনে ও অনিমেষনয়নে, দুর্দ্দর্শ সবিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। প্রতপ্ত সৌরকরে তদীয় বদন পঙ্কজবৎ সুশোভিত হইত; কিন্তু প্রখর রৌদ্র-তাপে ক্রমে তাঁহার অপাঙ্গযুগল কৃষ্ণাভ হইতে লাগিল[৩]। তিনি আহার ত্যাগ করিলেন। কেবল 'অযাচিতোপস্থিত' জলদ-জলে ও অমৃতদ্যুতির বিমল রশ্মি-ধারায় তাঁহার পারণা বিহিত হইত। তিমিরাবৃত গভীর নিশীথ-সময়ে, যখন তিনি অনাবৃত স্থলে শিলাখণ্ডে শয়ন করিয়া থাকিতেন, আর ভয়াবহ ঝটিকার সহিত বৃষ্টি পতিত হইত, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত, তখন মনে হইত, যেন নিশীথিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা-দর্শনাশায়, এক এক বার নয়ন উন্মীলন করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই, সেই সুকুমার-দেহের তাদৃশী শোচনীয়দশা দেখিয়া, সম-বেদনায় অধীর হইয়া ঝটিতি নয়ন মুদ্রণ করিতেছেন[৪]। এইভাবে গ্রীষ্মে

১—কুমার—৫ম—৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬।

২—কুমার, ৫ম—১৭।

৩—কুমার,—৫ম—১৮, ২০, ২১।

৪—কুমার, ৫ম—২২, ২৫।

সূর্য্যাতপে ও অনলমধ্যে, বর্ষায় উন্মুক্ত শিলাখণ্ডে এবং শীত-রজনীতে জলমধ্যে থাকিয়া পার্ব্বতী তপস্যা করেন। এইরূপ কঠোর তপশ্চরণে, দিন দিন তাঁহার অঙ্গ-লতিকা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এই ভাবে, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ চলিয়া গেল; কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে তাঁহার এই ঘোর, প্রাণপাতী সাধনা, তাঁহার প্রসন্নতার কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। উমা যখন তপস্যা আরম্ভ করেন, তখন যে সমুদয় বাল-পাদপ রোপণ করিয়াছিলেন, প্রত্যহ প্রভাত ও সায়ংকালে স্বহস্তে সলিল সেচন-পূর্ব্বক যাহাদিগকে জীবিত রাখিতেন, এক্ষণে সেই সমুদয় পাদপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, নানাবিধ ফল-পুষ্পে তাহারা এখন সুশোভিত, কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া দীনা রাজনন্দিনী এই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষার—চন্দ্রশেখর-বিষয়ক সেই অত্যুচ্চ মনোরথের—অঙ্কুর পর্য্যন্তও এত দিনে উত্থিত হইল না[১]। এইভাবে তপস্বিনী উমার বহুকাল কাটিয়া গেল।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ যেমন আকৃষ্ট হয়, এতকাল পরে, তেমনই হর-বদ্ধ-হৃদয়া পার্ব্বতীর ভক্তির আকর্ষণে ভক্ত-বৎসল আশুতোষের আসন টলিল। তিনি নবীন-ব্রহ্মচারী-বেশে পার্ব্বতীর আশ্রমে অতিথি হইলেন। বাসনা,—সেই তপস্বিনী-হৃদয়ের পরিমাণ কত, আর সে হৃদয়ের প্রণয়েরই বা গভীরতা কতদূর, তাহা আর একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন। পার্ব্বতী অতিথির যথাবিহিত সৎকার করিলেন। কে কি জন্য, তাঁহার আশ্রমে আজ অতিথিরূপে উপস্থিত, ইহার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিলেন না, বা জানিতে বাসনাও করিলেন না। তপস্যা-বিষয়ক দুই চারিটি কুশল-প্রশ্নের পর, সেই নবীন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পার্ব্বতি! কিসের জন্য তোমার এ কঠোর তপস্যা? হিরণ্যগর্ভের সমুন্নত ও সুপবিত্র বংশে তোমার জন্ম। ত্রিজগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশি যেন একত্র

১—কুমার, ৫ম—৬৫।

সমাহৃত করিয়া, তদ্দ্বারা তোমার দেহযষ্টি নির্ম্মিত। তোমার পিতা পর্ব্বত-কুলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সুতরাং কল্পনায় যত প্রকার ঐশ্বর্য্যের কথা উদিত হইতে পারে, সে সমস্তই ত তোমার পক্ষে একান্ত সুলভ। তোমার এই নবীন বয়ঃক্রম,—ত্রিজগতে তোমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ত কিছুই দেখি না, তবে তুমি কি বাসনায় এই মহাতপস্যায় রত হইয়াছ[১] ?” অতিথি এই ভাবে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্ব্বতী কিন্তু নির্ব্বাক্। অতিথি বলিলেন, ‘তুমি কি স্বর্গ-কামনায় তপস্যা করিতেছ ? তাহা যদি হয়, তবে তোমার কেন এ নিরর্থক শ্রম ? তোমার পিতৃভবন যে স্বর্গস্থ দেবতা-বৃন্দেরও নিত্য-লীলা-নিকেতন, ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’। আমার মনে হয়, স্বর্গ তোমার প্রার্থনীয় নহে। তবে কি উপযুক্ত পতি-লাভের জন্য তোমার এই তপস্যা ? তাহা হইলেও ত তোমার ন্যায় কন্যার পক্ষে এ শ্রম বৃথা। রত্নকেই লোকে যত্ন করিয়া অন্বেষণ করে, রত্ন স্বয়ং কখনো কাহাকেও অন্বেষণ করে না[২]।’ এতক্ষণ পার্ব্বতী নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ-ভাবে এবং আনত-বদনে অতিথির কথা শুনিতেছিলেন,—কিন্তু অতিথির এই প্রশ্ন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। চতুর ব্রহ্মচারী যেন, ঐ এক দীর্ঘ-নিশ্বাসেই সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। তখন অমনি তিনি বলিলেন,—‘গৌরি ! আর কত কাল এই ভাবে তপস্যায় শরীর-পাত করিবে ? যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন আমিও অনেক তপস্যা করিয়াছি, আমার সে তপস্যা সঞ্চিত আছে, না হয় তাহারই অর্দ্ধেক তোমাকে দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি তোমার অভীষ্ট লাভ কর ! কিন্তু তোমার সেই অভীষ্টটি কি, তাহা কি আমি

১—কুমার, ৫ম—৪১,—কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্য বেধসস্ত্রিলোক-সৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্য্য-সুখং নবং বয়স্তপঃ-ফলং স্যাৎ কিমতঃপরং বদ॥

২—কুমার, ৫ম—৪৫,—দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ, পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা—ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ॥

জানিতে পারি[১] ?" ব্রহ্মচারী এইভাবে, নানাবিধ আত্মীয়-ব্যবহারে পার্ব্বতীর হৃদয়-নিহিত অভিপ্রায় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর না দিলে, যদি অতিথি অবমাননা বোধ করেন,—এই আশঙ্কায়, পরম আতিথেয়ী উমা সমীপ-বর্ত্তিনী সখীকে ইঙ্গিত করিলেন। তখন তাঁহার সেই বয়স্যা বলিলেন—'ইঁহার অভিলাষ অতি উচ্চ! ইন্দ্রাদি অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী দেববৃন্দের কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষ ইঁহার নাই। কন্দর্পকে শাসন করিয়া যিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে, সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইবার নহে, সেই, 'অরূপহার্য্য' 'পিনাক-পাণি'কে পতিত্বে বরণ করিবার আশাতেই অভিমানিনী উমার এই কঠোর তপস্যা। জানিনা, কত দিনে ইঁহার সে আশা-লতা ফলবতী হইবে[২]।' বয়স্যার এই উক্তি শ্রবণে যেন বিস্মিত হইয়া, সেই 'নৈষ্ঠিক-সুন্দর' ব্রহ্মচারী বলিলেন—'সত্য নাকি? না আমাকে 'পরিহাস' করিতেছ[৩]।' পার্ব্বতীর আবার বিষম পরীক্ষা উপস্থিত। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি আজ আশ্রমে অতিথি, অতিথির অবমাননা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অথচ মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে যে কথা লুক্কায়িত, সেই কথার প্রকাশই বা কি করিয়া সম্ভবপর? পার্ব্বতী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। শেষে হৃদয়ে ভর করিয়া, অতি কষ্টে অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন—

১—কুমার, ৫ম-৫০,—'কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি! বিদ্যতে মমাপি পূর্ব্বাশ্রম-সঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধ-ভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্॥

২—কুমার, ৫ম-৫৩—ইয়ং মহেন্দ্র-প্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী।
অরূপ-হার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ পিনাক-পাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি॥

৩—কুমার, ৫ম—৬২।

'যথাশ্রুতং বেদবিদাং বর! ত্বয়া
জনোঽয়মুচ্চৈঃ-পদ-লঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তি-সাধনং,
মনোরথানামগতি র্ন বিদ্যতে'[1] ॥

হে পণ্ডিতবর! আপনি যাহা শুনিলেন, তাহা যথার্থ। সত্যই এ অভাজন অতি উচ্চপদের অভিলাষী। হায়, আমার এমনই দুরাশা যে সামান্য তপস্যা-দ্বারা সেই দুর্লভ-পদ-লাভের ইচ্ছা করিতেছি। মুগ্ধ বাসনা কোথায় না ধাবিত হয়?'

নীল-কণ্ঠের প্রতি পার্ব্বতীর যে অনুরাগ, কথায় তাহার এই প্রথম প্রকাশ। ইহা অপেক্ষা গভীর ভাব, আর কোথাও দেখিয়াছ কি? একটি মাত্র কথায়, অথচ সুপরিস্ফুট-ভাবে হৃদয়ের ভাব ও আত্মোৎসর্গের অনুপম চিত্রের এমন সুন্দর প্রকাশ আর আছে কি? কিন্তু ইহাই পার্ব্বতীর শেষ কথা নহে। ইহার পর যোগিবর-কর্ত্তৃক শিবের নানা প্রকার নিন্দা ও পার্ব্বতীর উত্তর—বড়ই চমৎকার। সংস্কৃতসাহিত্যের অন্য কোথাও তাহার তুলনা নাই।

'মহাদেবের তিন চক্ষু, জন্মের কোনই স্থিরতা নাই, চিতাভস্ম তাহার দেহের অনুলেপ, বিষধর সর্প তাঁহার অলঙ্কার, পরিধেয় কখনো নাগচর্ম্ম, কখনো বা তিনি দিগ্বসন, নর-কঙ্কাল তাঁহার মাল্য ও নর-কপাল তাঁহার পান-পাত্র, শ্মশান তাঁহার বিচরণক্ষেত্র, বলীবর্দ্দ তাঁহার বাহন; তুমি তাঁহার কোন্ গুণে মুগ্ধ হইলে? এখনও অনুরোধ করি, এ অসদিচ্ছা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত কর,'—বলিয়া ব্রহ্মচারী, শিবের কতই না নিন্দা-বাদ করিলেন[2]। কন্যা-হৃদয়ে কন্যা-জন-সুলভ রূপ-তৃষ্ণার উদয়

১—কুমার, ৫ম—৬৪

২—কুমার, ৫ম ৬৬, ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭২ ৭৩

করিতে যতিবর কত প্রয়াস করিলেন। কিন্তু তপস্বিনী পার্ব্বতীর হৃদয় স্থির, ধীর অভীষ্ট সাধনায় অটল। ব্রহ্মচারী-কথিত শিবের যত কিছু দোষ সে সমুদয়, পার্ব্বতী তাঁহার বাঞ্ছিত দেবতার অনন্য-সাধারণ গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। এইরূপে, অতিথি ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীর নিকটে ক্রমে অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠী পার্ব্বতী যখন বলিলেন—

'বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধ-ভোগি বা, গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দু-শেখরং ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ[১] ॥
বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং কথং স লক্ষ্য-প্রভবো ভবিষ্যতি[২] ॥

তখন ব্রহ্মচারী সেই পার্ব্বতী-হৃদয়ের গভীর প্রেম, অতুল আত্মসমর্পণ ও অলৌকিক নির্ভর দেখিয়া সত্য সত্যই অবাক্ হইলেন। পরে পার্ব্বতী যখন আবার বলিলেন যে, অতিথি-বর তোমার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় লাভ কি? তুমি শিবের সম্বন্ধে যেরূপ যেরূপ বিদিত আছ, স্বীকার করিলাম যে তিনি সেইরূপ অথবা তদপেক্ষাও নিন্দার পাত্র; কিন্তু তাহাতেই বা আমার কি? আমার চিত্ত তাঁহাতেই এক-নিষ্ঠ

১—কুমার,—৫ম—৭৮, ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, অতএব তাঁহার শরীর যে কি প্রকার ইহা অবধারণ কে করিবে? কখন অলঙ্কারে উজ্জ্বল, কখন সর্পই তাহার ভূষণ; কখন পরিধান হস্তিচর্ম্ম কখন বা পট্টবস্ত্র; কখন মনুষ্যের ললাটাস্থি মস্তকে ভূষণস্বরূপ ধারণ করেন, কখনও বা চন্দ্রই তাহার শিরোভূষণ হয়। (কৃষ্ণকমল)

২—কুমার, ৫ম—৮১—তুমিত অধঃপাতে গিয়াছ, শিবকে নিন্দা করাই তোমার অভিপ্রায়। তথাপি শিবের একটী প্রশংসা তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। তুমি বলিয়াছ তাঁহার জন্মের কোনই স্থিরতা নাই। ঠিক কথা, যিনি ব্রহ্মারও উৎপত্তির মূল, তাঁহার জন্মের নিরূপণ কিরূপে সম্ভবে? (কৃষ্ণকমল)

একমাত্র তাঁহাতেই অনুরক্ত[১]; তখন অতিথি যেন আরও বিস্মিত হইলেন। পার্ব্বতী দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যুবক আবার যেন কি বলিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, সতী এবার বিরক্ত হইলেন। যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার নিন্দাবাদ শুনিলে যে কেবল প্রাণে ব্যথা লাগে, তাহা নহে, তাদৃশ মহান্ মহোদয়ের নিন্দা শ্রবণে পাপও জন্মে, অথচ অতিথিকে নিবৃত্ত করিবার সাধ্যও আমার নাই, সুতরাং আমারই এস্থান ত্যাগ করা উচিত,—এই স্থির করিয়া যেমন

ইতো গমিষ্যাম্যথবেতিবাদিনী চচাল বালা স্তন-ভিন্ন-বল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ সমাললম্বে বৃষ-রাজকেতনঃ[২] ॥

'এ স্থান হইতে আমি চলিলাম' বলিয়া, পার্ব্বতী গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীও তৎক্ষণাৎ চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সহাস্য-বদনে, গমনোন্মুখী গৌরীকে ধারণ করিলেন। তখন বিস্ময়-বিমুগ্ধা উমা—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গ-যষ্টি
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃত মুদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধি-রাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ[৩] ॥

অকস্মাৎ সেই বহু-তপস্যা-লব্ধ হৃদয়েশ্বরকে দেখিয়া সমীর-পীড়িতা নলিনীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল! তিনি স্থানান্তরে গমন করিবার জন্য যে চরণ শূন্যে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা শূন্যেই উত্তোলিত রহিল। অতএব, পথিমধ্যে কোনও শৈলে প্রতিহত হইলে, নদীর জল যেমন ক্রমশঃ স্ফীত হইতেই

১—কুমার, ৫—৮২। ২—কুমার, ৫—৮৪। ৩—কুমার, ৫—৮৫।

থাকে, অগ্রসরও হয় না, পশ্চাদ্দিকেও যায় না, তদ্রূপ, শৈলেন্দ্রদুহিতা অগ্রসরও হইতে পারিলেন না, বা পশ্চান্নিবৃত্তও হইলেন না। তিনি চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়াই রহিলেন। অধোমুখী রাজনন্দিনীর তাদৃশ নিশ্চল-নিস্পন্দ-অবস্থান-দর্শনে, চন্দ্রশেখর হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ।

হে অবনতাঙ্গি! আজ হইতে আমি তোমার দাস হইলাম, তুমি তপস্যার দ্বারা আমাকে ক্রয় করিলে। ইন্দুভূষণের মুখে এই কথাটি শ্রবণ করিবামাত্রই তপস্বিনী গৌরী—

অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ্জ।

এই দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী প্রাণ-পাতিনী তপস্যার যত কিছু কষ্ট, যত কিছু গ্লানি, সমস্তই যেন অকস্মাৎ ভুলিয়া গেলেন! তাঁহার তপঃক্ষাম পতিতপ্রায় দেহে নবজীবনের আবির্ভাব হইল! আজ উমার সম্মুখে তদীয় জীবন-নাটিকার আর এক নূতন অঙ্ক সহসা উন্মুক্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

উপসংহার।

অসাধ্য-সাধন করিতে হইলে, উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিতে হইলে, তপস্যা চাই। আত্মসমর্পণ চাই। অন্তর্ জয় করিতে হইলে আন্তরিকতা চাই। তাই পার্ব্বতীর এই কঠোর তপস্যা। তপস্যা কদাচ ব্যর্থ হয় না। সেই কতকাল পূর্ব্বে, দেবর্ষি নারদের মুখে, বালিকা উমা, চন্দ্রশেখরের নামটি শুনিয়াই তাহার উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই দীর্ঘকাল যাবত্ তাঁহার কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন, একাগ্র-হৃদয়ে তাঁহার করুণার্থিনী হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, এতদিন পরে, আজ পার্ব্বতীর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। উমা স্বহস্তে যাঁহার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নির্জ্জনে সেই প্রতিমূর্ত্তিকে তিরস্কার করিতেন যে, হে বিশ্বনাথ, পণ্ডিতগণ তোমাকে সকলের অন্তর্যামী কহেন, কৈ, এ হতভাগিনীর অন্তরের যে কি বেদনা তাহা কি তুমি আজও জানিতে পারিতেছ না[১]? আজ অকস্মাৎ সেই অন্তরের দেবতাকে বাহিরে দেখিয়া উমার জন্ম সার্থক হইল। তখন উমার হৃদয়ের অবস্থা যে কিদৃশী, তাহা তিনি নিজেই ধারণা করিতে পারেন নাই, তাই তিনি 'ন যযৌ ন তস্থৌ।' এ বড় সুন্দর চিত্র! এমন নিরবদ্য চিত্র আর দেখিয়াছ কি? যত দিন জগতে বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে, মানুষের চেতনা শক্তি থাকিবে, ততদিন, এ প্রতিমা সর্ব্বত্রই ভক্তিভরে অর্চ্চিত হইবে। এই সকল স্বর্গীয় চিত্র যখন দর্শন করি, তখন মানব জন্ম সার্থক মনে হয়, হৃদয় লঘু হয়, দেহ পবিত্র হয়। মহাকবির উদ্দেশ্যে মস্তক আপনিই নত হইয়া আইসে।

১—কুমার, ৫ম—যদা বুধৈঃ সর্ব্বগতস্ত্বমুচ্যসে ন বেৎসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্।
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ।

এই ভাবে, সেই শিখণ্ডি-কুলমণ্ডিত, প্রকৃতির লীলাস্থলী, গৌরী-শিখর-পর্ব্বতে শশাঙ্ক-শেখরের সহিত উমা-শশীর মিলন হইল। যিনি একবার উমার বহিঃসৌন্দর্য্যে বিরক্ত হইয়া তাহাতে আবার মদনের আধিপত্য দেখিয়া ঘৃণার সহিত 'স্ত্রীসন্নিকর্ষ' পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মদনকেও ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, তিনি এখন সেই উমার মদন-গন্ধ-বর্জ্জিত আন্তরিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইলেন। তখন যাঁহার হৃদয় বজ্রাপেক্ষাও কঠিন ছিল, এখন তাঁহারই সেই হৃদয় কুসুমাপেক্ষাও কোমল হইল। মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি[১]।"

ক্রমে হিমালয়-গৃহে পরম সমারোহে হরপার্ব্বতীর বিবাহ হইল। সে বিবাহে হরগৌরীর পূজার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বর্গের তাবৎ দেববৃন্দ উপস্থিত হইলেন।

পুরাণ-কর্ত্তৃগণ রাজাধিরাজ হিমালয়ের রাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য, এইস্থলে আবার একটি স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শঙ্কর-শঙ্করীর আন্তরিক মিলন পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া, পুনরায় বহির্ম্মিলনের জন্য এই স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান। চিত্রকর কালিদাস উহা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি দেখিলেন এমন সুন্দর চিত্রে অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকিবে, তাহাই উহার আবর্জ্জনা-স্বরূপ। প্রকৃতির শাসনে যে কুসুম আপনিই বিকসিত-প্রায়, তাহাকে ফুটাইতে আবার বল-প্রয়োগ কেন? অপার্থিব চিত্রে পার্থিব কর-স্পর্শ কেন? উহা সৌন্দর্য্যের ঘোর পরিপন্থী। তাই তিনি ঐ সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১—উত্তরচরিত—লোকোত্তর মহাত্ম-বৃন্দের হৃদয় কখনো বজ্রাপেক্ষা কঠিন, আবার পরক্ষণেই হয়ত, কুসুমাপেক্ষাও কোমল। সে হৃদয়ের প্রকৃত স্বরূপ অতীব দুর্জ্ঞেয়।

হিমালয়-সদনে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। ব্রহ্মার বাক্য সফল হইল। তারকাসুরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আসন কম্পিত হইল। সরস্বতী স্বয়ং আসিয়া সেই বধূবরের স্তুতি করিলেন। অপ্সরাগণ অতিশয় যত্নের সহিত, দম্পতির প্রীতি-বর্দ্ধন-মানসে, এক অভিনয় করিলেন। স্বর্গের সমস্ত দেবগণ সেই স্থলে সমবেত। হর-পার্ব্বতীর আজ প্রীতির সীমা নাই। এমন সময়ে, মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া, দেববৃন্দ অঞ্জলিবদ্ধ-করে, আশুতোষের নিকটে ভস্মীভূত পঞ্চবাণের পুনর্জ্জীবন ভিক্ষা করিলেন। বিরূপাক্ষ যখন মদনকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন 'অপরিগ্রহ', আর আজ তিনি স-পরিগ্রহ, উমার সহিত মিলিত, অর্দ্ধ-নারীশ্বর-মূর্ত্তি। আজ আর তাঁহার সে অন্তঃকরণ নাই, কামকে হারাইয়া কামপ্রিয়া রতির যে কি দশা হইয়াছে, তাহা তিনি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। তাই যেমন প্রার্থনা, আশুতোষ অমনি প্রসন্ন-হৃদয়ে অনুমতি দিলেন যে, কাম পুনরুজ্জীবিত হইয়া আমার সেবা করুন! দেবতারা পরম আনন্দিত হইলেন। কামের পুনর্জ্জীবন লাভ হইল। মিলনের পূর্ব্বে সংসার কামশূন্য ছিল, আজ মিলনের পরে, সংসারে কামের আবির্ভাব হইল। এই চিত্রে কালিদাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অতি নিগূঢ় রহস্যের মীমাংসা করিলেন। কুমারসম্ভবও এক প্রকার সমাপ্ত হইল।

তারপর কুমারের অষ্টমে হরপার্ব্বতীর গন্ধমাদনাদি পর্ব্বত ভ্রমণের বিচিত্র বর্ণনা। সে বর্ণনা যে প্রকার চমৎকারিণী, তদনুরূপই হৃদয়গ্রাহিণী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যাঁহার হৃদয় উন্মত্ত, প্রকৃতির প্রেমে বিহ্বল হইয়া যিনি সংসার-ত্যাগী, প্রকৃতির অব্যর্থ আকর্ষণে, যিনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার সহিত, প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন হিমালয়ের কন্যার পর্ব্বত-ভ্রমণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-দর্শন; উভয়েই উভয়ের জন্য আত্মবিস্মৃত, শিবের সমস্তই যেন গৌরীময়, গৌরীরও সমস্তই শিবময়; কল্পনাতীত সুন্দর ভাব!

কালিদাস কুমারের অষ্টমে, সম্মিলিত 'পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের' যে স্বর্গীয় মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন, রঘুবংশের ত্রয়োদশে, সেই 'চিত্রীকৃত' প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগন্মাতা ও জগৎ-পিতা বলিয়া, পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের যে সকল ভাব, যে সকল অবস্থা, তাঁহার একান্ত প্রিয় হইলেও, বর্ণন করা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই, খিন্ন-হৃদয়ে বিরত হইয়াছেন, রঘুবংশে তাঁহার সে খেদ মিটাইয়াছেন। রাম-সীতার পবিত্র-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদের সেই অরণ্যবাস এবং লঙ্কা-সমর-বিজয়ের পর আকাশপথে পতি-পত্নীর অযোধ্যায় পুনরাগমন বৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণন করিয়া, কুমার-সম্ভবের বর্ণনায়, কবি, অপরিহার্য্য কারণে যে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রঘুবংশ আরম্ভ করিবার সময়েই কুমারসম্ভবের অনুক্ত অংশগুলি—যাহা কবির মানস-পটে গ্রথিত ছিল,—মনে পড়িয়াছে, তাই বুঝি কবি, কুমারসম্ভবেরই নায়ক-নায়িকা 'পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকেই' প্রণাম করিয়া, তাঁহার প্রিয় রঘুবংশের সূত্রপাত করিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মেঘদূত।

"সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ড কাব্য আছে, মেঘদূত তন্মধ্যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ড কাব্য কালিদাস-প্রণীত। মেঘদূত ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ অত্যন্ত স্ত্রৈণতাবশতঃ, আপন কর্ম্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে, তোমাকে একাকী এক বৎসর রাম-গিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে সে তথায় আটমাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শন-দুঃখে উন্মত্ত-প্রায় হয়। পরিশেষে আষাঢ়ের প্রথম-দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া, যক্ষ বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন-বোধে সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভার-গ্রহণ-প্রার্থনা জানাইল, এবং রাম-গিরি হইতে আপন আলয় অলকা পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর-রূপে মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস যক্ষের পথ-নির্দ্দেশ উপলক্ষে, এই খণ্ডকাব্যে, নানা গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, উপবন, ক্ষেত্র, দেবালয়, রাজধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষ-পত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি ও অনন্ত-সামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত[১]।"

১—বিদ্যাসাগর।

মেঘদূত এক অতি বিচিত্র কাব্য। উহার সহিত অন্য কোন কাব্যেরই তুলনা হয় না। মেঘদূতের তুলনা—মেঘদূত। এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে, মেঘদূতের কবি, কোথাও তাঁহার মনের মত স্থান, বা মনের মত সমাজ পাইলেন না। মর্ত্তের পদার্থে, মর্ত্তের সমাজে বা মর্ত্তের মানুষের বর্ণনায় তাঁহার তৃষিত কল্পনার তৃপ্তি হইল না, তাই তিনি অতিমর্ত্ত-লোকের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। মর্ত্তের সমস্ত মূর্ত্তিই স-সীম, সুতরাং সে মূর্ত্তিতে তাঁহার অসীম কল্পনার আশা মিটিবে কেন? তাই তিনি এক অ-সীম, অলৌকিক, নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। সে জগতে ইহলোকের কোন নিয়মই প্রচলিত নহে। কালিদাসের চিরানন্দময়ী কল্পনা-যষ্ক্রিকার সাহায্যে দেখিতে পাই, সে জগতের সবই যেন নূতন। সুখ মর্ত্তেও আছে, কালিদাসের কল্পিত সে নূতন রাজ্যেও আছে, তবে প্রভেদ এই, মর্ত্তের সুখের অন্ত আছে, আর তত্রত্য সুখ অনন্ত। সে রাজ্যের যাহারা প্রজা, তাহাদের জীবন অনন্ত-সুখময়। এক সময়ে, বঙ্গদেশে জগৎশেঠ-বংশীয়-গণ যেমন ধন-কুবের-স্বরূপ ছিলেন, তদ্রূপ, সে রাজ্যের প্রজা-পুঞ্জ স্বর্গের ইন্দ্রাদিরও ধন-কুবের-স্বরূপ (banker)। সে রাজ্যে ব্যাধি নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই,—এমন কি, সে রাজ্যের প্রজাদিগের বার্দ্ধক্য পর্য্যন্তও নাই। তাহারা স্থির-যৌবন-সম্পন্ন। দুঃখের জ্ঞান না থাকিলে সুখানুভূতি হয় না, সুখের মাধুর্য্যোপলব্ধি হয় না,—এই মহাজন-বাক্যের তথায় ব্যভিচার ঘটিয়াছে! সে রাজ্যের সকলেই চিরসুখমগ্ন। কালিদাসের সে নূতন রাজ্য এমনই সুখ-ময়, এমনই সুন্দর। বিরাট্-দেহ, দুগ্ধ-ধবল, স্ফটিকময় কৈলাস-পর্ব্বতের উপর, কবির সে কল্পিতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ কৈলাসের চির-তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গমালা সুদূর ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়াছে,—অথবা তাহাদের ঊর্দ্ধগমনের এখনও যেন বিরতি হয় নাই, তাহারা সেই অনাদিকাল হইতে এখনও যেন ঊর্দ্ধদেশে উঠিতেছে, উঠিতেছে, আরও উঠিতেছে। নির্ম্মল কাচের দ্বারা আবৃত, বা একেবারে কাচের দ্বারাই

নির্ম্মিত কক্ষমধ্যে, যেমন, একগাছি তৃণেরও চতুর্দ্দিকে প্রতিবিম্বন হয়, তদ্রূপ, সেই নির্ম্মল, শ্বেত-কান্তি, কৈলাসের গাত্রে তদুপরিস্থিত সমস্তই ইতস্ততঃ যুগপৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের শতগুণ বৃদ্ধন করিয়া লইতেছে। নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর চঞ্চল তরঙ্গাকুল বক্ষে, আকাশের একমাত্র চন্দ্র যেমন শতমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তদ্রূপ সেই নির্ম্মল ও বন্ধুর কৈলাস-গাত্রে পার্শ্ববর্ত্তী হিমালয়ের যুগপৎ শতমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বিরাট্ কৈলাসের সেই বিরাট্ স্ফটিক-ময়ী আকৃতির দর্শনে মনে হয়, বুঝি সুরপুর-বাসিনী ললনাদিগের এক খানি স্বচ্ছ দর্পণ স্বর্গের দ্বারদেশে প্রলম্বিত রহিয়াছে। কৈলাসের বিশাল দেহে যেমন কৃষ্ণতার লেশও নাই,—সমস্তই স্বচ্ছ, শ্বেত, নির্ম্মল,—কৈলাসবাসিগণের হৃদয়ও তেমনি, কৃষ্ণতার লেশ নাই, সে হৃদয় স্বচ্ছ, শ্বেত, নির্ম্মল। এমনই সুন্দর সে কৈলাস পর্ব্বত। এতাদৃশ রমণীয় পর্ব্বতের রমণীয়তর শৃঙ্গমালার উপরে, কালিদাসের সেই রমণীয়তম রাজ্য সন্নিবেশিত। যেমন সুন্দর রাজ্য, তাহার রাজ-ধানী অলকা-নগরীও আবার তেমনই সুন্দরী, কবির অলৌকিক কল্পনার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি। সে নগরীর সমস্তই নূতন, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতচর। সমাজ বল, শাসন বল, তথায় সে সবই অভিনব। সে নগরী বিদ্যুদ্-বিলাসিনী বনিতা-দিগের প্রিয় নিকেতন। মুরজের 'স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষে' সেই নগরী নিয়ত প্রতিধ্বনিত। তথায় গগন-স্পর্শী প্রাসাদ-নিচয়ের মণিময় কুট্টিমে সৌন্দর্য্যের অধিদেবতারা সতত ইতস্ততঃ পাদ-চারণ করিয়া বেড়ান। তথায় ছয় ঋতু যুগপৎ উল্লসিত হইয়া নগরবাসিগণের চিত্ত-বিনোদন করে[১]। মণি-মুক্তা-কাঞ্চন প্রভৃতি যাহাদের পক্ষে দুর্লভ, তাহারাই ঐ সকল মহার্ঘ দ্রব্যের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আত্ম-গৌরব-বৃদ্ধির প্রয়াস পায়; কিন্তু কবির এ অলৌকিক নগরে, সকলেই অজস্র সম্পত্তির

১—উত্তর মেঘ, ১।

অধিকারী,—তোমার আমার পরিমিত কল্পনায় যত ধন, যত সম্পত্তি আসিতে পারে, তদপেক্ষাও অধিকতর সম্পত্তির অধিকারী। যাহাদের গৃহ-মধ্য মণিময়, প্রাসাদ-ভিত্তি মণিময়, আর প্রাসাদ-নিবহ হীরক-মুক্তায় গ্রথিত, যাহাদের প্রাসাদ-মধ্য-বিলম্বিত চন্দ্রাতপের চন্দ্রকান্ত-মণিময় ঝালর, চন্দ্রোদয়ে ঘর্ম্মাক্ত হওয়ায়, তাহা হইতে টুপ্ টুপ্ করিয়া শিশিরবিন্দুবৎ জল-বিন্দু পতিত হইয়া, প্রাসাদবাসিগণের গাত্র-নির্ব্বাপণ করে, তাহাদের সম্পত্তির কথা কি আর অধিক বলিতে হইবে? তাই সে নগরের অধিবাসীরা হীরক মুক্তার অলঙ্কার ধারণ করে না, উহাতে তাহাদের বুঝি মর্য্যাদার হানি হয়। তাহারা প্রকৃতির মোহন-ভূষণে দেহ সজ্জিত করে। সে সজ্জার নিকটে হৈমী ভূষাও উল্লেখযোগ্য নহে। তাই কবি, শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শিশিরের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, নিদাঘের শিরীষ এবং বর্ষার কদম্ব কুসুমে যুগপৎ সে নগর-বাসিনী রমণীদিগকে ভূষিত করিয়াছেন[১]। সে নগরের মধ্য দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিত; তাহার উভয় তীরে শ্রেণি-বদ্ধ-ভাবে মন্দার তরুগণ, তটিনীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে যেন বিমুগ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান; রাশি রাশি স্বর্ণ-বালুকায় সে তটিনীর উভয় সৈকত অলঙ্কৃত। মন্দাকিনী-শীকর-বাহী, মন্দার তরুর সুশীতল সমীরণ, তথায় অভ্যাগত-গণের গাত্র নির্ব্বাপণ করে। সেই সৈকতে, সেই স্বর্ণ-বালুকার মধ্যে, সেই নগরীর অমরপ্রার্থিত কন্যকাগণ, দলে দলে, মণি লইয়া কত খেলাই খেলিতেছে, একবার মণিগুলি দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, খুঁজিতেছে, পাইতেছে, আবার ফেলিতেছে, এই ভাবে কত খেলাই করিতেছে।

১—উত্তরমেঘ, ২—হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়া-পাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং,
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

তীরস্থিত মন্দারবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ও শিশির সমীরণে, তাহাদের খেলিবার পরিশ্রমই বোধ হইতেছে না[১]।

সে নগরের বহির্দ্দেশে যেমন মেঘের ক্রীড়া, প্রাসাদ-মধ্যেও তেমনই মেঘের লীলা। মেঘ কখনও প্রাসাদ-বহির্ভাগে জলবর্ষণ করিয়া নগর স্নিগ্ধ করে, কখন বা উন্মুক্ত প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক, অধিবাসিগণের শরীর নির্ব্বাপণ করিয়া, ধূমাকারে গবাক্ষ-পথে বহির্গত হয়[২]। সে নগরের বহির্দ্দেশে যে সুন্দর উপবন, তথায় বিশাল-বপুঃ চন্দ্রশেখর বসিয়া আছেন, নগর-স্বামী যক্ষপতি কুবেরের আন্তরিক ভক্তিপাশে তিনি আবদ্ধ, ভক্তের প্রেমে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, তাই চন্দ্রমৌলী সেই উপবনে আসীন। তাঁহার সমুন্নত-ললাট-চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় সে নগর নিয়ত স্নাত। অন্ধকার তাহার ত্রিসীমাতেও আসিতে পারে না। ধবলকায় কৈলাসের সিত-মণিময় হর্ম্ম্যমালা, চন্দ্রশেখরের সেই ললাট-চন্দ্রে সিত-দ্যুতিতে আরও সিততর হইয়াছে; সেই হরশিরশ্চন্দ্রিকায় সমস্ত নগর আলোকিত[৩]। সে নগরে প্রাসাদের বহির্দ্দেশ যেমন জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত, অভ্যন্তর প্রদেশও তেমনই, প্রাসাদ-ভিত্তি-খচিত রত্নাবলীর কিরণমালায় সুশোভিত। অন্য আলোক নিষ্প্রয়োজন। তথায় অভিলাষ উদিত হইতেই যে বিলম্ব, উদয় মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপূর্ণ হয়। নগর-বীথিকার উভয় পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধ কল্পবৃক্ষ বিরাজমান, তাহাদের নিকট কাহারই কোন অভিলাষ অপূর্ণ থাকে না। পরিধেয় মণ্ডন, নয়নের বিভ্রম-জনক মধু, নূতন পল্লব, নূতন নূতন পুষ্প, চরণের অলক্তক,—বিচিত্র বিচিত্র বেশ-ভূষা—প্রভৃতি

১—উত্তরমেঘ, ৪—মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ
মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা-মুষ্টি-নিক্ষেপ-গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর-প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥

২—উত্তরমেঘ, ৬। ৩—উত্তরমেঘ, ৭

অবলাগণের সর্ব্ববিধ বিলাস-মণ্ডন ঐ কল্পবৃক্ষ প্রদান করে[১]। যাহার যখন যে বস্তুর প্রয়োজন, সে তখনই তাহা প্রাপ্ত হয়। মর্ত্তে এমন নগর কি হইতে পারে? যাহার সমস্তই মর্ত্তধর্ম্মের অতীত, মর্ত্ত নিয়মের অতীত, মর্ত্তে তাহার স্থান হইবে কেন? যাহার সকলই সুখময়, প্রসাদময়, উৎসবময়, মর্ত্তে তাহার স্থান হইবে কেন? মর্ত্তেও বর্ণনার বস্তু, হৃদয়ানন্দকর বস্তু, অনেক আছে সত্য—মর্ত্তের সমুদ্র, পর্ব্বত, আকাশ—ইহারা নিরতিশয় হৃদয়ানন্দকর বটে, কিন্তু এ সমস্তই ত মানবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, পরিদৃশ্যমান। সুতরাং এ সমুদয়ে কবির মন প্রসন্ন হইল না। তাই তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পাঠককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিলেন। মানুষ যাহা কল্পনাও করিতে পারে না, এমন স্থলে মানুষকে লইয়া গেলেন। সে স্থলে যাইয়া মানুষ যাহা দেখিল, শুনিল, সে সমস্তই নূতন। যাহা আজ নূতন, তাহা কাল পুরাতন হইবে, ইহাই বস্তুর ধর্ম্ম, কিন্তু কালিদাসের এ রমণীয় সৃষ্টি এমনই অনুপম, এমনই বিচিত্র, যে, ইহা কোন দিন পুরাতন হইবে না। ইহা চিরদিন যেমন স্বয়ং নূতন থাকিবে, কবিকেও তেমনই নিত্য নূতন করিয়া সাধারণে প্রতিভাত করিবে।

১—উত্তরমেঘ, ১১—বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশ-দক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমল-ন্যাস-যোগ্যং চ যস্যাম্
একঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নূতন সৃষ্টি।

জগতে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। কেহ ইহলোকের সুখই মানব-জীবনের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য মনে করেন, কেহ বা পরজীবনের সুখের আশায়, ক্ষয়িষ্ণু ঐহিক সুখে বীত-স্পৃহ হয়েন, কিন্তু সুখ সকলেরই বাঞ্ছিত। এই সুখের মোহে, লোক উন্মত্ত-হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। বিধাতার এমনই বিচিত্র লীলা যে, তিনি চিরদিন মানুষকে এই সুখের আশায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কাহারও আশার শেষ হইতে দেন না। অভীপ্সিত সুখ কেহই পায় না। রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইতে পর্ণকুটীর-বাসী ভিক্ষুকের হৃদয় পর্য্যন্ত এই কল্পিত সুখের মোহে বিমূঢ়, কল্পিত আশায় উন্মত্ত। এই আশার কুহক-মন্ত্রে আত্ম-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, পরমৈশ্বর্য্যশালী রাবণ, একদিন, লঙ্কানগরকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন ; এই সুখের আশায় অন্ধ হইয়া বৃত্র-তারক-শিশুপাল প্রভৃতি বীরগণ কত অসাধ্য-সাধনেই না প্রয়াস করিয়াছিলেন? কিন্তু তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সংসারকে সুখময় করিবার জন্য, ঋষি বিশ্বামিত্র মনের মত করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু বিদ্যুদ্-বিলাসের ন্যায়, তাহা ক্ষণকাল বিলসিত হইয়াই কোথায় মিলিয়া গেল! রাম-যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণ, ভীষ্ম-কর্ণ-অর্জ্জুন,—সকলকেই অল্প-বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কদাচ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। দুঃখ-শেল-বিমুক্ত সুখের চিত্র পার্থিব জগতে নাই। হয়ত বিধাতার সৃষ্টিতেও নাই। তাই কালিদাস বিধি-সৃষ্টি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, স্বয়ং এক নূতন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহার সেই নূতন সৃষ্টিকে মনের মত করিয়া, তাঁহার অপার্থিব কল্পনায় যতদূর হইতে পারে, তদপেক্ষাও যেন অধিকতর সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছেন। কৈলাস পর্ব্বতের অভ্র-ভেদি-

শৃঙ্গমালার উপরে, সেই নূতন সৃষ্টিকে বসাইয়াছেন। সে সৃষ্টি পৃথিবী হইতে অনেক দূরে—অনেক উচ্চে অবস্থিত। পৃথিবীর কোনও ছায়া সে রাজ্য স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল যে কৈলাসের শিখর-স্থিত বলিয়া সে রাজ্য পৃথিবীর উচ্চে, তাহা নহে; সুখে, সম্পদে, বিলাসে, প্রেমে,—সর্ব্বাংশেই সে কবি-সৃষ্টি বিধাতৃ-সৃষ্টির অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। জড়-জগৎ সে বিরাট্ কেবল আনন্দময়ী কবি-সৃষ্টির অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। পৃথিবীর বিষাদ, পৃথিবীর বেদনা, পৃথিবীর দীর্ঘনিশ্বাস ততদূর উঠিতেই পারে না। তাদৃশ চিরানন্দময়, চিরোৎসাহময় ও চিরোৎসবময় রাজ্য, কালিদাসের প্রিয় যক্ষ ও যক্ষবধূর লীলা-ভূমি। সেই আনন্দোচ্ছ্বাসময় রাজ্যের চিরানন্দময়ী রাজধানীতে যক্ষ-দম্পতির বাস। যে স্থানে চিরদিন ভোগ-সুখের শারদকৌমুদী বসন্তের দক্ষিণ-সমীর ও বর্ষার হৃদয়োন্মাদ বিরাজিত, সেই স্থলে, সেই আনন্দের, উৎসবের, সম্পদের, প্রেমের রাজধানীতে তাহারা পরম সুখে দিন যাপন করে। তাহারা বিলাসের, ভোগের ও সৌভাগ্যের বিশ্ব-বিমোহন ক্রোড়ে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত। শীত-দ্যুতি শশাঙ্কের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকাই তাহারা দেখে, তাহাই তাহারা চিরদিন ভোগ করে, কিন্তু সেই শশাঙ্কও যে মেঘাবৃত হইতে পারে, তাহার হৃদয়োন্মাদিনী চন্দ্রিকাও যে মুহূর্ত্তে জলদাবরণে আবৃত হইতে পারে, ইহা তাহারা বিদিত নহে। অপিচ, সেই শশাঙ্ক যখন আবার মেঘমুক্ত হয়, তখন, তাহার সেই উল্লাসিনী জ্যোৎস্না যে শতগুণ অধিক উল্লাসময়ী ও আনন্দময়ী হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকারিণী ও মনোহারিণী হয়, ইহাও তাহারা বুঝে না। তাহারা ভোগের মূর্ত্তি, ভোগই জানে, কিন্তু সেই ভোগ যে আবার কিয়ৎকাল প্রচ্ছন্ন থাকিলে, ভোগীর আকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়, ইহা তাহাদের জ্ঞান নাই। তাহারা এমনই মুগ্ধ, ভোগ-লালসার আবেশময় অঞ্চলে এমনই সুষুপ্ত। কবিকুল-রবি কালিদাস এবংবিধ

নায়ক নায়িকার প্রণয় এবং বিরহ উপজীব্য করিয়া মেঘদূত প্রণয়ন করিয়াছেন।

উন্মাদই মানুষের জীবন। যে হৃদয়ে উন্মাদ নাই, ভাবের তরঙ্গ নাই, তাহা স্রোতোহীন শৈবালপূর্ণ আবিল জল-রাশির তুল্য; ঐ জল যেমন অপেয়, অগ্রাহ্য ও অস্পৃশ্য, তদ্রূপ উন্মাদ-হীন, তরঙ্গহীন হৃদয়ও সংসারের অযোগ্য, অরম্য, অভোগ্য। তপস্বীর তপস্যায়, বিষয়ীর বিষয়-বাসনায়, ভোগীর ভোগ-লালসায় সমান উন্মাদ বিদ্যমান। হৃদয়ের উন্মাদ-বশতই, দেবর্ষি, বিরক্ত নারদ, নিশিদিন ভগবৎ-সঙ্গীতে আত্ম-বিস্মৃত। হৃদয়ে উন্মাদ ছিল বলিয়াই রাবণ-দুর্য্যোধন প্রভৃতি তাদৃশ বিমূঢ় ছিলেন। হৃদয়ের উন্মাদ-প্রযুক্তই যক্ষ ও যক্ষ-বধূ অহর্নিশ ভোগের আবেশে তন্দ্রালস ও অবশ-চিত্ত। হৃদয়োন্মাদের বশবর্ত্তী হইয়াই, একদা অগ্নি-উপাসক পারসীক-গণ, মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়া, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হৃদয়োন্মাদ-নিবন্ধনই, শক্তিশালী পিউরিটানগণ, জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, আমেরিকার গহন কাননে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, কি যোগী কি ভোগী সকলের হৃদয়েই উন্মাদ আছে। সেই উন্মাদের পরিমাণানুসারে, তাঁহাদিগকে, স্ব স্ব অভীপ্সিত ফলভোগ করিতে হয়। মেঘ-দূতের নায়ক যক্ষের হৃদয়ে ভোগের উন্মাদ ছিল, অথবা ভোগোন্মাদ ব্যতীত সে হৃদয়ের যেন পৃথগস্তিত্বই ছিল না, তাই তাহাকে অতিরিক্ত ভোগোন্মাদের ফলভোগও করিতে হইল। যক্ষ ভোগের মোহে কর্ত্তব্য-বিস্মৃত হইয়াছিল, উন্মত্ত-হৃদয়ে স্বকর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল, তাহার অনুরূপ ফলও পাইল। নিবৃত্তির উন্মাদে সুখ আছে, প্রবৃত্তির উন্মাদে সুখ আছে বটে, কিন্তু, দুঃখই অধিক। যক্ষ প্রবৃত্তির দাস, উপযুক্ত শাস্তি পাইল। অসহ্য দুঃখ-ভোগ করিল। সে দুঃসহ দুঃখ-ভারে ক্লান্ত হইয়া, নয়নজলে রাম-গিরির পাষাণময় দেহও যেন ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আর

কবির কবি কালিদাস, সেই যক্ষের অবসন্ন হৃদয়ের করুণ-ক্রন্দনে বিহ্বল হইয়া নিজেও কান্দিয়াছেন, চলাচল পৃথিবীকেও কান্দাইয়াছেন।

যক্ষ বিলাস-তরঙ্গিণী অলকায় মনের সুখে দিনপাত করিত, সুখে, মোহে, তন্দ্রায় অবশ হইয়া ভোগের কুহকস্বপ্ন দেখিত, অকস্মাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সমস্ত স্বপ্ন নিমেষ-মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল! সে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিত, জীবন অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, আর জাগরিত হইয়া দেখিল, সৌন্দর্য্যময় নহে জীবন অনন্ত কর্ত্তব্যময়, জীবনের কর্ত্তব্যের শেষ নাই। সে সৌন্দর্য্যের মোহে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিয়াছিল, তাই অলকাপতি কুবেরের আদেশে, একবৎসরের জন্য, তাহাকে একাকী মর্ত্তে নির্ব্বাসিত হইতে হইল[১]। বাঞ্ছিত-বিরহ ব্যতীত অলকায় অন্য শাস্তি ছিল না[২]। ভোগীর হৃদয়ে ভোগ-বঞ্চনা অতীব বেদনা-দায়িনী। যক্ষকে ভোগ-বঞ্চিত করিয়া, যাহার জন্য তাহার এত উন্মাদ, এত আবেশ, এত মোহ, তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া, যক্ষপতি কুবের, অলকায় প্রণয়ের এক নূতন চিত্র দেখাইলেন। যক্ষ দেবযোনি, বহু-ঐশ্বর্য্য-যুক্ত, অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। কুবের তাহার সে সমস্ত ক্ষমতা এক বৎসরের জন্য 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া লইলেন। তাহার সমস্ত দৈবশক্তি চলিয়া গেল। সে সাধারণ মানুষের ন্যায় হইল। সুতরাং তাহার ত'আর অলকায় স্থান হইতে পারে না, অলকা মানুষের স্থান নহে, তাই সে মর্ত্তে—রামগিরিতে নির্ব্বাসিত। কুবেরের শাসনে, ইচ্ছানুরূপ আকৃতি-পরিগ্রহের ক্ষমতা, কল্পনা মাত্রে অগম্য স্থানে গমন করিবার ক্ষমতা,—

১—পূর্ব্বমেঘ, ১।

২—উত্তর মেঘ,—আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট-সংযোগ-সাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্ বিপ্রযোগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

এ সমুদয় তাহার লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু সে যে রাজ্যের অধিবাসী, সেই রাজ্যের প্রজাগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব সম্পদ ও অলৌকিক বস্তু আছে, তাহার লোপ হইল না। বরং এই নির্ব্বাসনে সে সম্পদ আরও উপচিত হইল[১]। তাহার হৃদয়স্থ অসাধারণ প্রেম, অসাধারণ প্রণয়, কুবেরের এই শাসনে যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। মিলন-কালে যাহা শতমুখ ছিল, এই বিচ্ছেদকালে সেই অনুরাগ সহস্র-মুখ হইল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলবাহিনী প্রীতি-সরস্বতী এই গঙ্গাযমুনারূপী বিচ্ছেদের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য-শালিনী হইলেন। মধুর-সলিল দামোদরের অতর্কিত বন্যার আবির্ভাব হইল। প্রেমিক যক্ষ তাহার হৃদয়ের সেই কূলপ্লাবী বন্যায় নিজে ত ভাসিলই, পরন্তু যে স্থানে তাহার অধিষ্ঠান, সে স্থানকেও ভাসাইয়া দিল। আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত্ত, স্থাবর-জঙ্গম—সমস্ত তাহার সে ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সে নিজের করিয়া লইল। তাহার ক্রন্দনে বন-দেবতারা কান্দেন[২]।' তাহার বিলাপে বনস্থলী বিহগ কূজন-চ্ছলে করুণ বিলাপ করিয়া উঠে। সে যখন, তাহার বিরহানল-দগ্ধ-হৃদয়া ভার্য্যার প্রাণ রক্ষা-মানসে, অচেতন মেঘকে চেতন ভাবিয়া দূতরূপে প্রেরণ করে, তখন যক্ষের বেদনায় ব্যথিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই দূতের আহ্বান করে। যাহার যতদূর সামর্থ্য দূতের সহায়তা করে। যখন মেঘ দূত হইয়া অলকায় যাত্রা করিয়াছে, তখন বিস-কিসলয়-মুখী মরালশ্রেণি আকাশে তাহার সহায় হয়; বিচিত্র ইন্দ্রধনু শূন্যে তোরণ সাজাইয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করে; সরল জন-পদ-বধূগণ, শ্যামল শস্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের সারল্যোদ্ভাসিত মুখ হইতে মেঘ-নিন্দী অলক ভার অপসৃত করিয়া, আকাশে নবোদিত কালমেঘের দিকে

১—উত্তরমেঘ, ৪৯—স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তেত্বভোগাৎ
ইষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥

২—উত্তর মেঘ, ৪৩।

অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করে[১]। কোথাও মেঘকে পরিশ্রান্ত ভাবিয়া, তাহার উপবেশনের জন্য, পাষাণময় পর্ব্বতও সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া ধরে। সর্ব্বংসহা পৃথিবীও যেন যক্ষের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, নবজল-সম্পাতোত্থিত সৌরভে দূতের উৎসাহ-বর্দ্ধন করেন[২]। প্রকৃতিদেবী কোথাও বর্ষার ভূষণ কদম্ব-কুসুমের দ্বারা, কোথাও ঘ্রাণ-তর্পণ কেতকীদ্বারা, কোথাও বা কুটজাঞ্জলির দ্বারা যক্ষ-দূতের অভ্যর্থনা করেন[৩]। সৌন্দর্য্যের নিধান নীল-কণ্ঠ ময়ূরগণ, যক্ষের দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়াই যেন, সজল-নয়নে কেকা-রবে দূতবরের স্বাগত-জিজ্ঞাসা করে[৪]। এই ভাবে, মর্ত্তের রাম-গিরি হইতে স্বর্গের অলকা পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ পথের সর্ব্বত্রই সকলে, চেতনাচেতন-নির্ব্বিশেষে যক্ষের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, মর্ত্তের কুটজ-কেতকী হইতে স্বর্গের পারিজাত পর্য্যন্ত, মর্ত্তের মরাল-ময়ূর হইতে স্বর্গের সুর-যুবতীগণ পর্য্যন্ত, মর্ত্তের রেবা হইতে স্বর্গের মন্দাকিনী পর্য্যন্ত, যক্ষের সহিত একপ্রাণ হইয়াই যেন, তাহার দূতের সহায়তা করিতেছে। যেন সমবেদনার করুণ কণ্ঠে, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত 'ভূতগ্রাম' যুগপৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে।

কখনও যক্ষ, তাহার প্রিয়তমার কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্যও যদি দেখিতে পায়, তবে তাহাতে হয়ত, তাহার হৃদয়-বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে,—এই আশায়, ঈষচ্চঞ্চল শ্যামা-লতিকায় তাহার প্রিয়ার অঙ্গের, চকিত-হরিণীর তরল-নয়নে দৃষ্টিপাতের, চন্দ্রে বদনের, ময়ূরের সুনীল পুচ্ছরাশিতে কেশ-কলাপের, এবং তটিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় তাহার চঞ্চল ভ্রূ-বিলাসের সাদৃশ্য অন্বেষণ করে, কিন্তু সে সমুদয় তাহার প্রিয়তমার কোনও

১—উত্তর মেঘ, ১১, ১৫, ৮—১৬।

২—উত্তর মেঘ, ১২, ১৬।

৩—উত্তর মেঘ, ২১।

৪—উত্তর মেঘ, ২২।

বিষয়েরই সমকক্ষ নহে—দেখিয়া, নীরবে হতাশ-হৃদয়ে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া রোদন করিয়া উঠে[১]।

কখনও যক্ষ নির্জ্জনে বসিয়া তাহার সেই বড় সাধের জন্ম-ভূমির কথা ভাবে। তাহার কান্তা স্বহস্তে জল-সেচন-পূর্ব্বক যে মন্দারতরুকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, পুত্রাধিকস্নেহে লালন-পালন করিয়াছে সেই মন্দার[২], তাহার গৃহোপকণ্ঠের স্বচ্ছতোয়া দীর্ঘিকা, মরকত-শিলায় যাহার সোপানাবলী রচিত, যথায় বৈদূর্য্য-ময় মৃণালের উপর শত শত সোণার কমল বিকসিত, যাহার জলে বাস করিয়া হংসমালা জলদ-কালেও নিকটবর্ত্তী মানস-সরোবরে যাইতে চাহে না, সেই দীর্ঘিকা[৩], আর সেই দীর্ঘিকার তীরে যে ক্রীড়া-পর্ব্বত, যাহার শিখরমালা সুচারু ইন্দ্রনীল-মণিদ্বারা বিরচিত, সোণার কদলীতরু-দ্বারা যে পর্ব্বতের প্রান্তদেশ বেষ্টিত, যাহার উন্নত, স্বর্ণ-কদলী-মধ্য-গত, ইন্দ্র-নীল-মণিময় শিখর দেখিলে, মনে তড়িদ্-বিলসিত সুনীল মেঘ-মালার স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই ক্রীড়া-পর্ব্বত[৪],—আর সেই ক্রীড়া-পর্ব্বতের উপরে, কুরুবক-তরু-বেষ্টিত মাধবী-কুঞ্জের সমীপবর্ত্তী যে চঞ্চল-পল্লব রক্তাশোক ও বকুলতরু[৫], এবং সেই তরুদ্বয়ের মধ্যে যে স্বর্ণ দণ্ড, নীল-মণি-রাশিদ্বারা যে দণ্ডের মূলদেশ বদ্ধ, যে দণ্ডের উপরিস্থিত, স্বচ্ছ, স্ফটিক-নির্ম্মিত, পীঠের উপরে সায়ংকালে ময়ূর আসিয়া পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া দাঁড়াইত, আর তাহাকে যক্ষ-প্রিয়া করতালিকাদ্বারা নাচাইত,

১—উত্তর মেঘ, ৪১—শ্যামাস্বঙ্গং চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্তুচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রূ-বিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি।

২—উত্তর মেঘ, ১২।

৩—উত্তর মেঘ, ১৩।

৪—উত্তর মেঘ, ১৪।

৫—উত্তর মেঘ, ১৫।

ময়ূর তালে তালে নাচিত[১], সেই সব—একে একে, যক্ষ একাকী বসিয়া নিবিষ্ট-মনে ভাবে।

কখনও যক্ষ, পর্ব্বত-পৃষ্ঠে উপল-পট্টে, গৈরিকাদি দ্বারা তাঁহার হৃদয়াসীনা প্রিয়া-মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে যায়, কিন্তু সে চিত্র সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগে, অবরুদ্ধ কণ্ঠে, ক্রন্দন করিয়া উঠে, সহসা নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত হওয়ায়, সেই অর্দ্ধচিত্রিত মূর্ত্তি একবার আশা মিটাইয়া দেখিতেও পায় না[২]। কখনও যক্ষ, উত্তর দিক্ হইতে, সেই অলকার দিক্ হইতে আগত, তুষার-সিক্ত সমীরণকে আগ্রহে আলিঙ্গন করে, ধারণা এ বাতাস যখন অলকার দিক্ হইতে আসিয়াছে, তখন হয়ত, অলকার কোনও সংবাদ এ জানে[৩]। এই ভাবে যক্ষ, কখন লতাকুঞ্জে যায়, কখন বা অদৃশ্য বায়ুকে উন্মত্ত-হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে ছুটে। এক দিন যাহার অত সুখ, অত সম্পদ ছিল, যেমন অভিলাষই হউক না কেন, কল্পতরু তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিত, সুখের সম্মোহন অঞ্চলে যে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, আজ তাহার এই দশা! সে আজ তরুলতা, পশুপক্ষী—সকলেরই কৃপাপ্রার্থী। তাহার শোচনীয় দশা দর্শনে সকলেই মর্ম্মাহত। জড় জগৎ আজ নিজের জড়ত্ব-পরিহার-

---

১—উত্তর মেঘ, ১৬—তন্মধ্যে চ স্ফটিক-ফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জা-বলয়-সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবস বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥

২—উত্তর মেঘ, ৪২—ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতু-রাগৈঃ শিলায়াং
আত্মানং তে চরণ-পতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈ স্তাবন্ মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥

৩—উত্তর মেঘ, ৪৪।

রামগিরিতে বিরহী যক্ষ

Muhila Press, Calcutta.

পূর্ব্বক দুর্গত যক্ষের সমবেদনায় আকুল। কি করিলে যক্ষের সান্ত্বনা হইবে, ভাবিয়া সকলেই ব্যস্ত; নদ-নদী-গিরি-অরণ্য, গ্রাম-নগর-রাজধানী, তরু-লতা-পত্র-পুষ্প—সকলেই যক্ষের সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল করিতে উৎসুক। তাই মেঘ যখন রামগিরি হইতে অলকায় ছুটিয়াছে, তখন উহারা সকলেই প্রাণ দিয়া দূতের সেবা করিতেছে। চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ যক্ষের দুঃখে দুঃখিত এবং তাহারই ন্যায় উন্মত্ত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উন্মত্ত যক্ষ একাকী শ্মশান রামগিরিতে পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার প্রাণ যেন ঐ মেঘের সহিত অলকায় ছুটিয়াছে। না না, অচেতন মেঘ চেতন যক্ষের প্রাণটি লইয়া, নিজে চেতন হইয়া ছুটিয়াছে, আর এদিকে, প্রাণ-হীন যক্ষ মৃতের ন্যায়, রামগিরির বিরহ-তিমিরাবৃত ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে পড়িয়া আছে। তাহার প্রাণময় মেঘ দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞান শূন্য হইয়া, অলকার দিকে ছুটিতেছে, বাধা-বিঘ্ন সমস্ত উপেক্ষা পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। মেঘ যে স্থানে উপস্থিত হয়, তথায় সমস্তই তাহার আবেশময় ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া তাহারই মত উন্মত্ত হইয়া উঠে। পর্ব্বত তাহাকে দেখিয়া অশ্রুপাত করে, পৃথিবী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, নদীবক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়। চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের এ প্রকার ব্যাকুলতা আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কবি-কুল-পতি কালিদাস তাঁহার ভাবময়ী উচ্ছ্বাস-ময়ী আবেগময়ী কল্পনার বলে, যক্ষের যে মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেখিয়া চেতনাচেতন সমস্ত জগত যেন ভাবময় উচ্ছ্বাসময় ও আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিলেও কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।

কালিদাস, মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্বমেঘে, রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত—সুদীর্ঘ পথের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, পথি-পার্শ্ববর্ত্তী নদ-

নদী-গিরি-বন-উপবন-পথ-রাজধানী প্রভৃতির যে অত্যুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। অতিক্ষুদ্র পদার্থের, একটা সামান্য পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশেও যদি কোন সৌন্দর্য্য থাকে, তবে তাহা কালিদাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়িবেই পড়িবে। ময়ূরের শুভ্র অপাঙ্গ-দেশে জলবিন্দুর উদ্ভব কেমন সুন্দর দেখায়, তাহা তিনি জানিতেন। রৌদ্র-শুষ্ক কর্ষিত ভূমিখণ্ডে অকস্মাৎ নব-জল-পাতে কিরূপ সৌরভ উত্থিত হয়, তাহা তিনি বিদিত ছিলেন[১]। পূর্ব্বমেঘে, তিনি, তাঁহার প্রিয় উজ্জয়িনীর যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার পাঠকালে মনে হয়, যেন সেই কালিদাসের সময়ের উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়াছি। তথাকার সব যেন দেখিতে পাইতেছি। শিপ্রানদীর স্নিগ্ধ সমীরণে দেহ মন জুড়াইয়া যাইতেছে। ভবভূতি ব্যতীত আর অন্য কোন কবির বর্ণনায় এ ভাব জন্মে না। অন্য কোন কবি, পাঠককে স্বীয় বর্ণিত সময়ে বা বর্ণিত দেশে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারেন না। কালিদাসের বর্ণনায় এ শক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পাঠককে আকাশে, পৃথিবীতে, সমুদ্র-শয়ন-সুপ্ত বিষ্ণুর পাদ-প্রান্তে, আবার হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে, যখন যে স্থানে অভিলাষ, লইয়া যান। পাঠক মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কল্পনা-দেবীর অনুবর্ত্তন করেন। অন্যান্য কবিগণের বর্ণিত বিষয়, কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা নির্দ্দিষ্ট সমাজের উপযোগী, পরবর্ত্তী কালে তাহার আর তেমন উপযোগিতা থাকে না। কিন্তু কালিদাসের বর্ণনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার রচনা সকল সময়ের, সকল দেশের, সকল রসজ্ঞ পাঠকেরই সমান উপযোগী, সমান তৃপ্তি-প্রদ। যেরূপ পাঠকই হউন না কেন, তাঁহার যাহা আবশ্যক, তিনি যাহা ভাল বাসেন, সে সব কালিদাসের বর্ণনায় আছে। ইহা চিরদিন সমান নূতন।

১—পূর্ব্ব মেঘ, ২২, ২১।

কবির সৃষ্টি যে কত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমরা মেঘদূতে বেশ দেখিতে পাই। মেঘদূতে সৃষ্টি-নৈপুণ্যের (art) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থে, মহাকবির কল্পনা এক ভাবে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও প্রতিহত হয় নাই। কোকিলের কুহুস্বর বা ভ্রমরের গুঞ্জন, তটিনীর কুলকুল ধ্বনি বা কুসুমের সৌরভ, এই সমস্ত, প্রাণে যেমন একটা স্বপ্নময় ভাব আনিয়া দেয়, তদ্রূপ, মেঘদূতের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিও পাঠকের হৃদয়ে কেমন যেন একটা স্বপ্নময় আবেশময় ভাবের উদয় করিয়া দেয়। সে ভাবের বর্ণনা ভাষায় করা যায় না। তাহা কেবল সহৃদয়গণের অনুভবগম্য।

ভারতবর্ষের মান-চিত্রে আমরা যে সকল স্থানের কেবল নাম-নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, কালিদাসের এই বিচিত্র মান-চিত্রে সেই সকল স্থানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। অথবা মেঘদূত যেন, রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের একখানি বিরাট্ প্রতিকৃতি। ঐ বিশাল ভূমিখণ্ডের যে স্থানে যাহা যেমন ভাবে আছে, তাহা ঠিক সেই ভাবে এই প্রতিকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। কোথায় ময়ূর কণ্ঠ উন্নত করিয়াছে, কোথায় নদীর নীল সলিলে শ্বেত সফরী উদ্বর্ত্তন করিতেছে, কোথায় কোন্ রাজপথে, রমণীগণের কবরী হইতে কুসুম স্খলিত হইয়া পড়িয়া আছে, কোথায় কোন্ রমণী করতালিকা দ্বারা ময়ূর নাচাইতেছে, আর তাহার কর-কিসলয়-স্থিত কাঞ্চন-বলয় ক্বণ্ ক্বণ্ করিয়া বাজিতেছে— এ সব এই প্রতিকৃতিতে চিত্রিত। কবির তীক্ষ্ননয়ন এই বিস্তৃত ভূভাগের সমস্ত পদার্থের উপর, ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র-নির্ব্বিশেষে—পতিত। তাই বলিতেছিলাম, কালিদাস মেঘদূতে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-নৈপুণ্য যে কীদৃশ অলৌকিক, তাহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন। তবে, মেঘদূতে তিনি কোন আদর্শ গঠন করেন নাই, বা করিবার বাসনাও বোধ হয় তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। মেঘদূতের নায়ক-নায়িকা ভোগভূমির অধিবাসী, সুতরাং তাহাদের

সমস্তই ভোগময়। তাহাদের প্রতি-নিশ্বাসে, প্রতি-নয়ন-স্পন্দনে ভোগ-বাসনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। লালসার আবরণে তাহাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আবৃত। ভোগ ভূমির ভোগী দম্পতির প্রণয় এবং বিচ্ছেদের সম্পূর্ণ চিত্র যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে, তাহাই মাত্র তিনি দেখাইয়াছেন। নতুবা সমাজ-শিক্ষা বা লোক-শিক্ষার উপযোগী কোন আদর্শ-চরিত্র মেঘদূতে নাই। রাম-সীতা বা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার আদর্শ-চরিত্রে সমাজের বহুল উপকার সাধিত হয়, মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষপত্নীর চরিত্রে সেরূপ কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না।

কালিদাসের প্রতি বাগ্‌দেবতার অশেষ কৃপা ছিল। বিধাতা তাঁহাকে অলৌকিক প্রতিভা দিয়াছিলেন, আর রসিক সামাজিকগণ তাঁহার কবিতা পাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সাহায্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সুন্দর, সুচারু এবং সুপবিত্র পদার্থের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে ভারতবর্ষ গৌরবিত, তাঁহার নির্ম্মল কবিতালোকে সংস্কৃতভাষা আলোকিত এবং সর্ব্বদেশ-পূজিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে যখনই নয়ন-সংযোগ করি, তখনই আত্ম-বিস্মৃত হই, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে, তাঁহার উদ্দেশে মস্তক আপনিই নত হইয়া আইসে। তাঁহার কাব্য পাঠে আমরা ভারতবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত, আনন্দিত ও পরিপূত হইয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রঘুবংশ।

"সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।...রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য উনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত—সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন[১]!" "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং, তস্য চ টীকা সাপি চ পাঠ্যা।" শ্লোক আবৃত্তি-পূর্ব্বক তাঁহারা সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-নৈপুণ্য, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট চরিত্রাবলীর দেশ, কাল, ও অবস্থানুযায়ী সমাবেশ-বিষয়ে কৌশল। এই কৌশল যাঁহার নাই, তাঁহার রচনায় অন্য বহুবিধ গুণ থাকিলেও, উক্ত রচনাকে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। গীত-গোবিন্দ, মহানাটক, ঋতু-সংহার প্রভৃতি কাব্যে বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও উহাদিগকে প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। যদিও ঐ সমুদয় কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রসাদ-মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের সদ্ভাব আছে, স্বভাবের সুন্দর বর্ণন

১—বিদ্যাসাগরকৃত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র।'

আছে, কিন্তু সৃষ্টি-নৈপুণ্য উহাতে এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। সৃষ্টি-বিষয়ক নৈপুণ্য বা চাতুর্য্যই কাব্যের জীবন। সৃষ্টি-চাতুর্য্য স্বভাবের অনুরূপ হইলে যেমন মনোরম হয়, স্বভাবের প্রতিকূল অর্থাৎ যাহা বিশ্বের সৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না, তাদৃশ বিশ্ব-বিরোধী হইলে আবার তেমনই বিরক্তি-জনক হয়। এই জন্যই আরব্যোপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা বা 'পক্ষিরাজ ঘোটকের' গল্প সহৃদয়-সম্মত নহে। স্বভাবের নিয়মানুসারে, যে সকল ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে, চিরদিন ঘটিয়া আসিতেছে, কবির সৃষ্টিতে তদনুযায়ী ব্যাপারই থাকা উচিত। তবে, কবি যদি তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলে, ঐ ব্যাপার-সমূহকে স্বাভাবিক ব্যাপার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও বৈচিত্র্য-সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবির সে কাব্য আরও সুন্দর হয়। যেমন আত্মত্যাগ, ইহা মানবের একটী প্রধান গুণ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সংসারে এই আত্ম-ত্যাগের বহু নিদর্শন আছে। কবি তাঁহার কাব্যে যদি এই আত্ম-ত্যাগের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে তাহা সুন্দর হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতে সচরাচর যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, কবি যদি তদপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া উহা প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে সেই কবি-সৃষ্টি স্বভাবের সৃষ্টি অপেক্ষা সমধিক চমৎকারিণী ও হৃদয়-গ্রাহিণী হইবে। কিন্তু ঐ চমৎকারিণী কবি-সৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধ, অর্থাৎ অস্বাভাবিক কিছুই থাকিবে না। তবেই সে সৃষ্টি সর্ব্বাংশে নিরবদ্য হইল। স্বভাবে যাহা ষোল আনা আছে, কবি তাহা আঠারো আনা করিতে পারেন, কিন্তু স্বভাবে যাহার এক আনাও নাই, থাকিতে পারে না, তাদৃশ বস্তু রচনা করিলে, তাহাতে কবির নৈপুণ্যের অভাবই প্রকাশিত হয়। আবার স্বভাবে যাহা আছে, কেবল তাহার অনুকরণ করিয়া চরিত্র-সৃষ্টি করিলেও, তাহাতে কবির কোন প্রশংসার কথা নাই। জগতে, আমরা প্রত্যহ যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি, কবি-সৃষ্টিতে যদি

কেবল তাহারই অনুবৃত্তি দেখিতে পাই, তবে, তাহাতে কবির চিত্র করিবার ক্ষমতার,—যেমন দেখিয়াছেন, কবি ঠিক সেইরূপ চিত্র করিতে পারেন,— এই ক্ষমতার, কথঞ্চিৎ প্রশংসা করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহাই কবি-সৃষ্টির উৎকর্ষ, একথা বলা যাইতে পারে না। কেননা তাহাতে কবির সৃষ্টি-চাতুর্য্য পরিলক্ষিত হইল কৈ? আর সেই পরিদৃষ্ট পদার্থের পুনঃ-পরিদর্শনে জগতের, সমাজের তথা পাঠকের উপকার হইল কৈ! যে কাব্যে সমাজের কোন উপকার সাধিত না হয়, তাহাকে উত্তম কাব্য বলা যাইতে পারে না। সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসিয়া, অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্য দেখিতে বড়ই সুন্দর; পর্ব্বতের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া দূরে—অধোদেশবর্ত্তিনী স্তিমিত পৃথিবীর শোভা দেখিতে বড়ই সুন্দর; কবি, হয়ত তাঁহার চিত্র-সম্পাদিনী ক্ষমতার প্রভাবে, ঐ দুই মূর্ত্তির প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু কবির নির্ম্মিত ঐ প্রতিকৃতির দর্শনে ক্ষণস্থায়ী আমোদ ব্যতীত দর্শকের অন্য কোনও উপকার সাধিত হয় কি? দর্শকের কোন শিক্ষা হয় কি? যে সৃষ্টিতে আমোদ ব্যতিরিক্ত অন্য কোনই লাভ নাই, তাদৃশ কাব্য উৎকৃষ্ট নহে। সংসারে আমোদ-লাভের ত অনেক উপায় আছে। ক্ষণকালের জন্য হৃদয়ের তৃপ্তি-সাধনোপযোগী বহু পদার্থই ত ইতস্ততঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে আবার কাব্যের প্রয়োজন কি? চিত্তের ক্ষণিক আমোদ সম্পাদনের জন্যই যদি কাব্য পাঠ করিতে হয়, তবে 'আরব্যোপন্যাস' 'ভূত ও মানুষ' 'কঙ্কাবতী' প্রভৃতি কাব্যই ত একমাত্র পাঠ্য হইয়া উঠে। অথবা যে সকল কার্য্যে মনের সাময়িক আনন্দ জন্মে, সেই সকলের অনুষ্ঠান করাই ত উত্তম। যদি বল, অবিশুদ্ধ উপায়ে চিত্ত-প্রসাদ-লাভ অপেক্ষা, কাব্যাদি পাঠরূপ বিশুদ্ধ উপায়ে যদি চিত্ত-তৃপ্তি জন্মে, তবে মন্দ কি! তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতিও ত অবিশুদ্ধ নহে, আমোদ লাভই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে ঐ সকলের অনুশীলনই ত উচিত, কাব্য-

পাঠের আবশ্যকতা কি? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পাঠকের হৃদয়ে আমোদ-বিধান ব্যতীত, কাব্যের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য কাব্য-শরীরে এতই প্রচ্ছন্ন যে, পাঠক অকস্মাৎ তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন না। দৈব-শক্তি যেমন অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করে, তদ্রূপ কবির সেই গূঢ় উদ্দেশ্য পাঠকের অজ্ঞাত-সারে তদীয় হৃদয়ের উপর একটা গুরুতর কার্য্য করিয়া যায়। পাঠকের অন্তঃকরণে চিরদিনের মত একটা সংস্কার রাখিয়া যায়। কবির সে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য—পাঠক-হৃদয়ের উৎকর্ষ-বিধান, শুদ্ধি-বিধান, আর জগতের শিক্ষা-দান। কবি প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করেন। পরে, ঐ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে পাঠকের হৃদয়ও সুন্দর করিয়া তুলেন। ফুলের বর্ণ সুন্দর, দেখিলেই নয়নের তৃপ্তি জন্মে, ঐ ফুলে যদি আবার সৌরভ থাকে, তবে উহাতে মনও পরিতৃপ্ত হয়। কাব্যের বহিঃ-সৌন্দর্য্য নয়নরঞ্জন বটে, সেই কাব্যে যদি আবার অন্তঃ সৌন্দর্য্যও থাকে, তবে তাহা মনোরঞ্জনও হয়। নয়নের তৃপ্তি ক্ষণস্থায়িনী, মনের তৃপ্তি-চিরস্থায়িনী। যাহাতে প্রকৃতপক্ষে, হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে, তাহা চিরদিন মনে থাকে। কবে—কোন্-সময়ে, হয়ত জীবনে কি একটা সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে, তখন হৃদয়ের বড়ই পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাই আজ এই সুদীর্ঘকাল পরেও যেমন তাহার কথা মনে পড়ে, তদ্রূপ কাব্য-বর্ণিত কোন সৌন্দর্য্যময় চরিত্র পাঠ করিতে করিতে, যদি যথার্থই হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে, তবে তাহারও আধিপত্য চিরদিন হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকে। চিরদিন তাহা মনে পড়ে। সেই জন্যই কবিগণ লোক-শিক্ষোপযোগী আদর্শগুলিকে সৌন্দর্য্য-রূপ হৃদয়-রঞ্জন কঞ্চুকে আবৃত করিয়া জগতে শিক্ষার প্রচার করেন। ধীরতা এবং সত্যপ্রিয়তার ন্যায় গুণ নাই। তুমি ধীর হও, সত্যপ্রিয় হও—এই সারকথা মহাভারতে ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের সৃষ্টিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতের কবি, ঐ দুইটি চরিত্র চিত্রণ দ্বারা এই

সার কথা যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন, শত শত বাগ্মী তারস্বরে সহস্র বৎসর যাবৎ বক্তৃতা করিয়াও তাঁহাদের শ্রোতৃবৃন্দকে সেইরূপ সুন্দর, সুপরিস্ফুটভাবে বুঝাইতে পারিতেন না। রাজার শাসনে যে কাজ না হয়, কবির সৃষ্টি কৌশলে তাহা হইতে পারে। আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা কর, স্বার্থপরতা অতি অপকৃষ্ট—এই কথা ধর্ম্মোপদেষ্টা শত বৎসর পরিশ্রম দ্বারা যতটুকু বুঝাইবেন, কবি, রাম-কর্তৃক সীতাকে নির্ব্বাসিত করাইয়া, এক কথায়, তাহার অনেক অধিক, অনেক সহজে বুঝাইয়া দিলেন। তাই মনে হয়, কবিগণ জগতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক ও সর্ব্ব-প্রধান উপকারক! 'রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব।' কবি উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দেন না বটে, কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্ব্বলোকহৃদ্য, সুপবিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, তাহার প্রতি সাধু, অসাধু সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয়, সকলেই বিমুগ্ধ হয়েন। সুন্দর শারদ-কৌমুদী যত ভোগ করিবে তত আরও ভোগের বাসনা জন্মিবে। সুনীল সরসী-বক্ষে সুন্দর শতদল যত দেখিবে, তত আরও দেখিতে আকাঙ্ক্ষা হইবে। সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি যত অবলোকন করিবে, তোমার হৃদয়ে সেই মূর্ত্তি-দর্শন-পিপাসা তত আরও অধিক জাগিয়া উঠিবে। ক্রমে তোমার হৃদয়ে সেই পবিত্র মূর্ত্তি বিষয়ক অনুরাগ জন্মিবে, পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ জন্মিবে। এই ভাবে তোমার হৃদয়, আপনিই পবিত্র হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছিলাম, শত শত উপদেশে, শত শত শাসনে, শত শত অনুরোধে যে কার্য্য না হয়, কবির একটি মাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র সৃষ্টিতে তাহা সাধিত হয়।

কাব্যের এই সৌন্দর্য্য কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ত নহে। কেবল রূপ, গুণ, বা কেবল কোন বিশেষ অবস্থার বর্ণনে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না। দেশ, কাল, পাত্র, রূপ, গুণ, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃতির সমষ্টি

দ্বারা যদি কোন সুন্দর পদার্থ সৃষ্টি করা যায় তবে তাহার যে সৌন্দর্য্য তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। তাহাই কবি-সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। নতুবা অন্যান্য সমস্ত উপেক্ষা পূর্ব্বক, কেবল নায়িকার চিকুরবর্ণনাতেই যদি সর্গের অর্দ্ধেক ব্যয়িত হয়, তবে তাহাতে সৌন্দর্য্য ফুটিবে কেন? পরন্তু তাহা বিরক্তিকরই হইবে।)

সৃষ্টি-নৈপুণ্যই কবির প্রথম এবং প্রধান গুণ। সেই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কোন স্থানে ত্রুটি ঘটিলে, কাব্যের যেমন অঙ্গহানি হয়, তদ্রূপ লোক-শিক্ষা এবং সমাজশিক্ষারূপ যে উচ্চ উদ্দেশ্যসাধন-বাসনায়, কবি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারও সিদ্ধি বিষয়ে বিষম ব্যাঘাত ঘটে। যাহারা দুই একটি বা দশ-বিশটি শ্লোক রচনা করিয়া কোন পদার্থের কেবল বহিঃ-সৌন্দর্য্যটুকু প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আসন অনকাংশে নিরাপদ। যাঁহারা বহিঃ-সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্ণনীয় পদার্থকে স্থাপিত করিয়া, ঐ বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আলোকে উহাকে আলোকিত করেন, তাঁহাদের কার্য্যও তত দুষ্কর নহে। কিন্তু যাঁহারা বহিঃ-সৌন্দর্য্যকে দূরে রাখিয়া, বর্ণনীয় বস্তুর কেবল অভ্যন্তর প্রদেশেই দৃষ্টি করেন,—বেশভূষার প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভূষিত ব্যক্তির হৃদয়ের দিকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি করেন, যাঁহারা একটা সম্পূর্ণ বিরাট্ মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা সমাজ-শিক্ষা দিতে চাহেন—সেই সকল কবিগণের আসন বড়ই সমস্যাপূর্ণ। তাঁহাদিগকে প্রতিবর্ণে, প্রতিপদে সমাজের কথা ভাবিতে হয়, লোকহিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে হয়। যাহা সমাজের অমঙ্গলকর, যাহার আলোচনায়, সমাজের কোন প্রকৃত হিত-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বিষয় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই নিমিত্তই আমাদের আর্য্য-সাহিত্যে লেডি ম্যাক্‌বেথ বা ওথেলোর চিত্র নাই। ওরূপ চিত্র হৃদয় বিশেষের একান্ত উপযোগী বা অনুরূপ হইলেও উহা সমাজ-শিক্ষা-রূপ উদ্দেশ্যের ততটা সাধক নহে। এই জন্যই আমাদের সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে নিয়ম আছে যে সমাজের হিতজনক

চরিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যাহাতে সব উত্তম, সব সৎ তাদৃশ বস্তু সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই উত্তম, সাধু বস্তুর উত্তমত্ব ও সাধুত্ব সমধিক প্রকটিত করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল তৎপরিমিত অনুত্তম প্রতিনায়কের সৃষ্টি করিতে পারা যায়। নতুবা অনুত্তমত্বের অনুরোধে অনুত্তম চরিত্র বর্ণন সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি-বিরুদ্ধ।

মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য, অথবা সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশের বর্ণে বর্ণে এই সত্য বিদ্যমান। লোক-শিক্ষার উপযোগী বিষয়ে রঘুবংশের আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, গুরুর বাক্যে অটল বিশ্বাস, মাতৃ-রূপিণী পয়স্বিনী ধেনুর পরিচর্য্যা, ভিক্ষার্থী অতিথির অভিলাষ পূরণের জন্য ধরণী-পতির ব্যাকুলতা, লোক-রঞ্জনের জন্য, রাজ-সিংহাসন নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য, নৃপতির স্বহস্তে একপ্রকার হৃৎপিণ্ড উচ্ছেদ প্রভৃতি আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, লোক-হিতকর এবং সমাজ শিক্ষোপযোগী বহুতর বিষয়ে রঘুবংশ অলঙ্কৃত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দিলীপ।

স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি দিলীপ, নিজের অপুত্রকত্বরূপ দুর্দৈব খণ্ডনের জন্য, কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে মহিষীর সহিত উপস্থিত। মহিষী যে কেবল সূর্য্যবংশীয় নরপতির ভার্য্যা বলিয়া সম্মানিতা তাহা নহে, তিনি মগধেশ্বরের কন্যা, পিতৃকুল-পতিকুল উভয়কুলের আভিজাত্যে গৌরবান্বিতা। মহারাজ দিলীপ এতাদৃশী রাজমহিষীর সমভিব্যাহারে, অযোধ্যার সুখময় রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গুরুদেবের তপোবনে উপনীত হইলেন। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভেই এই বিরাট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দীনের ন্যায়, অনাথের ন্যায়, নরনাথ অসূর্য্যম্পশ্যা কুল-লক্ষ্মীর সহিত তপোবনে গেলেন। তাঁহার রাজসংসারে কোন যানেরই অভাব ছিল না। তিনি অবাধে, যানপ্রেরণ পূর্ব্বক, মহর্ষি বশিষ্ঠকে অযোধ্যায় আনয়ন করিতে পারিতেন। ইহাতে সম্মানের কোনই হানি হইত না, রাজার রাজোচিত বিনয়ও অব্যাহত থাকিত। কিন্তু রাজা দিলীপ বিনয়ের নিকট সম্পদের বলিদান করিলেন! বিনয়ের কোনও নিয়ম নাই, বিনয় কোনও প্রকার অনুশাসনে অনুশাসিত নহে। উহার যত সেবা করিবে, উহা ততই সুন্দর ও মনোহর হইবে। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পর্ণকুটীরে, ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-বাসী ক্ষিতীশ্বর মহিষীর সহিত দীনের ন্যায় উপনীত হইয়া, জগতে বিনয়ের এক নূতন মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। এ দিকে, যাঁহার কুটীরে আজ মহারাজ চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক উপস্থিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্যবহারও বশিষ্ঠেরই অনুরূপ। দিলীপের ন্যায় উদার-হৃদয় নরপতির গুরু-দেবের ব্যবহার যাদৃশ হওয়া উচিত, ঠিক তদ্রূপ। রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া, আশ্রম-বাসী অপরাপর জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অগ্রসর হইয়া রাজ-

দম্পতির অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা কিন্তু মুনিগণের নিকটে আসেন নাই, তাঁহার আগমন বশিষ্ঠের সন্নিধানে। বশিষ্ঠ এখন সন্ধ্যা-বন্দনাদি-নিরত। সুতরাং নরপতিকে কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতে হইল। তুমি কোশল-সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সত্য, কিন্তু বিষয়-নির্লিপ্ত বশিষ্ঠের আশ্রমে তুমি একজন অতিথি বই অন্য কিছুই নও। ঋষি বশিষ্ঠ 'সর্ব্বত্র সম-দর্শন'। সুতরাং নৃপতিকে অপেক্ষা করিতে হইল। ক্রমে তাঁহাদের আহ্বান হইল। নিত্য-ক্রিয়ার অবসানে দেবী অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তাপস-তেজে প্রদীপ্ত, বশিষ্ঠের চরণে রাজ-দম্পতি প্রণাম করিলেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, নৃপশ্রেষ্ঠ দিলীপকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর দশজনকেও ঋষি এই ভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। অযোধ্যাপতি বলিয়া কিছুই অতিরিক্ত করিলেন না। রাজা অঞ্জলি-বদ্ধ-করে কত স্তব স্তুতি করিয়া, পরে কহিলেন,— 'দেব, আপনার অনুগ্রহে আমার সর্ব্বত্রই মঙ্গল,—কিন্তু আপনার

> 'কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যাং অদৃষ্ট-সদৃশ-প্রজম্।
> ন মামবতি সদ্বীপা রত্ন-সূরপি মেদিনী[১] ॥'

এই বধূর অঙ্কে, আমার বংশের অনুরূপ পুত্ররত্নের অদর্শনে, রত্ন-প্রসবিনী পৃথিবীও আমার বিড়ম্বনাময় মনে হয়। আমি জানি, 'তপোদান-সমুদ্ভব' পুণ্য কেবল 'লোকান্তরে' সুখকর, কিন্তু দেব, সদ্বংশজ সন্তান, ইহলোক পরলোক—উভয় লোকেরই আনন্দের নিদান। আপনি ইহার যে হয় একটা প্রতিকার করুন।'

কুমার-সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে, তারকাসুর কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া, দেবগণ যখন প্রতিকার-বাসনায় পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক, তারকের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের সান্ত্বনার

১—রঘু, ১ম—৬৫।

জন্ত কত কথা, কত সমবেদনার আলাপ করিয়াছিলেন। আর আজ ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠের নিকট, বশিষ্ঠের শিষ্য, পুত্রাধিক প্রিয়তর, রাজাধিরাজ দিলীপ পুত্র-বিরহে কত দুঃখ-প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ অটল। কোন কথাই কহিলেন না। নীরবে সব শুনিলেন মাত্র। পিতামহ ব্রহ্মা আজ তাঁহার মানসপুত্রের স্থৈর্য্যে ধৈর্য্যে পরাজিত হইলেন। কালিদাস যখন কুমার-সম্ভবের কবি, তখন তাঁহার অবাধ কল্পনার গতি অতি প্রখর; আর তিনি যখন রঘুবংশের কবি, তখন তাঁহার সে গতি অনেকটা সংযত। তাই রঘুর বশিষ্ঠ কুমারের ব্রহ্মার ন্যায় হয়েন নাই।

দিলীপের বাক্যাবসানে, মহর্ষি 'ধ্যান-স্তিমিত-লোচন' হইয়া অপুত্রকতার কারণ বুঝিতে পারিলেন। দিলীপকে বলিলেন, 'মহারাজ! তুমি একদিন স্বর্গের ইন্দ্রের নিকট হইতে যখন মর্ত্তের দিকে আসিতেছিলে, তখন তোমার পথি-মধ্যে কল্প-তরু-চ্ছায়ায় কামধেনু সুরভি শয়ানা ছিলেন। তুমি স্বীয় রাজধানী-গমনে ঔৎসুক্য নিবন্ধন, পূজার্হা সুরভিকে পূজা না করিয়াই ব্যগ্র-হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে। কামধেনু তোমার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিলে, তেমন, আমার সন্তানের আরাধনা না করিলে তোমার সন্তান জন্মিবে না। রাজন্! সেই কারণে তোমার পুত্র-মুখ-সন্দর্শন প্রতিহত হইয়াছে। পূজনীয়ের পূজা, মানীর সম্মান না করিলে অকল্যাণ ঘটে। সেই কামধেনু সুরভি এখন দীর্ঘকালের জন্য পাতাল-বাসিনী। তাঁহার কন্যা নন্দিনীর তোমরা সস্ত্রীক আরাধনা কর। নন্দিনীর যদি পরিতোষ জন্মে, তবে তোমাদেরও অভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বশিষ্ঠের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরভি-তনয়া নন্দিনী অকস্মাৎ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অতর্কিতোপনতা সেই নন্দিনীকে দেখিয়া মহর্ষি আনন্দ-গদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিলেন, 'রাজন্!

তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন জানিবে, কল্যাণী নন্দিনী, নামমাত্রেই এই উপস্থিত। তুমি যাও, 'বন্ত-বৃত্তি' গ্রহণ-পূর্ব্বক এই ধেনুর অনুগমন করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে, ইঁহার সেবা কর গিয়া। আর বধূ সুদক্ষিণা 'ভক্তিমতী' হইয়া প্রত্যহ যেন ইঁহার সেবা করেন। যতদিন নন্দিনী প্রসন্ন না হয়েন, ততদিন এই ভাবে, ইঁহার 'পরিচর্য্যা' করিও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পিতা যেমন তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ উপযুক্ত পুত্রের পিতা হও।' এই বলিয়াই বশিষ্ঠ বিরত হইলেন। আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বরের উপর গোচারণের ভার অর্পিত হইল! নরনাথ অবনতমস্তকে গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, পূজ্যের পূজা-বাধ করিয়াছি, ঘোর অপকর্ম্ম করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। ক্রমে নিশা সমাগত হইল। মহর্ষি তপোবলে, রাজোচিত শয্যা, রাজোচিত আহারাদির ব্যবস্থা অবাধে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। পর্ণকুটীরে পর্ণ-শয্যা রচিত হইল। ফল-মূলাশন-পূর্ব্বক রাজ-দম্পতি সেই পর্ণ-শয়নে রজনী-যাপন করিলেন। রঘুর প্রথম সর্গ এইভাবে শেষ হইল।

সূর্য্যবংশের প্রবল-প্রতাপ নৃপতি গুরুদেবের কথায়, সুখসম্পদ্—সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া, সপত্নীক সাধারণ গোপালকের বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। গুরুদেবের প্রতি, পূজ্যের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি, ক্ষিতিপতির যে কীদৃশী আস্থা, তাহার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। পৃথিবীর আদি নরপতি বৈবস্বত মনুর বংশধর দিলীপ গুরুর প্রতি, তথা গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রতি, যে অনুরাগ-প্রদর্শন করিলেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। আর কবির কবি কালিদাস, এই বশিষ্ঠ-দিলীপবৃত্তান্তে জগতে যে শিক্ষার প্রচার করিলেন, শত শত উপদেশক, শত বৎসর উপদেশ দিয়াও, তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারেন না। কবি বিনয়ের তথা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার একটি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি খোদিত করিলেন।

সৌর-নৃপতি-গণের রাজ-ধানী অযোধ্যা হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম বহুদূরে অবস্থিত। দিলীপ-সুদক্ষিণা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তপোবনে গিয়াছেন, উভয়েই ক্লান্ত; কিন্তু কর্ত্তব্যের নিকটে ক্লান্তি অক্লান্তি নাই, গুরুজনের আজ্ঞায় সুখাসুখ-বিচার নাই। কোনমতে, রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়াই সেই দম্পতি নন্দিনীর সেবায় নিরত হইলেন। রাজ্ঞী সুদক্ষিণা নিজহস্তে কুসুম-দাম রচনা করিয়া ধেনুর গলায় পরাইয়া দিলেন। রাজা ধেনুর সহিত বনে যাত্রা করিলেন। দিলীপ কত প্রকারেই না নন্দিনীর সেবা করেন। কখন বন-চারিণী নন্দিনীর মুখের নিকটে সুমিষ্ট তৃণকবল তুলিয়া ধরেন, কখন গাত্র-কণ্ডূয়ন করিয়া দেন, কখন মশকাদি নিবারণ করেন। নন্দিনী যখন যেস্থানে যান, সম্রাট্ও তখনই তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। এইভাবে দিলীপের দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার যেন একটা পৃথগস্তিত্বই রহিল না। তিনি যেন সেই ধেনুর ছায়াময় হইয়া গেলেন। কাল যিনি, সাগরাম্বরা ধরণীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন, ছত্র-চামরাদিরূপ রাজ-সম্পদে যাঁহার সিংহাসন অলঙ্কৃত ছিল, আজ তিনি, সেই মহারাজ চক্রবর্ত্তী, 'লতা-প্রতান'-দ্বারা কেশ-সংযমনপূর্ব্বক, ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া 'মুনিহোম-ধেনুর' পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যিনি রাজপথে বহির্গত হইলে পৌর-কন্যাগণ 'আচার-লাজ' বিকীর্ণ করিয়া রাজার মঙ্গলাহ্বান করিতেন, আজ বনচারী সেই নরনাথের মস্তকে, বাল-লতিকা-শ্রেণি, মন্দ মন্দ মরুদান্দোলিত হইয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি কুসুম-রাশি বর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে যাঁহার চতুর্দ্দিকে অগণিত বন্দিবৃন্দ নিয়ত স্তুতি-পাঠ করিত, আজ নির্জ্জন-বন-বিহারী নিরনুচর সেই পৃথিবীপতি একাকী ধেনুর সহিত বনে বনে পর্য্যটন করিতেছেন, আর তরুশিরে উন্মদ শকুন্ত-নিচয় কলকণ্ঠে কূজন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে। মারুত-পূর্ণ কীচক-রন্ধ্র মধুর বংশি-স্বরে কানন-ভূমি ঝঙ্কারিত করিয়াছে। নরপতি আজ বিনয়ের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন,

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার যে চূড়ান্ত উদাহরণ দিলেন, তদ্দর্শনে প্রীত হইয়াই বুঝি বনদেবতারা বংশি-স্বর-সংযোগে যশস্বী নৃপতির যশোগান করিতেছেন। গিরি-নির্ঝরের শীকর-বাহী, বন-কুসুম-গন্ধি মৃদুল সমীরণ, নিশ্ছত্র, 'আতপ-ক্লান্ত,' পবিত্রাচার নরপতির শ্রান্তি-নাশ করিতেছে। রাজ-ভোগ-বঞ্চিত রাজা এইরূপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে, সুখের রাজ-সম্পদ্ বিস্মৃত হইয়া নন্দিনীর সেবা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর সায়ংকালে শরীর যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন নরনাথ, বনস্থলীর সেই অনুপম সান্ধ্য-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া দেহের শ্রান্তি-বিনোদন করেন। সন্ধ্যাগমে, বরাহগণ দলে দলে কর্দ্দমাক্ত-দেহে জলাশয় হইতে উঠিতেছে; বিহঙ্গম-গণ মধুর স্বর-লহরীতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া 'আবাস-বৃক্ষের' দিকে ধাবিত হইয়াছে; মৃগ-রাজি, সুনীল দূর্ব্বা-চ্ছাদিত ভূমিতে সুখে শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে। প্রকৃতির এই সুন্দর সজ্জিত উদ্যানে সন্ধ্যাদেবী ধীর-পদ-সঞ্চারে অবতরণ করিতেছেন। সমগ্র বনভূমি একেবারে 'শ্যামায়মান' হইয়া গিয়াছে।—নরপতি অনিমেষ নেত্রে বনস্থলীর এই সান্ধ্যশোভা অবলোকন করিতে করিতে দিবসের সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়া যান।

প্রভাতে, যখন নন্দিনী বন-চারণে বহির্গত হয়েন, তখন আশ্রমে, তাঁহার বৎসকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, সমস্ত দিন সে দুগ্ধ-পান করে নাই, দুগ্ধ-ভারে নন্দিনীর আপীন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। একে ত নন্দিনী নিজে স্থূলাঙ্গী, তাহার উপর আবার দুগ্ধপূর্ণ আপীনের দুর্ব্বহ ভার, তিনি অতি প্রয়াসের সহিত, দুলিতে দুলিতে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, আর স্থূলকায় নরপতিও দিবাশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, শরীর-ভার-বহনে যেন অসমর্থতা-প্রযুক্তই দুলিতে দুলিতে, নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে-ছেন, তাঁহাদের উভয়ের এই দোলায়িত গতি দ্বারা তপোবন-পথের এক অভিনব, সুন্দর শোভা জন্মিয়াছে।

সেই কখন—প্রত্যূষে, মহারাজ দিলীপ গোচারণে নির্গত হইয়াছেন, এখন সন্ধ্যা, তিনি এখনও ফিরিলেন না, তাই পতিব্রতা সুদক্ষিণা আকুল-নয়নে বন-পথের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দূরে, নন্দিনী ও রাজা দেখা দিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও নরনাথকে দেখিতে পান নাই, তাই রাজ-মহিষী অনিমেষ-নয়নে, প্রাণ ভরিয়া, তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

নন্দিনী আশ্রমে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই রাজ্ঞী সুদক্ষিণা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ক্রমে, রাজা ও রাজ্ঞী সায়ংকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া, গুরু-গুরু-পত্নীর পাদ-বন্দনা করিলেন। দীপ জ্বালিয়া রাত্রিতেও তাঁহারা কত প্রকারে নন্দিনীর সেবা করেন। পরে নন্দিনী যখন নিদ্রিতা হয়েন, তখন তাঁহারাও একটু নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করেন; আবার প্রত্যূষে, নন্দিনীর জাগরণের পূর্ব্বেই, তাঁহারা দিবসের সেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েন। এই ভাবে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

এক দিন নন্দিনী ঘুরিতে ঘুরিতে হিমালয়ের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হিমাদ্রির সে স্থানটি অতিশয় মনোরম। তথায় শিখর হইতে পতিত কলনাদিনী গঙ্গার প্রবাহ-ধারায় সমস্ত দেবদারু বন নিয়ত সিক্ত। সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর। মুনির হোমধেনু, তিনি ত দেবতা, তাঁহার আবার বিপদ্ কি?—এই ভাবিয়া ক্ষিতীশ্বর ক্ষণকালের জন্য হিমালয়ের সেই অনির্বাচ্য সৌন্দর্য্য দর্শন-বাসনায় যেমন সেই দিকে নয়ন প্রহিত করিয়াছেন, অমনি হঠাৎ কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর সিংহ আসিয়া নন্দিনীকে আক্রমণ করিল। নন্দিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই আক্রন্দন-ধ্বনি গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া আরও উচ্চৈস্তর হইল। আতুরের সখা দিলীপও সেই কাতরস্বরে চকিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধনুকে বাণ-সংযোগ করিয়া নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তিনি দেখিলেন, সেই লোহিতাঙ্গী ধেনুর মাংসল দেহের উপর এক প্রকাণ্ড কেশরী বসিয়া আছে। তাহার শ্বেত বর্ণ কেশর-কলাপ পার্ব্বতীয় বায়ুপ্রবাহে কম্পিত হইতেছে, দেখিলে মনে হয়, যেন পর্ব্বতের কোন গৈরিক-ধাতু-রঞ্জিত অধিত্যকায় একটি প্রকাণ্ড লোধ্রক্রমে অসংখ্য লোধ্র-কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, আর সেই শ্বেতবর্ণ কুসুমরাশিতে সমস্ত বৃক্ষটিও যেন শ্বেত হইয়া গিয়াছে। আশ্রিত-বৎসল দিলীপ তৎক্ষণাৎ সেই সিংহের বধ-সাধনে উদ্যত হইয়া পৃষ্ঠ-বদ্ধ তূণীর হইতে বাণ তুলিতে গেলেন, কিন্তু এ কি ?—তাঁহার হস্ত একেবারে অবশ হইয়া তূণীর-সংলগ্নই রহিল ! বাণ আর তোলা হইল না ! অপরাধী সিংহ পুরোভাগে গুরুদেবের হোম-ধেনুর প্রাণ-নাশোদ্যত, অথচ কোন প্রতিবিধানের উপায় নাই, রাজার বাহুদ্বয় একেবারে স্তম্ভিত ! তেজস্বী দিলীপ 'মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য ভোগীর' ন্যায়, আপন তেজে আপনিই দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। কোন প্রতিকার আর করিতে পারিলেন না। তখন পশুরাজ সেই নরাধিরাজকে মানুষের ভাষায় সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল ;—স্তম্ভিত নরপতি এবার বিস্মিত হইলেন।

সিংহ বলিল 'মহীপতে ! কেন বৃথা শ্রম ? তুমি আমার প্রতি যেরূপ অস্ত্রই প্রয়োগ কর না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবে। তোমার সমগ্র সামর্থ্য-প্রয়োগেও আমার কোন ক্ষতি হইবে না। আমি 'অষ্টমূর্ত্তির কিঙ্কর', আমার নাম 'কুম্ভোদর', কৃত্তিবাস আমার পৃষ্ঠে পাদ-ন্যাস-পূর্ব্বক বৃষভে আরোহণ করেন,—আমি তাঁহার এত অনুগ্রহের পাত্র। ঐ যে সম্মুখে স্নিগ্ধ দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছ, রাজন্ ! ঐ বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শূলভৃৎ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই গুহা আমার বাসস্থান। মহাদেবের প্রসাদে, আহার্য্যের জন্য আমাকে কোথাও যাইতে হয় না, আমার খাদ্য আপনি আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র ! আজ আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত, পরমেশ্বরের বিধানেই, আমার শোণিত-পিপাসা

মিটাইবার নিমিত্ত, আজ এই ধেনু লইয়া তুমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ। আমার খাদ্য আমি গ্রহণ করি, আর রাজন্! তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হও। গুরুদেবের চরণে তোমার যে কত ভক্তি, তাহা ত তুমি এই দীর্ঘ বনবাসেই প্রমাণ করিয়াছ, আর কেন? আয়ুধ-ধারী বীরের আয়ুধ-প্রয়োগ-শৈথিল্য না হইলেই হইল, প্রযুক্ত আয়ুধ যদি কোন দৈবকারণে বিফল হয়, তবে তাহাতে বীরের বীরত্বের কোনই হানি ঘটে না, সুতরাং তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।'

বীরবর দিলীপের জীবনে এই প্রথম পরাভব। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তিনি বাণ-প্রয়োগে 'বিতথ-প্রযত্ন' হয়েন নাই। তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—'মৃগেন্দ্র! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা সেই চন্দ্রশেখর আমার পরম পূজনীয়, তাঁহার শাসন সর্ব্বথা অলঙ্ঘ্য। আবার এ দিকে, এই ধেনু আমার গুরুদেবের প্রধান হোম-সাধন, সুতরাং ইনিও আমার উপেক্ষণীয় নহেন। যে ভাবেই হউক, এই ধেনুকে আমায় রক্ষা করিতেই হইবে। আরও দেখ, দিনমণি প্রায় অস্তগত, আশ্রমে নন্দিনীর সদ্যোজাত বৎস সমস্ত দিন স্তন্য-পান করিতে পায় নাই, সেও অতিশয় কাতর হইয়াছে। অতএব তুমি আমার এই দেহদ্বারা তোমার বুভুক্ষার নিবৃত্তি কর, সকল দিক্ রক্ষা হইবে। মহর্ষির ধেনু পরিত্যাগ কর।' উদার নরপতির এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে, কেশরী মনে মনে বড়ই প্রসন্ন হইল। কিন্তু সে, ভাব-গোপন করিয়া বলিল, 'রাজন্! তোমার কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি? এই বিশাল ধরণীর তুমি একচ্ছত্র অধিপতি, তোমার এই নবীন বয়ঃক্রম এবং অনিন্দ্য কান্তি, ইহাদের প্রত্যেকটিই দুর্লভ। তুমি এক তুচ্ছ ধেনুর জন্য এই সমস্ত সম্পদ্ বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছ—দেখিয়া, আমার মনে হইতেছে, তোমার ন্যায় কার্য্যাকার্য্য-বিচারশূন্য আর দ্বিতীয় নাই। ভাবিয়া দেখ, সত্য সত্যই যদি তোমার

হৃদয়ে জীবের প্রতি অনুকম্পা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও, এই ধেনুকেই তোমার ত্যাগ করা উচিত; কেন না, তোমার প্রাণ বিনিময়ে মাত্র ইহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু হে প্রজানাথ! তুমি যদি জীবিত থাকিতে পার, তবে, কত শত সহস্র প্রজাকে কত প্রকার বিঘ্ন-বিপদ্ হইতে পিতার ন্যায় রক্ষা করিতে পারিবে! তাই আবার বলি, ভাবিয়া দেখ, একটি ধেনুর জীবনের জন্য, শত শত প্রজার জীবনের প্রতি উদাসীন থাকা কি তোমার ন্যায় প্রজা-রঞ্জন নরপতির উচিত? তুমি মর্ত্তের ইন্দ্র তুল্য, এ ইন্দ্রত্ব চিরজীবন ভোগ কর, ইহাই আমার বাসনা। তুমি আত্ম-জীবন-দানে ধেনুর জীবন-রক্ষার বাসনা পরিহার কর।' এই ভাবে, সিংহ কত প্রলোভন দেখাইল। সিংহের সেই জলদ-গম্ভীর-স্বরে, সমগ্র হিমালয় যেন কাঁপিয়া উঠিল। এ দিকে দিলীপ সিংহের উক্তির উত্তর দিতে যাইবেন—এমন সময়ে, সিংহের প্রবল আক্রমণে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, পয়স্বিনী নন্দিনী মুহুর্মুহুঃ দিলীপকে কাতর-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধেনুর সেই কাতর দৃষ্টিতে দয়াময় নৃপতির হৃদয় যেন আরও বিগলিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, 'মৃগেন্দ্র! বিপন্নের বিপত্ত্রাণ রাজার ধর্ম্ম, যে রাজা সেই সনাতন রাজ-ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ, তাঁহার রাজৈশ্বর্য্যে বা নিন্দা-মলিন জীবনে প্রয়োজন কি? আমি এ বিপন্ন ধেনুকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার এই দেহ-রূপ মূল্য দ্বারা তোমার নিকট হইতে ইহার জীবন ক্রয় করিয়া লইতেছি, তাহা হইলে তোমারও পারণার ব্যাঘাত হইবে না, মুনির হোম-ধেনুরও জীবন রক্ষা হইবে। তুমি মৃগকুলের অধিপতি, তোমার উপর মহাদেব এই বৃক্ষরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন, তোমারও এই বৃক্ষের প্রতি কতই না যত্ন। আর আমি, আমার অবশ্য রক্ষণীয় আত্ম-ত্রাণাক্ষম এই ধেনুকে, তোমার নিকট নিধন করিয়া, বল দেখি, কোন্ মুখে, নিজে অক্ষত-দেহে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইব? মৃগেন্দ্র! যদি সত্য সত্যই তুমি আমার প্রতি

দয়াপরবশ হইয়া থাক, তবে আমার অবিনশ্বর যশঃ-শরীরের প্রতিই দয়ালু হও; এই নশ্বর পার্থিব শরীরে আমাদের তিল মাত্রও আস্থা নাই।' নন্দিনীর স্কন্ধোপরি উপবেশনপূর্ব্বক সিংহ দিলীপের এই অলৌকিক বাক্য-বিন্যাস এক মনে শ্রবণ করিতেছিল, যখন দেখিল যে, দিলীপ ধেনু-ত্যাগে কোন মতেই সম্মত নহেন, বরং নিজের প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প, তখন সিংহ অগত্যা বলিল, 'আচ্ছা, আমি ধেনুর পরিবর্ত্তে তোমাকেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম।' অমনি রাজরাজেশ্বর দিলীপও তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, নিমেষমধ্যে তাঁহার ভুজদ্বয়ে পূর্ব্ব-সামর্থ্য ফিরিয়া আসিল। তিনি মাংস-পিণ্ডের মত নিজের দেহটি ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মুখের নিম্নে স্থাপন করিলেন। প্রতিক্ষণে ভাবিতে লাগিলেন, কৈ এখনও সিংহ আমায় আক্রমণ করে না কেন? এমন সময়ে আকাশ হইতে বিদ্যাধরগণ রাজার উপর অজস্রধারে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন! হঠাৎ শব্দ হইল—'উঠ বৎস!' রাজা বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সে সিংহ নাই, স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, দুগ্ধ-প্রস্রবিণী নন্দিনী মাত্র সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তখন নন্দিনী মানুষীর মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৎস, আমি মায়াময় সিংহরূপে তোমায় পরীক্ষা করিলাম। তোমার এই আত্মত্যাগে আমি বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। তোমার কি অভিলাষ? কি বর প্রার্থনা কর? বল, আমি তাহা এখনই প্রদান করিতেছি।'

মহাকবি কালিদাস, এই ভাবে পরার্থে আত্মোৎসর্গের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। যে বংশের অলঙ্কার স্বয়ং রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী জানকী, যে বংশের উজ্জ্বল রত্ন ভ্রাতৃপ্রেমমত্ত ভরত ও লক্ষ্মণ,—সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ দিলীপের আচরণ সর্ব্বাংশে তদনুরূপই হইয়াছে।

—o—

ষোড়শ অধ্যায়।

পুত্র-লাভ।

নন্দিনীর নিকট হইতে আকাঙ্ক্ষিত পুত্র-লাভ-বিষয়ক বর-প্রাপ্ত হইয়া, গুরুর আদেশে, তাঁহারই আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, দিলীপ-সুদক্ষিণা অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এতদিন বনে বনে নিয়ত পরিভ্রমণে রাজার শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনি যখন সেই ক্ষীণ-দেহে রাজধানীতে পুনরাগমন করিলেন, তখন—

তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন
প্রজাঃ প্রজার্থ-ব্রত-কর্ষিতাঙ্গম্।
নেত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভিঃ
নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্[১] ॥

কৃষ্ণ পক্ষের পর, যখন আকাশে ওষধিপতি পুনরুদিত হয়েন, তখন তিমির-ক্লিষ্ট প্রজা-গণ যে ভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, আজ প্রকৃতিপুঞ্জ ঠিক তেমনই ঔৎসুক্যপূর্ণ-হৃদয়ে এবং অতৃপ্ত-নয়নে, সন্তানের জন্য ক্ষীণকায় নরনাথকে দেখিতে লাগিল। মহাকবি কালিদাস এই শ্লোকে, "অদর্শনেন, আহিতৌৎসুক্যং এবং তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভিঃ, পপুঃ"— এই কতিপয় পদের দ্বারা, রাজা ও প্রজার মধ্যে তখন যে কি ভাব ছিল, রাজাকে প্রজাগণ কিরূপ ভালবাসিত, কিরূপ চক্ষে দেখিত, তাহার একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন সুন্দর ভাব, দেব-দুর্লভ স্নেহ ও ভক্তির এমন প্রাঞ্জল বর্ণনা অন্যত্র অতি বিরল।

ক্রমে রাণীর গর্ভ-সঞ্চার হইল। অন্তঃপুরে আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। রাণীর এই গর্ভাবস্থার যে কতিপয় চিত্র আছে, তাহার

১—রঘু, ২—৭৩,

সৌন্দর্য্য অপরকে বুঝান যায় না। কালিদাসের ভাষা ব্যতীত অন্যত্র সে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ অসম্ভব।

যথাসময়ে কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন। যে সন্তানের জন্য রাজার সেই গোচারণ-বৃত্তি-গ্রহণ, বনে বনে ভ্রমণ, পরিশেষে সিংহের মুখে আত্ম-সমর্পণ, সেই সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। রাজা প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সন্তানের মুখ দেখিতে গেলেন। তিনি যাইয়া নির্নিমেষ-নয়নে নব-কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃশ্য, সে ভাব—অতি মধুর, অতি সুন্দর। সংস্কৃত-সাহিত্যে বুঝি তেমন ছবি আর এক খানিও নাই। তখন—

> নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুষা
> নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
> মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু-দর্শনাৎ
> গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি[১] ॥

রাজ-পুত্র দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। এতদিন রাজার প্রতি রাণীর এবং রাণীর প্রতি রাজার যে অখণ্ড্য প্রেম, হৃদয়ের যে দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিল, আজ এই পুত্র কর্ত্তৃক তাহা বিভক্ত হইল; কিন্তু সেই হৃদয়াকর্ষক প্রেম দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ বর্দ্ধিতই হইল। এত দিন রাজা ও রাণী—পরস্পর পরস্পরের হৃদয়াবলম্বন ছিলেন, এক্ষণে, নবকুমার তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয়াবলম্বন হইলেন। কিন্তু তবুও যেন, রাজদম্পতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম আরও উপচিতই হইল।

যথাসময়ে কুমারের নাম-করণ হইল,—'রঘু'। সূর্য্যবংশের ভাবী অধীশ্বরের যাদৃশ শিক্ষা-দীক্ষা হওয়া উচিত, তাহার কিছুরই ক্রটি হইল

১—রঘু, ৩—১৭।

না। শৈশব-সীমা অতিক্রম করিয়া রাজপুত্র ক্রমে যৌবনের সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে—

মহোক্ষতাং বৎসতরঃ স্পৃশন্নিব,
দ্বিপেন্দ্র-ভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব,
রঘুঃ ক্রমাদ্ যৌবন-ভিন্ন-শৈশবঃ,
পুপোষ গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ ॥

বৎসতর দিনে দিনে যেমন বলশালী মহান্ বৃষভে পরিণত হয়, করি-শাবক দিনে দিনে যেমন যূথপতি করীন্দ্রে পরিণত হয়, তদ্রূপ শিশু রঘুও দিনে দিনে বয়স্থ হইলেন, তাঁহার স্বভাবসুন্দর ললিত কলেবর গাম্ভীর্য্যের সমাবেশে আরও মনোহরতর হইল। উপযুক্ত সময়ে তাঁহার 'বিবাহ-দীক্ষা' নির্বর্ত্তিত হইল। যুবরাজ সুদৃঢ় প্রাংশু শরীরের দ্বারা, বপুষ্মান্ দিলীপকেও যেন অতিক্রমণ করিলেন।

স্বর্গের ইন্দ্র শতাশ্বমেধ যাগ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম 'শতক্রতু'। মহারাজ দিলীপও প্রায় নিরনব্বুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আর একটি করিতে পারিলেই তিনিও 'শতক্রতু' আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন, তাই দিলীপ, আর একটি অশ্বমেধ আরম্ভ-পূর্ব্বক, তাহার তুরঙ্গ-রক্ষণে যুবরাজ রঘুকে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন—প্রমাদ, তাঁহার অদ্বিতীয় 'শতক্রতু' নামটি এতদিনে বুঝি বিলুপ্ত হয়। তাই তিনি, অকস্মাৎ সেই যুবরাজ রক্ষিত যজ্ঞাশ্বের অপহরণ করিলেন। ক্রমে ইন্দ্র ও রঘু—পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। পরিশেষে বিষম যুদ্ধ বাধিল। যুবরাজ রঘুর বীরত্ব-দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র পরম সন্তুষ্ট হইলেন। গুণের আদর করিয়া রঘুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তাঁহার রুধিরাক্ত দেহে করস্পর্শ করিতে লাগিলেন। পরে ইন্দ্র, দিলীপকে যজ্ঞ-ফল-যুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ

দিলীপ যজ্ঞ-সমাধা-পূর্ব্বক, বৃদ্ধবয়সে, কুলের চিরন্তন প্রথানুসারে, যুবরাজকে রাজচ্ছত্র অর্পণ করিয়া শান্তিলাভের বাসনায় বনগমন করিলেন। মগধ-রাজনন্দিনী সাধ্বী সুদক্ষিণাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

দিলীপ-চরিত্রে দেখিলাম,—আর্য্য-নরপতিগণের সিংহাসন বিলাসের সামগ্রী নহে। উহা রাজার কঠোর কর্ত্তব্যের কেন্দ্রস্বরূপ। রাজা প্রজার মঙ্গলের জন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। প্রজামণ্ডলীই তাঁহার অস্তিত্ব। তদতিরিক্ত অন্য অস্তিত্ব তাঁহার নাই। দেখিলাম আর্য্য-নরপতি—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্র-গুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ[১] ॥

দেখিলাম—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য স-প্রসবা ইব[২] ॥

পরিশেষে যখন আরও দেখিলাম যে,—

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্ম-হেতবঃ[৩] ॥

১—রঘু—১ম সর্গ, ১৮—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে কর-গ্রহণ করিতেন। দিবাকর, পৃথিবী হইতে যে পরিমাণে জল গ্রহণ করেন, তাহার সহস্র গুণ দান করিয়া থাকেন।

২—রঘু—১ম, ২২—তাঁহার জ্ঞান ছিল, কিন্তু জ্ঞান-বিষয়ক গর্ব্ব ছিল না, সকলের সকল বৃত্তান্তই তিনি জানিতেন কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতেন না। প্রতীকারের যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল, কিন্তু তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি ত্যাগী ছিলেন, অথচ তিনি কদাচ নিজকৃত দানের কীর্ত্তন করিতেন না। তাঁহার গুণরাশি, পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে, তাঁহার হৃদয়ে বাস করিত।

৩—রঘু—১ম, ২৪—প্রজাবৃন্দের শিক্ষা, রক্ষা, ভরণ, পোষণ—এ সমস্তই তিনি করিতেন। প্রকৃত পক্ষে, তিনিই—প্রজাদিগের পিতা ছিলেন। তাহাদের জন্মদাতা পিতা কেবল নামতঃ পিতা।

তখন বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। কবির চরিত্র-সৃষ্টি-দর্শনে স্তম্ভিত হইলাম। বিধাতার সৃষ্টি এই কবি-সৃষ্টির নিকট অকিঞ্চিৎকরী।

একবার যৌবনে, দিলীপ, ইচ্ছামাত্রই রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, গুরুর আদেশে ধেনু-পালকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার বৃদ্ধবয়সে, যেমন দেখিলেন যে, জীবনের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, অমনি রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া বনে যাত্রা করিলেন। আত্ম-ত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন দেখাইলেন। যাঁহার হৃদয়ে ত্যাগশক্তি বলবতী, যাঁহার অন্তঃকরণ আসক্তি-শূন্য, তিনি কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে, সর্ব্বদাই সমান। কাল-ধর্ম্মে তাঁহাকে মুগ্ধ বা বিচলিত করিতে পারে না। জগৎ তাঁহার অধীন, তিনি জগতের অধীন নহেন।

স্বভাবের নয়ন-রঞ্জন সৌন্দর্য্যের মধ্যেও যেমন প্রতি পলে জগদীশ্বরের মহিমা অনুভূত হয়; বনের প্রতি পত্র পুষ্প পল্লবে, তটিনীর কুল-কুল ধ্বনিতে, বিহঙ্গমের কল-মধুর-স্বর-লহরীতেও যেমন বিশ্বেশ্বরের অপার করুণার, অনন্ত শক্তির উপলব্ধি হয়; তদ্রূপ কালিদাসের এই সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি-সমূহের মধ্যেও একটা অতুল মহিমা, অনুপম শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার চিত্রাবলীর বহিঃ-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে, তন্মধ্যে কবির ভুবনহিতৈষণা দেখিতে পাওয়া যায়। কবি সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া পাঠককে একটা পবিত্র পদার্থ—অনুকরণযোগ্য চরিত্র দেখাইয়া দেন। পাঠকের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হৃদয়ে, সে চরিত্রের প্রভাব, পাষাণ-গত রেখার ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রঘু।

মহারাজ দিলীপ চলিয়া গিয়াছেন। নবীন নরপতি রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। প্রজামণ্ডলী প্রথমে দিলীপের বিচ্ছেদে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে,

> মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ।
> ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ[১] ॥

প্রজাগণ নব ভূপতি রঘুর দিকে চাহিয়া দিলীপের কথা ভুলিতে বসিল। এই স্থলে, একটি উপমায়, একটি নিয়তদৃষ্ট-পদার্থের নূতন সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন-দ্বারা কালিদাস, নরপতি রঘুর সমগ্র চরিত্রটি বুঝাইয়া দিলেন। অন্য কেহ হইলে হয়ত, রঘুর উৎকর্ষ-বর্ণনের নিমিত্ত একটা পৃথক্ সর্গই লিখিয়া ফেলিতেন। এই জন্যই বলিয়াছি, কালিদাস 'কালিদাস'।

রঘুর রাজত্বে সকলেই উল্লসিত, সমস্তই সমধিক-ফল-সম্পন্ন। রাজ্যের কোথাও কোন প্রকার অভাব অভিযোগ নাই। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুখের সমীর-হিল্লোল প্রবাহিত। ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত। সমগ্র রাজ্য আনন্দ ও শান্তির আবেশময় অঞ্চলে সুষুপ্ত। রঘুর ব্যবহারে, রঘুর ন্যায়-বিচারে, রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সন্তুষ্ট। তাঁহার এমনই সুযশ যে,—কৃষক-ললনাগণ যখন শস্য-রক্ষার জন্য ক্ষেত্রে গমন করে, তখন তাহারা দলে দলে, 'ইক্ষুচ্ছায়ায়' নিষণ্ণ হইয়া, মধুর 'গীতক্ষম' গুণাবলী তারস্বরে, গান করে[২]। এমনই প্রতাপের সময়ে রাজ্যের

১—রঘু—৪র্থ—৯—আমের মুকুল বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোহর, সত্য, কিন্তু যখন সেই মুকুলে আবার আম হয়, তখন, তাহার গুণ-গরিমায় লোকে মুকুলের কথা যেমন কতকটা ভুলিয়া যায়, তদ্রূপ, রঘুর ব্যবহারে, শিষ্টতায়, লোকে ক্রমে দিলীপের কথা ভুলিয়া গেল।

২—রঘু, ৪—২০।

সময়ে, রাজ্যের শান্তির সময়ে, রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সে দিগ্বিজয়ের অর্থ পররাজ্য লুণ্ঠন বা পররাজ্য গ্রাস নহে, সে দিগ্বিজয়ের অর্থ,—যিনি প্রতিকূল, তাঁহাকে অনুকূল করিয়া, তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই পুনরর্পণ। রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, নানাদেশ, নানা রাজ্য বিজয় করিয়া, শত্রু-নৃপতিদিগকে সামন্ত-শ্রেণিভুক্ত করিয়া, 'কুল-রাজধানী' অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই দিগ্বিজয়-ব্যাপার-বর্ণনে কালিদাস যে অমানুষিক সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কোথায় সেই প্রাচী-দিকের প্রান্তবর্ত্তি রাজ্য! কোথায় সেই ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ!—তখন বাষ্পীয় জল-যান বা বাষ্পীয় শকট ছিল না, তাড়িত-বার্ত্তাবহ ছিল না, অ-তার-তাড়িত-বার্ত্তাবহের আবিষ্কারও হয় নাই, সেই সময়ে কালিদাস, ভারতের প্রাচী দিক্ হইতে প্রতীচী পর্য্যন্ত যত প্রধান প্রধান রাজ্য ছিল, সে সমস্তেরই প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি, সুহ্মদেশ ও গঙ্গা-প্রবাহ-বিধৌত বঙ্গদেশ প্রভৃতির এমন সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠক নিজের গৃহে উপবেশন-পূর্ব্বক, কালিদাসের কবিতারূপী দিব্য 'দূরবীক্ষণের' সাহায্যে যেন কালিদাসের সম-সাময়িক তৎতৎ দেশ-সমূহের প্রতিকৃতি দর্শন করিতেছেন। তাঁহার শক্তিমতী কল্পনা কখন দ্বিরদাবলীর দ্বারা সেতু-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক, গভীর 'কপিশা' পার হইয়া, উৎকল রাজ্যের মধ্যদিয়া 'কলিঙ্গাভিমুখে' চলিয়াছে; কখন আবার 'ফলবৎ-পূগ-মালিনী' বেলা ভূমির উপর দিয়া, ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে ছুটিয়াছে। কখন তাঁহার কল্পনা-সুন্দরী, পথি-শ্রমে যেন একটু ক্লান্ত হইয়াই,—মলয় পর্ব্বতের যে উপত্যকায় মারীচ-বনে মরীচ-লোলুপ হারীত-পক্ষি-গণ নিয়ত বিচরণ করে, সেই কমনীয় স্থানে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতেছে, কখন বা চন্দন-কাননে ভ্রমণ করিতেছে। আবার কখন দেখিতেছি, পশ্চিম-ঘাট-শ্রেণির পাদ-দেশ-বাহিনী 'তাম্রপর্ণী' তটিনী, যে স্থানে সমুদ্রে সঙ্গত

হইয়াছে, তথায় যাইয়া, তাঁহার উৎসুক কল্পনা বালিকার ন্যায় সমুদ্র-বেলা হইতে রাশি রাশি মুক্তা সঙ্কলন করিতেছে। কখন কেরল-কামিনী-বৃন্দের অলক-মালায় কুঙ্কুম-চূর্ণের অভাব দেখিয়া, দুঃখিত-হৃদয়ে, তথায় সেনা-পদ-সমুত্থিত লোহিতাভ পার্থিব-রজঃ ছড়াইয়া দিতেছে। কখনও কেরল-দেশ-বাহিনী মুরলা-তটিনীর সুশীতল-সমীরণোত্থিত কেতকী-পরাগে, তাঁহার কল্পনা-সুন্দরী রঘুর সেনাগণের গাত্র মার্জ্জনা করিতেছে। তাঁহার অনিন্দ্য-কল্পনা পারস্য-দেশের যবনীগণের মদ-রক্ত মুখকমলের শোভা দেখিতে চায় না, ঘৃণায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এইভাবে, মহাকবি সমগ্র ভারতের,—না-না, শুধু ভারত নয়, ভারতের বহির্ভূত রাজ্য সমূহেরও এমনই সুন্দর, এমনই অনুপম চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যে রাজ্যের যাহা যাহা প্রধান সামগ্রী, প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রধান উল্লেখ-যোগ্য পদার্থ, তাহা তিনি এমন ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন যে, যখন রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ পাঠ করি, তখন একখানি বিশাল আলেখ্য-পটে যেন সমগ্র ভারতের প্রতিমূর্ত্তিটি দেখিতে পাই। পাঠক! যদি প্রাচীন ভারতের প্রকৃত মান-চিত্র দর্শন করিতে চান্, যদি নিত্য-সুন্দরী ভারতভূমির প্রাচীন রাজ্য সমূহের লুপ্ত সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে চান্, আর যদি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব-মাধুরী উপভোগ করিতে চান, তবে একবার রঘু-বংশের চতুর্থ সর্গ পাঠ করুন। মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার প্রভাব দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হউন।

ক্ষিতীশ্বর রঘু দিগ্বিজয়-প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় 'বিশ্বজিদ্ যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করিলেন। এই মহাযজ্ঞের দক্ষিণা যথাসর্ব্বস্ব। মহা সমারোহে বিশ্ব-বিজয়ী নরপতির বিশ্বজিদ্ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। পৃথিবীর বিজিত নৃপতি-গণ, বিজয়ী সম্রাটের চরণে, উপহাররূপে, কত মণি-মুক্তা-হীরকাদি অর্পণ করিয়াছিলেন, সূর্য্য-বংশের প্রাচীন রাজকোষেও কত অনর্ঘ রত্ন-রাজি ছিল, কত ধন—কত সম্পদ্ ছিল, এই যজ্ঞের দক্ষিণা-রূপে সে

সমস্তই উৎসৃষ্ট হইল। অত বড় রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীর গৃহে একটী কপর্দ্দকও রহিল না। কল্পতরু রঘুর সকাশে কোন প্রার্থীই কোন বিষয়ে বিফলাশ হইল না। তিনি ক্ষয়শীল সম্পদের বিনিময়ে, অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিলেন। এই মহাযজ্ঞে মহারাজ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে, মহর্ষি বরতন্তুর এক কৃতবিদ্য শিষ্য গুরুদক্ষিণাসংগ্রহের জন্য রঘুর সমীপে প্রার্থি-রূপে উপস্থিত হইলেন। পরম আতিথেয় মহারাজ রঘুও 'উপাত্ত-বিদ্য' 'বরতন্তু শিষ্যের' যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

তবার্হতো নাভিগমেন তৃপ্তং
মনো নিয়োগ-ক্রিয়য়োৎসুকং মে।
অপ্যাজ্ঞয়া শাসিতুরাত্মনা বা
প্রাপ্তোঽসি সম্ভাবয়িতুং বনান্ মাম্[১] ॥

'হে পরম-পূজ্য! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক, আমার আলয়ে যে পদার্পণ করিয়াছেন, মাত্র ইহাতেই আমি পরিতৃপ্ত নহি। আপনার কোন আদেশ পালনের জন্য আমার হৃদয় একান্ত উৎসুক হইয়াছে। হয় আপনি স্বয়ং কোন আদেশ করিয়া, না হয় আপনার গুরুদেবের কোন আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও সম্মানিত করুন।'—এই বলিয়াই স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি, 'সমাপ্ত-বিদ্য' ব্রাহ্মণ-যুবার নিকটে আত্ম-দীনতা প্রকাশ করিলেন। কি সুন্দর চিত্র! বিশ্ববিজয়ী, প্রবল-প্রতাপ, সূর্য্য-বংশাবতংস পৃথিবীপতি, একজন দীন-হীন, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের আগমনে যে ব্যবহার করিলেন, যে প্রকার বিনয়-প্রদর্শন করিলেন, তাহা জগতের শিক্ষণীয়। এরূপ মহৎ চিত্র পাঠক আর কোথাও দেখিয়াছেন কি!

১—রঘু, ৫ম—১১।

কালিদাস চিরদিন সরস্বতীর উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সরস্বতীর সেবক, তাঁহাদের মর্য্যাদা-জ্ঞান তাঁহার বিশেষরূপ ছিল। তাই বিদ্বান্ বরতন্তু-শিষ্যের সম্মান করিবার জন্য, তাঁহার শতমুখী কল্পনা যেন সহস্র-মুখী হইয়া উঠিয়াছে।

যখন বরতন্তু-শিষ্য কৌৎস রাজ-ভবনে উপস্থিত হয়েন, তখন, উৎসৃষ্ট-সর্ব্বস্ব নরনাথ রঘু, মৃণ্ময়-পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক, কৌৎসের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পৃথিবী-পতির অক্ষয় ভাণ্ডারে এমন একটি ধাতব পাত্র পর্য্যন্ত ছিল না, যাহাতে, সমাগত অতিথির অভ্যর্থনার নিমিত্ত পাদ্যার্ঘ্য স্থাপন করেন। ঋষি-যুবক কৃত-বিদ্য, ব্যবহারজ্ঞ। তিনি নৃপতির অর্ঘ্য-পাত্র-দর্শনেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্দ্দশকোটি সুবর্ণ-মুদ্রা-ভিক্ষার স্থান এ নহে। আসিয়াছেন, নির্ব্বাক্-বদনে ফিরিয়া গেলে রাজার অসম্মান করা হয়, এবং আত্মগোপন করিবারও কোন কারণ নাই ; সুতরাং স্বাধীন-হৃদয় নবীন কৌৎস প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'রাজন্! আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানিবেন। আপনি যাহাদের রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদের আবার অশুভের সম্ভাবনা কোথায়? দিবাকর যখন প্রকাশমান, তখন কি অন্ধতমসের আবির্ভাব লোকে কল্পনাও করিতে পারে? নরনাথ! পূজ্যের প্রতি ভক্তিপ্রকাশ আপনার কুলের চিরাভ্যস্ত, আজ নূতন নহে ; কিন্তু আপনি অদ্যকার ভক্তি দ্বারা আপনার পূর্ব্বপুরুষ দিগকেও অতিক্রমণ করিলেন। যদি বলেন যে, 'তবে তুমি একটু বিমনা কেন?' রাজন্! খুলিয়াই বলি,—আমি অসময়ে আপনার নিকটে প্রার্থিরূপে আসিয়াছি, ইহাই আমার বিষাদের একমাত্র কারণ। আপনি সৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন, ইহাতে দুঃখিত হইবেন না, কেননা'—

শরীর-মাত্রেণ নরেন্দ্র! তিষ্ঠন্
আভাসি তীর্থ-প্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ।

আরণ্যকোপাত্ত-ফল-প্রসূতিঃ
স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ[১] ॥
স্থানে ভবানেক-নরাধিপঃ সন্
অকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি।
পর্য্যায়-পীতস্য সুরৈ র্হিমাংশোঃ
কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ[২] ॥
তদন্যতস্তাবদনন্য-কার্য্যঃ
গুর্ব্বর্থমাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে।
স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং
শরদ্‌ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি[৩] ॥

এই বলিয়া কৌৎস গমনোদ্যত হইলে, নৃপতি, অতিশয় বিনয়-সহকারে, তাঁহার গমনে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিদ্বন্! আপনার

১—রঘু, ৫—১৫—হে নরেন্দ্র। আপনি সৎপাত্রে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, এক্ষণে শরীরটা ব্যতীত, আপনার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই, তবুও, অরণ্যচর মুনিগণ যখন সমস্ত ফল আহরণ করিয়া লইয়া যান, তখন সেই ফলহীন নীবার-কাণ্ড কাণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াও যে প্রকার শোভা পায়, আপনারাও আজ সেইরূপ শোভা জন্মিয়াছে।

২—নরনাথ! আপনি অদ্বিতীয় নৃপতি হইয়াও, আজ যজ্ঞে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, ইহাতে আক্ষেপ অপেক্ষা আনন্দই অধিক। কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ পর্য্যায়ক্রমে হিমাংশুর কলা পান করিয়া থাকেন, আমার মনে হয়, শশাঙ্কের পক্ষে শুক্লপক্ষীয় বৃদ্ধি অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষীয় এই 'কলাক্ষয়' 'শ্লাঘ্যতর'।

৩—রাজন্! গুরুদেবের আজ্ঞা-পালন ব্যতীত আমার এখন আর অন্য কার্য্য নাই, সুতরাং আমি যাই। গুরুর আদিষ্ট অর্থের আহরণে যত্ন করি গিয়া। আপনার মঙ্গল হউক। মহীপতে! চাতক জলদ-জল ব্যতিরিক্ত অন্য জল পান করে না সত্য, কিন্তু তবুও সে, জলশূন্য 'শরদ্‌ঘনের' নিকটে কদাচ জল প্রার্থনা করে না। আমি অন্যত্র যাই।

অভিলষিত গুরুদক্ষিণার পরিমাণ কত ?, মহর্ষি-শিষ্য কহিলেন—'রাজন্! চতুর্দ্দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রামাত্র। নরেন্দ্র! আপনার অর্ঘ্য-পাত্র-দর্শনেই বুঝিয়াছি যে, আপনি এখন নামতঃ রাজা, বস্তুতঃ আপনি নিঃস্ব, সুতরাং আপনাকে কোন উপরোধ করা বৃথা। আমি যাই।' কৌৎসের এই নিরাশ-বচনে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়া, দয়ার্দ্র-হৃদয়, 'জগদেক-নাথ' রঘু কাতরমনে ও স্খলিতকণ্ঠে কহিলেন—

গুর্ব্বর্থমর্থী শ্রুত-পার-দৃশ্বা
রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামং।
গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে
মা ভূৎ পরীবাদ-নবাবতারঃ[১] ॥

রাজর্ষি রঘুর এই উদার বাক্য পাঠ মাত্রেই শরীর কণ্টকিত হয়। দান-বীর রঘুর সহিষ্ণু হৃদয়ের যে সমুদায় মূর্ত্তি কালিদাস চিত্র করিয়াছেন, তাহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যে অতি দুর্লভ।

এক দিকে,—তেজস্বী ঋষিপুত্র, পৃথিবী-পতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অকুতোভয়ে ও সরল-প্রাণে বলিতেছেন—'আমি যাই, নিঃস্ব আপনি, আপনার নিকটে কালক্ষেপে লাভ কি ?'—ঋষি-তনয়ের নবীন হৃদয় সংসারের ছল-কৌশলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, প্রকৃত ব্রাহ্মণের হৃদয় যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তদ্রূপ। 'তুমি স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইতে পার, কিন্তু তাহাতে আমার কি ? তোমার নিকটে আত্ম-গোপন করিব কেন ? আমি প্রাণ-পাত করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছি, এখন দক্ষিণা-

১—রঘু, ৫ম—২৪—হায়! বেদ-বিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণ, গুরুর জন্য অর্থ প্রার্থনা করিতে আসিয়া, আজ রঘুর নিকটে বিফলাশ হইয়া, অন্য দাতার সমীপে যাইতেছেন,—এইরূপ 'পরিবাদ' আমার এই নূতন, আমার এ নিন্দার আর অবধি থাকিবে না। প্রার্থনা করি, এমন নিন্দা যেন আমার কদাচ না হয়। ব্রাহ্মণ! আপনি স্থির হউন্।

দানের প্রয়োজন, আমি নিঃস্ব, তুমি ধনবান্, আমি নিজের ভোগের জন্য প্রার্থী নহি। গুরুদক্ষিণার প্রার্থী। তোমার নিকট আসিয়াছি, দাও, ভাল, নচেৎ চলিয়া যাইব। ইহাতে কুণ্ঠার বিষয় কি? আত্মার্থেই কুণ্ঠা জন্মে। পরার্থে কুণ্ঠা কিসের?'—তাই ব্রাহ্মণযুবক অতি প্রাঞ্জলভাবে নিজের বক্তব্য জানাইলেন। জগৎপতির স্তুতি-বাদের নামও করিলেন না। তখন ভারতে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম জীবিত ছিল, তাই কালিদাসের কৃপায় এ চিত্র আমরা দেখিলাম। দেখিয়া পূত হইলাম। অন্য দিকে,—আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর একটি ঋষি-তনয়ের আগমনে শশব্যস্ত হইয়া, তাঁহার প্রীতি-সাধনে তৎ-পর। কি করিলে—তাঁহার সম্মান রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় আকুল। সমাগত ব্রাহ্মণ-তনয়ের সম্মুখে, মহারাজ ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা-পালনোন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান। রাজা এবং মহারাজদিগের উপর বনবাসী, নিঃস্ব, চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব যে কতদূর ছিল, ইহা তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, কিরূপ তেজস্বী, কিরূপ অকুতোভয় হওয়া আবশ্যক, তাহা, এবং প্রকৃত রাজা হইতে হইলে, কেবল ভূমি-খণ্ডের নহে, প্রজাবৃন্দের হৃদয়ের রাজা হইতে হইলে, কিরূপ নম্র, কিরূপ মুক্ত-হৃদয় ও কীদৃশ নিঃস্বার্থ এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা, এই কৌৎস-রঘু-ব্যাপারে কালিদাস অতি সুস্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সু-প্রভাত।

ইহার পরবর্ত্তী চিত্র আরও বিস্ময়-জনক। বীর-শ্রেষ্ঠ রঘু কুবেরকে জয় করিয়া অর্থাহরণের বাসনা করিলেন। কুবেরবিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন। সমস্ত প্রস্তুত। এমন সময়ে, দৈবক্রমে, রঘুর কোষাগারে প্রচুর মণি-মাণিক্যাদির, অজস্র রত্ন-সুবর্ণ প্রভৃতির সমাগম হইল। ব্রাহ্মণ-যুবকের যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অনেক অধিক ধনাগম হইল। তখন, হর্ষোৎফুল্ল নরনাথ সেই সমস্ত অর্থ-রাশি কৌৎসকে প্রদান করিতে উদ্যত। এদিকে, কৌৎস গুরু-দক্ষিণার অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ। অযোধ্যার সমবেত জনমণ্ডলী কৌৎস এবং রঘুর এই বিচিত্র আত্ম-ত্যাগ-দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া অবাক হইয়া—চিত্রলিখিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল[১]।

ঋষিপুত্র গুরু-দক্ষিণা-গ্রহণ-পূর্ব্বক, প্রস্থান-সময়ে, 'আনতপূর্ব্বকায়' রঘুর শিরঃস্পর্শ করিয়া, আশীর্ব্বাদচ্ছলে বলিলেন, রাজন্!—

আশাস্যমন্যৎ পুনরুক্ত-ভূতম্
শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণ্যধিজগ্মুষস্তে।
পুত্রং লভস্বাত্ম-গুণানুরূপম্
ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব[২]।

১—রঘু, ৫ম—৩১।

২—রঘু, ৫ম—৩৪—হে নরনাথ! জগতে যত প্রকার সম্পদ হইতে পারে, আপনি সে সকলেরই ভাজন হইয়াছেন, আপনার সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই; সুতরাং যেরূপ আশীর্ব্বাদই করি না কেন, তাহা পুনরুক্ত হইবে। অতএব এই আশীর্ব্বাদ করি, যে, আপনার পিতা যেমন আপনাকে তদীয় আত্মগুণানুরূপ পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ আত্মগুণানুরূপ পুত্র লাভ করুন।

ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ অচিরেই সফল হইল। যথাসময়ে, রাজ-মহিষী একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। শুভক্ষণে কুমারের নাম-করণোৎসব সম্পন্ন হইল। নাম হইল 'অজ'। শুক্ল-পক্ষের শশীর ন্যায়, সে কুমার, দিনে দিনে, সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন হইতে লাগিলেন। কি 'ওজস্বি' রূপে, কি বীর্য্য-সম্পদে, কি সমুন্নত কলেবরে, সর্ব্বাংশেই কুমার রঘুর ন্যায় হইলেন[১]।

ক্রমে কুমার যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিলেন। তাঁহার যৌব-রাজ্যাভিষেকের কাল উপস্থিত প্রায়। এমন সময়ে বিদর্ভদেশের অধিপতি, তদীয় সহোদরা ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের নিমিত্ত ভারতের অন্যান্য নরপতিগণের ন্যায়, কুমার অজকেও আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। পিতা রঘু, পুত্রের পরিণয়কাল এবং বিদর্ভ-পতির উচ্চকুলমর্য্যাদার বিষয় চিন্তা করিয়া, সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে অজকে বিদর্ভরাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। বিদর্ভপতি মহাসমারোহের সহিত অজকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কুমার অজের বাসের জন্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কুমার তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত যে সমুদয় বন্দিপুত্রগণ গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ স্তুতি-গান করিতেন। একদিন প্রত্যূষে, তাঁহারা নিদ্রালস অজের নিদ্রাভঙ্গের জন্য, সকলে সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন—

'রাত্রির্গতা মতিমতাং বর ! মুঞ্চ শয্যাং
ধাত্রা দ্বিধৈব ননু ধূর্জ্জগতো বিভক্তা।

১—রঘু ৫ম—৩৭—রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্‌বিভিদে কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।

তামেকত স্তব বিভর্ত্তি গুরুর্বিনিদ্রঃ
তস্যা ভবানপরধুর্য্য-পদাবলম্বী[১] ॥
তদ্বল্গুনা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ
সদ্যঃ পরস্পর-তুলামধিরোহতাং দ্বে।
প্রস্পন্দমান-পরুষেতর-তারমন্ত-
শ্চক্ষুস্তব প্রচলিত-ভ্রমরঞ্চ পদ্মম্[২] ॥
বৃন্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং
সংসৃজ্যতে সরসিজৈররুণাংশু-ভিন্নৈঃ।
স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাত-বায়ুঃ
সৌরভ্যমীপ্সুরিব তে মুখ-মারুতস্য[৩]।
যাবৎ প্রতাপ-নিধিরাক্রমতে ন ভানুঃ
অহ্নায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম্

১—রঘু, ৫ম—৬৬—হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ? নিশা অবসান হইয়াছে, আপনি শয্যা-ত্যাগ করুন। বিধাতা এই বিশাল ধরণীর দুর্ব্বহ ভার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আপনার বৃদ্ধ পিতা সেই গুরুভারের এক অংশ দিবারজনী নিরলসভাবে বহন করিতেছেন, অপর অংশ আপনাকে বহন করিতে হইবে। উভয়ভার বহন একজন—বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তি কি বহন করিতে পারেন?

২—রঘু, ৫ম—৬৮—অতএব গাত্রোত্থান করুন। হে যুবরাজ! মনোজ্ঞ নয়ন উন্মীলন করুন। তন্মধ্যবর্ত্তিনী তরল তারকা প্রস্পন্দিত হইয়া, প্রচলিত-ভ্রমর, প্রভাতবায়ু-বিকম্পিত, কমলের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হউক।

৩—রঘু, ৫ম—৬৯—যুবরাজ! প্রাতঃসমীরণ, তরুরাজি হইতে শিথিল বৃন্ত কুসুমরাশি উড়াইয়া লইতেছে, "অরুণাংশু" বিকসিত সরসিজাবলীর সহিত খেলা করিতেছে, বুঝি সে উহাদের সম্পর্কে, আপনার 'মুখ-মারুতের' 'স্বাভাবিক সৌরভ লাভ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছে।

আয়োধনাগ্রসরতাং ত্বয়ি বীর! যাতে
কিংবা রিপূংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি[১]।

বন্দিপুত্রগণের এই ব্যঙ্গাত্মক উপদেশপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণমাত্রেই কুমার, —'সপদি বিগত-নিদ্রস্তল্পমুজ্‌ঝাং চকার।' তৎক্ষণাৎ, নিদ্রা-পরিহার পূর্ব্বক, শয্যাত্যাগ করিলেন। কি সুন্দর চিত্র। বৃদ্ধ রঘু তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভারে খিন্ন হইতেছেন, আর যুবরাজ তুমি সুখ-শয্যায় নিদ্রিত! এই কি তোমার নিদ্রার সময়? বর্ত্তমান কালেও অধঃপতিত ব্রাহ্মণগণ, নানাকারণে ঐশ্বর্য্য-মত্তদিগের স্তব করিয়া থাকেন, কিন্তু সে স্তব নহে, তোষামোদ। আর কালিদাসের সৃষ্ট বন্দিপুত্রগণও স্তব করিয়াছেন, উহা স্তব নহে, শিষ্যের প্রতি যেন আচার্য্যের উপদেশ। দেশের যত দিন অধঃপতন না হয়, তত দিন, সকলেরই মনোবৃত্তি উন্নত ও উদার থাকে, তাহাতে নীচতা আসিতেই পারে না। আর যখন দেশের মজ্জা ভাঙ্গিয়া যায়, সমাজের মেরুদণ্ড শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই, লোকের মনে নীচতা প্রবেশ করে, অকুতোভয়তার বিলোপ ঘটে।

শরতের মধুর প্রভাতে, যখন দিগ্‌-বালিকাগণ কুজ্ঝটিকার শুভ্র-বসন পরিধান করিয়া, শ্যামল ক্ষেত্র-সমূহে, শাক্ সব্‌জির ডালা সাজাইয়া বসিয়া থাকে, যখন তরুলতার প্রতি পত্রাগ্র হইতে, প্রকৃতির আনন্দাশ্রু তুল্য বিন্দু বিন্দু শিশির ক্ষরিতে থাকে,—যখন কল-কণ্ঠ বিহগ-শ্রেণি, উন্মদ-হৃদয়ে পর্য্যটকের শ্রবণবিবরে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে থাকে,—তখন সেই মধুর শারদ প্রভাতে যেমন, তুমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, সেই

১—রঘু, ৫ম—৭১—প্রতাপনিধি ভানু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশে সমুদিত না হয়েন, ততক্ষণই, অরুণ তমোনাশ করিয়া থাকেন। হে বীর! আপনি এখন সমরে অগ্রণী হইয়াছেন, আপনার ন্যায় শূরোত্তম পুত্র বিদ্যমান থাকিতেও কি আপনার বৃদ্ধ পিতা এখনও স্বয়ং রিপুদলের উচ্ছেদে ক্লিষ্ট ও ব্যস্ত থাকিবেন? ইহা কি সঙ্গত?

দিক হইতে আর তোমার নয়ন আকর্ষণ করিতে পারিবে না, যে দিকে মনোনিবেশ করিবে, সেই দিক্ হইতে আর মন ফিরাইতে পারিবে না, তদ্রূপ, মহা কবি কালিদাসের অনুপম চিত্রাবলীর যে খানিতেই যখন নয়ন-পাত করিবে, তাহা হইতে আর নয়ন পরাবর্ত্তন করিতে পারিবে না, যত দেখিবে, তত আরও দেখিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। এমনই সুন্দর সে চিত্র-সমূহ। সৌন্দর্য্যের সহিত ভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলনে কালিদাস-রচনা সকল সাহিত্যের শিরোদেশ-বর্ত্তিনী হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর।

আজ ইন্দুমতীর স্বয়ংবর। ভারতের তাবৎ রাজন্যবর্গ ঐশ্বর্য্যোচিত বেশভূষায় সু-সজ্জিত হইয়া, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট মঞ্চোপরি, নানা রত্ন-খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কালিদাসের এই বর্ণনা-পাঠে, ভারতের—সেই তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সুখের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে। রাজন্য-গণ—সকলেই যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কে যেন এখনও আসেন নাই। সকলেরই মুখে একটু উৎকণ্ঠার ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে। এমন সময়ে—কুমার অজ উপস্থিত হইলেন। কন্দর্প-কল্প বীর কুমারকে দর্শন করিয়া, সমবেত নৃপতি-বৃন্দের প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝিলেন যে, না, ইন্দুমতী লাভ আর আমার তদৃষ্টে নাই[১]।

বিদর্ভ-পতি, অগ্রে অগ্রে, মঞ্চের সোপান-পথ-নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছেন, আর তদনুসারে, কুমার, ধীর-পদ-সঞ্চারে, সোপান-পথ বাহিয়া মঞ্চে উঠিতেছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দেখিলে মনে হয়, বুঝি কোন দৃপ্ত সিংহ-শাবক, মন্থর-চরণে, স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট শিলাখণ্ড অতিক্রম করিয়া উত্তুঙ্গ 'নগোৎসঙ্গে' আরোহণ করিতেছে। সেই 'মহার্হ-আসন-সংস্থিত' 'উদার-নেপথ্য' রাজকুমার-গণের মধ্যে, অজের দেহই তেজো-দীপ্তিতে অধিকতম উদ্ভাসিত হইতে লাগিল[২]।

পৌরগণ এতক্ষণ অপরাপর রাজন্যদিগকে দেখিতেছিলেন। কিন্তু কুমার অজের প্রবেশ মাত্রেই, তাঁহাদের নয়ন-পঙ্‌ক্তি ভ্রমর-পঙ্‌ক্তির ন্যায়, যুগপৎ অজের বদন-কমলে পতিত হইল। সকলে নিস্পন্দ-নয়নে, কুমারের নিরবদ্য সৌন্দর্য্যামৃত পান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে,

---

১—রঘু, ৬—১, ২। ২—রঘু ৬—৩, ৬।

ভূপতি-বৃন্দের কুল-শীলাদি-বৃত্তান্তবিৎ স্তুতি-পাঠক-গণ, ক্রমে স্তুতিচ্ছলে, সমাগত চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজন্য-গণের যথাযথ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধি 'অগুরু-সার'-মিশ্রিত ধূপ-গুগ্‌গুলাদির ঘ্রাণ-তর্পণ সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। মৃদঙ্গ শঙ্খ প্রভৃতির বাদ্য-শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখর হইয়া উঠিল। স্বয়ংবর সভার উপকণ্ঠ-বর্ত্তি উপবনে, কলাপি-গণ, মৃদঙ্গ-ধ্বনিকে মেঘ-ধ্বনি জ্ঞান করিয়া সহস্র-চন্দ্রক-শোভিত কলাপ-বিস্তার-পূর্ব্বক, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বিশাল রাজ-প্রাসাদ যেন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল[১]। স্বয়ংবর-সভাসীন নৃপতিবৃন্দ—সকলেই যেন একটু উদ্বিগ্ন—চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—এমনই সময়ে,—

মনুষ্য-বাহ্যং চতুরস্র-যানং
অধ্যাস্য কন্যা পরি-বার-শোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর-রাজ-মার্গম্
পতিংবরা কৢপ্ত-বিবাহ-বেশা[২] ॥

স্বয়ংবরার্থিনী রাজ-কন্যা বিবাহোচিত সাজ-সজ্জায় বিভূষিত ও সমবয়স্ক সহচরী-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া, রাজ-কুমার-পরিপূর্ণ স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করিলেন।

ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রিয় পুত্রগণ, কুমারী ইন্দুমতীর সভাপ্রবেশে, সত্য সত্যই যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের আসনে এমন ভাবে উপবেশন করিলেন, এমন ভাবে, অতি সাবধানে, ভাব-ভঙ্গি করিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই ইন্দুমতীর নয়ন আকৃষ্ট হয়[৩]। কেহ করস্থিত লীলা-কমল কম্পন করিতে লাগিলেন। কেহবা বক্র-কণ্ঠে, স্বীয় রত্ন-খচিত প্রাবারক

১—রঘু, ৬—৭ ৮, ৯। ২—রঘু, ৬—১০। ৩—রঘু, ৬—১২।

দ্বারা, সঙ্কীভূত কলেবর পুনরাবরণচ্ছলে, একবার নিজের চম্পকাভ দেহখানি দেখাইলেন। কোন যুবা হৈম-পাদ-পীঠ বিলেখন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ আবার আসন হইতে ঈষদুন্নত হইয়া, কণ্ঠের রত্ন-হার দোলায়মান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক রাজকুমারের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কোন নবীন রাজ-কুমার নখাগ্রে আপাণ্ডুর কেতকদল ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]। প্রত্যেকেরই মন ইন্দুমতীর দিকে, অথচ প্রত্যেকেই যেন আবার ঘোর অন্যমনস্ক। কেহই ধরা দিতে চান না। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। স্বয়ংবর সভাস্থ রাজ-কুমারগণের এই বর্ণনা অতীব চমৎকারিণী। প্রত্যেক কবিতাই যেন এক একখানি অতি সুন্দর ফ্রেমে আবদ্ধ ছবি। প্রতি শ্লোক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ে একখানি পূর্ণাবয়ব নিরুপম ছবি জাগিয়া উঠে।

ইন্দুমতী উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রধান দ্বার-পালিকা ঈষদগ্রসর হইয়া রাজনন্দিনীর পার্শ্বদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নাম সুনন্দা। তিনি পরম-বাগ্মিনী। সভাস্থ নৃপতিবৃন্দের—সকলের বংশ-বৃত্তান্ত—চরিত্র-বৃত্তান্তই তিনি স-বিশেষ বিদিত ছিলেন[২]। তিনি সর্ব্বপ্রথমে, রাজকন্যাকে মগধেশ্বরের নিকট-বর্ত্তিনী করিয়া, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—'ইন্দুমতি! মগধরাজ্যের যে পরম আশ্রিতবৎসল, 'অগাধ-সত্ত্ব', 'প্রজারঞ্জন' নরপতির নাম শ্রবণ করিয়াছ, ইনিই সেই মহাত্মা। ইঁহার নাম 'পরন্তপ,' কার্য্যেও ইনি পরন্তপ। রাজকুমারি! আকাশে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র উদিত হইলেও, যেমন তমস্বিনী রজনী চন্দ্রমার দ্বারাই চন্দ্রিকা-শালিনী হয়েন, তদ্রূপ, পৃথিবীতে অন্য শত সহস্র নৃপতি বিদ্যমান থাকিলেও, ইঁহার দ্বারাই পৃথিবী গৌরব-শালিনী। যদি বাসনা হয়,—মগধরাজধানী কুসুমপুরের অভ্রংলিহ প্রাসাদ-সমূহের বাতায়ন-বিলাসিনী রমণীদিগের যদি নয়ন-রঞ্জন করিতে চাও, তবে ইঁহার কণ্ঠে

১—রঘু, ৬—১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭।　　　　২—রঘু, ৬—২০।

মাল্য অর্পণ করিতে পার। যদিও পাটলিপুত্রের সীমন্তিনীরা অনিন্দ্য-সুন্দরী, কিন্তু তথাপি, তুমি যখন ইঁহার সহিত নগর প্রবেশ করিবে, তখন তাঁহারাও তোমার ন্যায় সৌন্দর্য্যতরঙ্গিণীকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিবার আশায়, নিশ্চয়ই রাজপথের উচ্চ অট্টালিকার গবাক্ষ-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন[১]।

প্রতিহারী সুনন্দা বিরত হইলে তন্বী ইন্দুমতী মগধেশ্বরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই, সরলভাবে তাঁহাকে একটি প্রণাম করিলেন, কথাবার্ত্তা কিছুই কহিলেন না[২]। ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে মগধেশ্বর পরম সম্মানী, চতুর সুনন্দা তাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই নিকটে ইন্দুমতীকে লইয়া গেলেন। তারপর প্রগল্‌ভা সুনন্দা, ক্রমে, অঙ্গ, অবন্তি, অনূপ, রেবা-তটবর্ত্তিনী মাহিষ্মতী, মথুরা, কলিঙ্গ ও পাণ্ড্য[৩] এই কয়েকটি প্রদেশের অধিপতিগণের সম্মুখে যাইয়া, ইন্দুমতীকে তাঁহাদের পরিচয়-প্রদান করিলেন। এই সমুদয় নরপতিবৃন্দের মধ্যে যাঁহার রাজ্যে যে লোভনীয় বস্তু আছে, যে সকল বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য পদার্থ আছে, নিরপেক্ষ-ভাবে সে সব বর্ণন করিলেন। সুনন্দা-প্রদত্ত নিজের নিজের পরিচয় এবং নিজ নিজ রাজ্যের পরিচয়-শ্রবণে কোন নৃপতিরই আর মনে ক্ষোভ রহিল না। কোন্ রাজার প্রতি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর সমান কৃপা[৪]। সিপ্রা-তটিনীর তীরে কোন্ রাজার মনোহর উদ্যান-পরম্পরা বিরাজমান[৫], কোন্ রাজার অন্তঃপুর-কামিনীগণের অবগাহন-কালে, তাঁহারের চন্দন-চর্চ্চিত-কলেবর-সংসর্গে নীল-সলিলা যমুনাও গঙ্গাজল-মিশ্রিতার মত প্রতিভাত হয়েন[৬], সে সব, সুনন্দা, একটি একটি করিয়া, রাজকুমারিরীকে বুঝাইয়া দিলেন। কোথায় কুসুম-সুরভি শিলাতলে উপবেশন-পূর্ব্বক, রমণীয়

১—রঘু, ৬—২১, ২২, ২৪। ২—রঘু, ৬—২৫।

৩—রঘু, ৬—২৭, ৩২, ৩৭, ৪৩, ৪৫, ৫৩, ৬০।

৪—রঘু, ৬—২৯। ৫—রঘু, ৬—৩৫ ৬—রঘু, ৬—৪৮।

গোবর্দ্ধন-গিরির গুহাসমূহে, নব-বর্ষা-সমাগমে, উন্মদ-কলাপি-নিচয়ের মনোহর নর্ত্তন দেখিতে পাইবেন,[১]—কোন্ রাজ্যের 'অম্বুরাশির' 'তালী-বন-মর্ম্মর' বেলা-ভূমিতে বিরচন-কালে, শীকর-বাহী সমীরণ, দূরবর্ত্তী দ্বীপ হইতে, লবঙ্গ-কেশর উড়াইয়া আনিয়া, ইন্দুমতীর ঘর্ম্মবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া দিবে[২]; কোন্ রাজ্যে, মলয়-পর্ব্বতোপরি, তাম্বুল-বল্লী-পরিণদ্ধ-পুগ-বৃক্ষপরিশোভিত, 'এলা-লতালিঙ্গিত-চন্দন-তরু-বিভূষিত ও 'তমাল-পত্রাস্তরণ'-সম্বলিত উপবন সমূহে, নিয়ত ভ্রমণ করিয়া আত্ম-প্রসাদ-লাভ করিতে পারিবেন;—তাহা বিশেষরূপে রাজনন্দিনীকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন[৩]। ইন্দু-প্রভা ইন্দুমতী, ধীর-ভাবে, সুনন্দার উক্তি গুলি শুনিয়া গেলেন মাত্র। তাঁহার হস্তাবলম্বিত বরমাল্য হস্তেই রহিল। অতুল-রূপশালিনী রাজ-কুমারী এক এক জন রাজাকে যেমন যেমন অতিক্রম করিয়া আর এক নৃপতির সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, অমনি পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতির সুসজ্জিত দেহের উপর—আশোদ্ভাসিত বদনের উপর যেন একটা বিষাদের—মালিন্যের গাঢ় আবরণ পড়িতে লাগিল। সে অতি অপূর্ব্ব চিত্র!

সঞ্চারিণী দীপ-শিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্র-মার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বি-বর্ণ-ভাবং স স ভূমিপালঃ[৪] ॥

ক্রমে সুনন্দা, রাজ-নন্দিনীকে লইয়া কুমার অজের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। এপর্য্যন্ত যত নরপতির সম্মুখেই ইন্দুমতী উপস্থিত হইয়াছেন, কোথাও ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়ান নাই, 'দোলাচল-চিত্তে' তাঁহার

১—রঘু, ৬—৫১। ২—রঘু, ৬—৫৭।
৩—রঘু, ৬—৬৪। ৪—রঘু, ৬—৬৭।

পরিচয়টি শ্রবণ করিয়া, অন্য নৃপতির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। আর এখন—কন্দর্প-কান্তি রাজকুমার অজের পুরোবর্ত্তিনী হইয়াই, 'পতিংবরা' রাজ-কুমারী প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল-নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে অতি সুন্দর দৃশ্য! বুঝি কল্পনা-কাননের সমস্ত-সম্পদ,—সমস্ত কুসুম-রাশি সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা, 'বাণীর বরপুত্র' কালিদাস, অজ-ইন্দুমতীর এই প্রথম সন্দর্শন-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

'প্রফুল্ল-সহকার' পরিত্যাগ করিয়া, ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি যেমন অন্য বৃক্ষের দিকে যাইতে চাহে না, তদ্রূপ, ভ্রমর-নীল-নয়না ইন্দুমতী কন্দর্প-সুন্দর অজকে পরিত্যাগ করিয়া আর অন্যত্র যাইতে বাসনাই করিলেন না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন[১]। প্রতিভাশালিনী সুনন্দার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তবুও কর্ত্তব্যবোধে, তিনি, সূর্য্যবংশের সবিস্তর পরিচয়-প্রদান পূর্ব্বক, যুবরাজ অজের গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন—'ইন্দুমতি! আর কেন?

কুলেন, কান্ত্যা, বয়সা নবেন,
গুণৈশ্চ তৈ স্তৈর্বিনয়-প্রধানৈঃ,
ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব,
রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন[২] ॥

সমুন্নত কুল, অনবদ্য কান্তি, নবীন বয়ঃক্রম, এবং 'বিনয়-প্রধান' অনন্ত গুণাবলী—সর্ব্বাংশেই, এ রাজকুমার তোমার অনুরূপ, অতএব ইঁহাকেই বরণ কর। রত্ন কাঞ্চনের সহিত সম্মিলিত হউক।' সুনন্দা বিরত হইলে, 'নরেন্দ্র-কন্যা' তাঁহার সেই দুগ্ধ-ধবল অমল-দৃষ্টি-দ্বারা, একবার অজকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন[৩]। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুনন্দাও অমনি সহাস্য বদনে কহিলেন,—'রাজকুমারি! এক স্থানে আর কতক্ষণ দাঁড়াইবে?

১—রঘু, ৬—৬৯। ২—রঘু, ৬—৭৯। ৩—রঘু, ৬—৮০।

চল, অন্ত নৃপতির নিকটে যাই।' ইন্দুমতী এ কথার কোনই উত্তর দিলেন না, 'কেবল একবার ঈষৎ কুটিল-নয়নে, সখী সুনন্দার প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

আর্য্যে ব্রজামোহন্যত ইত্যথৈনাং
বধূরসূয়া-কুটিলং দদর্শ।

এই কয়েকটি পদের দ্বারা, কবির কবি কালিদাস, যেন একেবারে, ইন্দুমতী ও সুনন্দার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণতত্ত্বের বহির্বিকাশ করিয়া দিলেন[১]।

রাজ-কুমারী রাজ-কুমারের কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করিলেন। লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'অতি উত্তম হইয়াছে', কেহ বলিল, "তীর্থরাজ জলনিধির' সহিত পবিত্র-নীরা 'জহ্নুকন্যা' সঙ্গতা হইয়াছেন"। চতুর্দ্দিকে মহোৎসবের প্রবাহ বহিল। রাজ্যের সকলেই আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। কেবল, স্বয়ংবরার্থী সমাগত রাজন্য-বর্গের হৃদয়াকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন করিল[২]।

কালিদাস, এই স্বয়ংবর-ব্যাপারে, ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিদিগকে এক স্থানে সম্মিলিত করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যের তথা সৎকীর্ত্তির যথাযথ বর্ণন-পূর্ব্বক, স্বকীয় ভারতব্যাপিনী কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ মতাবলম্বিগণের অন্যতম যুক্তি এই যে,—কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবর উপলক্ষে যে কয়জন নৃপতির বর্ণন করিয়াছেন, যে সকল রাজ্যের বর্ণন করিয়াছেন, ঐ ঐ নৃপতি-বৃন্দের তৎ তৎ রাজ্য-সমূহ ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই অভ্যুদিত হইয়াছিল। ৫ম এবং ৬ষ্ঠ

১—রঘু, ৬—৮২।   ২—রঘু, ৬—৮৫, ৮৬।

শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগনে যে কয়টি প্রধান প্রধান নক্ষত্র সমুদিত ছিল, কালিদাস সে সমস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ, পাঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশের ন্যায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে যে কয়টি প্রধান প্রধান স্থান ছিল, রাজ-শক্তির কেন্দ্র ছিল, কালিদাস, সে সকল ক'টিরই পরিদৃষ্টবৎ বর্ণন করিয়াছেন। যদি কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে কদাচ তিনি, তদানীন্তন রাজ্য-সমূহের নামোল্লেখ এবং নরপতিবৃন্দের ওরূপ প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ বর্ণন করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ তিনি মগধেশ্বরের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন[১]। ইহাও উক্ত মতের একটি প্রধান পরিপোষক প্রমাণ। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার আর সে পূর্ব্ব সম্পদ্ নাই। এক সময়ে 'মগধ' বলিলে যাহা বুঝাইত, যে বিশাল রাজশক্তির কথা, রাজ্যের প্রতিপত্তির কথা মনে জাগিয়া উঠিত, এখন আর সে মগধ নাই, তবে তাহার নাম একেবারে লুপ্ত হয় নাই, কিংবা সে রাজবংশেরও সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই। অন্যান্য অনেক নূতন নূতন রাজ্যে নব নব ভূপতি অভ্যুদিত হইলেও, প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া, মগধেশ্বরেরই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। সমবেত, নবাভ্যুদিত, রাজন্য-বর্গের মধ্যে যদি লুপ্ত-গৌরব মগধ-পতির একটু বিশেষ সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে, প্রাচীন রাজবংশের অবমাননা হয়। তাই কালিদাস, প্রথমেই মগধেশ্বরের সম্মুখে ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া, সুনন্দা দ্বারা নৃপতির পরিচয় প্রদান করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, বিশুষ্ক হওয়া স্বত্বেও যেমন কালীঘাটের গঙ্গাকে 'আদিগঙ্গা' বলিয়া সম্মান করিতে হয়, তদ্রূপ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ-রাজ্য পতিত হওয়া সত্ত্বেও আদি রাজ্য বলিয়া মগধের এবং আদিম রাজা বলিয়া মগধপতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে।—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের এই যুক্তি

[১] রঘু, ৬—২০, ২১।

তত ভূয়োদর্শন-সম্ভূত বলিয়া মনে হয় না। কেন না ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় সমবেত রাজন্য-গণের পরিচয়-কালে, মগধ, অঙ্গ, অবন্তি, পাণ্ড্য, অনূপ, মথুরা, কলিঙ্গ প্রভৃতি যে কতিপয় রাজ্যের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মহাভারতেও ঐ ঐ রাজ্যের নির্দ্দেশ পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারতের যে স্থলে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের চারি ভ্রাতার চতুর্দ্দিক বিজয় করিতে বহির্গত হওয়ার এবং দিগ্‌বিজয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবার বর্ণন আছে, সেই স্থলে তাঁহাদের বিজিত রাজ্যসমূহের মধ্যে, কালিদাসবর্ণিত অঙ্গ-অনূপ-অবন্তি রাজ্যেরও নামোল্লেখ আছে। যদি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও উক্ত রাজ্যসমূহ অভ্যুদিত না থাকিত, তবে ব্যাস-কৃত মহাভারতে উহাদের নির্দ্দেশ থাকিল কি প্রকারে? প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহাশয়দিগের কালিদাস-বিষয়ক মতটি স্বীকার করিতে গেলে, ব্যাসদেবকেও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অধঃপাতিত করিতে হয়। কেন না যুক্তি ত উভয়ত্রই তুল্য। কোন কোন সাহসিক ঐতিহাসিক আবার মহাভারতের ঐ উৎকৃষ্ট দিগ্‌বিজয় ভাগটিকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া স্বমত দৃঢ় করিতে আগ্রহ করেন। এ কথার আর উত্তর কি? 'তত্র মৌনং হি শোভনম্।' ক্রমে অনেক অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িয়াছি, এইক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করি।

কালিদাস, প্রাচীন ভারতের বড় স্পর্দ্ধার স্থল—উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় বর্ত্তমান ছিলেন, বিদ্যায়, ধনে, মানে, সর্ব্ব প্রকারে, যিনি ভারতের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, সেই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনী-পতির রাজধানীতে কত উৎসব, কত বিবাহ দেখিয়াছিলেন। ভারত তখন এক অদ্বিতীয় অধিপতির অধীন। খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ভারতবর্ষ তখন বিভক্ত ছিল না। সুতরাং ভারতের একচ্ছত্র নৃপতির প্রাসাদে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের পরিণয়োৎসবে যে কি প্রকার সমারোহ, কি প্রকার ঘটা হইত, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না।

কালিদাস স্বচক্ষে সে সমুদয় দর্শন করিয়াছেন, তাই, তাহাদেরই আদর্শে অজ-ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-ব্যাপার অত সুন্দর করিতে পারিয়াছেন। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের ন্যায়, ইহার ষষ্ঠ সর্গেও প্রাচীন ভারতের অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র পরিদৃষ্ট হয়।

সংসারে সাধারণতঃ যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা ক্ষুদ্রই হউক, আর বৃহৎই হউক, কালিদাস কবির চক্ষে সে সমুদয় দেখিতেন, আর চিত্রকরের চক্ষে তাহা চিত্রিত করিতেন। নবপরিণীত বর-বধূ যখন রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া গমন করেন, তখন পথি-পার্শ্ব-বর্ত্তী অট্টালিকা সমূহের বাতায়নে, ললনাগণ বর কন্যা দেখিবার নিমিত্ত কিরূপ উৎসুকভাবে আসিয়া দাঁড়াইতেন, কত ব্যস্ত হইতেন, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিদিত ছিলেন। অচিরোদ্বাহিত জায়া-পতি-সন্দর্শনে পুরমহিলাদিগের যে কি পরিমাণে কৌতূহল, তাহা তিনি যেন রমণীবৃন্দের মনের মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক, দেখিতে পাইতেন[১]। তাই দেখি, তাঁহার অজ-ইন্দুমতীর স্বয়ংবরান্তে অন্তঃপুর-যাত্রা-কালে, কোন ভামিনী হয়ত, অর্দ্ধ-সংযত কেশ-কলাপ এক হস্তে ধারণ করিয়া, অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত, নবদম্পতির দর্শনাশায় গবাক্ষের দিকে ছুটিয়াছেন; কেহ বা প্রসাধিকার হস্ত হইতে তরল-অলক্তক-রঞ্জিত চরণ বল-পূর্ব্বক আচ্ছিন্ন করিয়া, সমস্ত পথ চরণের অসম্পূর্ণ অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিতে করিতে দ্রুত-পদে যাইতেছেন; কেহ আবার একচক্ষে অঞ্জন পরিয়াই ত্বরিত-চরণে গবাক্ষ-পার্শ্বে উপস্থিত হইতেছেন, অন্য নয়নে অঞ্জন-দানের আর অবসর পান নাই। কেহ দ্রুত-গতি নিবন্ধন স্খলিত-গ্রন্থি বসন হস্ত-দ্বারা নিতম্ব দেশে চাপিয়া ধরিয়াছেন[২]। বর্ত্তমান সময়ে রাজপথে যখন কোন ধনিক-তনয়, পরিণয়ান্তে নব বধূর সহিত সমারোহে চলিয়া যান, এবং সেই সময়ে উভয় পার্শ্বস্থ প্রাসাদবাসিনী

১—রঘু, ৭—৫। ২—রঘু, ৭—৭, ৮, ৯

কামিনীরা যেরূপ যেরূপ করেন, কালিদাস, অজ-ইন্দুমতীর এই শোভা-যাত্রাতেও অবিকল সেইরূপ সেইরূপ করাইয়াছেন। প্রতি শ্লোকেই এক একখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছবি। তাহা দর্শন করিতে করিতে আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে, মনে হয় যেন সত্য সত্যই সেই সময়ের সেই বিবাহ-যাত্রা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পাঠকের এইরূপ আত্মবিস্মৃতি-বিধান কালিদাসের নিজস্ব।

রঘুবংশের সপ্তমসর্গের শেষভাগে, মহাকবি কালিদাস, 'ইন্দুমতী-নিরাশ' অপরাপর নৃপতি বৃন্দের সহিত, ইন্দুমতী-বল্লভ অজের যে যুদ্ধবর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণের কোমলতা অনেকটা অনুভব করিতে পারি। যুদ্ধবর্ণনায় তিনি তাঁহার বিশ্ববিমোহিনী কল্পনার তেমন লীলা দেখাইতে পারেন নাই। ও বিষয়ে, কবিগুরু বাল্মীকি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ঐ সকল স্থলে, যে প্রকার অদ্ভুত রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বোধ হয়, এই জন্যই কালিদাস, যুদ্ধাদিবর্ণনায় কোথাও তত প্রয়াস করেন নাই। বাল্মীকির সবিস্তর বর্ণিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণনা করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

বিংশ অধ্যায়।

ইন্দুমতী-বিয়োগ।

পরিণয়ের পর অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত যুবরাজ অজের হস্তে, বৃদ্ধ মহারাজ রঘু বিশাল কোশল-সাম্রাজ্যের গুরুভার ন্যস্ত করিলেন[১]। কালিদাস এই স্থলে, পুরাকালে ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া যে সকল ব্যাপার ঘটিত, তাহা অতি কৌশলে বলিয়া গেলেন। কবিগণই দেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক। অন্যান্য রাজ-সংসারের অনেক স্থলেই হয়ত, নবীন যুবরাজগণ সিংহাসনাধিরোহণের নিমিত্ত একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া নানাবিধ পাপ-সঞ্চয় পূর্ব্বক, রাজচ্ছত্র অধিকার করিতেন। কোন স্থলে বা বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত অধিকারীর বিনাশ-সাধন পর্য্যন্তও ঘটিত। হৃদয়ে যখন ভোগ-তৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে রাক্ষসীর আকার ধারণপূর্ব্বক জগদ্-গ্রাসে সমুদ্যত হয়। যুবরাজ অজ যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন, তখন তাদৃশ কোন অশুভ ঘটনা হয় নাই, পিতার আজ্ঞা বলিয়া তিনি সিংহাসন স্বীকার করিলেন[২]। নতুবা সে মহাপুরুষের অন্তঃকরণে ভোগ-তৃষ্ণার অস্পষ্ট ছায়াও পতিত হইতে পারে নাই। অজের নবীন যৌবন অনুপম বিনয় ভূষণে বিভূষিত হইয়া, যেন আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। তিনি পিতার রাজশ্রী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তদীয় সমস্ত গুণাবলীও প্রাপ্ত হইলেন। প্রজামণ্ডলী এই রাজ-পরিবর্ত্তন অনুভব করিবারও অবসর পাইল না। তাহাদের মনে হইল, যেন মহারাজ রঘুই পূর্ব্ববৎ সিংহাসনে অধিরূঢ় আছেন[৩]। অজের কোন বিষয়েই কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই। তিনি নিস্তরঙ্গ জলধি-বক্ষের ন্যায় স্থির। পাছে রাজ্যের কোথাও কোনরূপ উদ্বেগের আবির্ভাব হয়,

---

১ রঘু, ৮—১। ২—রঘু, ৮-২। ৩—রঘু, ৮-৫।

এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই অতি সাবধানে রাজ্য-ভোগ করিতেন[১]। তাঁহার বিনয়-প্রধান চরিত্রের এমনই মাহাত্ম্য যে—

অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ত্।
উদধেরিব নিম্নগা-শতেষ্বভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ[২] ॥

প্রজাপুঞ্জের প্রত্যেকেই মনে করিত, 'আমিই মহীপতির প্রিয়তম।' শত সহস্র নদী সমুদ্রে পতিত হয়, সমুদ্রের নিকটে কিন্তু সকল নদীই সমান। কোনস্থলে কোন প্রকার ইতরবিশেষভাব নাই। অজেরও ঠিক সেইরূপ ছিল। সকল প্রজাই তাঁহার চক্ষে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পরিদৃষ্ট হইত। রাজচরিত্র যদি সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়, তবেই তাহাকে সর্ব্বাংশে নিরবদ্য,—প্রকৃত রাজোচিত বলা যাইতে পারে। নতুবা রাজা যদি আবার কোনও ব্যক্তিবিশেষের কর-সঞ্চালিত পুত্তলিকার ন্যায় হয়েন, তবে তাহা রাজা এবং রাজ্য—উভয়েরই পরিণামে ঘোর অমঙ্গলের কারণ হয়। পার্থিব ভূমিখণ্ডের ভোগে রাজার যে সুখ, প্রকৃতিপুঞ্জের অপার্থিব হৃদয়ের রাজত্বে তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ। মহারাজ অজ সে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পাইতেন।

বৃদ্ধ নৃপতি রঘু, কুলের চিরন্তন নিয়মানুসারে, যখন তপোবন গমনে কৃত-সংকল্প হইলেন, তখন অজ,—

পিতরং প্রণিপত্য পাদয়ো-
রপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ[৩]।

'আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না'—এই প্রার্থনা, কাতর-বচনে ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, পিতৃচরণে কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন। পুত্রবৎসল রঘুও পুত্রের এ অভিলাষ বা 'আবদার' উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

১—রঘু, ৮—৭। ২—রঘু, ৮—৮। ৩—রঘু, ৮—১২।

স্বীকার করিলেন। কিন্তু সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্ম্মোকের পুনর্গ্রহণ করে না, তদ্রূপ তিনিও পরিত্যক্ত রাজশ্রীর আর পুনরাদান করিলেন না। তিনি নগরের বহির্দ্দেশে, এক নির্জ্জন স্থানে, আশ্রম-ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় দিনপাত করিতে লাগিলেন[১]। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন সমস্ত রাত্রি, পৃথিবীকে শীতল চন্দ্রিকামৃতে স্নাত করাইয়া, ঐ এক দিকে সুধাকর অস্তগমনোন্মুখ, আর ঐ পূর্ব্বাকাশ উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত করিয়া, অন্য দিকে তরুণ সূর্য্য জগতে নূতন আলোক বিতরণের জন্য অভ্যুদিত[২]! সুখের রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি, সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজমান। রঘু আসমুদ্র পৃথিবীর আধিপত্য নিমেষ-মধ্যে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, নির্লিপ্ত-ভাবে নির্জ্জন-বাস করিতে লাগিলেন। অজ পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনাসক্ত-ভাবে রাজ্য-পালনে ব্যাপৃত হইলেন। সূর্য্যবংশীয় নরপতি-গণের হৃদয়ে আসক্তির যেন কোন অধিকারই নাই। প্রত্যুত, আসক্তিই যেন তাঁহাদের কিঙ্করী। যখন ইচ্ছা, তাহাকে ত্যাগ করিতেছেন। যখন ইচ্ছা, একটু আদর করিতেছেন। আদর্শ নরপতি হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আসক্তি-শূন্য হওয়া আবশ্যক। আত্ম-হৃদয় রঞ্জনের পিপাসা থাকিলে পর-হৃদয়-রঞ্জন করা যায় না। আত্ম-ত্যাগ ব্যতীত পর-তৃপ্তি-বিধান হয় না। সর্ব্বত্র সমদর্শন হওয়া যায় না। সৌর-বংশীয় নৃপতি-গণের চিত্তে এই গুণ অতিশয় প্রবল ছিল। কালিদাস, স্বকীয় অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশলে আদর্শ-রাজ-চরিত্র প্রদর্শন করিলেন। প্রকৃত রাজার মূর্ত্তি দেখাইলেন। 'রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ',—এই কথা আরও সুস্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

মহারাজ অজ, পরম উৎসাহের সহিত, নিরপেক্ষ-ভাবে রাজ্য-শাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার বৈচিত্র্যময় সংসারে কাহারও অদৃষ্টে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লিখিত হয় নাই!

১—রঘু, ৮—১৩। ২—রঘু, ৮—১৫।

এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতে, রাজা প্রজা—সকলেই এই নিয়মের অধীন। মহারাজ অজ যথাসময়ে পুত্র দশরথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্র-লাভে তাঁহার সুখের রাজ-সংসার যেন আরও অধিকতর সুখময়—শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে, অজের সুখের স্নিগ্ধ-চন্দ্রিকা-স্নাত অদৃষ্ট-গগনে হঠাৎ কাল মেঘের উদয় হইল। অথবা মেঘ বলি কেন? তাঁহার ইহজীবনের সমস্ত শান্তি, সমস্ত সুখ, সমূলে বিধ্বস্ত করিবার জন্য, যেন কালান্তক ধূমকেতু অবির্ভূত হইল। আনন্দের মণিময় প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার নিমিত্ত, যেন 'বিনামেঘে বজ্রাঘাত' হইল। 'ব্যোমচর' নারদের কর-স্থিত বীণা হইতে, অকস্মাৎ একছড়া পারিজাত মালা স্খলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল, না—না, পৃথিবীতে নহে, পৃথিবী-পতির হৃদয় ভগ্ন করিবার জন্য, তদীয় রাজ-লক্ষ্মীর দেহে পতিত হইল। মহারাজ, রাজ্য পালন-চিন্তা-ক্লান্ত হৃদয়ের কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য-বিধানের জন্য, মহিষী ইন্দুমতীর সহিত একদিন নগরোপকণ্ঠবর্ত্তিনী উদ্যান-বাটিকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন; দেবর্ষি নারদের বীণা-স্খলিত কুসুম-স্রক্, তথায়, ইন্দুমতীর দেহে পতিত হইল[১]। অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন অমৃতও গরলে পরিণত হয়, চন্দন-তরুও বিষদ্রুমের আকার ধারণ করে। আজও তাহাই হইল। ঐ অকস্মাৎ স্খলিত কুসুম মালিকার স্পর্শমাত্রেই, কুসুমাধিক-কোমলা, বিহ্বলা 'নরোত্তম-প্রিয়া' চিরদিনের মতন নয়ন নিমীলন করিলেন। অকস্মাৎ যেন দুরন্ত রাহু আসিয়া, নির্ম্মল আকাশ-বক্ষ হইতে শারদ কৌমুদীকে বিলুপ্ত করিল! কালিদাস, পৃথিবীর মধ্যে যে বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করী, অজকে সেই বিপদে পাতিত করিয়া, জগতে দুঃসহবেদনার একটা খরস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সে বেদনার ভয়ঙ্কর প্রভাব চিন্তা করিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। ক্রন্দন বা বিলাপ প্রভৃতি, সংসারের প্রত্যেককেই, নানা কারণে, কখন না কখন করিতে

১—রঘু, ৮—৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭।

হয়। সেই ক্রন্দন-বিলাপের মধ্যে যে'টি সর্ব্বাপেক্ষা অরুন্তুদ, সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়দ্রাবী, কালিদাস তাহার বর্ণন করিলেন। সকল বিষয়েই যে'টি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সেইটিই কালিদাসের বর্ণনীয় ছিল। সুখের মধ্যে যে'টি সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিমোহন, দুঃখের মধ্যে যে'টি সর্ব্বাপেক্ষা যাতনাদায়ক, সেই উভয়েই তাঁহার সমান বর্ণনার বিষয়। তিনি দুঃখ বর্ণনা করিতেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যহীন দুঃখ কল্পনাও করিতেন না। যে দুঃখে চমৎকারিতা নাই, যে রোদনে পৃথিবী রোদন করিবে না, যে বিলাপে পাষাণ বিগলিত হইবে না, তাহার দিকে তিনি দৃষ্টি করিতেন না।

পৃথিবীপতি অজ যখন—তাঁহার সেই স্বয়ংবর-গৃহীতা ইন্দুমতীর অকস্মাৎ মূর্চ্ছায়, উন্মত্তবৎ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন, সেই উপবনবর্ত্তিনী বৃক্ষ-বল্লরীও যেন তাঁহার দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। দৃঢ়কায় পর্ব্বতকন্দর হইতে যখন অগ্ন্যুদ্গম হয়, তখন যেমন, সেই অগ্নিপাতে পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য-জনপদ প্রভৃতিও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ, দৃঢ়চিত্ত অজ যখন—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলা-বিধৌ,
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্[১] ?

বলিয়া তারকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও যেন বিলাপ করিয়া উঠিল।

ক্রমে একে একে, সেই সমস্ত ঘটনা, মহারাজ অজের স্বপ্নের ন্যায় মনে পড়িতে লাগিল। সেই স্বয়ংবর ও স্বয়ংবরান্তে 'ইন্দুমতী-নির্য্যাণ'

১—রঘু, ৮—৬৭—সংসার কর্ম্মে তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রণায় তুমি আমার সচিব, রহস্যে তুমি আমার সখী, ললিত-কলা-বিষয়ে তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা, অথবা তুমি আমার সর্ব্বস্ব, অকরুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া, বল, আমার কি না হরণ করিল?

ভগ্নমনোরথ রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ, সেই রাজলক্ষ্মীর সহিত 'সমর-বিজয়-লক্ষ্মীর' শুভ সম্মিলন,—সেই জীবনের সুখ, বার্দ্ধক্যের অনন্য-সাধারণ অবলম্বন, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ,—তার পর,—তার পর, সেই সুখে, দুঃখে, হর্ষে, বিষাদে, একমাত্র অংশভাগিনী ইন্দুমতীর সেই স্বর্গীয় হৃদয়, অপার্থিব প্রেম, অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও অনুপম পাতিব্রত্য—সব আজ অজের হৃদয়ে ছায়ার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। প্রশান্ত-গম্ভীর বারিধি-বক্ষে, যেমন, হঠাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাবে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ আসিয়া, অনন্ত জল-রাশিকেও সংক্ষোভিত করিয়া তুলে, তদ্রূপ আজ, প্রশান্ত হৃদয় মহীপতির অন্তঃকরণে, এই সুদীর্ঘ জীবনের, ইন্দুমতীময় জীবনের কত কথা, কত ঘটনা যুগপৎ উদিত হইয়া, তাঁহাকে একান্ত অধীর করিয়া তুলিল। তাই আসমুদ্র ধরণীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর প্রাকৃতজনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে, দুঃখে, সুখে, যখনই মানব-হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার ধীরতা বিলুপ্ত হয়, আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। অজ-হৃদয়েরও আজ সেই অবস্থা। মহারাজ অজ যৌবনের প্রারম্ভে, বিদর্ভরাজের উদ্যান-বাটিকায় যে অনর্ঘ-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, যে রত্নের সুশীতল কিরণ-জালে, তাঁহার হৃদয় সংসারের কোন তাপ, কোন ক্লান্তিই কখনো অনুভব করে নাই, আজ অযোধ্যার উদ্যান-বাটিকায় সেই রত্নের বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহার জীবনাকাশের শারদী চন্দ্রিকা চিরদিনের মত তিরোহিত হইল। তিনি 'বাষ্প-স্তম্ভিত-কণ্ঠে' ও শূন্য-হৃদয়ে, রাজ-লক্ষ্মী-শূন্য বিষাদ-কালিমাবৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন? ইন্দুমতী-বিহীন হইয়া রাজ-পুরীতে এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ। উৎসব-দায়িনী রজনীর অবসানে, রজনী-পতি শশাঙ্কের যেমন সমস্ত জ্যোতিঃ তিরোহিত হয়, কেবল তাঁহার নিষ্প্রভ দেহে মালিন্যের একটা ছায়া থাকিয়া যায়, তদ্রূপ আজ ইন্দুমতী-বল্লভের দেহেরও যেন সমস্ত তেজ, সমস্ত

লাবণ্য তিরোহিত হইল, কেবল—তদীয় কলেবরে গুরুশোক-কৃত কালিমার একটা গাঢ় আবরণ পড়িয়া রহিল। তাঁহার হৃদয় শোকভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন[১]।

আশ্রম-বাসী কুল-গুরু বশিষ্ঠ, ধ্যান-বলে শিষ্যের এই আকস্মিক বিপৎ-পাতের বিষয় বিদিত হইয়াই, তৎক্ষণাৎ, অজের প্রবোধের জন্য একজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া, তিনি স্বয়ং আসিতে পারিলেন না, তাই শিষ্যের মুখে স্বকীয় বক্তব্য বলিয়া পাঠাইলেন[২]। কালিদাসের সৃষ্ট পাত্রসমূহে দেখিতে পাই, কোথাও কোন কারণে,—শোকে, মোহে, হর্ষে, বিষাদে—কিছুতেই—কেহ কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন নহেন। যথাসময়ে বশিষ্ঠ গুরুর কর্ত্তব্য করিলেন। কিন্তু গুরুর কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া, তিনি ঋষির কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। যজ্ঞ-ভঙ্গ করিয়া নিজেই আসিলেন না।

শিষ্য আসিয়া ইন্দুমতীর প্রাণ-বিয়োগের সমস্ত কারণ প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন—'রাজন্! অভ্যুদয়ের সময়ে, সকল বিষয়েই আপনার যে প্রকার স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য দেখিয়াছি, আজ এই বিপদের সময়েও, তদ্রূপ আত্ম-সামর্থ্য প্রকাশ করুন। নর-নাথ! আপনি চিরজীবন রোদন করিলেও আর রাজ-মহিষীর সন্দর্শন পাইবেন না। অনুমরণেও আর তাঁহার লাভ হইবে না। দেহিগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মফলের অনুসারে, লোকান্তরেও বিভিন্ন পথে গমন করে[৩]। তাই বলি নরেন্দ্র!—

অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীং অনুগৃহ্ণীষ নিবাপ-দত্তিভিঃ।
স্বজনাশ্রু কিলাতি-সন্ততং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে॥ ৮।৮৬
মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্ যদি জন্তুর্নন্থ লাভবানসৌ॥ ৮।৮৭

১—রঘু, ৮ম—৭৪। ২—রঘু, ৮ম—৭৪। ৩—রঘু, ৮ম—৮৫।

অপগচ্ছতি মূঢ়-চেতনঃ প্রিয়-নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্। ৮।৮৮
ন পৃথগ্-জনবচ্ছুচো বশং বশিনামুত্তম! গন্তুমর্হসি।
দ্রুম-সানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েহপি
তে চলাঃ[১] ॥ ৮।৯৯

গুরুদেব-কর্তৃক শিষ্য-মুখে প্রেষিত উপদেশাবলী ইন্দুমতী-বল্লভ, শূন্য-হৃদয়ে শ্রবণ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রিয়া-হীন জীবনের সুদীর্ঘ অষ্ট পরিবৎসর কাল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কুমারের বয়ঃ-প্রাপ্তির অপেক্ষায় অতিবাহিত হইল। জীবনের ভার তাঁহার পক্ষে একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। তিনি একাকী ইন্দুমতীর প্রতিকৃতি দর্শন করিতেন, একাকী স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতেন, কখনো বা, একটিবার যদি স্বপ্নেও ইন্দুমতীর দর্শন পান, এই আশায় নিদ্রার কতই না আরাধনা করিতেন[২]।

১—রঘু, ৮ম—৮৬—শোক সংবরণপূর্ব্বক, মহিষীর ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করুন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যত রোদন করা যায়, ততই তাহার পরলোকে কষ্ট হইতে থাকে।

৮৭—দেহ ধারণ করিলেই মরণ আছে, বরঞ্চ বেঁচে থাকাই আশ্চর্য্য। জন্তুগণ এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কিছুদিনও আমোদ-প্রমোদে কাটাইতে পারে, তবে সে-ই তাহাদিগের যথেষ্ট লাভ।'

৮৮—মহারাজ! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া আপনার উচিত নহে। দেখুন, সৎ-পুরুষেরা কদাচ শোকের বশীভূত হয়েন না। মূঢ়েরাই প্রিয়নাশকে হৃদয়ের শল্য-স্বরূপ বোধ করিয়া থাকে। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ, ইষ্টনাশ হইলে, শোকের কথা দূরে থাকুক, বরঞ্চ হৃদয়ের শল্যোদ্ধার হইল, এই বিবেচনা করিয়া থাকেন।'

৮৯—মহাত্মন! প্রাকৃত লোকের ন্যায় আপনকার শোক মোহের বশীভূত হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে; যদি বায়ু-ভরে উভয়েই বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষ ও পর্ব্বতের বিশেষ কি? (চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ কৃত রঘুবংশানুবাদ)

২—রঘু, ৮ম—৯২।

সুদৃঢ় সৌধ-গাত্রে একটি ক্ষুদ্র অশ্বত্থ তরু অঙ্কুরিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে যেমন প্রাসাদটিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ, ইন্দুমতীর অসহ্য 'শোকশল্য' অতি অল্প-কাল-মধ্যেই মহারাজ অজের হৃদয়-পঞ্জর ভগ্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্ষিতি-পতি ভাবিতে লাগিলেন, 'মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে ভাল, আর কেন?' ক্রমে শোকাচ্ছন্ন নৃপতির সকল শোকের শান্তি হইল। তিনি যুব-রাজ দশরথের হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ-পূর্ব্বক, গঙ্গা এবং সরযূর পবিত্র সঙ্গমে প্রায়োপ-বেশনে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সকল যাতনার অবসান করিলেন[১]।

যাঁহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া,—যে শান্তি-প্রতিমার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে সংসার-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে মহীপতি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। সূর্য্যবংশের রাজ-সংসারে একটা প্রবল শোকের ঝড় বহিয়া গেল। সেই তুমুল ঝড়ে স্থাবর-জঙ্গম জগৎও যেন আন্দোলিত ও আকুলিত হইল, বিষাদের প্রগাঢ় অন্ধতমসে ডুবিয়া গেল। আর কবির কবি কালিদাস সেই শোক-গাথা গান করিয়া, ত্রিজগৎকে কাঁদাইলেন, নিজেও করুণ-কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অশ্রু-প্রবাহে, তাঁহার উপাস্য-দেবতা সরস্বতীর চরণ প্রক্ষালিত করিলেন! বিশুদ্ধ প্রেমের দৃষ্টান্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ করিলেন।

১—রঘু, ৮ম—৯৩, ৯৪, ৯৫।

একবিংশ অধ্যায়।

দশরথ।

যুবরাজ দশরথ, মহারাজ অজের শোকাশ্রু-দিগ্ধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রজারঞ্জন অজের প্রায়োপবেশন-মরণে অযোধ্যার রাজধানীস্থ সকলেই মর্ম্মাহত। রাজসংসারে গভীর শোকের একটা গাঢ় আবরণ পড়িয়াছে। মহারাজ দিলীপের সময় হইতে অজের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, যে অযোধ্যায় কেহ কখন বিশাদের মুখ দেখে নাই, এই সুদীর্ঘকাল, আমোদ আহ্লাদের অমৃত-সাগরে যে অযোধ্যা নিরন্তর নিমগ্ন ছিল, আজ সেই সুখের অযোধ্যায় কালকীট প্রবেশ করিল। অযোধ্যাবাসিগণের সুখরূপ নির্ম্মল আকাশে ঘন-কৃষ্ণ মেঘের আবির্ভাব হইল। হয়ত, কালে এই মেঘ 'অগ্নিবর্ণ'-প্রলয় মেঘে পরিণত হইয়া, অনল-বর্ষণ-পূর্ব্বক, সোণার অযোধ্যা ভস্মসাৎ করিবে।

চিরদিন কখন সমান যায় না। তোমার জীবনে একবার যদি বিষাদের রেখাপাত হয়, তবে, আমরণ তোমাকে ঐ রেখা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। কত সোণার সংসার,—সুখ-শান্তির আবেশময় উৎসঙ্গে সুষুপ্ত সংসার, হঠাৎ একটা দুর্দ্দৈব-সম্পাতে চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! দুর্দ্দৈব, অঙ্কুর-রূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক, প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া, সুদৃঢ় সংসার-ভিত্তি শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে! আজ অযোধ্যার রাজ-সংসারেরও সুখের স্বপ্ন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তথায় বিষাদ ভুজঙ্গ-শিশু এই প্রথম প্রবেশ করিল। কালে ইহার প্রভাবে যে কতদূর কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

রাজা দশরথ সংসারে প্রবেশ করিবার সময়েই একটা মহা অমঙ্গলের ছায়া-স্পর্শ করিলেন। সূর্য্যবংশের চিরপবিত্র রাজসিংহাসনে, পূর্ব্বে কোন যুবরাজ যখন অভিষিক্ত হইতেন, তখন কত আমোদ, কত সমারোহ হইত;

আর এই দশরথের অভিষেক হইয়া গেল, তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইলেন, কিন্তু প্রজাগণের আর সে আনন্দ নাই, সে প্রীতি নাই; কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহারা দশরথের অভ্যর্থনা করিল মাত্র, কিন্তু প্রাণের সহিত উৎসবে যোগ দিতে পারিল না। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, যাঁহার জীবনের প্রভাত, এই প্রকার অবসাদ-কুজ্ঝটিকার মধ্যবর্ত্তী, তাঁহার জীবনের সায়ংকাল না জানি কতই ভীষণ।

সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী ইন্দুমতীর সহসা অন্তর্ধানের পর অযোধ্যার রাজসংসারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিল, সে—কোমল-হৃদয় দশরথের জীবন বিড়ম্বনাময় করিবে, শ্রীরামচন্দ্রের সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিবে, সোণার অযোধ্যা-রাজ্য শ্মশানে পরিণত করিবে, পরিশেষে, তরুণ নরপতি অগ্নিবর্ণের প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া, সে আত্মতৃপ্তি সাধন করিবে।

মহারাজ অজ, জীবিতকালে, যুবরাজ দশরথকে সকল বিষয়েই বিশেষরূপে শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দশরথ রাজা হইয়া, পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক, দক্ষতার সহিত বিশাল কোশল-সাম্রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল। আমোদ প্রমোদ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে রাজ্যের সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ-উৎসবের তরঙ্গ। রাজার অন্তঃকরণও অতিশয় প্রফুল্ল। তিনি ভোগময় বসন্তকে রাজোচিত ঐশ্বর্য্য সহকারে ভোগ করিলেন[১] কালিদাস সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের এপর্য্যন্ত কোনরূপ ভোগ-তৃষ্ণার পরিচয় প্রদান করেন নাই। দশরথের এই বসন্ত-সম্ভোগ-বৃত্তান্ত-বর্ণনে, কালিদাস, অতি কৌশলে, দশরথ-চরিত্রের একটা দিক একটু দেখাইয়া গেলেন। এই দিকটা, হয়ত দশরথের একটু দুর্ব্বল ছিল। এই জন্যই বুঝি, বৃদ্ধ বয়সে, তাঁহার উপর তরুণী মহারাণীর আধিপত্য একটু প্রবল হইয়াছিল?

১—রঘু, ৯ম—৪৮।

দশরথ মৃগয়া-প্রিয় ছিলেন। মৃগয়ায় নির্গত হইলেন। কোমল-হৃদয় নৃপতি মৃগয়া করিতে গিয়াও কোমলতার হাত এড়াইতে পারিতেন না। মৃগয়াকারী যদি লক্ষ্যীকৃত শরব্যে বাণ-নিক্ষেপে কোন কারণে বাধা-প্রাপ্ত হয়েন, কিংবা শরব্যই যদি কোন প্রকারে, সেই অব্যর্থ-সন্ধান বধকর্ত্তার নিশিত বাণ ব্যর্থ করিতে পারে, তবে তাহাতে মৃগয়াকারীর যে প্রকার মনোবেদনা জন্মে, তাহা বর্ণনীয় নহে। কিন্তু দশরথের অন্তঃকরণ এমনই কোমল ছিল যে, তিনি লক্ষ্যীকৃত মৃগকে বাণ-বিদ্ধ করিতে করিতেও করেন নাই, করুণ-হৃদয়ে তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। নিজের উত্তোলিত ধনু হইতে বাণ সংহার করিয়াছেন। সে অতি বিচিত্র দৃশ্য। তিনি, হয়ত কোন হরিণকে লক্ষ্য করিয়া বাণ-সন্ধান করিয়াছেন, বাণক্ষেপ করেন আর কি, এমন সময়ে দেখিলেন যে, হরিণী আসিয়া তাহার প্রাণেশ্বরের দেহ স্বদেহে অন্তরিত করিয়া রাজার বাণের পথে দাঁড়াইল। অমনি নরেন্দ্র কৃপা-বিগলিত-চিত্তে হরিণ-দম্পতিকে মুক্তি দিলেন। অমন প্রণয়ে ব্যাঘাত করিতে প্রণয়ী দশরথের প্রবৃত্তি হইল না। ধনু-র্যোজিত শর প্রতিসংহারপূর্ব্বক, তূণীরে পুনঃস্থাপিত করিলেন। এতই কোমল তাঁহার অন্তঃকরণ[১]।

তিনি কতবার কত মৃগের প্রতি বাণক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়করে ধনু-ধারণ পূর্ব্বক, আকর্ণ শিঞ্জিনী কর্ষণ করিয়াছেন, প্রাণ-ভয়ার্ত্ত মৃগ, অতিত্রাসে, তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়াছে, বাণ-পাতের আর বিলম্ব নাই, এমন সময়ে দশরথ তাঁহার কর্ণান্ত-বদ্ধ দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করিলেন, বাণক্ষেপ আর করা হইল না। পলায়মান মৃগের সেই ভয়-চকিত নয়ন-দর্শনে, তাঁহার হৃদয়ে, তদীয় মৃগাক্ষী মহিষীর চঞ্চল নয়ন ভাসিয়া উঠিল : স্নিগ্ধ-হৃদয়, নরনাথের আর সে মৃগ হনন করা হইল না। এমনই কোমল তাঁহার অন্তঃকরণ[২]।

১—রঘু, ৯ম—৫৭।   ২—রঘু, ৯ম—৫৮।

কালিদাস বহির্জ্জগতের প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্য যেমন তন্ন তন্ন করিয়া নিজে দেখিতেন, অপরকেও দেখাইতেন, অন্তর্জ্জগতের অনুপম সৌন্দর্য্য-সমূহও তেমনই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পাইতেন, অন্তকেও দেখাইতেন। মহারাজ দশরথের হৃদয়-বৃত্তি যে কিরূপ মৃদু, কিরূপ নবনীতবৎ কোমল ছিল, তাহা কবি, উপরি-ধৃত ঐ দুইটি চিত্রের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন। হৃদয়ে এতাদৃশ মৃদুত্বের অতিপ্রভাব পরাক্রান্ত নরপতির পক্ষে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থল-বিশেষে ইহাতে অনেক কুফলও ফলিয়া থাকে। এই অতিমৃদুত্ব-রূপ রশ্মি আকর্ষণ করিয়াই, কৈকেয়ী রাজহৃদয় বশীভূত করিয়াছিলেন ও রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন বিষয়েই অতি-প্রিয়তা ভাল নহে। মৃগয়া দশরথের অতি প্রিয় ছিল। তিনি সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষও ছিলেন। পরোক্ষে কোন প্রকার শব্দ হইলেও, সেই শব্দ উদ্দেশ করিয়া দশরথ বাণক্ষেপ করিতেন। নিমেষমধ্যে, বাণ শব্দকারীর প্রাণ সংহার করিত। অন্ধমুনিতনয় সিন্ধুর 'কুম্ভ-পূরণ-সম্ভব' শব্দ শুনিয়া সেই নির্জ্জন গহন বনে, করিশব্দভ্রমে, দশরথ তাঁহার শব্দপাতী বাণক্ষেপ করিয়া অন্ধের যষ্টি সিন্ধুর জীবন-শেষ করিলেন[১]। সূর্য্যবংশের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কুবলয়দল সহসা মলিন হইবার উপক্রম করিল। নরহত্যা হইল। ইন্দুমতীর অপঘাত-মরণে এবং অজের প্রায়োপবেশনে অযোধ্যার রাজসংসারে যে অমঙ্গলের ছায়া-পাত হইয়াছিল, এবার দশরথকৃত এই নরহত্যায় তাহার মূর্ত্তি আরও একটু ফুটিয়া উঠিল। বুঝিতে পারা গেল যে, সূর্য্যবংশের সুগঠিত প্রাসাদ-মন্দিরে অশ্বত্থ-প্ররোহ জন্মিয়াছে, ক্রমে বাড়িতেছে। অজের শোকাশ্রুতপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়াতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, দশরথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নহে। তার পর এই ঘটনায় আরও বুঝা গেল যে, মহারাজ দশরথ দুরদৃষ্ট। সূর্য্য-বংশের ভবিষ্যৎ

১—রঘু, ৯ম—৭৩, ৭৪, ৭৫,।

সুখের নহে। জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, সূর্য্যবংশীয় নৃপতির কর্ম্ম-দোষে আজ পবিত্রকুলে পাপস্পর্শ হইল।

দশরথের প্রবল প্রতাপ। ভারতের তাবৎ রাজন্য-বৃন্দ তাঁহার অধীন, সামন্ত নৃপতি-রূপে গণ্য। তিনি যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তখন, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দশরথের যজ্ঞভূমিতে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার এমনই সম্মান, এতই প্রভাব। ইন্দ্রের নিকটে তাঁহার মস্তক অবনত হইত, নতুবা পৃথিবীর অন্য কোন নৃপতির নিকট তাঁহার শির নত হইত না[১]। এই একটি চিত্রে কালিদাস মহারথ দশরথের বীরত্বকাহিনী বিবৃত করিলেন। এত অল্প কথায়, এমন পরিস্ফুট-ভাবে, একজন প্রবল-পরাক্রম মহীপতির বীরত্ববর্ণন অন্যত্র দুর্লভ।

এইভাবে, অতি তেজস্বিতার সহিত, দশরথ বহুকাল রাজত্ব করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিল না। কোশল-সাম্রাজ্যের ভাবী অধিপতির অভাব-চিন্তায় মনস্বী দশরথ তদীয় প্রপিতামহ দিলীপের ন্যায় মধ্যে মধ্যে একটু বিমনা হইয়া পড়েন[২]। কালিদাস জীবহৃদয়ের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকা পর্য্যন্ত এত সূক্ষ্মভাবে চিনিতেন যে, কখন্ কোন্ শিরায় কি রক্ত প্রবাহিত হয়, কখন্ হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে কিরূপ ভাবের উদয় হয়,—তাহা তিনি অভিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিদের ন্যায়, নিপুণ জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। সংসারের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ অপত্য। কালিদাস, যখনই অবসর পাইয়াছেন, তখনই এই আকর্ষণী দ্বারা তাঁহার সামাজিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন।

সংসারের এই 'সদ্যঃশোক-তমোপহ' সন্তানের অভাবে দশরথ বড়ই ক্ষুণ্ণ। এমন সময়ে, অত্যাচারি-রাবণ-কর্ত্তৃক একান্ত বিড়ম্বিত হইয়া, প্রতিকার-বাসনায় দেবগণ ক্ষীরোদ-শয়ন-সুপ্ত বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত

১—রঘু, ৯ম—২২।

২—রঘু ১০—৩।

হইলেন। সমবেত দেববৃন্দ, মর্ম্মের বেদনা জ্ঞাপন করিয়া সেই জলশায়ী বিশ্বরূপের কত স্তব করিলেন।

কবিকুল-কেশরী কালিদাস স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভার মোহনমন্ত্রে যেন, পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া অকস্মাৎ অযোধ্যার রাজধানী হইতে, নিমেষমধ্যে, সেই সমুদ্র-তলে, 'ভোগিভোগসমাসীন' মহাবিষ্ণুর পাদ-প্রান্তে লইয়া গেলেন।

একবার কুমার-সম্ভবে, কবি, ইন্দ্রাদি-দেব-গণের সহিত পাঠক-দিগকেও, হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা ব্রহ্মার চরণ-প্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন। দুরন্ত তারকাসুরের কারাগারে বন্দীকৃত সুরললনাগণের লাঞ্ছনার বর্ণন করিয়া নির্ব্বিকার স্বয়ম্ভুর সহিত পাঠকদিগকেও কাঁদাইয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রবণ হৃদয়ের অন্তস্তলে বেদনার একটা খরস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। আবার এখন, এই রঘুবংশের দশমসর্গে, প্রবীণ কবি কালিদাস, দুরন্ত-রাবণ-কৃত অত্যাচারে ব্যথিত দেবগণের আন্তরিক বেদনা বর্ণন-দ্বারা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমকেও ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। দয়ার্ণব মধুসূদন অবধ্য রাবণের অত্যাচার স্মরণ করিয়া, জগতের মঙ্গলের জন্য কত কষ্ট—কত লাঞ্ছনা স্বীকার করিলেন। বলিলেন—'দেবগণ! ভয় নাই, আশ্বস্ত হও, আমিই প্রতিবিধান করিব!'

সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণ-ভূমের্বলিক্ষমম্।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃ-কমলোচ্চয়ম্'[1] ॥

অমিতপরাক্রম রাবণ স্বকীয় পাশব-ক্ষমতা-বলে জগতের কত অকল্যাণ —কত অমঙ্গল করিতেছিল। জগন্নাথের মঙ্গলময় রাজ্যে যথাসময়ে

১—রঘু, ১০-৪৪-সংপ্রতি আমি সূর্য্যবংশাবতংস দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নিশিত শরের দ্বারা সেই পাপিষ্ঠ রাবণের মস্তকাবলী ছিন্ন করিব, এবং সেই মস্তকারূপ কমলের দ্বারা রণভূমির অর্চ্চনা করিব।

তাহার প্রতিকারের সূত্রপাত হইল। বিধাতা অত্যাচারীর অত্যাচার-শাস্তির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

রঘুবংশের কবিতাবলী-রূপ মধুর উদ্যানের মধ্যে, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, যে একটা প্রবল সমাজ-হিতৈষণা, লোক-হিতৈষণা, ততোধিক,—একটা প্রবল ধর্ম্মভাব যেন অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রতিচরিত্রে, প্রতিকথায়, প্রতিবর্ণে কবির লোক-শিক্ষা প্রবৃত্তি এবং জগতে সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বপ্রচার-বাসনা জাগরূক রহিয়াছে। পবিত্র চরিত্রের আলোচনায় দেশের তথা সমাজের যে অশেষ মঙ্গল হয়, ইহা কবি বিদিত ছিলেন, তাই অবসর পাইলেই, তিনি তাদৃশ চরিত্র-চিত্রণ দ্বারা জগতের অসীম হিতসাধন করিয়াছেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রাম।

দশরথের রাজ-প্রাসাদে, মাহেন্দ্রক্ষণে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন—কুমার-চতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করিলেন। এ দিকে ঠিক সেই সময়ে,—রামচন্দ্রের উৎপত্তি-ক্ষণে, দশাননের কিরীট-বদ্ধ মণি-মালিকার স্থূল-স্বচ্ছ মণিগুলি ঝর ঝর করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যেন রোরুদ্যমানা রাক্ষস-কুল-রাজলক্ষ্মীর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু, এই প্রথম, পৃথিবীতে পতিত হইল[১]।

কবি তদীয় রঘুবংশের ভবিষ্যৎ নায়কের জন্ম-মুহূর্ত্তেই তাঁহার শক্তিমত্তার বিলক্ষণ আভাস প্রদান করিলেন। রামচন্দ্রের অন্য কোন বিশেষ বীরত্ব-গাথা কীর্ত্তন না করিলেও কেবল এই বর্ণনাটীর দ্বারাই, সে সমস্ত অনুমান করিতে পারা যায়।

কালে দুরন্ত রাবণের সহিত রামচন্দ্রের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে, এবং সেই যুদ্ধের যে ফলাফল হইবে, তাহা জ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা পাঠক-মাত্রেরই জন্মিবার কথা। সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই ত রঘুবংশেরও প্রতিপাদ্য সু-সম্পূর্ণ হইল, অথচ সে আকাঙ্ক্ষার যদি বিলোপ ঘটে, তবে সেই সঙ্গে, কাব্যপাঠেরও উৎসাহ-হানি হইবার সম্ভব; তাই মহাকবি মধ্যে মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা একটু একটু বৃদ্ধি করিতেছেন। সেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পূর্ব্বাভাস-স্বরূপে, প্রসঙ্গক্রমে, রাম-রাবণের প্রতিযোগিতার একটু একটু উল্লেখ করিতেছেন। পাঠক মধ্যে মধ্যে বুঝিতে পারিতেছেন যে, কালে রাম-রাবণের মধ্যে কি ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইবে। পাঠকের কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। রচনা-নৈপুণ্যের ইহা পরম উৎকর্ষ।

১—রঘু ১০ম—৭৫—দশানন-কীরেটেভ্যঃ তৎক্ষণং রাক্ষস-শ্রিয়ঃ।
মণি-ব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ।

যখন রামের শরে, 'বহুল-ক্ষপা-ছবি' 'নর-কপাল-কুণ্ডলা' 'পুরুষান্ত্র-মেখালা'-ধারিণী তাড়কা পতিত হইল, তখন তাহার বিরাট্ দেহের ভারে কেবল যে বনভূমিই কম্পিত হইয়াছিল, তাহা নহে, ত্রিলোক-বিজয়-পূর্ব্বক, রাবণ যে চঞ্চলা কমলাকে চিরস্থিরা মনে করিয়া স্বালয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তিনি পর্য্যন্তও হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিলেন[১]। রাম-রাবণের ভবিষ্যৎ সঙ্ঘর্ষের যে পরিণাম, তাহার একটা সাধারণ আভাস দিয়া, কবি পাঠকদিগকে আশ্বস্ত করিলেন।

কালিদাস তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের কোন স্থলেই কোন প্রকার ত্রুটি রাখিতেন না। দুর্ব্বলতার কোন চিহ্নই তদীয় নায়ক-নিচয়ে পরিলক্ষিত হয় না। তিনি বিলক্ষণ-রূপে জ্ঞাত ছিলেন যে, যাহা অসুন্দর, তাহার সমস্তই অসুন্দর, অসুন্দরের আর শ্রেণী-বিভাগ চলে না। তাই তাঁহার বর্ণনায়, কোন স্থানে অসুন্দরের রেখা মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না।

যজ্ঞের বিঘ্নভূত রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্ত, বিশ্বামিত্র যখন বালক রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞভূমিতে লইয়া গেলেন, তখন ধনুর্দ্ধর রাম একবার উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, আকাশমণ্ডল শত সহস্র রাক্ষসে সঙ্কুল, বুঝি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা সমগ্র যজ্ঞ-স্থলে একটা প্রলয় করিয়া বসিবে। বালক রামচন্দ্র কিন্তু, তাহাদের যে দুইজন অধিপতি, কেবল তাহাদিগকেই শরব্য করিলেন। গরুড় যেমন 'মহোরগ' ব্যতীত, দুর্ব্বল নগণ্য জল-সর্পের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না, তদ্রূপ রাম অপরাপর রাক্ষস-দিগকে লক্ষ্য করিলেন না[২]। দাস্ত রাম-চরিত্রের অন্য একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশ কালিদাস এইবার অতি সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শন করিলেন।

১—রঘু, ১১শ—১৫, ১৬।

১৯—বাণ-ভিন্ন-হৃদয়া নিপেতুষী সা সকাননভুবং ন কেবলাম্।
বিষ্টপ-ত্রয়-পরাজয়-স্থিরাং রাবণ-শ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ॥

২—রঘু, ১১শ—২৭—তত্র যাবধিপতী মখ-দ্বিষাং তৌ শরব্যমকরোৎ স নেতরান্।
কিং মহোরগবিসর্পি-বিক্রমঃ রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ত্ততে?

নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ-সমাপ্তি হইলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের নিকট মিথিলাপতির সেই অশক্যভঙ্গ 'হরধনুর' বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। বালত্ব-সুলভ-কৌতূহল-নিবন্ধন এবং ক্ষাত্রতেজের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে রাম সেই অনন্য-দুরানম চাপ দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। বিশ্বামিত্রও তাঁহাদিগকে মিথিলার রাজসভায় লইয়া গেলেন। মিথিলেশ্বর, 'প্রথিত-বংশ'-সম্ভূত বালক রাম-লক্ষ্মণের 'ললিত' কলেবর এবং অনন্য-দুরানম' হরধনু,—এতদুভয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন[১]। মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি কেন আমার দুহিতার পরিণয়ে এই ধনুর্ভঙ্গ-পণ করিয়াছিলাম? আহা, বালকের কি মধুর আকৃতি! যদি ইহারা ধনুর্ভঙ্গ করিতে না পারে, তবে উপায়?' পবিত্র আকৃতির এমনই একটা ঐশী শক্তি যে, তাহার নিকট সকলকেই পরাজিত হইতে হয়। যাহা সুন্দর, তাহার জয় সর্ব্বত্র।

রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে সেই বিশাল হর-চাপ ভগ্ন করিলেন। সভাস্থ অপরাপর নৃপতি-বৃন্দ 'বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে' তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দৃঢ়কায় নৃপতি যে ধনু উত্তোলন করিতে না পারিয়া সলজ্জবদনে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই ধনু শিশু রামচন্দ্র ভগ্ন পর্য্যন্ত করিলেন, ইহাতে জনকের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি, যে ধনু-র্ভঙ্গ-পণের জন্য পূর্ব্বে অনুশোচনা করিয়াছিলেন, এইক্ষণ তাহারই আবার মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন—'এরূপ কঠোর পণ যদি না করিতাম, তবেত এমন জামাতা পাইতাম না[২]।

রামচন্দ্র বালক। এই বাল্যকালেই তিনি যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহা জগতে দুর্লভ। সূর্য্যবংশের অন্য কোন নরপতি, বাল্য

১—রঘু, ১১শ—৩৮—তস্য বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ পার্থিবঃ প্রথিত-বংশ-জন্মনঃ।
স্বং বিচিন্ত্য চ ধনুর্দুরানমং পীড়িতো দুহিতৃ-শুল্ক-সংস্থয়া॥

২—রঘু, ১১শ—৪৫, ৪৭।

ত দূরের কথা, যৌবনেও এমন বীরত্ব অতি কমই প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন। তাড়কা-বধ, যজ্ঞ-বিঘ্ন-কারী রাক্ষসদিগের নিধন এবং হরধনুর্ভঙ্গ —এই ঘটনাত্রয়ে শিশু রামচন্দ্র স্বকীয় অতুল বীরত্বের যে পরিচয় দিলেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইল। এই শিশু যৌবনে যে কীদৃশ শক্তি-সম্পন্ন হইবে, এই চিন্তায় অপরাপর নৃপতিগণ একটু ম্লান হইলেন।

জনক প্রসন্ন-চিত্তে রামচন্দ্রের হস্তে সীতা-সম্প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ জানকীর কনিষ্ঠা, জনকের ঔরসী-কন্যা উর্ম্মিলার পাণিপীড়ন করিলেন। ভরত এবং শত্রুঘ্ন পূর্ব্বেই দশরথের সহিত মিথিলায় আনীত হইয়াছিলেন, তাহাদের করে যথাক্রমে কুশধ্বজ-দুহিতা মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি অর্পিত হইলেন। দশরথ আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে, পুত্র-পুত্রবধূগণের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী পরমবিক্রম পরশুরাম উপস্থিত হইয়া, ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "রাম! শুনিলাম জগতের অন্যান্য নৃপতি-গণ, মিথিলাপতির পণীকৃত যে ধনু উত্তোলন করিতেও পারেন নাই, তুমি নাকি সেই মহাধনু হাসিতে হাসিতে ভাঙ্গিয়াছ? এই কথা শ্রবণ করা অবধি, আমার মনে হইতেছে যে, এতদিনে আমার বীর্য্যরূপ উন্নত পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন ভগ্ন হইল। এতকাল জগতে 'রাম' বলিলে আমাকেই বুঝাইত, তোমার এই অভ্যুদয়ে, আজ হইতে সেই রামনামে তুমিই বোধিত হইবে,—এই কথা ভাবিতেও আমার লজ্জা জন্মে। অতএব, আমার এমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি তাহার শৈশবেই নিধন করিব[১]।" ক্রমে উভয়ে বিষম যুদ্ধ বাধিল। প্রৌঢ় দশরথ, ক্ষত্রিয়-কুল-ধূম-কেতু ভার্গবের অতীত বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করিয়া

১—রঘু, ১১শ—৭২—মৈথিলস্য ধনুরন্য-পার্থিবৈঃ ত্বং কিলানমিতপূর্ব্বমক্ষণোঃ।
তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে বীর্য্য-শৃঙ্গমিব ভগ্নমাত্মনঃ॥
৭৩—অন্যদা জগতি রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চরিত এব মামগাৎ।
ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি ব্যস্তবৃত্তিরুদয়োন্মুখে ত্বয়ি॥

মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি বড় আহ্লাদ করিয়া, জ্যেষ্ঠ তনয়ের 'রাম' এই নাম রাখিয়াছিলেন। আজ ভাবিতেছেন যে, অন্য নামও ত অনেক ছিল, তবে আমি কেন আমার পুত্রের 'রাম' নাম রাখিলাম১? কিন্তু অচিরেই রামচন্দ্র বিজয়ী হইলেন। তিনি পরাজিত পরশুরামকে ক্ষমা করিলেন। পরশুরামও রামের অনুগ্রহে চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। কবি, রামের চরিত্র-রূপ সমুন্নত সৌধের আর একটি কক্ষ যেন খুলিয়া দিলেন। সামান্য শত্রু নয়, যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, তাদৃশ মহাবল-সম্পন্ন শত্রুকেও ক্ষত্রিয়-কুল-ভূষণ রাম ক্ষমা করিলেন, ইহাতে বীরত্ব অপেক্ষা রাম-হৃদের মহনীয়ত্বই সমধিক প্রকাশিত হইল। রামের সমস্তই যেন অদ্ভুত—আশ্চর্য্যপূর্ণ। তাঁহার যেমন শৌর্য্য তেমনই গাম্ভীর্য্য, যেমন উৎসাহ তেমনই ক্ষমা, সবই অলৌকিক।

কতিপয় দিনের মধ্যেই দশরথ, পুত্র-পুত্রবধূগণের সহিত অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। রাজলক্ষ্মীরূপিণী বধূদিগের রাজধানী প্রবেশে অযোধ্যায় যেন আনন্দের হাট বসিল। এত আনন্দ, এত সুখ অযোধ্যায় বুঝি আর কখনও হয় নাই। প্রজাকুল পরমোৎসাহে রাজপুত্র রামচন্দ্রের বিজয়-গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশের একাদশ সর্গে, রামচরিত্রে প্রকাণ্ডত্ব, কোমলত্ব এবং তেজস্বিত্বের সহিত মধুরত্বের সমাবেশ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাঠকদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন।

১—রঘু, ১১শ—৬৮।

—০—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বনবাস।

দিনে দিনে রামচন্দ্রের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। এ দিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথেরও ক্রমে বিষয়-ভোগে বিরক্তি জন্মিয়া আসিল। উষাকালের প্রদীপ-শিখার ন্যায়, তাঁহার নির্ব্বাণ ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। বার্দ্ধক্যাগমনের শ্বেত বৈজয়ন্তিকারূপে, প্রথমতঃ মানবের কর্ণমূলের কেশ পরিপক্ক হয়। দশরথেরও তাহাই হইল। অথবা—

তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্থতামিতি।
কৈকেয়ী-শঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা[১]॥

প্রগল্ভা রাজ্ঞী কৈকেয়ীর ভয়ে, বুঝি জরা বৃদ্ধ মহারাজের কর্ণমূলে আসিয়া গোপনে বলিল যে, 'আর কেন? রামচন্দ্রের হস্তে রাজ-লক্ষ্মীকে অর্পণ কর।' কিয়ৎকাল পরেই কৈকেয়ীর যে মর্ম্মচ্ছেদিনী ক্রিয়া দর্শন করিতে হইবে, কবি, পূর্ব্ব হইতেই তজ্জন্য, পাঠকদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের উপর প্রৌঢ়া কৈকেয়ীর আধিপত্যও যে কত দূর, তাহাও অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিয়া গেলেন।

উপযুক্ত সময় ভাবিয়া, দশরথ রামের যৌব-রাজ্যাভিষেকে অভিলাষ করিলেন। এই সুখ-সংবাদ ক্ষণমধ্যে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল। রাজ্যের সমগ্র অধিবাসী প্রজা-হৃদয়-রঞ্জন রামের এই অভ্যুদয়-শ্রবণে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। অযোধ্যার অপ্রতিরথ বীর রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসব যে ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত, প্রবীণ দশরথ তদনুরূপ আয়োজন করিলেন। সমস্ত প্রস্তুত। রাজধানীর বন, উপবন, প্রাসাদ,

---

১—রঘু. ১২শ—২।

বীথিকা-বিপণি—সমস্ত সজ্জিত হইল। অযোধ্যায় এত আনন্দ কেহ কদাচ দেখে নাই। দীপালোকে অযোধ্যানগরী রাকা-রজনীর ন্যায় হাসিতে লাগিল। কাল তাহার রাম রাজা হইবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। 'ক্রূর-নিশ্চয়া' কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম নির্ব্বাসিত হইলেন। বিমাতা কৈকেয়ী রাহুর আকার ধারণ করিয়া, যেন অযোধ্যার শারদ-পূর্ণ-শশীকে অতর্কিতভাবে গ্রাস করিল[১]। অকস্মাৎ সমগ্র কোশলরাজ্য বিষাদের 'সূচি-ভেদ্য' অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইল। কাল রাজা হইবেন—বলিয়া, যিনি, অধিবাস-দিবসীয় মঙ্গল ক্ষৌমাদি ধারণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি বনবাসোচিত বল্কলাদি পরিধান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কোন ভাবান্তর ঘটিল না। রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন—ভাবিয়া, যেমন রাম অতি প্রসন্ন হয়েন নাই, বনবাসী হইবেন—ভাবিয়া তেমনই তিনি অতি অপ্রসন্নও হইলেন না। রামের সমস্তই অদ্ভুত[২]! তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে মাতাপিতৃ-চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বনবাসের জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সাধ্বী জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অযোধ্যার যেন জীবন চলিয়া গেল। সোণার অযোধ্যা মৃতদেহের ন্যায় হত-শ্রী হইয়া পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ পুত্র-শোকের গুরুভার সহ্য করিতে পারিলেন না। জন্মের মত নয়ন-মুদ্রণ করিয়া, কৈকেয়ীর হস্ত হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিলেন[৩]।

১—রঘু, ১২শ—৪।

২—রঘু, ১২শ—৭—পিত্রা দত্তাং রুদন্ রামঃ প্রাঙ্মহীং প্রত্যপদ্যত।
পশ্চাদ্ বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোঽগ্রহীৎ॥
৮—দধতো মঙ্গলক্ষৌমে বসানস্য চ বল্কলে।
দদৃশুর্ব্বিস্মিতাস্তস্য মুখরাগং সমং জনাঃ।

৩—রঘু, ১২শ—১০।

দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্র-শোকাৎ
অন্ত্যে বয়স্যহমিব[১] ॥

বলিয়া, পুত্র-শোক-কাতর মুমূর্ষু অন্ধমুনি দশরথকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, এতদিনে সেই—ব্রহ্মশাপ সফল হইল। অযোধ্যায় মহা অরাজক উপস্থিত হইল। ছিদ্রান্বেষী প্রতি-পক্ষ নৃপতিগণ অবসর বুঝিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে, অযোধ্যারাজ্যের সুখ-সম্পদ্ স্বপ্নের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল !

কবিগুরু বাল্মীকি এই সকল স্থলে, শোকের যে সমুদয় অপ্রতিম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। রামের বনগমন-সময়ে, সীতা, অনুগামিনী হইবেন বলিয়া, রামচন্দ্রকে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা এতই করুণ, যে পাঠ করা যায় না। যখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, প্রজাবৃন্দ, তাঁহাদিগকে কিয়দ্দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া, রোদন করিতে করিতে রাম-শূন্য অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল, তখনকার চিত্র দর্শন করিলে পাষাণও বিগলিত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বুঝি শতধা বিদীর্ণ হয়। কবিকুলপতি কালিদাস দেখিলেন যে, না,—বাল্মীকি-বর্ণিত ঐ সকল অনুপম চিত্রের আর পুনশ্চিত্রণের আবশ্যকতা নাই, আর উহা অতি দুষ্করও বটে;—তাই তিনি মাত্র দুই তিনটি শ্লোকে, রামায়ণের প্রায় ৫।৭টি অধ্যায় বিবৃত করিলেন। বাল্মীকির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন না।

সংসারে স্বার্থের করাল-ছায়া-পাত হইলে, তাহার পরিণাম যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়, কবি তাহা বর্ণে বর্ণে বুঝাইয়া দিলেন। কৈকেয়ী ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইবার আশায় রামকে নির্ব্বাসিত করিলেন,

১—রঘু, ৯ম—৭৯।—আমার ন্যায় তুমিও বৃদ্ধ বয়সে দুঃসহ পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিবে।

মহাপাপ সঞ্চয় করিলেন। ভরত 'রাজ্য-তৃষ্ণা-পরাঙ্মুখ' হইয়া জননী-কৃত সেই মহাপাপের যেন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অপরাধিনী কৈকেয়ী পুত্রের এই দেবোচিত ব্যবহারে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন।

নির্ব্বাসিত রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত, অযোধ্যা ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। নির্জ্জন বনে, তাঁহারা তিনজনে, পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, বন্য ফলমূলের দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ প্রশমন করেন। এই ভাবে যৌবনেই তাঁহারা বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুগণের কুলব্রত বানপ্রস্থ আশ্রয়-পূর্ব্বক, দিনপাত করিতে লাগিলেন। রাজ-পুত্র রামচন্দ্র যখন আতপ-তাপে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন বনস্পতির ছায়ায় কখনো উপবেশন করেন, কখনো বা বন-চারিণী মিথিলা-রাজ-নন্দিনীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন-পূর্ব্বক অবসন্ন-দেহে ঘুমাইয়া পড়েন[১]। সমস্ত দিন বনপর্য্যটনের পর, সায়ংকালে সৌর-কুল বধূ জানকী যখন আর চলিতে পারেন না, তখন হয়ত, কোন মহীরুহের মূলে, রাম উপবিষ্ট হয়েন, এবং পরিশ্রমালসা সীতা রামের উরুদেশে মস্তক স্থাপিত করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন, আর সুশীল লক্ষ্মণ, সমস্ত রাত্রি ধনুর্ব্বাণ করে লইয়া, প্রহরীর ন্যায়, রামসীতার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এইভাবে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। বনবাসে তাঁহাদের যেন কোনই কষ্ট নাই। বিশেষতঃ রাম,—সম্পদ্, বিপদ্—সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাব, অবিচলিত। তাঁহার উদার বলিষ্ঠ হৃদয় সর্ব্বদাই সাগর-বক্ষের ন্যায় প্রশান্ত।

রাম বনে প্রস্থান করিবার কিছু দিন পরেই ভরত সসৈন্যে রামের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বাসনা, একবার প্রাণান্ত যত্ন করিবেন, যদি কোন মতে রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিতে পারেন। রাম এক এক

১—রঘু, ১৩শ—৩৫—অত্রানুগোদং মৃগয়া-নিবৃত্তস্তরঙ্গ-বাতেন বিনীত-খেদঃ।
রহস্তদুৎসঙ্গ-নিষণ্ণ-মূর্দ্ধা স্মরামি বানীর-গৃহেষু সুপ্তঃ॥

রজনী, এক একটি বৃক্ষের তলে কাটাইতে কাটাইতে চলিয়াছেন, আর ভরত দূরে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ, রামের অনুসরণ-পূর্ব্বক, সেই সেই তরুর নীচে যাইয়া, রামাদির পরিত্যক্ত পর্ণশয্যা প্রভৃতি দর্শন করিয়া কান্দিয়া, বিলাপ করিয়া, বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন[১]। এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রোরুদ্যমান ভরতকে দেখিয়া বীর-হৃদয় রঘূত্তমও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃবৎসল রামের প্রাণ ভরতের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। সে যাত্রায়, রাম কত প্রয়াসে, ভরতকে ফিরাইয়া দিলেন। 'আবার যদি ভরত আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তবেই ঘোর বিপদ্'—এই ভাবিয়া, রাম দূরে, অনেক দূরে, যে স্থান অযোধ্যার লোকের অগম্য, তথায় যাইবার মানসে, 'চিত্রকূটস্থলী' পরিত্যাগ করিলেন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ যখন প্রকৃতির প্রিয় বসতি চিত্রকূট ত্যাগ করেন, তখন তত্রত্য হরিণ-হরিণীগণ পর্য্যন্তও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল[২]। রাম-হৃদয়ের সম্মোহন আকর্ষণে বনের পশুপক্ষি-গণেরও চিত্ত বিচলিত হইল। কিন্তু অযোধ্যার মহারাণী কৈকেয়ী অবিচলিতা।

রাম ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আর বল্কল-বসনা জনক-তনয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন: যেন কৈকেয়ী-কর্তৃক প্রতিষিদ্ধা হইয়াও গুণানুরাগিণী অযোধ্যা-রাজলক্ষ্মী রামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন[৩]। এই ভাবে তাঁহারা মহর্ষি অত্রির আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, অত্রি পত্নী অনুসূয়া আসিয়া নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যে, মনের সাধ পুরাইয়া সীতার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন। জানকী-দেহের 'পুণ্য গন্ধে' সমস্ত তপোবন আমোদিত হইল। কুসুম-নিষণ্ণ ভ্রমর-পঙ্ক্তি, চঞ্চলচিত্তে কুসুম-গুচ্ছ হইতে সীতার দেহের দিকে ধাবিত হইল[৪]। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে তাঁহারা পঞ্চবটী বনে উপনীত হইলেন।

১—রঘু, ১২—১৪। ২—রঘু, ১২—২৪।
৩—রঘু, ১২—২৬। ৪—রঘু, ১২—২৭।

দুষ্টা ব্যাঘ্রী যেমন নিদাঘতাপে অত্যন্ত উত্তাপিত হইয়া চন্দন বৃক্ষের সন্নিকটে যায়, তদ্রূপ, পঞ্চবটীবাসিনী, কলুষিতহৃদয়া শূর্পণখা রামের নিকটবর্ত্তিনী হইল। রাম এবং শূর্পণখার উক্তি প্রত্যুক্তি-শ্রবণে জানকী ঈষৎ হাস্য করিলেন। ইহাতেই পাপিনী রাবণানুজা ক্রোধপরবশ-চিত্তে অকস্মাৎ নিজের বিকট-মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিল। তাহার সেই ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে, ভীত হইয়া মৈথিলী রামের অঙ্কে মুখ লুক্কায়িত করিলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে রমণী কোকিলার ন্যায় মঞ্জুবাদিনী ছিল, হঠাৎ তাহার এই প্রকার রূপ, আর এবংবিধ গুহাবিদারী কণ্ঠস্বর! লক্ষ্মণের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি কর্ণাদিচ্ছেদন-পূর্ব্বক সেই পাপিনীর আতিথ্য করিলেন[১]। শান্ত দণ্ডকারণ্যে সহসা যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। শূর্পণখার রক্ষক-রূপী রাক্ষসগণের সহিত বিষম যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে, রামের নিশিত-শায়কে খর-ত্রিশিরঃ প্রভৃতি প্রাণত্যাগ করিল। তখন হতভাগিনী শূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের নিকটে যাইয়া আদ্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিল। ক্রোধে লঙ্কাধিপতির বিশাল-বপুঃ কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, যেন কেহ আসিয়া তাঁহার দশটি মস্তকেই যুগপৎ পদাঘাত করিল[২]। তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইল। আগ্নেয়-গিরির ন্যায় যেন অগ্ন্যুদগম করিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিকার-পরায়ণ হইয়া মায়ামৃগের ছলনা দ্বারা রামময়-জীবিতা জানকীকে হরণ করিলেন। লঙ্কায় রাক্ষস-কুল-রাজ-লক্ষ্মীও যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিলেন।

রাম রাজ-সিংহাসন উপেক্ষা করিয়া বনে আসিয়াও সীতার সংসর্গে সকল কষ্টই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্রে এবং সীতার পাতিব্রত্যে রামের সকল ক্লেশেরই এক প্রকার অবসান হইয়াছিল। রাজ্যাপেক্ষা বনবাসই যেন তাঁহার অধিকতর অভিপ্রেত হইয়া উঠিয়াছিল। সীতার ভক্তি-স্নেহ-পূর্ণ পরিচর্য্যায় রামের চিত্তে রাজ্য-পরিত্যাগ-জন্য কোন

১—রঘু, ১২—৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০। ২—রঘু, ১২—৫২।

দুঃখই কদাচ উদিত হইত না। নির্ম্মম রাক্ষস, অত্যাচারী রাক্ষস রামের সেই 'প্রিয়স্তোক-বাদিনী' 'অরণ্যবাস-প্রিয়সখী' জানকীকে হরণ করিল। বনবাসের সমস্ত দুঃখ,—সীতা মুখ দর্শনে এতদিন যে সমুদয় দুঃখক্লেশ রাম বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, সে সব যেন যুগপৎ উপস্থিত হইয়া, সীতা-বিচ্ছেদ-কাতর রামচন্দ্রকে আরও কাতরতর করিয়া তুলিল। আজ সীতাকে হারাইয়া রামের সেই সব কথা মনে পড়িল। যৌবরাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বদিনে, অধিবাসকালের সেই ক্ষৌম-বসন-ধারণ, আবার পরদিন প্রভাতে তাহা ত্যাগ করিয়া সেই বল্কল-পরিধান, সেই পুত্র-বিচ্ছেদ-বিধুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রার কাতরা আর্ত্তনাদ, বারংবার প্রতিষেধসত্ত্বেও পতিপ্রাণা জনক-তনয়ার সেই প্রবল অনুগমনেচ্ছা—সেই বাদ-প্রতিবাদ,—সমস্ত আজ রাম-হৃদয়ে যুগপৎ সমুদিত হইল।

বন-গমনে বার বার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, সজল-নয়নে সেই যে সীতা বলিয়াছিলেন—

> 'ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
> ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা'[১] ॥
> যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব!
> অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশ-কণ্টকান্[২]
> সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
> অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্' ॥

১—রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭শ সর্গ, শ্লোক ৬—রমণীর কি ইহকাল কি পরকালে পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই। কোন কালেই আত্মা, পিতা, মাতা, পুত্র কি সখীজন—কেহই তাহাদের আশ্রয় স্থান নহে।

২—ঐ, ঐ, শ্লোক—৭—হে রাঘব! যদি তুমি আজই দুর্গম গহন বনে প্রস্থান কর, তবে আমিও তোমার অগ্রে অগ্রে পথের কুশ কণ্টক প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে করিতে যাইব।

৩—ঐ, ঐ, শ্লোক—১২—হে দয়িত! আমি ত্রিলোকের সুখ বিস্মৃত হইয়া, কেবল

ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ! সমান-সুখ-দুঃখিনীম্[১] ॥

সেই সমস্ত কথাগুলি, আজ একটি একটি করিয়া রামের মনে জাগিতে লাগিল। রাম একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই—

মহাবাত-সমুদ্ধূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ! তন্মন্যে পরার্দ্ধ্যমিব চন্দনম্[২] ॥
শাদ্বলেষু যদা শিষ্যে বনান্তে বন-গোচরা।
কুশাস্তরণ-যুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ[৩] ॥
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ নাথ! ময়া সহ[৪] ॥

পাতিব্রতা-ধর্ম্ম-চিন্তা করিয়া, তোমার সহিত পরম সুখে বাস করিব। আমার পিতৃ-ভবনের ন্যায় গহন কাননও আমার পক্ষে অশেষ আনন্দ-দায়ক হইবে।

১—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯শ সর্গ, শ্লোক-২০। হে কাকুৎস্থ! আমি তোমাতে একান্ত ভক্তিমতী, আমি পতিব্রতা, দীনা তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। তুমি কেন তবে তোমার এই সমান-সুখ-দুঃখিনীকে সঙ্গে লইবে না? ভাবিয়া দেখ, তোমার ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

২—ঐ, ঐ, ৩০ সর্গ, শ্লোক ১০—হে হৃদয়রঞ্জন! মহাবায়ু-পরিচালিত রেণু দ্বারা আমার শরীর ধূসরীকৃত হইলেও, আমি মনে করিব যে, আমার অঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত হইল।

৩—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০শ সর্গ, শ্লোক ১৪—নাথ! তোমার সহচারিণী হইয়া বনে তৃণশয্যায় শয়ন করা, আর তোমাকে ছাড়িয়া, বিচিত্র আস্তরণ-যুক্ত শয্যায় শয়ন করা বল দেখি, ইহার কোনটি আমার অধিকতর প্রিয়?

৪—ঐ, ঐ, শ্লোক ১৮—হে দয়িত! তোমার সহিত বাস করাই আমার স্বর্গ, তোমার বিরহই আমার প্রত্যক্ষ নরক, আমার হৃদয়ের এ প্রীতি ত তোমার অবিদিত নহে, তবে কেন আমায় ব্যথা দাও? আমাকে লইয়া চল।

প্রভৃতি সীতার আর্ত্তনাদ-কাহিনী[১] স্মরণ করিয়া শূন্যহৃদয় রাম মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন, আর দীন-হৃদয় লক্ষ্মণ সাশ্রু-নয়নে অগ্রজের পরিচর্য্যায় রত হইলেন।

এদিকে পাপিষ্ঠ দশানন সাধ্বী জানকীকে লইয়া গিয়া, লঙ্কার অশোক উপবনে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সেই অশোকবনে, পরমদুঃখিনী সীতা, 'বিষবল্লী'-পরিবেষ্টিত সঞ্জীবনী লতিকার ন্যায় অত্যাচারিণী রাক্ষসীদিগের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া, দিবস-রজনী নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতেন[২]। রাবণ যখন সীতাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিবার নিমিত্ত, তাঁহার সম্মুখে মায়া-কল্পিত রাম-মূর্ত্তির শিরশ্ছেদ করিত, আর পতিগত-প্রাণা সীতা তদ্দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেন, তখন পাষণ্ডের আনন্দের আর অবধি থাকিত না। যখন সীতা-পক্ষপাতিনী রাক্ষসী ত্রিজটা বুঝাইয়া দিত যে, উহা বাস্তব রাম নহে, তখন সীতা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতেন যে, ত্রিজটার কথা শুনিবার পূর্ব্বেত ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমার আর্য্য-পুত্রেরই শিরশ্ছেদ হইল, হায়, এ ভাবনার পরও আমি জীবিত ছিলাম, ধিক্ আমার জীবনে!—এই ভাবিয়া তিনি লজ্জা এবং ঘৃণায় মনে মনে যেন মরিয়া যাইতেন[৩]। এইরূপে লঙ্কার অশোকবনে শোকার্ত্তা পতি-দেবতা সীতার দিন কাটিতে লাগিল।

রাম দারাপহারীর প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়া, দুস্তর-জলধি-বন্ধন-পূর্ব্বক, সদলবলে লঙ্কায় উপনীত হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সেরূপ সংগ্রাম বুঝি জগতে আর কখনও হয় নাই। মহাবলপরাক্রমশালী রাম, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার আজানুলম্বিত ভুজের সামর্থ্য প্রকাশ করিবার

১—ঐ, ঐ, শ্লোক ২২—ইতি সা শোক-সন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু।
চুক্রোশ পতিমায়ন্তা ভৃশমালিঙ্গ্য স-স্বরম্॥

২—রঘু, ১২শ—৬১—জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ।

৩—রঘু, ১২শ—৭৪, ৭৫।

উপযুক্ত কোন অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। মহাবল-পরাক্রমশালী রাবণও স্বীয় বাহুবল প্রকাশের প্রকৃতক্ষেত্র এতদিনে পান নাই। তাই আজ 'বীর-যুগল পরস্পরের বীরত্বে পরম আপ্যায়িত হইলেন'[১]।

রাবণ নিহত হইয়াছে। রাবণ দুর্ব্বুদ্ধি-বশে নিজে মজিল, সোণার লঙ্কা নগরীকেও মজাইল। সবংশে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। ভার্য্যাবমর্ষীর যথোচিত শাস্তি-বিধান-পূর্ব্বক, মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, অনল-পরিশুদ্ধা জানকীকে লইয়া, সানুজ রামচন্দ্র অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। দেব-যজন-সম্ভবা সীতার পাতিব্রত্যে সীতা-পতির কদাচ কোন প্রকার সংশয় জন্মে নাই। তিনি বিদিত ছিলেন যে, আকাশ-গাত্রে কলঙ্কস্পর্শ সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সীতা-চরিত্রে কলঙ্ক-লেশ-স্পর্শও অসম্ভব। তথাপি, লোক-রঞ্জন রঘু-শ্রেষ্ঠ, অনেক চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বাপর অনেক ভাবিয়া, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন। অনল-বিশুদ্ধ হেমের ন্যায় হেমপ্রভা সীতার দেহ-কান্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। অনেক দিন পরে, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে, অপহৃত রত্নের উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক, রাম অযোধ্যায় চলিয়াছেন[২]। যে অযোধ্যা হইতে একদিন রাম,—

'যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ-চক্রবর্ত্তী
সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী[৩] ॥'

১—রঘু, ১২—৮৭—অন্যোন্যদর্শন-প্রাপ্ত-বিক্রমাবসরং চিরাত্।
রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবত্ ॥

২—রঘু, ১২—১ ৪।

৩—মহানাটক—যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা দূরে চলিয়া গেল। যাহা কখনো

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বন-যাত্রা করিয়াছিলেন, আজ সেই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সেই হর-ধনুর্ভঙ্গ-বিজিতা পতিপ্রাণা সীতাকে লইয়া, দুরন্ত রাবণের শক্তিশেলে আহত-পুনরুজ্জীবিত লক্ষ্মণকে লইয়া, আর যাঁহারা যাঁহারা, তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বীভূতা সীতার উদ্ধারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, সেই সকল কপি-রাক্ষসদিগকে লইয়া, রাম পরম আনন্দে অযোধ্যায় চলিয়াছেন।

স্বপ্নেও ভাবি নাই, অকস্মাৎ তাহাই আজ উপনত হইল। যে আমি কাল প্রাতঃকালে বসুধার একচ্ছত্র সম্রাট্ হইব, সেই আমি আজ জটাবল্কল পরিধান করিয়া বন যাত্রা করিতেছি, অদৃষ্ট-চক্রের কি বিচিত্র গতি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

আকাশপথে।

রামের হৃদয় আজ বড়ই উৎফুল্ল। জীবনের শান্তি-প্রতিমাকে, সংসারের প্রধান আকর্ষণকে হারাইয়া, রাম বড় যাতনাতেই ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃ ধারা-যন্ত্রের ন্যায় শতচ্ছিদ্র—জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছিল। আজ অনেক কষ্টের পর, অনেক সাধ্যসাধনার পর, আবার রামচন্দ্র সেই প্রনষ্ট প্রতিমার পুনর্দ্দর্শন পাইয়াছেন। রামের হৃদয় আনন্দে, আকাঙ্ক্ষায়, আবেশে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্মভূমি প্রিয় অযোধ্যা—এক দিন সীতার সহিত কান্দিতে কান্দিতে যাহাকে ছাড়িয়াছিলেন, আজ আবার হাসিতে হাসিতে সেই সীতার সহিত সেই অযোধ্যায় চলিয়াছেন। রামের অপার আনন্দ! আর আনন্দময়ী বাগ্‌দেবতার বরপুত্র মহাকবি কালিদাস, তাঁহার বিশ্বমোহিনী কল্পনা-বীণা বাদন করিতে করিতে, যেন সেই দেব-দম্পতির অনুসরণ পূর্ব্বক, কবিতারূপী লাজ-কুসুমাঞ্জলি বিকীর্ণ করিতেছেন।

সীতার সহিত পুষ্পক-রথে আরোহণ পূর্ব্বক, রাম শান্ত আকাশ পথে চলিয়াছেন। জগতের অনেক ঊর্দ্ধে—অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। রাম-সীতার চরিত্র, রাম-সীতার প্রণয়, রাম-সীতার হৃদয় জগতের অনেক ঊর্দ্ধের বস্তু। মর্ত্তের কোন মলিন বাসনায় বা মলিন ভাবনায় সে স্বর্গীয় বস্তু কলুষিত নহে। তাই তাঁহারা জগতের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া যাইতেছেন। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের নীচে, অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর উষ্ণ সমীরণ সে শান্ত আকাশের তত দূরে উঠিতেই পারে না। দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন, ইহাই জগতের নিয়ম। রাম জীবনের সেই সুখের দিন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে সীতার সহিত কাটাইয়াছেন।

অকস্মাৎ—সেই সুখের দিনের মধ্যাহ্নেই দৈবদুর্যোগে, গাঢ় তমস্বিনী নিশা আসিয়াছিল, তাই কত কষ্টে, কত লাঞ্ছনায় এই সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল বনে বনে বিষাদ-রজনী যাপন করিয়াছেন। আজ আবার মধুর প্রভাতের অরুণরাগ হাসিয়া উঠিয়াছে। রাম সুখের দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

পতি-দেবতা সীতা শত নিষেধ সত্ত্বেও রামের ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া, উন্মাদিনী হইয়া পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন; সুবর্ণ-মৃগের কুহকে বিমূঢ় হইয়া, জীবিতেশ্বরকে মৃগানুসরণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; পাপিষ্ঠ রাক্ষস তাহাকে কোথায়—কোন সাগর-পারে হরণ করিয়া লইয়া গেল! আর পতি-মুখ-দর্শনের আশাও ছিল না। নিজের দোষে নিজেই বিপৎ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন। তিনি সেই অশোককাননে বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন, আর নিজের দুর্ভাগ্যস্মরণ করিয়া, নিজকেই ধিক্কার দিতেন। পিতা জনক ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়া, যে রত্নাহার জানকীর কণ্ঠে পরাইয়াছিলেন, স্বদোষে জানকী তাহা হারাইয়াছেন। তাঁহার আর দুঃখের অবধি ছিল না। দীর্ঘকাল পরে, তাঁহার সেই চিরধ্যাত হৃদয়েশ্বরের সহিত সীতা মিলিত হইয়াছেন। সেই কল্পনাতীত, আশাতীত, প্রনষ্ট হৃদয়রত্নের সহিত পুনঃসঙ্গত হইয়াছেন, আজ সীতার পরম আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—যাহা কাল তাঁহার নয়নে রুক্ষ 'জীর্ণ অরণ্যবৎ' ভীষণ শ্মশানবৎ, গত-জীবিত শবদেহবৎ প্রতীয়মান হইত, আজ সেই জগৎ নূতন—অনন্ত-সৌন্দর্য্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। কেমন যেন একটা স্বপ্নময়, মোহময়, আবেশময় ভাবে আজ স্থাবর জঙ্গম জগৎ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আর সেই জগতের নবীন সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে জগদ্ধাত্রীরূপিণী সীতাও যেন কেমন আজ স্বপ্নময়ী, মোহময়ী, আবেশময়ী হইয়া পড়িয়াছেন। চির-সুন্দর রাম, স্বয়ং তাঁহাকে একটি একটি করিয়া অধোবর্ত্তিনী সুন্দরী পৃথিবীর অনুপম শোভা দেখাইতেছেন। সেই

বনবাস কালে, দুইজনে মিলিয়া যে স্থানে বসিতেন, যে স্থানে নিদ্রা যাইতেন, যে স্থানে সীতার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া রাম, এবং কখনো বা রামের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া সীতা শ্রান্তি-বিনোদন করিতেন, সেই সব আজ সীতাপতি সীতাকে দেখাইতেছেন। সীতা দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে মজিতেছেন, একেবারে আত্মহারা হইতেছেন। পৃথিবীর আজ সকলই সুন্দর। বিশ্বনাথ যেন তাঁহার সৌন্দর্য্যের অক্ষয়-ভাণ্ডার খুলিয়া আজ বিশ্বেশ্বরীকে দেখাইতেছেন, আর বিশ্বেশ্বরী আনন্দ-পারিপ্লব-হৃদয়ে, সেই শোভা দেখিতে দেখিতে সুখ-তন্দ্রায় নিমীলিতাক্ষী হইয়া পড়িতেছেন। এমন সুন্দর ছবি আর আছে কি?

যে জন্য মনুষ্য-দেহ ধারণ, এই পঙ্কিল সংসার ক্ষেত্রের কণ্টকময় পথে বিচরণ, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; ত্রিজগতের পরম শত্রু, দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারীর শাস্তি-বিধান হইয়াছে। ইন্দ্রাদিদেবতাবৃন্দের ম্লানমুখে আবার প্রসাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, জগতের একটা প্রধান কার্য্য—দেবদানব-গন্ধর্ব্বেরও অসাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাই রামের আজ অপার আনন্দ! তিনি নারায়ণের পূর্ণ অবতার, আর স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা-রূপে অবতীর্ণা, সম্মিলিত লক্ষ্মী-নারায়ণ আজ পুষ্পকরথে উঠিয়া ঊর্দ্ধে আকাশ-পথে, নিম্নস্থ পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন, তুচ্ছ জড়-জগতের অনেক ঊর্দ্ধ দিয়া নক্ষত্র-বেগে চলিয়াছেন, আর সমস্ত জড় জগৎ তাঁহাদের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে; না—না, নিম্নে থাকিয়া যাহার যতটুকু ক্ষমতা, জড় জগতের তাবৎ পদার্থ রাম সীতার পরিচর্য্যা করিতেছে। কোথাও পর্ব্বতের নিতম্বে ঘননীল পয়োদ-মালা নর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছে। কোথাও আকাশে, সারস-পক্ষিগণ, চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে বিমানের সমীপবর্ত্তী হইয়া, যেন শূন্যে তোরণ সাজাইয়া রাম-সীতার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। কোথাও গিরি-নির্ঝর-ধ্বনি গহ্বরে গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, যেন বিজয়-দুন্দুভি-দ্বারা রাম-সীতার

পুনরাগমন-সংবাদ ঘোষিত করিতেছে। এইরূপে, সমস্ত জড়-জগৎ আজ সচ্চিদানন্দ রাম-সীতার সেবা করিবার নিমিত্ত, প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত, যেন চৈতন্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মহত্তের সংসর্গে আজ জড়ের জড়ত্ব দূর হইয়াছে। পাতাল হইতে 'নবকন্দলী' উঠিয়াছে, পৃথিবী হইতে সমুদ্র-নদ-নদী-গিরি-বন-উপবন,—কোথাও হরিণ-হরিণী, কোথাও মৎস্য-জলহস্তী-ভুজঙ্গ, কোথাও বা 'স্তবকাভি-নম্র' লতাকুঞ্জ, যেখানে যে যেমন পারিতেছে, রাম সীতার হৃদয়রঞ্জনে তৎপর হইয়াছে। আকাশে কখনো মেঘ, কখনো বিদ্যুৎ, কখনো বা মলয় পবন আসিয়া রাম-সীতার শুশ্রূষা করিতেছে। চরাচর জগৎ আজ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। রাবণ বধ হইয়াছে, সীতার উদ্ধার হইয়াছে, জগতের আতঙ্ক-নিবৃত্তি হইয়াছে। তাই সর্ব্বত্রই আনন্দের উচ্ছ্বাস।

সীতা—মিথিলা-পতি রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক-দুহিতা সীতা যেমন রামের হৃদয়ের অধিদেবতা, তেমন জগতেরও পরম আরাধ্য-দেবতা। সীতার সম্পর্কে কেবল রামের সংসার নহে, অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ নহে,—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও পবিত্র এবং আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও কেবল রামের হৃদয়ে নহে, অযোধ্যার বা মিথিলার রাজ-সংসারে নহে, সমগ্র ভারতে, না—না, সমগ্র জগতে দুঃখের, শোকের, বিষাদের প্রবল ঝটিকা বহিয়াছিল। সেই সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন হইয়াছে, তাই এই মিলনের দিনে, চেতনাচেতন-নির্ব্বিশেষে সকলেই আনন্দে উন্মত্ত-প্রায়। নারীকুল-দেবতা অনল-বিশুদ্ধা সীতা আজ ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই অতিশয়িত আনন্দ-নির্ভরে সমস্ত পৃথিবী যেন রোমাঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যের একটা প্রবাহ বহিয়াছে। আর কবির কবি কালিদাস, সেই চৈতন্যের সহিত, তাহার চিরচৈতন্যময়ী কল্পনাকে উন্মাদিনী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলিত হইলে জগৎ যে কত সুন্দর দেখায়, তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সমস্ত জগৎকে যেন একটা স্বপ্নময়—আবেশময় ভাবে বিভোর করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতীর প্রিয়পুত্রের অনুগ্রহে, আমরাও যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব আবেশময় ভাবে বিমুগ্ধ হইতেছি। কি সুন্দর চিত্র!

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

রাম-সীতার পুনর্ম্মিলন হইয়াছে। সূর্য্যবংশের অসূর্য্যম্পশ্যা কুল-লক্ষ্মীকে পাপিষ্ঠ শত্রু হরণ করিয়া, নিৰ্ম্মলকুলে কলঙ্কলেপন করিয়াছিল, সে কলঙ্ক ক্ষালিত হইয়াছে। বহু কাল পরে সম্মিলিত রাম-সীতা আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া—এক-প্রাণ হইয়া আকাশ-যানে চলিয়াছেন। কখন বিদ্যুৎ-বিলসিত মেঘের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে, কখন অমৃত-শীকর-বর্ষী মেঘের অধোদেশে আনন্দ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে, কখন বা, মেঘ যতদূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহারও ঊর্দ্ধদেশে, শান্তগগনের প্রশান্ত গম্ভীর উৎসঙ্গতলে বসিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতে হইতে দেব-দম্পতি চলিয়াছেন। দূর আকাশ পৃষ্ঠ হইতে, অধোদেশে—অতিদূরে সমুদ্রের নীলকান্তি দেখা যাইতেছে। সীতা উদ্ধারের জন্য দুস্তর সাগরে যে সেতু-বন্ধন করিতে হইয়াছিল, সেই সেতু দেখা যাইতেছে। সেই সেতু-গাত্রে আহত হইয়া, সমুদ্রের জলরাশি অনন্ত ফেনপুঞ্জ উদ্‌গিরণ করিতেছে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! শরতের মধুর রজনীতে সুনীল আকাশে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র-রাশি উদিত হয়, এবং সেই নক্ষত্রাবলীর মধ্যভাগে লম্বমান ছায়াপথ শোভা পায়, আজ সেতুবদ্ধ সমুদ্রেরও ঠিক তদ্রূপ শোভা জন্মিয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ ব্যক্তির চক্ষে শারদ গগন যেমন সুন্দর, আজ আকাশ-বিহারী রামের নয়নে অধোদেশ-বর্ত্তী সুনীল অম্বুরাশিও তদ্রূপ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে[১]। 'গুণজ্ঞ' রাম প্রাণ ভরিয়া সমুদ্রের এই অনির্ব্বাচ্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহার

১—রঘু, ১৩শ—২—বৈদেহি। পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়া-পথেনেব শরৎ-প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত-চারুতারম্।

প্রাণাধিকা বৈদেহীকেও দেখাইতেছেন। সীতা-উদ্ধারের জন্য রামকে সমুদ্র পর্য্যন্তও বন্ধন করিতে হইয়াছিল,—ভাবিয়া, সীতার অন্তঃকরণে, অনুরাগ, প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা—ইহাদের সম্মিলিত উৎস সহস্র-ধারে সমুত্থিত হইতেছে। কোথাও তরঙ্গ-ভরে নৃত্য করিতে করিতে তটিনী তটিনী-পতির সহিত সঙ্গত হইতেছে। কোথাও প্রবল-কায় তিমিঙ্গিল মৎস্যের রন্ধ্র-যুক্ত মস্তক হইতে সহস্র-ধারে জল উত্থিত হইতেছে, দেখিলে ধারা-যন্ত্র বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। কোথাও সমুদ্রের স্বচ্ছ-দর্পণ-সন্নিভ উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া, জল-হস্তী নক্র প্রভৃতি জন্তু উৎপতিত হইতেছে। কোথাও বা বেলা-পরিবাহী সুশীতল বায়ু পান করিবার আশায় ভুজঙ্গম-গণ নির্গত হইতেছে, 'সূর্য্যাংশু-সম্পর্কে' তাহাদের ইদ্ধ শিরোমণি-সমূহ যেন আরও সমিদ্ধতর হইয়াছে। প্রিয়দর্শন রাম, একটি একটি করিয়া, এই সমস্ত প্রিয়-দর্শনা জানকীকে দেখাইতেছেন[১]। সীতা দেখিতেছেন,—একবার সুন্দর সমুদ্রের দিকে চাহিতেছেন, আবার চির-সুন্দর রামের দিকে চাহিতেছেন। শ্যামল-কান্তি সমুদ্রের শোভায় সীতার নয়ন-মন আকৃষ্ট হইতেছে, আর নব দূর্ব্বা-দল-শ্যাম রামের প্রফুল্ল-কান্তি দর্শনে সীতার অতৃপ্ত-নয়নের আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। জল-পান করিবার জন্য মেঘ যেমন সমুদ্রবক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে, অমনি ভীষণ আবর্ত্তের বেগে মেঘও আবর্ত্তিত হইতেছে, দেখিলেই মনে হয়, বুঝি জলদাভ পর্ব্বতের দ্বারা জলধি পুনরায় প্রমথিত হইতেছে। রাম দেখিতেছেন, দেখাইতেছেন[২]।

দূর আকাশ হইতে, ভূ-পৃষ্ঠে একটি কাল রেখার ন্যায় সমুদ্রের 'তরুরাজি-নীলা' বেলা-ভূমি দেখা যাইতেছে, দূরে—ভূ-লগ্ন আকাশ-গাত্রে যেন কেহ একটি মলিন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, গাম্ভীর্য্য এবং

১—রঘু, ১৩শ—৯, ১০, ১১, ১২।

২—রঘু, ১৩শ—১৪।

মাধুর্য্যের সমাবেশে সে সৌন্দর্য্য অপ্রতিম, রাম দেখিতেছেন, আত্ম-বিহ্বল হইয়া তাঁহার সীতাকেও দেখাইতেছেন[১]।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা, বিমান-পথে প্রায় সমুদ্র পার হইয়া বেলাভূমির[১] নিকটবর্ত্তী হইলেন। বেলা-বর্ত্তিনী কেতক-বীথিকা হইতে পরাগ আনিয়া শীকর-বাহী বায়ু, আয়তাক্ষী জানকীর মুখে লেপন করিয়া দিল[২]। যেন বন-দেবতাগণ অনল-পরীক্ষিতা জানকীকে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। রাম অনিমেষ-নয়নে, সেই পরাগ-পাণ্ডুরা সীতা-মুখচ্ছবি দর্শন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে পুষ্পক, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-মুক্তা-খচিত, 'ফলাবর্জ্জিত-পূগ-মাল' সমুদ্রকূলে উপনীত হইল। বিমানের অতিশয়-ত্বরিত-গতি-নিবন্ধন মনে হইল, যেন 'সকাননা' পৃথিবী দূরস্থিত জলধি-প্রান্ত হইতে ক্রমে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। সে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ যাবৎ সীতা পুষ্পকের পুরোবর্ত্তিনী শোভাই দেখিতেছিলেন; অকস্মাৎ রাম, পশ্চাদ্ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যখন পৃথিবীর এই সমুদ্র-নিষ্ক্রমণ-শোভা দর্শন করিলেন, তখন অমনি, 'এমন সুন্দর ছবি সীতাকে দেখান হইল না'—ভাবিয়া কহিলেন,—

> **কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু! পশ্চান্**
> **মার্গে মৃগ-প্রেক্ষিণি! দৃষ্টি-পাতম্।**
> **এষা বিদূরী-ভবতঃ সমুদ্রাৎ**
> **সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ[৩] ॥**

সীতা বিমুগ্ধ-নেত্রে রাম-প্রদর্শিত শোভা দেখিতে লাগিলেন।

১—রঘু, ১৩—১৫—দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী তমাল-তালী-বন-রাজি-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্ক লেখা॥

২—রঘু, ১৩—১৬—বেলানিলঃ কেতক-রেণুভিস্তে সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি।

৩—রঘু, ১৩—১৮।

কনক-কান্তি মৈথিলী কখনো কৌতূহল বশতঃ পুষ্পকের বাতায়ন-পথে, তাঁহার মৃণাল-কল্প কর দোলাইয়া মেঘ স্পর্শ করিতে যান, আর অমনি মেঘেরও বিদ্যুৎ বিলসিত হয়, তদ্দর্শনে রাম আনন্দ-বিহ্বল হইয়া বলেন—'সীতে! ঐ দেখ, মেঘ তোমার হস্তে বিদ্যুতের বলয় পরাইতে আসিতেছে'[১]।

মনোরথ-গতি পুষ্পক-রথ দেখিতে দেখিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল! নিম্ন-দেশে দণ্ডকারণ্যের সেই জনস্থান, যে স্থানে সীতার সহিত রাম অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন, যে স্থানে সুবর্ণমৃগের লোভে জানকী রামকে গহন অরণ্যে পাঠাইয়াছিলেন, যে স্থানে দুরন্ত রাক্ষস অতিথিচ্ছলে আসিয়া জানকীকে হরণ করিয়া লইয়াছিল—সেই জনস্থান! জনস্থানের আর এখন সে দিন নাই; বনবাস-কালে, রামচন্দ্র, তত্রত্য তাবদ্ বিঘ্নভূত রাক্ষস-দিগকে নিহত করিয়াছেন। জনস্থান এখন একপ্রকার বিঘ্নশূন্য। তাই পূর্ব্বে যে সকল তপস্বিগণ আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, 'নিরুপদ্রব' ভাবিয়া তাঁহারা আবার জনস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, নূতন নূতন পর্ণশালা রচনা করিয়াছেন। 'জনস্থান' সত্যই এখন জন-স্থান হইয়াছে[২]। সেই পূর্ব্ব-পরিচিত জনস্থানের ঊর্দ্ধভাগে আসিয়া যখন পুষ্পক উপস্থিত হইল, তখন করুণাময় রামের হৃদয়ের কবাট যেন সহসা খুলিয়া গেল। সেই সমস্ত একে একে, তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল! সেই সীতার অঙ্কে মস্তক-স্থাপন-পূর্ব্বক স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় নিদ্রা,—সেই সীতার সহিত পর্ব্বতের নির্ঝরে নির্ঝরে অভিষেক,—সেই বন-কুসুম-সুরভি কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ ও শীতল-শিলা-ফলকে উপবেশন,—সব মনে পড়িল। নদীতে সহসা 'বান' আসিলে

১—রঘু, ১৩—২১ করেণ বাতায়নলম্বিতেন স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি! কুতূহলিন্যা।
আমুক্তবীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে।

২—রঘু—১৩—২২।

যেমন নদীর জল স্ফীত হইতে হইতে তাহার উভয়কূল ভাসাইয়া ইতস্ততঃ বহিয়া যায়, তদ্রূপ, আজ জনস্থান দর্শনে রামের হৃদয়েও যেন পূর্ব্বস্মৃতির কূলপ্লাবিনী বন্যা উপস্থিত হইল। সে বন্যায় তাঁহার গভীর হৃদয় ভাসিয়া গেল। তিনি উন্মুক্ত চিত্তে সীতাকে জনস্থানের সেই সকল পূর্ব্বানুভূত স্থল-সমূহ দেখাইতে লাগিলেন। জনস্থানে রামের যেমন অনেক সুখের স্মৃতি বিদ্যমান, তেমন তাঁহার দুঃখময় জীবনের অনন্ত দুঃখের স্মৃতিও জনস্থানের প্রতি পর্ব্বতে, প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পল্লবে, প্রতি পত্রে বিরাজমান। মায়া-মৃগের ছলনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রাম যখন কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দেখিলেন যে তাঁহার সীতা নাই, তখন 'সীতে! সীতে!' বলিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে কত অন্বেষণ করিয়াছিলেন, 'কোথায় সীতে! কোথায় তুমি জনক-নন্দিনি!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তখন রামের দুঃখে বনের তরু লতা-পশু পক্ষী পর্য্যন্তও অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিল।

রাজ-সিংহাসন পরিহার করায় রামের কোনই কষ্ট হইয়াছিল না। পতিব্রতা সীতা এবং ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণের স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহারে তিনি সকল দুঃখেই একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাম সীতার সহিত পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে রাবণ সীতাকে হরণ করিল, রামের জনস্থান-স্বপ্নের অবসান হইল। সেই সময়ে যাহার জন্য যে স্থানে কত কাঁদিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে লইয়া সেই স্থানে আসিয়াছেন, তাই আনন্দময়-জীবিত রামের গভীর হৃদয়-সমুদ্রও উত্তাল হইয়াছে। তিনি মুগ্ধা সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—'দেখ জানকি! ঐ সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যে স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলাম যে, তোমার চরণের একখানি নূপুর, যেন তোমার অঙ্গচ্যুত হইবার মনের দুঃখে মৃত্তিকাতে নীরবে পড়িয়াছিল,—ঐ সেই স্থান'[1]।

[1] রঘু, ১৩—২৩—সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাম্।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণার-বিন্দ-বিশ্লেষ দুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্॥

'ঐ দেখ, ঐ সম্মুখে মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখর-মালা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, ঐ সকল শিখর-গাত্রে নূতন মেঘ দেখিয়া, জানকি! তোমাকে স্মরণ করিয়া কতই না কাঁদিয়াছিলাম, মেঘও তখন নবজল-বর্ষণচ্ছলে আমার দুঃখে কাঁদিয়াছিল[১]। জনকনন্দিনি! ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান, যেখানে—

গন্ধশ্চ ধারাহত-পল্বলানাং
কাদম্বমর্দ্ধোদ্গতকেশরঞ্চ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবু-
র্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে[২] ॥

ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান—

পূর্ব্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র
কম্পোত্তরং ভীরু! তবোপগূঢ়ম্।
গুহা-বিসারিণ্যতিবাহিতানি
ময়া কথঞ্চিদ্ ঘন-গর্জ্জিতানি[৩] ॥

১—রঘু, ১৩—২৬—এতদ্গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ ত্বদ্বিপ্রয়োগাশ্রু-সমং বিসৃষ্টম্॥

২—রঘু, ১৩—২৭—"তোমার সহযোগে যে সকল বস্তু আমার নিতান্ত সুখজনক ছিল, বিরহাবস্থায় তাহারাই সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। নব-বারি-সিক্ত মৃদ্গন্ধ, অর্দ্ধোদ্গত-কেসর কদম্বমুকুল এবং ময়ূরগণের মনোহর কেকারব—এই সকল পদার্থ সুমধুর হইলেও তৎকালে বিষতুল্য বোধ হইত।"

৩—রঘু, ১৩—২৮—"পূর্ব্বে গভীর ঘন-গর্জ্জন কালে তুমি চকিত হইয়া আমায় যে আলিঙ্গন করিতে, বিরহাবস্থায়, গিরি-গহ্বর-প্রতিধ্বনিত মেঘ-শব্দ শ্রবণে তাহা মনে পড়িয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।" (চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ কৃত রঘুবংশের অনুবাদ)।

সরস-তীরে কিসলয়-ভর-নমিতাঙ্গী, তন্বী অশোক-লতিকা,—বিরহোন্মত্ত রাম সীতা-ভ্রমে কাঁদিতে কাঁদিতে যাহার নিকটে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, আর অনুজ লক্ষ্মণ সজল-নয়নে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন[1], সেই অশোক-লতিকা প্রভৃতি, একটি একটি করিয়া জানকী বল্লভ, জানকীকে দেখাইতে লাগিলেন। সীতা তাঁহার বশংবদ আর্য্যপুত্রের সেই পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া অশ্রু-ধারাপ্লুত-নেত্রে একবার রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ক্ষণকাল-মধ্যেই বিমান পঞ্চবটীর নিকটবর্ত্তী হইল। গোদাবরীর বক্ষো-বিহারিণী সারসপঙ্ক্তি আকাশে উঠিয়া পঞ্চবটীর সেই পূর্ব্বপরিচিত অতিথিদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিল[2]। কৃশাঙ্গী জানকী বনবাস-ক্লেশে একান্ত কাতর থাকিয়াও পঞ্চবটী বনে কলসে কলসে জল সেচন-পূর্ব্বক যে সকল বাল সহকার সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, নবীন তৃণ-কবল দানে যে সমুদয় হরিণ-শিশুর জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বাল-সহকার সমূহ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, আর তাহাদেরই সুশীতল ছায়ায়, সেই সীতা-সংবর্দ্ধিত হরিণ-শ্রেণী ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া আছে[3]; যেন দূরে—আকাশে, তাহাদের কোন চিরপরিচিত ব্যক্তিকে তাহারা দেখিতে পাইয়াছে। করুণাময় রাম পঞ্চবটীর ঐ সৌন্দর্য্য দর্শনে কেমন যেন একটা আবেশময় ভাবে অবশ হইয়া সীতাকে উহা দেখাইলেন। সীতা দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে একেবারে বিগলিত হইলেন।

বিমান গোদাবরী-তটে উপনীত হইল। তখন রামের সেই [illegible]

১—রঘু, ১৩—৩২—ইহা তথাশোকলতাঞ্চ তন্বীং স্তনাভিরাম-স্তবকাভিনম্রাম্।
ত্বৎপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ ॥

২—রঘু, ১৩-৩৩।

৩—রঘু, ১৩—৩৪—এষা ত্বয়া পেশল-মধ্যয়াপি ঘটাম্বু-সংবর্দ্ধিত-বালচূতা।
আনন্দয়ত্যুন্মুখ কৃষ্ণ-সারা দৃষ্টা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥

কথা মনে পড়িল। রামের জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। বুঝি তেমন সুখের দিন আর আসিবে না। রাম অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন,—

অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্ত
স্তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ।
রহস্ত্বদুৎসঙ্গ-নিষণ্ণ-মূর্দ্ধা
স্মরামি বানীর-গৃহেষু সুপ্তঃ[১] ॥

ক্রমে পুষ্পক পঞ্চবটী, তপোবন, আশ্রম, চিত্রকূট প্রভৃতি কত স্থান অতিক্রম করিয়া, প্রয়াগে উপস্থিত হইল। রাম গঙ্গা-যমুনার সেই অপূর্ব্ব সঙ্গম-শোভা সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস সে স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের যে অনুপম বর্ণন করিয়াছেন, সংস্কৃত-ভাষায় তাহা অদ্বিতীয়।

বিমান বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়াছে। দূরে চণ্ডাল-গড় গুহকের পুরী। বন-গমনের সময়ে সারথি সুমন্ত্র ঐ পর্য্যন্ত রামের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানও রামের চিরস্মরণীয়। আজ চণ্ডাল-গড় দর্শনে রামের সেই মুকুট-পরিত্যাগ-কাহিনী মনে পড়িল। অমনি বলিলেন, 'জানকি! মনে পড়ে কি? এই সেই নিষাদাধিপতির আবাস ভবন। এই স্থানেই আমি 'মৌলিমণি' পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে জটা-বন্ধন করিয়াছিলাম। আর তদ্দর্শনে, করুণ-হৃদয় সুমন্ত্র 'কৈকেয়ি! তোর অভিলাষ এত দিনে পূর্ণ হইল' বলিতে বলিতে কতই না ক্রন্দন করিয়াছিলেন[২]।'

১—রঘু, ১৩—৩৫—'আমি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই গোদাবরীর তীরস্থ বেতসকুঞ্জে সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তিদূর করিতাম, এবং ত্বদীয় উৎসঙ্গদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতাম। সম্প্রতি পুনর্ব্বার সেইরূপ শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।' (চন্দ্রকান্ত)

২—রঘু, ১৩—৫৯ 'পুরং নিষাদাধিপতেরিদং তৎ যস্মিন্ ময়া মৌলিমণিং বিহায়।
জটাসু বদ্ধাস্বরুদৎ সুমন্ত্রঃ কৈকেয়ি! কামাঃ ফলিতাস্তবেতি॥

দেখিতে দেখিতে 'বিমান-রাজ' অযোধ্যা-তল-বাহিনী সরযূর তটে উপস্থিত হইল। রাম আজ চতুর্দ্দশ বৎসর দেশ-ত্যাগী, স্থির-সৌন্দর্য্যময়ী সরযূর শান্তোজ্জ্বল-মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত। রাম ভারতের কত দেশ, কত নদ-নদী, কত পর্ব্বত-সমুদ্র দেখিয়াছেন কিন্তু সরযূর কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয়েন নাই। বহুকাল পরে জননী দর্শনে প্রবাস-প্রত্যাগত সন্তানের হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, সরযূ-দর্শনে আজ রাম-হৃদয়েরও সেই দশা ঘটিল। তাঁহার অন্তঃকরণ-বাহিনী জন্মভূমি-প্রীতি-রূপিণী মহানদী একেবারে যেন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। রাম প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে বলিলেন 'সীতে! ঐ আমাদের সরযূ, উনি উত্তর-কোশল-পতিদিগের সকলেরই যেন জননী। জননী যেমন সন্তানকে স্তন্য দান করেন, অঙ্কে ধারণ করেন, সরযূও তেমনি স্বকীয় দুগ্ধাধিক সঞ্জীবন সলিলের দ্বারা অযোধ্যাপতিদিগকে সঞ্জীবিত রাখেন। উঁহার তট-রূপ-উৎসঙ্গ-বর্ত্তিনী অযোধ্যা পুরীতে আমার পূর্ব্বপুরুষ-গণ মহাসুখে কালাতিপাত করিয়াছেন। আমার মা কৌশল্যা যেমন মদীয় পরমারাধ্য পিতা কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়া, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে আমার পথের দিকে চাহিয়া আছেন, তদ্রূপ মাতৃ-রূপিণী সরযূও, ঐ দেখ, যেন এতদিন উৎসুক-হৃদয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আজ বহুদিন পরে আমি আসিতেছি, তাই মাতার ন্যায়, আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেন তাঁহার তরঙ্গরূপী স্নেহ-শীতল কর প্রসারণ করিতেছেন'[১]।

বহুকালপরে অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ, প্রসন্ন-সলিলা, 'তটশালিনী, সুন্দর' সরযূ দর্শন করিয়া রামের হৃদয় আনন্দ সন্দোহে আপ্লুত হইল। তিনি

১—রঘু, ১৩—৬২—যাং সৈকতোৎসঙ্গ-সুখোচিতানাং প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্দ্ধিতানাং ॥
সামান্য-ধাত্রীমিব মানসং মে সম্ভাবয়ত্যুত্তর-কোশলানাম্ ॥
—৬৩—সেয়ং মদীয়া জননীব তেন মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং তরঙ্গ-হস্তৈরুপগূহতীব ॥

তাঁহার আদরিণী সীতাকে, কত প্রকারে, সরযূর চিরমধুর সুষমা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাম-সীতার হৃদয়ে যে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাষার বুঝি তত সামর্থ্য নাই।

রাম-সীতা আসিতেছেন—সংবাদ পাইয়াই জটা-চীর-ধারী ভরত অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। রাজ্যের প্রবীণ প্রবীণ অমাত্য-গণ ভরতের সহিত রাম-সীতা-দর্শনে আসিলেন। সেই কবে, কত দিন, কত বৎসর হইল রাম বন-যাত্রা করিয়াছেন, আর এই দীর্ঘকাল রামানুরক্ত ভরত, রামের পাদুকা তদীয় প্রতিনিধিরূপে সিংহাসনে স্থাপন-পূর্ব্বক, ভৃত্যের ন্যায়, অনাসক্ত-ভাবে রাজ্য-পালন করিতেছেন! আজ অযোধ্যার রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ভরতেরও কঠোর 'আসিধার ব্রত' উদ্‌যাপিত হইল। ভরতের অসীম আনন্দ। অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে যেন একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল[১]।

"ইনি আমার বিপৎকালের পরম বন্ধু 'হরীশ্বর' সুগ্রীব, ইনি রাক্ষস-যুদ্ধে আমার অগ্রসর যোদ্ধা মহাবীর বিভীষণ, ইঁহাদিগকে অভিবাদন কর" বলিয়া রাম ক্রমে 'রাজ্যাশ্রম-মুনি' ভরতকে, সমাগত কপিরাক্ষস-দিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। ভরত তাঁহার জটিল মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। সে অতি আনন্দের চিত্র[২]। বহুকাল পরে হৃত রত্নের উদ্ধার করিয়া রাম ঘরে ফিরিয়াছেন, সকলেই

১—রঘু, ১৩—৬৬—অসৌ পুরস্কৃত্য গুরুং পদাতিঃ পশ্চাদবস্থাপিত-বাহিনীকঃ।
বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহ চীরবাসাঃ মামর্ঘ্যপাণির্ভরতোঽভ্যুপৈতি॥
—৬৭—পিত্রা বিসৃষ্টাং মদপেক্ষয়া যঃ শ্রিয়ং যুবাপ্যঙ্ক-গতামভোক্তা।
ইয়ন্তি বর্ষাণি তয়া সহোগ্রং অভ্যস্যতীব ব্রতমাসিধারম্॥

২—রঘু, ১৩—৭২—দুর্জ্জাত-বন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃ প্রহর্ত্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘু-নন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে॥

অপার সুখ-সাগরে নিমগ্ন। ক্রমে ভরত লক্ষ্মণের সমীপবর্ত্তী হইলে, বিনীত লক্ষ্মণ তাঁহাকে আনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন। ভরতও অমনি লক্ষ্মণকে উঠাইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিতের বিষম শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। লক্ষ্মণের সেই বন্ধুর বক্ষে যখন ভরতের বক্ষ সংলগ্ন হইল, তখন, ভরত অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না[১]।

ক্রমে, ধীরপদ-সঞ্চারে ভরত আসিয়া, আর্য্যা জানকীর চরণে প্রণাম করিলেন। তখন—

লঙ্কেশ্বর-প্রণতি-ভঙ্গ-দৃঢ়-ব্রতং তৎ
বন্দ্যং যুগং চরণয়োর্জ্জনকাত্মজায়াঃ।
জ্যেষ্ঠানুবৃত্তি-জটিলঞ্চ শিরোঽস্য সাধো
রন্যোন্য-পাবনমভূদুভয়ং সমেত্য[২] ॥

জানকীর যে চরণ-যুগল লঙ্কেশ্বরের অভ্যর্থনা ভঙ্গ করিয়া, সুদৃঢ় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছে, এবং দান্ত ভরতের যে মস্তক প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ দুর্ব্বহ জটাভার ধারণ করিয়াছে, সম্প্রতি সেই পবিত্র বস্তুদ্বয় মিলিত হইয়া পরস্পর যেন পবিত্রতর হইল।

১—রঘু, ১৩—৭৩—সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্র-শিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎ-প্রহরণ-ব্রণ-কর্কশেন ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥

২—রঘু, ১৩—৭৮।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

বজ্রাঘাত।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে গমন করা অবধি কৌশল্যা ও সুমিত্রা আর অন্তঃপুর কক্ষের বহির্ভাগে আসেন নাই। সীতা-শূন্য সংসারের মুখ দর্শন করেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের নয়ন অন্ধ হইয়াছে। যখন বন-বাস-নিবৃত্ত রাম-লক্ষ্মণ আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন, তখন তাঁহারা রাম-লক্ষ্মণের মুখ দেখিতে পাইলেন না। বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহাদের এই চতুর্দ্দশ বর্ষের সমস্ত বেদনা—যন্ত্রণা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিলেন যে এই তাঁহাদের রাম, আর এই তাঁহাদের লক্ষ্মণ। তাঁহারা ধীরে ধীরে পুত্র-দ্বয়ের কলেবরে কর-চালনা করিতে লাগিলেন। পুত্র-দ্বয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ স্পর্শ করিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। 'বীর-প্রসবিনী' শব্দ, ক্ষত্রিয়-কামিনীগণের একান্ত অভিপ্রেত হইলেও, তাঁহাদের কিন্তু আর উহাতে স্পৃহা রহিল না। জানকী এতক্ষণ একপার্শ্বে চিত্রিতার ন্যায় নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইক্ষণে, 'আমি স্বামীর অনন্ত ক্লেশ-কারিণী সীতা প্রণাম করিতেছি'—বলিয়া, মহিষীদ্বয়ের চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। তখন কৌশল্যা এবং সুমিত্রা উভয়ে যুগপৎ সীতাকে ধরিয়া বলিলেন,—'মা! উঠ, তোমার পবিত্র চরিত-প্রভাবেই, রাম-লক্ষ্মণ এই দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। ভাগ্যবতি! রঘু-কুল-রাজ-লক্ষ্মি! উঠ'[১]!

ক্রমে বৃদ্ধ অমাত্য-গণ, মহা-সমারোহে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। দশরথ, কৈকেয়ীর প্রতিবন্ধকতায় প্রজাপুঞ্জের যে আশ

১—রঘু, ১৪—২, ৩, ৪, ৫, ৬।

পূর্ণ করিতে না পারিয়া, ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আজ সে আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু দশরথ দেখিলেন না!

অভিষেকান্তে, রাম আকুল-হৃদয়ে, দশরথের আলেখ্য-যুক্ত কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক, অশ্রু-ভারাক্রান্ত-নয়নে পিতার প্রতিকৃতিকে প্রণাম করিলেন। এই কক্ষে দশরথ বাস করিতেন। একদিন এই বিশাল কক্ষ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল, আর এখন একেবারে শূন্য। কেবল এক-পার্শ্বে দশরথের একখানি জীর্ণ প্রতিকৃতি দোলায়মান। পিতার ঐ প্রতিকৃতিদর্শন করিয়া রাম উচ্ছ্বলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ প্রশমন করিলেন[১]।

রামের সেই প্রতিহতারব্ধ অভিষেকের উৎসবে অযোধ্যা-নগরী নিমগ্ন। দেখিতে দেখিতে মাসার্দ্ধকাল অতিবাহিত হইল। সমাগত তপোধনগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। সীতা স্বহস্তে নানাবিধ উপহার দানে, পরমোপকারী রক্ষঃকপীন্দ্রদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। রাম ক্ষুণ্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রস্থানে সম্মতি দিলেন।

রামরাজ্যে সকলেই সুখী। রামের ব্যবস্থাগুণে দরিদ্রেরও ধনাগম হইল। তাঁহার শৌর্য্যে রাজ্যের সমস্ত উপদ্রব প্রশমিত হইল। তিনি পিতার ন্যায়, প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ হইলেন[২]। অনেক দিন পরে,—অনেক দুঃখ, অনেক অবসাদ, অনেক বিড়ম্বনার পরে, অযোধ্যা-রাজ্য আবার শান্তির উৎসঙ্গে সুষুপ্ত হইল। রাম ধর্ম্মৈক-শরণ হইয়া, পৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, রাজ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ নিজে বিদিত হইয়া, তাহার প্রতিকার-ব্যবস্থা করেন। আর দিনান্তে

১—রঘু, ১৪—১৫, ১৬।

২—রঘু, ১৪—২৩—তেনার্থবান্ লোভ-পরাঙ্মুখেন তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী॥

কখনও বা রাজ্য-চিন্তাবসন্ন হৃদয়ের কথঞ্চিৎ বিনোদনের নিমিত্ত, বৈদেহীর সহিত চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিয়া নানাবিধ চিত্র দর্শন করেন।

দণ্ডকারণ্যে সীতাকে হারাইয়া রাম উন্মত্ত-হৃদয়ে কত বিলাপ করিয়াছিলেন, কুঞ্জে কুঞ্জে, লতায় লতায়, পত্রে পত্রে, সীতার কত অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিরহ-বিলাপ-অন্বেষণের অবস্থাগুলি বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া, সেই সেই সময়ের পৃথক্ পৃথক্ চিত্র রচিত হইয়াছে। দুঃখের দিনের সেই সমুদয় চিত্রে গৃহভিত্তি সজ্জিত। আজ সুখের দিনে, মিলনের দিনে, রাম-সীতা সেই সকল চিত্র দেখিতেছেন। একপ্রাণ হইয়া দেখিতেছেন, আর দুই জনে তৎকালের সেই সেই অবস্থাগুলি ভাবিতেছেন। পরস্পরের জন্য পরস্পরের সেই আকুলতার ছবি দেখিতে দেখিতে, পরস্পরের ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছেন। অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সে এক সুখের মুহূর্ত্ত[১]। রাম-সীতার জীবনে তেমন সুখের মুহূর্ত্ত বুঝি আর আসে নাই। আসিবেও না! রাম আজ অযোধ্যার অধীশ্বর, আর জনকনন্দিনী অযোধ্যার অধীশ্বরী, আনন্দের পরিসীমা নাই। তাঁহারা সেই পূর্ব্বানুভূত ঘটনাবলীর ছবি, সেই নির্জ্জন-বনবাস কালের মিলনের এবং বিরহের ছবি দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দুই-জনেই যেন নিজের নিজের পৃথগস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সুখে, মোহে, বিস্ময়ে, জড়তায়—কেমন যেন অলস হইয়া পড়িতেছেন। গর্ভ-ভরালসা জনক-তনয়া ক্রমে আনন্দ-তন্দ্রাবেশে নিমীলিতাক্ষী হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিদ্রার আবেশ আসিল। এই প্রকার আনন্দালসভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, নিজের সত্তা যেন সীতার নিকটে ন্যাসবৎ গচ্ছিত রাখিয়া, রাম রাজধানীর আনন্দময়ী বহিরবস্থা দর্শনেচ্ছু হইয়া অভ্রংলিহ

১—রঘু, ১৪—২৫—তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
　　প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্॥

প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। আর তাঁহার প্রাণ যেন সেই চিত্র-শালিকা-শায়িনী সীতার নিকটে পড়িয়া রহিল।

এমন সময়ে, দুর্ম্মুখ আসিয়া, 'রক্ষোভবনোষিতা' জনকাত্মজার চরিত্রে স্থূলদর্শী প্রজাগণ যে কলঙ্কারোপ করিতেছে, তাহা অতি গোপনে অযোধ্যা-পতির নিকটে প্রকাশ করিল। তখন—

কলত্র-নিন্দা-গুরুণা কিলৈবং
অভ্যাহতং কীর্ত্তি-বিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং
বৈদেহী-বন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে[১] ॥

তখন সেই 'দেব-যজন-সম্ভবা, স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিত-বসুন্ধরা, অরণ্য-বাসসহচরী, প্রিয়স্তোক বাদিনী, নিমি-জনক-বংশ-নন্দিনী, রামময়-জীবিতা,' অনল-পরীক্ষিতা দেবীর চরিত্রে প্রজাগণের দোষারোপ-কথা চিন্তা করিয়া, বৈদেহী-বল্লভের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। রাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, প্রজারঞ্জন যে বংশের চিরব্রত, সেই বংশের অবতংস, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়াও প্রকৃতি-পুঞ্জের হৃদয়-রঞ্জনে বদ্ধপরিকর হইলেন। রাম তৎক্ষণাৎ—

নিশ্চিত্য চানন্য-নিবৃত্তি বাচ্যং
ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ[২] ॥

যেমন প্রজাগণের সন্দেহ-বার্ত্তা-শ্রবণ, অমনি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সীতা যে কি প্রকার শুদ্ধশীলা, তাহা রাম জানিতেন, রাম যে কিরূপ সীতাময়-প্রাণ, তাহাও সীতা জানিতেন। রাজার কঠোর কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া, রাম একপদে সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। একদিকে জীবনের সুখ, অন্যদিকে রাজার কর্ত্তব্য,

১—রঘু, ১৪—৩৩। ২—রঘু, ১৪—৩৫।

একদিকে শুদ্ধিমতী জানকী, অন্যদিকে প্রাচীন এবং নিষ্কলঙ্ক অযোধ্যা-রাজ-বংশের কীর্ত্তি প্রভৃতি তৌল করিয়া, বশিষ্ঠ-হৃদয় রাম নিমেষ-মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতৃগণ! একদিন পিতার প্রীত্যর্থে সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আর আজ প্রজার প্রীত্যর্থে বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিতেছি। তোমরা আমার এ কার্য্যে বাধা দিও না। তোমরা ত জান যে,—

অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু
লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে
নারোপিতা সিদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ[২] ॥
রক্ষো-বধান্তো ন চ মে প্রয়াসঃ
ব্যর্থঃ—স বৈর-প্রতিমোচনায়।
অমর্ষণঃ শোণিত-কাঙ্ক্ষয়া কিং
সদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ[৩] ॥

তাই [illegible] অনুরোধ করি আমার এ কার্য্যে তোমরা বাধা দিও না। আমি জানি [illegible] তোমরা নিরতিশয় করুণ-হৃদয়। যদি তোমরা আমার

২—রঘু [illegible]—'আমি জানি, সীতা কোন দোষে দূষিত নহে। কিন্তু দুর্নিবার লোকাপবাদ [illegible] নিতান্ত অসহ্য। লোকে কি না কল্পিত পারে, দেখ, তাহারা পৃথিবীর ছায়াকে [illegible] শশধরের কলঙ্করূপে আরোপ করিয়াছে।'

৩—[illegible]—'সীতাকে পরিত্যাগ করিলে দুর্দ্দান্ত দশাননকে সবংশে বিনাশ করা পণ্ড [illegible] না, যে হেতু সে কেবল বৈর-নির্যাতনের নিমিত্তই করিয়াছি। সর্পকে পদাহত করি [illegible] সর্প যে অপরাধীকে দংশন করে, সে কি রুধির পান করিবার আশয়ে না বৈর-নির্যাতন [illegible]?'　　　　(চন্দ্রকান্ত)

নিন্দা-বিমুক্ত প্রাণের আশ কর, তবে আমার এ কার্য্যেরও অনুমোদন কর[১]।' সংক্ষোভিত সমুদ্রবৎ ক্ষুব্ধ-হৃদয় রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতৃ-ত্রয় নীরবে অধোবদন হইলেন। তখন—

ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্তঃ
নিষেদ্ধুমাসীদনুমোদিতুং বা[২]।

ক্রমে 'লোকত্রয়-গীত-কীর্ত্তি' রাম তাঁহার প্রাণাধিক লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন,—'ভাই, তোমার ভ্রাতৃজায়া জানকী তপোবন-দর্শন-বাসনা জানাইয়াছিলেন, তুমি সেই ছলে, তাঁহাকে এখনই বাল্মীকির আশ্রমে লইয়া যাও এবং তথায় পরিত্যাগ করিয়া আইস।' লক্ষ্মণ শুনিলেন, পরশুরাম যেমন পিতৃমুখে মাতৃ-হত্যার আদেশ শুনিয়া-ছিলেন, সেই ভাবে লক্ষ্মণ শুনিলেন। গুরুজনের আদেশ 'অবিচারণীয়' মনে করিয়া অগ্রজের শাসন স্বীকার করিলেন[৩]। অযোধ্যার সমুচ্চসৌধ-তল-শায়িনী শান্তি দেবতার বক্ষে যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল। স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলে এপর্য্যন্ত কেহ যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, রাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। পৃথিবীতে পরের জন্য জীবন-দানের কথা ক্বচিৎ শুনা যায় বটে, কিন্তু এই প্রকার, পরের একটু সন্তোষ-বিধানের জন্য জীবনাধিক বস্তুর বিসর্জ্জনের কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

কবিগুরু বাল্মীকি এই যে একটা বিরাট্ চরিত্র গঠন করিয়াছেন, ইহার উপমা অন্যত্র নাই। ভারতের অমর কবি কালিদাস সেই বিরাট্ চরিত্রের,—বাল্মীকি কর্ত্তৃক সবিস্তর বর্ণিত সেই মহৎ চরিত্রের

১—রঘু, ১৪—৪২।

২—রঘু, ১৪-৪৩ তাঁহারা কেহই অগ্রজের বাক্যের প্রতিবাদ বা অনুমোদন কিছুই করিতে পারিলেন না। ৩—রঘু ১৪-৪৬। (চন্দ্রকান্ত)

অতি সঙ্ক্ষেপে এমন ছায়াময়ী মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন যে, সেই ছায়াময়ী, তড়িন্ময়ী, আবেশময়ী মূর্ত্তি যখনই দর্শন করি, যখনই সেই রামচরিত্রের আলোচনা করি, তখনই স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই, উদ্‌ভ্রান্ত হই। দশরথ, প্রিয়তমা মহিষীর কথায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, আর আজ, সেই দশরথ-তনয়, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র রাম, প্রজার কথায় নিজের সংসারের শান্তি, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের তৃপ্তি, নয়নের দীপ্তি, পবিত্র-শীলা সহধর্ম্মিণীকে চিরনির্ব্বাসিত করিলেন।

দশরথ ইন্দুমতী-বিয়োগ-কাতর অজের তপ্তাশ্রু-দিগ্ধ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। মহারাজ অজ কাঁদিতে কাঁদিতে দশরথের অভিষেক করিয়াছিলেন। দশরথও কাঁদিতে কাঁদিতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। অজ জীবনের দুর্ব্বহ ভারে একান্ত কাতর হইয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন; আর দশরথের পুত্রশোকে অপমৃত্যু ঘটিল। রাম বন-প্রত্যাগত হইয়া, পিতৃশোক-কাতরমনে ও সজল-নয়নে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার জীবনের সুখ, স্বপ্নের মত কোথায় চলিয়া গেল। কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র পড়িয়া রহিল। সিংহাসন রামের কাল হইল। একবার সিংহাসনে উঠিতে যাইয়া নিজে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আবার সেই সিংহাসনে উঠিয়াই জীবনের শান্তি-প্রতিমাকে নিজেই নির্ব্বাসিত করিলেন। কুক্ষণে দশরথ রাজা হইয়াছিলেন, কুক্ষণে রাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসন পিতা-পুত্র উভয়েরই কাল হইল। দিলীপের সেই সুখময়, শান্তিময়, উৎসবময় সংসার এতদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অযোধ্যা-রাজ্যের রাজ-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বিসর্জ্জন।

সীতার আজ বড় আনন্দের দিন। তিনি একবার ভাগীরথীর 'তীর-তপোবন'-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। সীতা-পতি বুঝি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিয়াছেন, সেই সমুদয় 'পূর্ব্বানুভূত' 'রুচির প্রদেশ' সীতা আবার দেখিতে পাইবেন, তাই তাঁহার এত আনন্দ। সীতার প্রিয়-কার্য্য সাধনে রাম সর্ব্বদাই তৎপর—ভাবিয়া সীতার হৃদয়ে আজ অতুল আনন্দ। কিন্তু সীতা—

নাবুদ্ধ কল্প-দ্রুমতাং বিহায়
জাতং তমাত্মন্যসি-পত্র-বৃক্ষম্[১] ॥

বুঝিতে পারিলেন না যে, কল্পবৃক্ষ আজ তাঁহার অদৃষ্ট-দোষে বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

সীতা লক্ষ্মণের সহিত সুমন্ত্র-পরিচালিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। লক্ষ্মণ অতিকষ্টে হৃদয়ের ভাব-গোপন-পূর্ব্বক, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু সীতার দক্ষিণ-নয়ন বারংবার স্পন্দিত হইয়া ভাবী গুরুতর দুঃখের সূচনা করিতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ দক্ষিণাক্ষি-স্ফুরণ-নিবন্ধন সীতার হৃদয়ে একটা ঘোর আতঙ্কের উদ্রেক হইল। তাঁহার 'মুখারবিন্দ' অকস্মাৎ 'পরিম্লান' হইল। সাধ্বী জানকী অন্তঃকরণে রাজা এবং রাজভ্রাতৃগণের নিরন্তর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। রথ অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই বীচি-মালিনী ভাগীরথী। গুরুর আদেশে, সাধ্বী বনিতাকে, 'সুমিত্রাতনয়' আজ জন্মের মত বনবাস দিতে চলিয়াছেন, ঘোর অকার্য্য করিতে উদ্যত

১—রঘু, ১৪—৪৮।

হইয়াছেন, তাই যেন পুরোবর্ত্তিনী জাহ্নবী তদীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপ কর-পল্লব কম্পিত করিয়া লক্ষ্মণকে প্রতিষেধ করিলেন[১]। লক্ষ্মণ অতিক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতৃ-জায়াকে পুলিনে অবতীর্ণ করিয়া, কিরাত-বাহিত নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হইয়া, মহীপতির কালকূটবৎ ভীষণ আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, ধরিত্রী-দুহিতা সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া, শেল-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায়, পরশু-নিকৃত্তা শাল-যষ্টির ন্যায়, স্বর্গচ্যুতা দেবতার ন্যায়, জননী পৃথিবীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন[২]। কিন্তু জননীর প্রাণও যেন আজ কঠিন হইল। 'তোমার পতি অতিশয় সাধু-চরিত্র, পবিত্র সূর্য্যবংশে তাঁহার জন্ম, তাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যক্তি কেন আজ অকস্মাৎ তোমাকে ত্যাগ করিলেন' —এইরূপ সংশয়িতা হইয়াই যেন জননী দুহিতাকে একটু স্থানও দিলেন না[৩]। লক্ষ্মণ অনেক যত্নে সীতার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। অন্তঃকরণের প্রজ্বলিত দুঃখানলে সীতা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার—'মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ[৪]।' মোহ অপেক্ষা চৈতন্য লাভ অধিকতর কষ্টের কারণ হইল। বিনা দোষে নিরপরাধা সাধ্বী সহ-ধর্ম্ম-চারিণীকে রামচন্দ্র পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, আর্য্যা জানকী তাঁহার প্রতি কোনই দোষারোপ করিলেন না। কেবল তিনি মুহুর্মুহুঃ আপন অদৃষ্টকেই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ চিরকাল রামের অনুজের ন্যায় দৃঢ় হইয়া, সাধ্বী রাজ-নন্দিনীকে সমীপবর্ত্তী

১—রঘু, ১৪—৫১—গুরোর্নিয়োগাদ্ বনিতাং বনান্তে সাধ্বীং সুমিত্রা-তনয়ো বিহাস্যন্।
অবার্য্যতেবোত্থিতবীচি-হস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ॥

২—রঘু, ১৪—৫২, ৫৩, ৫৪।

৩—রঘু, ১৪—৫৫—ইক্ষ্বাকু-বংশ-প্রভবঃ কথং ত্বাং ত্যজেদকস্মাৎ পতিরার্য্যবৃত্তঃ।
ইতি ক্ষিতিঃ সংশয়িতেব তস্যৈ দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ॥

৪—রঘু, ১৪—৫৬।

বাল্মীকি-তপোবনের পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং আনত-বদনে ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, 'দেবি! আমি পরাধীন, প্রভুর আদেশ পালন করিতে যাইয়া, যে ঘোর নৃশংসত্ব প্রকাশ করিলাম, তাহা ক্ষমা করুন'—বলিয়া রঘু-কুল-বধূর চরণতলে ছিন্ন তরুর ন্যায় পতিত হইলেন[১]। ভাগীরথীর পবিত্র-সৈকত-বর্ত্তি তপোবনে সীতা-লক্ষ্মণের এই বিষাদময় অভিনয়ে যেন একটা গভীর শোকের, অনন্ত দুঃখের ঝটিকা উত্থিত হইল। সীতা রোরুদ্যমান লক্ষ্মণের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা-বিধান-পূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! তোমার অপরাধ কি? উঠ, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও। শ্বশ্রূদিগকে এজন্মের মত আমার শেষ প্রণাম জানাইও[২]। আর'—অশ্রু-নয়না সীতা কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, 'আর লক্ষ্মণ! তুমি আমার এই কয়েকটি কথা তোমাদের সেই নূতন রাজাকে বলিও,—বলিও, আর্য্যপুত্র স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে আমার সতীত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আর আজ অলীক লোকাপবাদ শ্রবণ-মাত্রেই, সেই তিনিই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি জগদ্‌-বিখ্যাত সূর্য্যবংশের কিংবা ত্রিজগদ্‌-বন্দ্য আর্য্যপুত্রের অনুরূপ কার্য্য হইল[৩]?'

"বলিও, 'জ্ঞানবান্ তুমি, তোমার দোষ কি? আমি জন্মান্তরে কত পাপই করিয়াছিলাম, এই সমুদয় তাহাদেরই বিষময় পরিণাম।" বলিও 'যখন তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলাম, তখন তপস্বিগণ নিশাচর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাপস-কামিনীরা আমার শরণাগত হইতেন, আর তুমি, আমার অনুরোধে তাঁহাদের বিপদ নিবারণ করিতে, আর এক্ষণে

১—রঘু, ১৪—৫৮। ২—রঘু, ১৪—৬০।

৩—রঘু, ১৪—৬১—বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য

অযোধ্যার অধীশ্বর তুমি বিদ্যমান থাকিতে, সেই আমি, গহন বনে কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব? কে আমাকে রক্ষা করিবে? তুমি ত্যাগ করিয়াছ, কর, কিন্তু আমি অনন্যহৃদয়ে একমাত্র তোমারই ধ্যান করিব। জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই, তোমার সহিত আর যেন বিচ্ছেদ না হয়।

"লক্ষ্মণ, আর বলিও, 'বর্ণাশ্রম-পালনই রাজার ধর্ম্ম, সুতরাং আমি এখন অযোধ্যা-বাসিনী না হইলেও আশ্রমবাসিনী বলিয়া যেন তোমার কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হই। পতির চক্ষে আমাকে না দেখিলে, কিন্তু রাজার চক্ষে দেখিতে ভুলিও না।[১]" এই বলিয়া সীতা বিরত হইলে, লক্ষ্মণ বিদায়-গ্রহণ করিয়া শূন্যমনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। অবসন্ন-দেহা সীতা অনিমেষনয়নে লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যতদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্মণকে দেখা গেল,—চাহিয়া চাহিয়া পরিশেষে বাণ-বিদ্ধা কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন[২]। করুণ-বিলাপিনী জানকীর দুঃখে সমগ্র বনস্থলীও যেন কাঁদিয়া উঠিল। তখন—

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।

১—রঘু, ১৪—৬২—কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কাম-চারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর-পাতকানাং বিপাক-বিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ॥
—৬৪—নিশাচরোপপ্লুত-ভর্তৃকানাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে?
—৬৬—ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা নচ বিপ্রযোগঃ॥
—৬৭—নৃপস্য বর্ণাশ্রম-পালনং যৎ স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্ব্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া॥
২—রঘু ১৪—৬৮—তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং রামানুজে দৃষ্টি-পথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ॥

তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখ-ভাবম্
অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি[1] ॥

অশেষ দুঃখ-ভোগ করিবার জন্য বিধাতা জানকীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর নিরন্তর দুঃখভোগ করিবার জন্যই বুঝি রামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন!

জীবনের প্রারম্ভে, পরম সুখের দিনে—যখন সীতা কোশল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে তাপসীবেশ ধারণ-পূর্ব্বক গহন বনে গমন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার কোন কষ্ট ছিল না। রামের সহিত একত্র বাসে, তাঁহার সমস্তই আনন্দময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে বন-বাস-সুখও তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অচিরকাল মধ্যেই রাবণ তাঁহার সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন করিল। আজন্ম দুঃখিনী সীতার ক্লেশের আর অবধি রহিল না। বহুকালের পর রাম-চন্দ্রের সন্দর্শন পাইয়া সীতা ভাবিয়াছিলেন, বুঝি এইবার তাঁহার দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু বিধাতা যে তাঁহার অদৃষ্টে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই। রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কবে তাঁহার ন্যায় চিরদুঃখিনী হইয়াছে? বুঝি যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই তাঁহার নারীজন্ম হইয়াছিল।"

কবি, এ যাবৎ সীতার কোন বিশেষ কথাবার্ত্তার উল্লেখ করেন নাই। কদাচিৎ রাম-চরিত্রের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ প্রদর্শন-কালে, সীতা-রূপিণী স্থির-সৌদামিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। এইক্ষণে নারী-জীবনের এই ভয়ঙ্কর দুঃখের সময়ে, রাজকন্যা সীতার করুণ-রোদনে কবি,

১—১৪—৬৯—ময়ূরগণ প্রমোদ-নৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিল। মৃগগণ গৃহীত কুশ কবল পরিত্যাগ করিল এবং পাদপগণ কুসুমবর্ষণচ্ছলে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

সমস্ত জগৎ—চেতনাচেতন নির্ব্বিশেষে যেন দুঃখের অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। 'জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পুনরায় পতিরূপে প্রাপ্ত হই, তোমার সহিত এ জন্মের ন্যায় পরজন্মে যেন আর বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা'—বলিয়া পবিত্র-শীলা সীতা যখন সজল-নয়নে, শোকাকুল লক্ষ্মণকে আত্মবক্তব্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তখন সীতা-হৃদয়ের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, রামের প্রতি তাঁহার যে অটল অনুরাগ, অসীম নির্ভর, তাহা চিন্তা করিয়া, সেই সাধ্বীর চরণোদ্দেশে কাহার মস্তক না অবনত হয়? যে দেশে সীতার ন্যায় সতীর জন্ম হয়, সে দেশ ধন্য, তীর্থ-কল্প। যে দেশের সাহিত্যে আবার সীতার ন্যায় দেবীর চরিত্র চিত্রিত, সেই সাহিত্য এবং সেই চরিত্রের যিনি চিত্রকর,—উভয়েই পূজার্হ।

সীতাকে বনবাস দিয়া, লক্ষ্মণ নিতান্ত দীন-হৃদয়ে অযোধ্যায় প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাস-ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং চিন্তানতবদনে রামের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন—'আর্য্য! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনার আদেশ পালন করিয়া আসিল।' লক্ষ্মণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্রেই—

> বভূব রামঃ সহসা সবাষ্প-
> স্তুষার-বর্ষীব সহস্য-চন্দ্রঃ।
> কৌলীন-ভীতেন গৃহান্ নিরস্তা
> ন তেন বৈদেহ-সুতা মনস্তঃ'[১] ॥

শিশির মাসের তুষারবর্ষী হিমাংশুর ন্যায় রাম বাষ্পভরাপ্লুত হইলেন। 'দেবযজন-সম্ভবা' সীতাকে তিনি অপবাদ ভয়েই গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত

১—রঘু, ১৪—৮৪।

করিয়াছিলেন, নতুবা, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে সীতার ধ্যান বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সংসার তাঁহার নিকট যেন নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। তবুও তিনি দৃঢ়-হৃদয়ে রাজ-কার্য্য-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন[১]। যখন একটু অবসর পান, তখন সেই হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া, তাঁহার বাষ্প-দিগ্ধ চক্ষুর কথঞ্চিৎ বিনোদন করেন। এইভাবে সীতা-পতি রামচন্দ্র শূন্য-হৃদয়ে 'রত্নাকর-মেখলা পৃথিবীর' পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার আর আসক্তি রহিল না[২]। এইস্থলে বাল্মীকির রামের সহিত, কালিদাসের রামের কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাল্মীকির রাম, 'সীতাকে বনবাস দিয়া যারপর নাই অধৈর্য্য ও শোকাভিভূত হইলেন; এবং আহার, বিহার রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা-প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে একবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অন্যের প্রবেশ-প্রতিষেধ-পূর্ব্বক একাকী আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৩]। আর কালিদাসের রাম,—

> নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্
> বর্ণাশ্রমাবেক্ষণ-জাগরূকঃ।
> স ভ্রাতৃ-সাধারণভোগমৃদ্ধং
> রাজ্যং রজো-রিক্তমনাঃ শশাস[৪] ॥

বাল্মীকির রাম প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত 'সাধু-শীলা,' 'সরলান্তঃকরণা'

১—রঘু, ১৪—৮৭।

২—রঘু, ১৫—১ কৃতসীতা-পরিত্যাগঃ স রত্নাকর-মেখলাম্।
বুভুজে পৃথিবী-পালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্ ॥

৩—বিদ্যাসাগর-কৃত সীতার বনবাস, ৫ম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভভাগ।

৪—রঘু, ১৪—৮৫।

সহধর্ম্মিণীকে নির্ব্বাসিত করিয়া, শোকাভিভূত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের জন্য রাজ-কার্য্য-পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিলেন। আর কালিদাসের রাম, সীতার ন্যায় সহধর্ম্মচারিণীকে বিসর্জ্জন দিয়াও, অন্তর্জ্জলিতানল শমীতরুর ন্যায় দগ্ধ-হৃদয়েও অনাসক্ত ভাবে ভ্রাতৃগণের সহিত প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। শোকাবেগে রাজার কর্ত্তব্য প্রতিহত হইল না।

কালিদাস তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ গঠন করিলেন: কর্ত্তব্যের নিকট মহাপুরুষের সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। পৃথিবীর এমন কোন পদার্থই নাই, জীবনের এমন কোন আকাঙ্ক্ষ্য বস্তুই নাই, যাহা মহাপুরুষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে পরিত্যাগ করিতে না পারেন। এই উদার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কবি কালিদাস, মহাপুরুষ রামের ন্যায়, নিজেও অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন, দুর্লভ অমরত্ব রত্নে বিভূষিত হইলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার একান্ত প্রিয় সংস্কৃত সাহিত্যকেও অক্ষয়-কীর্ত্তি-মণ্ডনে বিমণ্ডিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

যবনিকা-পতন।

বাল্মীকির তপোবনে সীতার দুইটি কুমার প্রসূত হইয়াছে। সত্য-প্রিয় দশরথ বাল্মীকির পরম সুহৃদ্ ছিলেন। সীতা যে পতিব্রতা কামিনীদিগের শিরোবর্ত্তিনী, ইহাও মহর্ষি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন। তিনি সেই সাধ্বী দশরথ কুল-বধূর সন্তানদ্বয়কে অতিযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নব-কুমার-যুগল কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, করুণাময় মহর্ষি, তাহাদিগের দ্বারা স্বরচিত রাম-চরিত গান করাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই কোমল-কণ্ঠ বালকদ্বয় যখন তাহাদের আজন্ম-দুঃখিনী জননীর সমক্ষে, শৈশব-সুলভ-নৃত্য-করতালিকাদি-সহযোগে ও অপ্রবুদ্ধভাবে রাম-চরিত গান করিত, তখন তাহাদের বনবাসিনী জননী, সজল-নয়নে এবং নিবিষ্ট-মনে সেই গান শুনিতে শুনিতে, হৃদয়ে অহর্নিশ প্রজ্বলিত রাম-বিরহানলের কথঞ্চিৎ শান্তি করিতেন[১]। তখন তপো-বনের চঞ্চল-নয়ন হরিণগণও নিস্পন্দ হইয়া কুমারযুগলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত[২]।

রামের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মহর্ষি বাল্মীকি যখন অযোধ্যার রাজ-সভায় আগমন-পূর্ব্বক, সেই নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম তাপস-কুমার-বেশী বালকযুগলের দ্বারা রাম-চরিত সংগীত করাইলেন, তখন অযোধ্যার সমৃদ্ধি-শালিনী মহাপরিষৎ একাগ্রমনে সেই অমৃতময় সংগীত শ্রবণ করিতে লাগিল। সমগ্র পারিষদ-মণ্ডলী 'অশ্রুমুখী' হই-লেন। শিশির কালের প্রভাতে, বিন্দু বিন্দু হিম-নিস্যন্দিনী, বাত-রহিতা

১—রঘু, ১৫—৩৪ রামস্য মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ।
তদ্বিয়োগ-ব্যথাং কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রতুঃ সুতৌ।

২—রঘু, ১৫—৬৮ মৈথিলী তনয়োদ্গীত-নিঃস্পন্দ-মৃগমাশ্রমম্।

বনস্থলীর ন্যায়, সেই সভা আনন্দে, বিস্ময়ে, মোহে, অশ্রুধারাপ্লুতা ও স্পন্দন-রহিতা চিত্র-লিখিতার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল[১]।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজ-সভায় উপবেশন করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট-চিত্তে ঐ বালক-সংগীত শ্রবণ করিতেছিলেন। বীত-স্পৃহ গুণজ্ঞ রাম হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে, বালকযুগলকে অসংখ্য ধন-রত্নাদি দান করিলেন। বালক-দ্বয়ের প্রবীণতা এবং জগৎপতি রামের দান-শীলতা দর্শন করিয়া সেই লোক প্রবাহ নিরতিশয় বিস্মিত হইল। বাল্মীকি ধীরভাবে এ সমুদয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসার-মালিন্য-মুক্ত অন্তঃকরণে সংপরোনাস্তি আনন্দের উদ্রেক হইল। কোমলকায় শিশুদ্বয়ের তাপস-বেশ-দর্শনে রামের করুণাময় হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি তখন স্নেহ-পূর্ণ-বচনে ঐ বালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কাহার সন্তান? কে তোমাদিগকে এমন সুমধুর সঙ্গীত শিখাইয়াছেন? কোন্ মহাকবি এ সঙ্গীতের রচয়িতা[২]?'

এ দিকে তাপসবেশী বালক-যুগল, রামের সম্মুখে, নৃত্য করিতে করিতে রামায়ণ-গানে উন্মত্ত। জ্ঞান হওয়া অবধি, বাল্মীকির আশ্রমে, রামায়ণে যে রামের অশেষ কীর্ত্তি-বিবরণ পাঠ করিয়াছে, ইনিই যে সেই রাম, সেই রামায়ণের নায়ক রাম, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। কি সুন্দর চিত্র! রামের মত পিতাকে লব-কুশ পিতা বলিয়া চিনিতে পারিল না বা লব-কুশের ন্যায় পুত্ররত্নকেও রাম চিনিতে পারিলেন না; নিরপরাধা দেব-যজন-সম্ভবা সীতার নির্ব্বাসনের, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত সূর্য্যবংশপতি রামের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। হিন্দুর চরম প্রায়শ্চিত্ত 'চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক প্রাজাপত্য' ইহার নিকট উল্লেখ-

১—রঘু, ১৫—৬৬ তদ্গীত-শ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
হিম-নিষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্ব্বাতেব বনস্থলী॥

২—রঘু, ১৫—৬৯।

যোগ্যই নহে। মহাকবি, অতি কৌশলে, 'দারত্যাগী' নৃপতির শাসন করিলেন।

রাম-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, লব-কুশ বিনয় সহকারে, ঐ মহর্ষি এই মহাকাব্যের রচয়িতা এবং আমাদিগেরও শিক্ষক বলিয়া বাল্মীকিকে নির্দ্দেশ করিলেন। লব-কুশের বাক্য-শ্রবণ-মাত্রেই সানুজ, রাম মহর্ষির চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, বিশাল অযোধ্যা রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তখন পরম-কারুণিক কবি বাল্মীকি, 'লব-কুশ যে মৈথিলীর গর্ভ-সম্ভূত পুত্র'—ইহা প্রকাশ-পূর্ব্বক সীতার পুনঃপরিগ্রহণ-প্রার্থনা জানাইলেন[১]।

মহাকবি-কালিদাসের অলোক-সামান্যা কল্পনা সুন্দরী, এই স্থলে যেন দশভুজার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুন্দর রামচরিত্রের প্রসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রজাগণের মনে সীতা-চরিত্র-সম্বন্ধে ঈষৎ সন্দেহের অঙ্কুরোৎপত্তিমাত্রেই, রাম কঠোরহৃদয়ে সীতা-বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সামান্য সন্দেহের পরিণাম যে এমন ভয়ানক হইবে, তাহা প্রজাপুঞ্জ তখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। সীতা-নির্ব্বাসনের পরক্ষণ হইতেই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। শুদ্ধ-শীলা জানকীর বিশুদ্ধ-চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া, আর সেই শারদ-চন্দ্রিকাবৎ সুনির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপের বিষয় চিন্তা করিয়া, প্রজাবৃন্দ, লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুশোচনায়, মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়াছিল। কি করিলে অযোধ্যার বিসর্জ্জিত শারদা প্রতিমা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কি করিলে সেই নিষ্কলঙ্ক-প্রকৃতি অগ্নি-পরীক্ষিতা দেবীর পুনঃ সন্দর্শন পাওয়া যায়, এই ভাবনায় প্রজাপুঞ্জ অহর্নিশ ব্যাকুল ছিল। রাম প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর তাহার প্রতিবিধানের পন্থা নাই। হস্তচ্যুত অক্ষ আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। রামের এবারকার জীবনের খেলা শেষ

১—রঘু, ১৫, ৬৯, ৭০।

হইয়াছে তিনি যথাসর্ব্বস্ব হারিয়াছেন। আর জিতিবার আশা নাই। এ সমস্ত বিষয় অযোধ্যার রাজা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রজা-গণের এতদিনে ভ্রান্তি-নিরাস হইয়াছে; জানকীর পবিত্র চরিত্রে, তাহাদের যে অলীক সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা দূর হইয়াছে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, এক্ষণে যদি জনক-দুহিতাকে পুনরায় গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে প্রজাগণের সন্তোষের আর অবধি থাকিবে না। এ সমস্ত বিদিত থাকিয়াও নৃপতি রামচন্দ্র, ইচ্ছানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না। জল-বিন্দু লোল প্রজা-হৃদয়ের অস্থৈর্য্য চিন্তা করিয়া, জানকী-সম্বন্ধে, তিনি একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। রাজার রাজ্য-পালন এবং প্রজা-রঞ্জন যে কীদৃশ কঠোর কার্য্য, তাহা কবি এই রাম-চরিত্রে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি সীতাগ্রহণের জন্য স্বয়ং অনুরোধ করিতেছেন বলিয়াই রামচন্দ্র কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

তাত! শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্নুষা তে জাত-বেদসি।
দৌরাত্ম্যাদ্রক্ষসস্তাং তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ॥
তাঃ স্বচারিত্রমুদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী।
ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্যে ত্বদাজ্ঞয়া[১]॥

জানকীর তথাবিধ নির্ব্বাসনে রামের অন্তঃকরণ নিরন্তর অসহ্য বেদনাপূর্ণ ছিল। বাল্মীকি অনুরোধ করিতেছেন, প্রজাবৃন্দও তাহাদের

১—রঘু, ১৫—৭২, ৭৩।—হে পরমপূজ্য! আমাদের সমক্ষেই আপনার স্নুষার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল। তিনি নিজেই নিজ-চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরন্ত রাক্ষসের দৌরাত্ম্য-শঙ্কা অত্রত্য প্রজা-বৃন্দের অন্তঃকরণ হইতে বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। অতএব মৈথিলী প্রথমতঃ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার প্রজাদিগের প্রত্যয়োৎপাদন করুন, তাহা হইলেই, আমি পুত্রবতী সীতাকে, আপনার আদেশে, পুনরায় গ্রহণ করিতে পারি।

ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছে, তবুও কিন্তু প্রজারঞ্জন রাম অকস্মাৎ সীতা-পরিগ্রহ স্বীকার করিলেন না।

রামের কথা শ্রবণমাত্রেই, বাল্মীকি শিষ্য-প্রেরণ-পূর্ব্বক আশ্রম হইতে মৈথিলীকে আনয়ন করিলেন। একদা রামচন্দ্র, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি-স্মরণ-পূর্ব্বক, পৌরজানপদদিগকে একত্র সমবেত করিয়া মহর্ষির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পরম-কারুণিক বাল্মীকি পুত্রবতী জনকতনয়াকে লইয়া রামের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। মলিন-মুখী সীতা যখন স্পন্দনরহিত সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার পরিধানে কাষায় বসন, নয়নদ্বয় স্বকীয় চরণমূলে অর্পিত, অঙ্গলতিকা ক্ষীণ অথচ প্রশান্ত। দেখিলেই মনে হয়, বুঝি সতীত্ব রমণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তখন—

জনাস্তদালোক-পথাৎ প্রতিসংহৃত-চক্ষুষঃ।
তস্থুস্তেঽবাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে ফলিতা ইব শালয়ঃ[১] ॥

বাল্মীকি বলিলেন 'মা! তোমার চরিত্র-সম্বন্ধে লোকের যাহাতে সকল সংশয় দূর হয়, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর।' বাল্মীকির আদেশ শ্রবণ করিয়াই দেব-যজন-সম্ভবা বিশুদ্ধশীলা সীতা, মহর্ষি-শিষ্য-প্রদত্ত পবিত্র-সলিলে আচমন পূর্ব্বক, একাগ্র-মনে, দুঃখ-ভরাধ্মাত-হৃদয়ে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—

বাঙ্মনঃ-কর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি[২] ॥

'মা ভূত-ধাত্রি! যদি আমি বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কিংবা কর্ম্মের

১—রঘু, ১৫—৭৮—জানকী উপস্থিত হইলে, সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব নয়ন সীতার দৃষ্টিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, ফলভরনত শস্যের ন্যায় অধোবদন হইল।

২—রঘু, ১৫—৮১।

দ্বারাও জীবনে কদাচ আমার পতির চরণে কোন প্রকার অপরাধ করিয়া না থাকি, আমার চরিত্র যদি নিষ্কলঙ্ক হয়, তবে মা! তোমার অঙ্কে আমায় স্থান দাও। এ চিরদুঃখিনীর দগ্ধ-হৃদয় নির্ব্বাপিত কর।'

পতিদেবতা সীতার কথা শেষ হইতে না হইতেই, হঠাৎ সভা-মধ্যবর্ত্তিনী ভূমি দ্বিধা ভিন্ন করিয়া, শতহ্রদার প্রভার ন্যায় অত্যুজ্জ্বল প্রভামণ্ডল উদ্গত হইল। সেই অত্যদ্ভুত জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যে, 'নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসনে' আসীনা, সমুদ্র-মেখলা, মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা আবির্ভূত হইলেন। ফণি-মালার উজ্জ্বল-শিরোমণি সমূহের বিমলালোকে ভূত-ধাত্রীর স্নিগ্ধ দেব-দেহ সমুদ্ভাসিত হইল; অমৃত-বর্ষি-চন্দ্রবৎ স্নেহ-বর্ষী নয়নে তিনি সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

পৃথিবী আবির্ভূত হইয়াই, দুহিতা সীতাকে স্বকীয় অঙ্কে ধারণ করিলেন। আজন্ম দুঃখিনী সাধ্বী জানকী অনিমেষ-নয়নে একবার জন্মের মত রামকে দেখিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতেই,—'না না'—এই কথা রামের মুখ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই, বসুন্ধরা, সীতাকে লইয়া নিমেষ মধ্যে সেই আলোকপথে পাতাল-প্রবেশ করিলেন। রামের চিরবিষাদময় জীবনাভিনয়ের এক প্রকার শেষ যবনিকা পতিত হইল[১]।

সতীর সতীত্বের জয় হইল। রামের প্রজারঞ্জন যজ্ঞে এতদিনে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। রাম সীতার চরিত্রোদাহরণে সমাজের একটী অশেষ মঙ্গল সাধিত হইল। চরিত্র-মাহাত্ম্যে সীতা জগদ্বাসীর হৃদয়ের চিরারাধ্য

১—রঘু, ১৫—৮২—এবমুক্তে তয়া সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যোভবাদ্ভুবঃ।
শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদ্যযৌ ॥
—৮৩—তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী।
সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীদ্ বসুন্ধরা ॥
—৮৪—সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাং।
মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ ॥

দেবতা হইয়া রহিলেন। চরিত্র-প্রভাবে রাম-চন্দ্র জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইলেন। রাম-সীতার পূজার ব্যপদেশে রাম-সীতার চরিত্রের পূজা হইতে লাগিল। বহুবৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ, রাম-সীতার পবিত্র চরিত পূজিত হইতেছে। ভারতের প্রতি নগরে, প্রতি জনপদে, প্রতি হৃদয়ে রাম-সীতা পূজিত হইতেছেন। যত দিন বিধাতার সৃষ্টি বিদ্যমান থাকিবে, সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ভারতবাসীর দেহে জীবন থাকিবে, তত দিন রাম-সীতার অনর্ঘ চরিত্র সর্ব্বত্র ভক্তিভরে অর্চ্চিত হইবে।

কবিগুরু বাল্মীকি, বিস্তৃত ভাবে, রাম সীতার যে বিরাট্ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাকবি কালিদাস, কবিগুরুর সেই চির-সুন্দরী সৃষ্টি হইতে, রসজ্ঞ ভাবুক পাঠকের উপযোগী করিয়া, সংক্ষেপে রাম-সীতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কালিদাসের চিত্রিত এই সংক্ষিপ্ত মূর্ত্তি সর্ব্বাংশে নিরবদ্য হইয়াছে। ইহাতে কালিদাসের লেখনী ধন্য হইয়াছে, সরস্বতীর বরদান সার্থক হইয়াছে, ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল ও গৌরব-যুক্ত হইয়াছে, আর আমরা—নীরস পাঠকেরাও কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি রাম-চরিত্রে যে অলোক-সামান্য আত্ম-ত্যাগের এবং সীতা-চরিত্রে যে অনন্য-রমণী-সুলভ সতীত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা, নিঃস্বার্থ আদর্শ মহাপুরুষের এবং সতী ললনার জন্মভূমি বলিয়া ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি এবং মহাকবি কালিদাস, সমগ্র জগতে, সীতার জন্য চিরকালের মত, যেন পবিত্রতার এবং সমবেদনার ধারা-দ্বয়বতী একটি নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে সীতার নামোচ্চারণ করিলেই, তাঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ পবিত্রতার এবং সমবেদনার উৎস উত্থিত হয়। 'সীতা' এই কতিপয় বর্ণের স্মরণ মাত্রেই হৃদয়ে পবিত্রতার এক অতি সুশীতল ছায়া পতিত হয়। পতিদেবতা সীতার উদ্দেশে মস্তক নত হইয়া আইসে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নিশীথ-স্বপ্ন।

অযোধ্যার আর এখন সে দিন নাই। এখন আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। জগতের কার্য্য করিতে রাম আসিয়াছিলেন, কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন—সকলেই অগ্রজের অনুগমন করিয়াছেন। আদর্শদেবী সীতার স্মৃতি বক্ষে লইয়া আদর্শদেব রাম লীলা-সংহার করিয়াছেন। যাইবার সময়ে, তিনি, লঙ্কাপতি বিভীষণকে দক্ষিণে চিত্রকূটের এবং পবন-তনয়কে উত্তরে হিমালয়ের আধিপত্য প্রদান করিয়া, ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যেন দুইটি অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন[১]।

তাঁহাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পুত্রগণের মধ্যে বয়ঃক্রমে এবং গুণ-গরিমায় কুশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাই কুমার-গণ ঐকমত্য-সহকারে তাঁহাকেই রাজ্যের বিশেষ বিশেষ ধনরত্নাদি অর্পণ করিলেন, পরে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট রাজ্যে গমন করিয়া, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য, সেতুবন্ধন, কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যাদি, গজ-গ্রহণ প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন[২]।

রাম কুশাবতী-নগরে কুশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কুশ তথায় পরম উৎসাহে রাজত্ব করিতেছেন। অন্যান্য কুমারগণের প্রত্যেককেই এক একটি পৃথক্ রাজ্য অর্পিত হইয়াছিল; তাঁহারাও নিজের নিজের রাজ্যের শাসনে ব্যাপৃত হইলেন। এদিকে অযোধ্যা-নগরী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। রামের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যারও সকল সম্পদ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। দুরন্ত কাল, ক্রমে অযোধ্যাকে মহারণ্যে পরিণত করিতে বসিয়াছে। যেন অযোধ্যায় একটা মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে।

১—রঘু, ১৫—১০১, ২—রঘু, ১৬—২।

সূর্য্যবংশের রাজধানী, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার স্থল, পুণ্য-সলিলা সরযূ-তীর-শোভিনী অযোধ্যার দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছে। অথবা যে রাজা সীতার ন্যায় সাধ্বী দেবতার প্রতি ঐরূপ বিচার, তাহার পরিণামও বুঝি এই প্রকারই হয়।

যত্র স্ত্রিয়স্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ॥

যে স্থানে সাধ্বী রমণীর পূজা হয়, তথায় দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অযোধ্যার প্রজাগণ তাহাদের সাধ্বী রাজ-লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করে নাই, তাই বুঝি তথায় এখন দেবতার মন্দিরে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অযোধ্যার সকল সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। অযোধ্যার রাজপথ জনশূন্য, সৌধাবলী হতশ্রী, উদ্যান-সমূহ জঙ্গলাকীর্ণ, বাপী-তড়াগাদি প্রায় বিশুষ্ক, কচিৎ বা ঘন-পঙ্কিল-জল-পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অযোধ্যার সকল সম্পদ—সকল সৌভাগ্যই যেন রাম সীতার সহিত তিরোহিত হইয়াছে। জনসঞ্চার-শূন্য, গহন অরণ্যে পরিপূর্ণ, হিংস্র-শ্বাপদ সঙ্কুল অযোধ্যায় কাহার সাধ্য প্রবেশ করে।

অযোধ্যার রাজবংশের প্রধান পুরুষ কুশ, বহুদিন যাবৎ তাঁহার নিজ-রাজধানী কুশাবতীতে আছেন। সৌভাগ্য সম্পদে কুশাবতী পুণ্যতম অযোধ্যার তুল্য। কুশের দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। এমন সময়ে, একদা গভীর রজনীতে, যখন রাজ-প্রাসাদের প্রায় সকলেই নিদ্রিত, আলোকমালা নির্ব্বাপিত, কেবল, মহারাজ কুশ যে কক্ষে শয়িত, তথায় কএকটি প্রদীপ অতিস্তিমিত-ভাবে জ্বলিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কুশের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার শয়নকক্ষের এক পার্শ্বে একটি বনিতা চিত্রার্পিতার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা। ইতঃপূর্ব্বে কুশ সে ললনাকে আর কখনও দেখেন নাই। ললনার মূর্ত্তি বিষাদময়ী, পরিচ্ছদাদি প্রোষিতভর্তৃকা কামিনীর অনুরূপ।
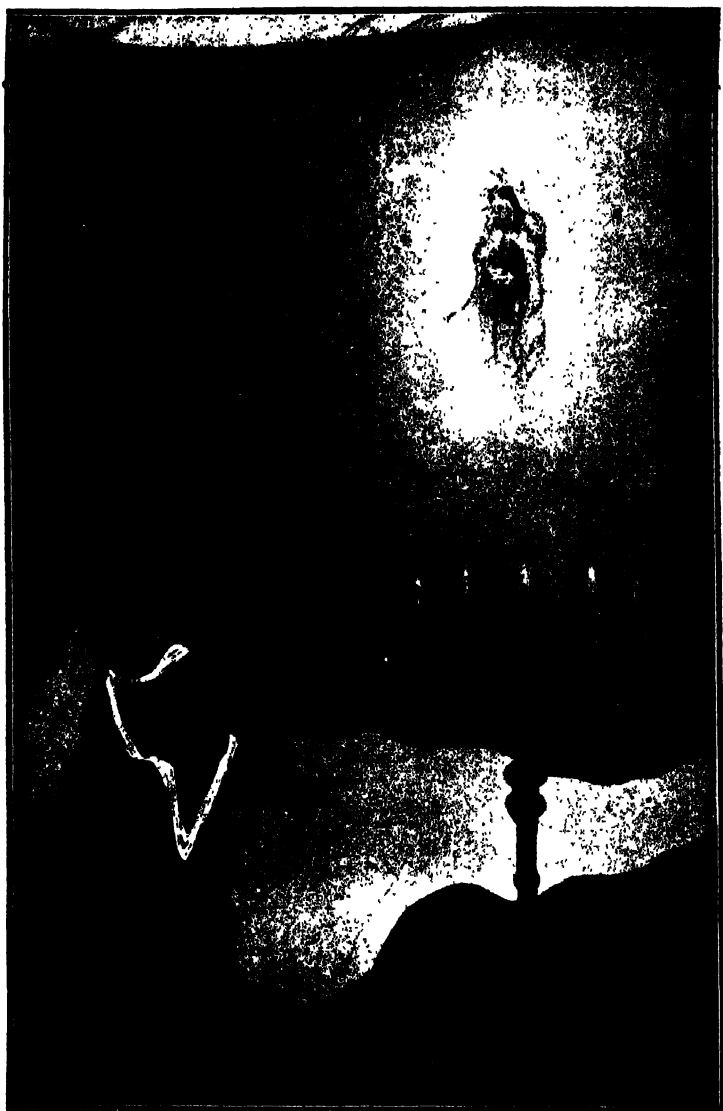
নিশীথে কুশ ও অযোধ্যার অধিদেবতা

Mohila Press, Calcutta.

দেখিলেই মনে হয় বুঝি বিষণ্ণতা শরীর-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক, মহারাজ কুশের সমীপে উপনীত হইয়াছেন[১]।

অর্গল-বদ্ধ কক্ষে অকস্মাৎ গভীর রজনীতে ললনা সমাগমে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া, শয়ান নরপতি, শয্যা হইতে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ ঈষদুন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন[২]। "অর্গল-বদ্ধ কক্ষে কি উপায়ে তুমি প্রবেশ করিলে? কে? তোমার ত কোন যোগ-প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না; শিশির-মথিতা মৃণালিনীর ন্যায় তোমার আকৃতি বিষাদময়ী কেন? তুমি কি শরীরিণী করুণা? ভদ্রে! কে তুমি? কাহার ভার্য্যা? আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন? 'জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের হৃদয় নিয়ত পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ'—এইটি বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া, তোমার যাহা বক্তব্য থাকে—বল[৩]।"

তখন সেই বিষাদিনী ললনা সজল-নয়নে ও কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন—"রাজন্! আপনার পিতা তাঁহার স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমন-কালে যে নগরের সমস্ত পৌরবর্গকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এই হত-ভাগিনী সেই জন-হীন নগরের অনাথা অধিদেবতা[৪]।" "নর-নাথ! সম্পদ্ এবং সৌভাগ্য-গরিমায়, ইন্দ্রের অমরাবতী বা ধন-পতি কুবেরের অলকা-নগরীও এক সময়ে আমার নিকট পরাজিত ছিল। আর আজ সেই আমি—সেই অতীত-গৌরব-সাক্ষিণী হতভাগিনী আমি, আপনার ন্যায়

১—রঘু, ১৬—৪ অপার্দ্ধরাত্রে স্তিমিত প্রদীপে শয্যা-গৃহে সুপ্ত-জনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থ-কলত্র-বেশামদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ॥

২—রঘু, ১৬—৬।

৩—রঘু, ১৬—৭—লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে যোগ-প্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে;
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥
—৮—কা ত্বং শুভে! কস্য পরিগ্রহো বা কিংবা মদভ্যাগম-কারণং তে?
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং মনঃ পরস্ত্রী-বিমুখ-প্রবৃত্তি॥

৪—রঘু, ১৬—৯।

'সমগ্র-শক্তি'-সম্পন্ন অধীশ্বর বিরাজমান থাকিতেও এই প্রকার 'করুণ অবস্থা' প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার দুঃখের ইয়ত্তা নাই। নরেন্দ্র! আমি যখন আমার সেই অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করি, তখন বক্ষঃ শতধা বিদীর্ণ হয়[১]।"

"পূর্ব্বে আমার যে নগরে, রজনীতে দীপ্তিমৎ-নূপুর-ধারিণী সীমন্তিনীরা রাজ-পথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন, আর তাঁহাদের রত্ন-খচিত নূপুরালোকে রাজ-বর্ত্ম আলোকিত হইত, পৃথগালোকের আর প্রয়োজনই হইত না, এখন সেই নগরের সেই সকল রাজপথে আমিষলোলুপ উল্কামুখ শৃগাল-শ্রেণি বিকট শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে[২]।

"মহারাজ! পূর্ব্বে আমার যে সকল বাপী-দীর্ঘিকায় প্রমদাগণ সুখে সন্তরণ করিতেন, আর তাঁহাদের বাহুবল্লী-প্রহত হইয়া নীল-জল-রাশি মৃদঙ্গবৎ ধীর ধ্বনি করিত, এখন সেই সকল দীর্ঘিকার জলে বন্যমহিষাদি অবতরণ পূর্ব্বক, তাহা তাহাদের কঠিন শৃঙ্গের দ্বারা নিয়ত আহত করিতেছে, এখন আর তাহার সে 'স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষ' নাই, দীর্ঘিকা যেন মর্ম্মান্তিক যাতনায় অস্থির হইয়া একটা কঠোর চীৎকার করিতেছে[৩]।

"নর-নাথ! পূর্ব্বে প্রতি অট্টালিকার সম্মুখে ময়ূরের উপবেশনের জন্য 'বাস-যষ্টি প্রোথিত থাকিত, যখন ঐ সকল প্রাসাদে নাগরিক-গণ মৃদঙ্গ-বাদন করিতেন, তখন মৃদঙ্গ-ধ্বনিকে মেঘ-ধ্বনি মনে করিয়া,

১—রঘু, ১৬—১০—বস্বোক-সারামভিভূয় সাহং সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্র-শক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্॥

২—রঘু, ১৬—১২—নিশাসু ভাস্বৎকল-নূপুরাণাং যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ স বাহ্যতে রাজ-পথঃ শিবাভিঃ॥

৩—রঘু, ১৬—১৩—আস্ফালিতং যৎ প্রমদা-করাগ্রৈর্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্॥

ময়ূরগণ ঐ সমস্ত 'বাস-যষ্টির' উপরে উঠিয়া, পুচ্ছবিস্তার পূর্ব্বক কত নৃত্য করিত, কত আনন্দ করিত। এখন আর সে বাস-যষ্টি নাই, সে 'মৃদঙ্গ' নাই, সব বিলুপ্ত হইয়াছে; আছে শুধু সেই শূন্য অট্টালিকা সমূহ। নগর এখন গহন-বনে পরিণত! আর সেই গহন-কানন-জাত দাবানল-স্ফুলিঙ্গে আমার সেই রমণীয়-কান্তি কলাপি-নিচয়ের কলাপ-গুচ্ছও বিদগ্ধ! হায়, আমার সেই সুন্দর 'ক্রীড়াময়ূর'-সমূহ এখন 'বন-বর্হীর' ন্যায় হত-শ্রী হইয়াছে[১]!"

"রাজন্! পূর্ব্বে বিলাসিনীগণ, হর্ম্ম্যমালার যে সকল সোপান তাঁহাদের অলক্তক-সিক্ত চরণ-বিন্যাসে সুরঞ্জিত করিতেন, সেই সকল সোপান, এক্ষণে, মৃগঘাতী ভীষণ ব্যাঘ্র-সমূহের শোণিত-দিগ্ধ চরণাঘাতে আহত হইতেছে। প্রভো! প্রাসাদ-ভিত্তিতে পূর্ব্বে নানাবিধ পদ্মবন অঙ্কিত ছিল, সেই সকল পদ্ম-বনে বৃহদ্ বৃহদ্ দ্বিপেন্দ্র অঙ্কিত ছিল, আর তাহাদিগকে তাহাদের প্রিয়তমকরেণুরা প্রীতিভরে মৃণাল-ভঙ্গ অর্পণ করিতেছে,—অঙ্কিত ছিল। সেই সব চিত্রাবলী দর্শন করিলে মনে হইত, সত্যই বুঝি কমল-বনে অবতীর্ণ হইয়া করীর সহিত করি-বধূগণ ক্রীড়া করিতেছে। সে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! হায়, এক্ষণ, সেই সকল আলিখিত মাতঙ্গকে বাস্তবমাতঙ্গভ্রমে, কুপিত মৃগেন্দ্রগণ, সশব্দে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক, তাহাদের কুম্ভের উপর পড়িতেছে। সিংহের প্রখর নখাঘাতে সেই চিত্রাবলী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে[২]।"

১—রঘু, ১৬—১৪—বৃক্ষেশয়া যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গাৎ মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহত-শেষবর্হাঃ ক্রীড়ানয়ূরা বন-বর্হিণত্বম্॥

২—রঘু, ১৬—১৫—সোপান-মার্গেষু চ যেষু রামা নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্র-দিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে॥

—১৬—চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভির্দত্তমৃণাল-ভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্ন-কুম্ভাঃ সংরব্ধ-সিংহ-প্রহৃতং বহন্তি॥

"রাজন্! সৌধস্তম্ভে যে সকল দারুময়ী রমণীমূর্ত্তি সংযোজিত ছিল, যত্নাভাবে তাহাদের বর্ণ-বিন্যাস বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং চিত্রাবলীও ধূসর হইয়াছে। আর সেই সমুদয় মূর্ত্তির উপরে সর্পকুল তাহাদের নির্ম্মোক-মোচন করিয়া, সে গুলিকে একান্ত হত-শ্রী করিয়াছে, সেই ছবিগুলির দশা দেখিলে কে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে[1] ?"

"নরপতে! আমার অযোধ্যার হর্ম্ম্যমালার এখন আর সে সুধা-ধবলী কান্তি নাই। সংস্কারের অভাবে তাহাদের সমুচ্চ ধবলকায় এখন গাঢ় শ্যামবর্ণে আবৃত হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে তৃণাবলী জন্মিয়াছে। চন্দ্র-কিরণ এখনও 'মুক্তা-গুণ' ধবল আছে সত্য, কিন্তু তাহা ঐ সকল প্রাসাদে আর পূর্ব্ববৎ প্রতিফলিত হয় না[2]।"

"রাজন্! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,—আমার যে সকল কোমল উদ্যান-লতিকা কুসুম-গুচ্ছে অলঙ্কৃত হইলে, পূর্ব্বে বিলাসিনীগণ, সদয়-হৃদয়ে, ধীরে ধীরে তাহাদের শাখা আনত করিয়া কুসুম চয়ন করিতেন, এক্ষণে বানর এবং বানর-কল্প নির্দ্দয় নিষাদ-সমূহ সেই সকল কুসুমাভরণা ললিত-লতিকা শ্রেণীকে যথেচ্ছ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে[3]।"

"প্রভো! আমার সেই পুণ্য-প্রবাহিণী সরযূর আর এখন সে অবস্থা নাই। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায়, তাহার তটে নিয়ত নানাবিধ পূজোপহার সজ্জিত থাকে না। স্নানীয় সুগন্ধি-দ্রব্যে এখন আর তাহার জল সুবাসিত

১—রঘু, ১৬—১৭—স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানাং উৎক্রান্তবর্ণ-ক্রম-ধূসরাণাং।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গাৎ নির্ম্মোক-পট্টাঃ ফণিভির্ব্বিমুক্তাঃ॥

২—রঘু, ১৬—১৮—কালান্তরশ্যাম-সুধেষু নক্তং ইতস্ততোরূঢ়-তৃণাঙ্কুরেষু।
ত এব মুক্তা-গুণ-শুদ্ধয়োঽপি হর্ম্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ॥

৩—রঘু, ১৬—১৯—আবর্জ্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ ক্লিশ্যন্ত উদ্যান-লতা মদীয়াঃ॥

হয় না’। তাহার সকল সৌভাগ্যই বিলুপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সেই সরযূ-তটবর্ত্তী স্নিগ্ধ বেতস-লতা-মণ্ডপগুলি। কিন্তু রাজন্! সে গুলিও শূন্য, জন-প্রচার-বর্জ্জিত! সরযূর দশাদর্শনে বুক ফাটিয়া যায়! তাই প্রার্থনা করি, নরনাথ! আপনার পিতা রামচন্দ্র যেমন তাঁহার নৈমিত্তিক মানুষ-দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, স্বকীয় সনাতনী ঐশী তনু গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ, আপনিও আপনার এই নৈমিত্তিক নিকেতন পরিহার করিয়া, আপনার সনাতনী কুল-রাজধানীর অধিদেবতা আমাকে অনুগ্রহ করুন। ‘অযোধ্যা রাজ্যে ফিরিয়া চলুন’[১]।

অকস্মাৎ স্তব্ধ বিতন্ত্রী-ঝঙ্কারের ন্যায়, অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার করুণকণ্ঠ-স্বর নিরুদ্ধ হইল। মহারাজ কুশও মন্ত্র-মুগ্ধবৎ অযোধ্যা-প্রতিগমনে প্রতিশ্রুত হইলেন। অমনি সেই ‘অদৃষ্ট-পূর্ব্বা’ নগরাধিদেবতাও মানবী মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবী-দেহ ধারণ করিয়া, প্রসন্ন-বদনে তিরোহিত হইলেন। মহারাজ কুশের এ সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ‘কুল-রাজধানী’ অযোধ্যার দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি বিষাদে, লজ্জায়, দুঃখে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। সেই মানবী দেবীর উদাত্ত বর্ণন শ্রবণে, কুশের নয়নের সম্মুখে যেন সেই প্রাচীন অযোধ্যার সমৃদ্ধিমতী মূর্ত্তি এবং বর্ত্তমান অযোধ্যার এই বিষাদিনী মূর্ত্তি যুগপৎ ভাসিতে লাগিল।

মহাকবি কালিদাস এ যাবৎ অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কাব্যের প্রতিপাদ্য-বিষয়-সমূহ এমন ভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত, যাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে না পারেন যে, ‘কবির

১—রঘু, ১৬—২১—বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি স্নানীয়-সংসর্গ মনাপ্নুবন্তি।
—উপান্ত-বানীর-গৃহাণি দৃষ্ট্বা শূন্যানি দূয়ে সরযূ-জলানি॥
—২২—তদৰ্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্॥

অভিপ্রায় এখন অমুক পদার্থের বর্ণন।' কবির উদ্দেশ্য কাব্যের সর্ব্বত্রই একান্ত নিগূঢ় থাকা উচিত। নতুবা, কোন বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বেই কবি যদি মুখ-বন্ধ করিয়া বলেন যে, আমি এখন অমুক বিষয় বর্ণন করিব,—তবে তাহা অতীব অশ্রদ্ধেয় হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহাকবি কালিদাস তদীয় কাব্যাবলীর সর্ব্বত্রই ঐ দোষ বর্জ্জন করিয়াছেন। এমন কৌশলে তাঁহার প্রতিপাদ্য বস্তুর বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকবৃন্দ কবির সে কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই, তদীয় বর্ণিত বিষয়ের মনোরমতায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কালিদাসের ইন্দুমতী-সৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কোথাও ইন্দুমতীর কেবল রূপ বা গুণের বর্ণনায় তত প্রয়াস করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে, মধ্যে মধ্যে ইন্দুমতীর এমন এক একটি বিশেষণ দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারাই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বর্ণন হইতে যদি ইন্দুমতীর সেই সকল বিশেষণগুলি একত্র সমাহৃত করা যায়, তবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রীহর্ষের দময়ন্তীর শত-শ্লোক-ব্যাপিনী সৌন্দর্য্যবর্ণনাও ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকরী। গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্রই কবির উদ্দেশ্য অতি রহস্যপূর্ণ রাখিতে হইবে। সেই রহস্য-ভেদ হইলেই কাব্যের একটি বিশেষ চমৎকারিতার ব্যাঘাত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই, অনেক গ্রন্থে লিখিত থাকে, 'পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনিই আমাদের আলোচ্য নাটকের (বা গ্রন্থের) নায়ক (বা নায়িকা) অমুক।' ইহা অত্যন্ত অন্যায়, রীতি-বিরুদ্ধ। কৌশলে সামাজিকদিগের সম্মুখে পাত্রের পরিচয় দিতে হইবে। যে স্থানে সেই কৌশলের অভাব ঘটে, তথায় কাব্যেরও সন্ধিভঙ্গরূপ একটা প্রধান দোষ জন্মে। এই দোষের জন্য গ্রন্থকার অপরাধী। গ্রন্থ-কারের মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, সৌন্দর্য্য-[illegible] করা তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং যাহা কিছু সৌন্দর্য্যের

পরিপন্থী, সঙ্কীর্ণ কিংবা নীচ, তাহা অকুন্ঠিত চিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অযোধ্যার সম্পদের দিনে, যখন দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম প্রভৃতি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যখন অযোধ্যা ইন্দ্রের অমরাবতী অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে অধিকতর গৌরব-শালিনী ছিল, তখন কিন্তু কবি অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। কদাচিৎ একটি বিশেষণ দিয়া, কখনো বা প্রসঙ্গতঃ একটু ইঙ্গিত করিয়া, কবি, অযোধ্যার অপার্থিব সম্পদের আভাস দিয়াছেন মাত্র। আর এখন সেই সোণার অযোধ্যা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অমনি কবিও, তাঁহার অবাধ-কল্পনা-প্রভাবে, অযোধ্যার সেই লুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক, লোক-নয়নের সম্মুখে, এক অতি নিরুপম চিত্র উত্তোলন করিয়া ধরিয়াছেন। সম্পদের দিনে সম্পদ যতদূর হৃদয়াকর্ষিণী, বিপদের দিনে, দুঃখের দিনে ঐ সম্পদের স্মারিতমূর্ত্তি তদপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শিনী। আবার যদি দুঃখের দিনের অবস্থার সহিত, সেই অতীত সুখের অবস্থার তুলনা করা যায়, তবে উহা যে কি প্রকার মর্ম্ম-স্থল-স্পর্শিনী ও হৃদয়োন্মাদিনী হয়, তাহা সহৃদয়-গণের অনুভব-গম্য। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। তাই মহাকবি অযোধ্যার বিষাদিনী পরম দুঃখিনী অধিদেবতাকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তাঁহারই মুখ দিয়া, তাঁহার সেই অতীত সুখের অবস্থা এবং বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থা উভয়ই কীর্ত্তিত করাইতেছেন। রাজমহিষী যেন অনাথা ভিখারিণী হইয়া পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছেন। আর করুণ কবি কালিদাস সেই রাজমহিষীর সহিত নিজে ত কাঁদিতেছেনই, সেই সঙ্গে আমাদিগকেও কাঁদাইতেছেন। কবি-সৃষ্টির এই চরমোৎকর্ষ দর্শন করিতে করিতে পাঠক তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পদ-গর্ব্ব—বিভব-মাৎসর্য্য দূরীভূত হইতেছে। পাঠক-হৃদয়ে রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, সত্ত্ব-গুণের

আবির্ভাব হইতেছে। তখন পাঠক তাঁহার সেই সত্ত্ব-প্রধান চিত্তে ভঙ্গুর সম্পদের নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন—

'যদু-পতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়[১] ॥'

১—যদু-পতি শ্রীকৃষ্ণের সেই মথুরাপুরী আজ কোথায়? শ্রীরামচন্দ্রের সমৃদ্ধিশালিনী উত্তর-কোশলাই বা এখন কোথায়? কাল-সাগরের অতলগর্ভে সমস্তই নিমগ্ন হইয়াছে। সুতরাং এই সকল চিন্তা করিয়া মনঃস্থির কর। এ জগৎ যে নিতান্ত অসৎ, ক্ষণভঙ্গুর, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া লও।

ত্রিংশ অধ্যায়।

অধঃপতন।

মহারাজ কুশ, প্রভাতে সভাস্থ হইয়া অমাত্য-পরিষদদিগের নিকট পূর্ব্ব-রজনীর অদ্ভুত কাহিনী বর্ণন করিলেন। রামচন্দ্রের অযোধ্যার অধিদেবতার সেই দুঃখময়ী উক্তি, সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি এবং সেই দীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, কুশ মুহুর্মুহুঃ বিষণ্ন হইতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গ স্থির করিলেন যে, না—কুশাবতীতে আর থাকা উচিত নহে। অচিরেই অযোধ্যাগমন আবশ্যক। অত্যল্পকাল মধ্যেই কুশাবতী ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিয়া, কুশ সদলবলে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই, নরনাথ, রাজ্যের ও রাজধানীর অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন এবং একান্ত সাবধানতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিরন্তর রাজ-কার্য্য-পর্য্যালোচনায় যদি কখনও কুশের শ্রান্তি অনুভূত হইত, তবে তখন, তিনি, সঙ্গীতাদির আলোচনা করিতেন, মৃগয়াদ্বারা চিত্ত-বিনোদন করিতেন, কখনও বা, বীচি-মালিনী সরযূর বক্ষে নৌকারোহণে, সলিল-বিলাসিনী রমণীদিগের জল-বিহার দর্শন করিয়া, স্বকীয় অতুল-ঐশ্বর্য্য-উদ্বেজিত হৃদয়ের প্রীতিবিধান করিতেন। জল-বিহারিণীগণের জল-ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে, যখন আনন্দভরে, তাঁহার হৃদয় স্তিমিত হইয়া আসিত, তখন নর-নাথ পার্শ্ব-বর্ত্তিনী চামর-ধারিণী কিরাত-বালাকে সেই জল-তরঙ্গিণী-সমূহের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেন। সরল-হৃদয়া কিরাত-তনয়া, মুগ্ধ-নয়নে, তরঙ্গিণী সরযূর বক্ষে, নৃপতি-প্রদর্শিত সেই তরঙ্গ-চঞ্চল-রাজহংসীবৎ রমণীদিগের অঙ্গহার দর্শন করিত[১]।

১—রঘু, ১৬—৫৪,।৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬।

আমরা, ইতঃপূর্ব্বে, সূর্য্যবংশীয় অন্য কোন নৃপতির এবংবিধ ক্রীড়াদর্শনোৎসুক্যের কোনরূপ পরিচয় পাই নাই। অবিবাহিত তরুণ কুশ,—যিনি সেই কুশাবতীতে, নিশীথ-সময়ে, অকস্মাৎ নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে উপনতা অযোধ্যার অধিদেবতাকে দৃঢ়-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং
মনঃ পরস্ত্রী-বিমুখ-প্রবৃত্তি[1] ॥

"জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের মন নিয়ত পর-কলত্র বিমুখ—এই কথাটি ভাবিয়া তোমার যাহা বক্তব্য বলিতে পার।" তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মহারাজের পক্ষে এই প্রকার আমোদ প্রমোদ দোষাবহ না হইলেও, শুদ্ধশীলা পতি-দেবতা সীতার অগ্নিপরীক্ষাতেও যে রাজ্যের প্রজাগণ একসময়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারিয়াছিল না,—

'অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু
লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ[2] ॥

বলিয়া সীতাময়জীবিত রামচন্দ্র, লোকাপবাদ-ভয়ে, যে রাজ্যের সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মীকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই অযোধ্যা-রাজ্যের অপরিণীত রাজার পক্ষে,—সেই রাম-সীতার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্রের পক্ষে এবংবিধ আমোদ যে কদাচ অভিপ্রেত এবং প্রশংসনীয় নহে, ইহা মহাকবি অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিলেন।

রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধান সম্পূর্ণ হইলে নিশ্চিন্ত-হৃদয় কুশ, কুমুদ্বতী-নামিকা একটি পরমসুন্দরী নাগ-কন্যার পাণি-পীড়ন করিলেন।[3]

১—২৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন।। ২—২৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন। ৩—রঘু, ১৬—৮৫, ৮৬, ৮৭ ৮৮,।

ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতির,—মগধ-বিদর্ভ-মিথিলা প্রভৃতির পরম সম্মানিত প্রাচীন রাজ্য-সমূহের অধিপতিগণের দুহিতারা যে রাজ্যের রাজ-মহিষী হইতেন, রাজ্যের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীজ্ঞান করিয়া, প্রজামণ্ডলী ভক্তিভরে যাহাদের চরণে প্রণাম করিত, দেবীর দেবী সীতা যে বংশের কুলবধূ, সেই বংশের অবতংস, রাম-সীতার জ্যেষ্ঠ-তনয়, মহারাজ কুশ, নাগ-নন্দিনী কুমুদ্বতীর পাণি-গ্রহণ করিলেন, অযোধ্যার বৈবস্বতমনুর বংশের পক্ষে ইহা কল্যাণকর হইল কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়।

ফলতঃ, আমরা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, রাম-রাজত্বের পর হইতেই অযোধ্যার সুখ-স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহারাজ দিলীপ হইতে রাম পর্য্যন্ত নৃপতিগণের মধ্যে যে সমুদয় গুণ, যে সমুদয় হৃদয়-সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই গুণাবলী রামের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটি একটি করিয়া ক্রমে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে!

মহারাজ কুশ শৌর্য্য-বীর্য্যের অদ্বিতীয় আধার হইয়াও, দুর্জ্জয়নামক এক দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হইলেন, তাহাকেও নিহত করিলেন। সাধ্বী রাজ-মহিষী কমুদ্বতীও কুশের অনুগমন করিলেন। 'সীতার পুত্র-বধূ তাঁহার অনুরূপ কার্য্য করিয়া অক্ষয়-পতি-লোক-প্রাপ্ত হইলেন'[১]।

বীরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইলে, অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়, অনন্ত কীর্ত্তি জন্মে? যশোজ্যোতিতে উভয়-লোক আলোকিত হয়। কুশেরও তাহাই হইল। সব সত্য, কিন্তু আহবক্ষেত্রে শত্রু-শায়কে প্রাণ-পরিহার, সৌরবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে আর ঘটে নাই, এই প্রথম। রামের আত্মজের এই মৃত্যু অযোধ্যার রাজবংশের যেমন গৌরব-জনক, তেমনই কিঞ্চিৎ অগৌরবেরও পরিচায়ক। চিরদিন যাঁহারা শত্রুকে

১—রঘু, ১৭,—৫,১৬, ৭।

পদ-দলিত করিয়া মহোল্লাসে রাজ-ধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন, আজ সেই বংশের প্রধান পুরুষ শত্রু-দলন করিলেন সত্য, কিন্তু নিজেও দলিত হইলেন। এই ব্যাপার যে অযোধ্যার রাজ-বংশের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ পরম্পরার একটা প্রধান দ্যোতক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অযোধ্যার অভ্রংভেদী গৌরবস্তম্ভের সমুন্নত শির যে কি প্রকারে, ক্রমে, ক্রমে, লবণ-জর্জ্জর সৌধ-শিরের ন্যায় ক্ষীণ ও স্খলিত হইতেছিল, তাহা মহাকবি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিলেন।

কুশ, যুদ্ধযাত্রার সময়ে, 'মন্ত্রি-বৃদ্ধ'দিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে যদি আর প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তবে আমার পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিও।[১] তদনুসারে কুমার অতিথি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। কুশনন্দন অতিথির রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র-রাজ্য আনন্দে হাসিয়া উঠিল। তিনি—

'বন্ধচ্ছেদং স বদ্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্।
ধুর্য্যাণাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহঞ্চাদিশদ্ গবাম্[২] ॥
ক্রীড়া-পতত্রিণোঽপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ।
লব্ধ-মোক্ষাস্তদাদেশাৎ যথেষ্ট-গতোয়োঽভবন্[৩]॥

মহারাজ অতিথি, রাজ্যে যাহার যে দুঃখ ছিল, যে অভাব ছিল, সে সমস্তের মোচন করিয়া, কেবল পার্থিব রত্ন-খচিত রাজ-সিংহাসনে নহে, প্রজার অপার্থিব হৃদয়-সিংহাসনেও অধিষ্ঠিত হইলেন।

১—রঘু, ১৭—৮।

২—রঘু, ১৭—১৯—, ৩— ২০— } অতিথি রাজা হইয়া বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিলেন, যাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদিগের সে দণ্ড রহিত করিলেন, যে সমুদয় জন্তু, ভার বহন করিত, তাহাদের মুক্তি দিলেন, আর তাহাদিগকে ভার বহিতে হইত না। দুগ্ধবতী ধেনুর দুগ্ধ-দোহন নিষেধ করিলেন। ক্রীড়া-বিহঙ্গম-গণ, তাঁহার আদেশ-ক্রমে, পঞ্জর-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যে দিকে প্রাণ যায়,—উড়িয়া গেল।

স্বকীয় অত্যুজ্জ্বল-প্রজ্ঞালোক-প্রভাবে তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, নিয়ত কূট-নীতির আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন কাতর্য্যের লক্ষণ, ভীরুত্বের চিহ্ন, এবং একান্ত নীতি-বিরহিত পাশববলে রাজ্য-শাসনও হিংস্র-ব্যাঘ্রাদির নিরীহ মৃগ-শাসন-তুল্য[১]। রাজ্যের সুশাসন করিতে হইলে —নীতি এবং শৌর্য্য—উভয়ই আবশ্যক। অতিথি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশব-বলে রাজ্য-জয় হয় বটে, কিন্তু রাজ্যবাসীর হৃদয়-জয় হয় না।

যশস্বী অতিথি, সূর্য্যবংশের চির প্রথানুসারে, পুত্র নিষধের হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ পূর্ব্বক, ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিয়া, যথাসময়ে পুণ্যার্জ্জিত লোকে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নিষধের পর, নল, নভ, পুণ্ডরীক, দেবানীক, অহীনগু, পারিযাত্র, শিল, উন্নাভ, বজ্রণাভ, শঙ্খন, অশ্বিরূপ, বিশ্বসহ, হিরণ্যাভ, কৌশল্য, ব্রহ্মিষ্ঠ, পুত্র, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন এবং সুদর্শন-তনয় অগ্নিবর্ণ[২]—এই কয়জন নৃপতি অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে ক্রমে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অগ্নিবর্ণ আসন্ন-প্রসবা মহিষীকে অকূল শোক-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াই কালিদাস তদীয় রঘুবংশের শেষ করিয়াছেন।

মহারাজ ধ্রুব-সন্ধির সংসারে তত আসক্তি ছিল না। তাঁহার পুত্র সুদর্শন যখন অতি শিশু, তখন ধ্রুবসন্ধি ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রবীণ জৈমিনির শিষ্যত্ব স্বীকার-পূর্ব্বক, যোগবলে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়েন[৩]। তাঁহার নির্ব্বাণের পর, প্রজাকুল অনাথ হইল দেখিয়া, অমাত্যবর্গ সেই এক মাত্র 'কুলতন্তু' সুদর্শনকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

১—রঘু, ১৭—৪৭—কাতর্য্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্য্যং শ্বাপদ-চেষ্টিতম্।

২—রঘু, ১৮—, (যথাক্রমে) ১, ৫, ৬, ৮, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, এবং ১৯—।

৩—রঘু—, ১৮শ ২৩।

প্রজাপুঞ্জের হৃদয় আশ্বস্ত হইল। ভারতবাসিগণ চিরদিনই রাজাকে দেবতার অংশ-জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, রাজাও প্রজাদিগকে পুত্রাধিক-স্নেহে পালন করিয়া থাকেন। অযোধ্যার শিশু নরপতিকেও প্রজাগণ দেবশিশুতুল্য জ্ঞান করিয়া, উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিত। কুমারের বয়ঃক্রম যখন মাত্র ছয়বৎসর, তখন তিনি হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজ-বীথিকায় ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। শৈশবসুলভ চাঞ্চল্য-নিবন্ধন যদি বা ভূপতিত হয়েন, এই ভয়ে, পরিচালক সেই 'উজ্জ্বল-নেপথ্য' মুগ্ধকান্তি কুমারকে ক্রোড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। আর প্রকৃতিপুঞ্জ চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া, অনিমেষ-নয়নে ও ভক্তি-পূর্ণ মনে, তাহাদের সেই ভাবী অধীশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইত[১]।

ক্রমে কুমার যৌবন-সীমায় উপনীত হইলেন। পৌরগণেরও অন্তঃকরণ আশায় উৎফুল্ল হইল। চতুর্দ্দিকে দূতী প্রেরিত হইল। তাহারা নানা দিগ্‌-দেশান্তর হইতে রাজ-কুমারীগণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া লইয়া আসিল। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকাম অমাত্য-বৃন্দ, আভিজাত্যে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বোত্তমা সুদর্শনা এক কুমারীর সহিত 'সুদর্শনের' বিবাহ দিলেন[২]। বালক নৃপতি সুদর্শনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এতদিন যে রাজলক্ষ্মী অমূর্ত্ত অবস্থায় অলক্ষ্যে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, কালের অপেক্ষায় ছিলেন, এইক্ষণে যেন তিনি অভ্যুদিত নৃপতির সেবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

১—রঘু, ১৮—২৯—তং রাজবীথ্যামধিহস্তি যান্তং আধোরণালম্বিতমগ্র্যবেশম্।
যড্‌বর্ষদেশীয়মপি প্রভুত্বাৎ প্রৈক্ষন্ত পৌরাঃ পিতৃগৌরবেণ॥

২—রঘু, ১৮—৫৩।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দীপ নির্ব্বাণ।

যথাসময়ে বিজ্ঞ সুদর্শন আত্মজ অগ্নিবর্ণের হস্তে বিশাল কোশল সাম্রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া, নৈমিষারণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক, স্বকীয় সংসার-বিরক্ত হৃদয়ে শান্তিবিধান করিলেন। দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শয্যা, মণি-মুক্তা-মণ্ডিত প্রাসাদ, মর্ম্মর-সোপানবদ্ধ দীর্ঘিকা প্রভৃতি যাঁহার ভোগের সাধন ছিল, নৈমিষারণ্যের কুশময় শয়নে, পর্ণ-শালায় এবং তীর্থ-সলিলে, তিনি সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন[১]। ইক্ষ্বাকু-বংশের চিরাচরিত নিয়মানুসারে, যোগবলে সুদর্শন মোক্ষলাভ করিলেন। তাঁহার সকল বিরক্তির অবসান হইল।

তেজস্বী কুমার অগ্নিবর্ণ অযোধ্যার পরম পবিত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু নবীন-রাজ্যের নবীন নরপতিকে রাজ্যশাসনে যে প্রকার প্রয়াস করিতে হয়, মহারাজ সুদর্শনের ব্যবস্থা-গুণে, তাঁহাকে কোন বিষয়েই সেইরূপ প্রয়াস করিতে হইল না। রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি, সকলেই রাজার প্রতি অশেষ-ভক্তি-সম্পন্ন[২]।

তিনি সমৃদ্ধি-শালিনী অযোধ্যাকে তাঁহার ভোগের সামগ্রী মনে করিলেন। ভোগী অগ্নি-বর্ণের ভোগাসক্ত হৃদয়ে রাজ্যপালনের গুরু চিন্তার উন্মেষও হইত না, বা হইলেও, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বিষয়ান্তর-প্রসঙ্গে বিস্মৃত হইতেন। নিরন্তর নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে তাঁহার কাল অতিবাহিত হইত। ধর্ম্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, রাজ-কার্য্য-পর্য্যালোচনার অবসর তাঁহার প্রায়ই ঘটিত না। ক্রমে ব্যাধি অতিশয় সাংঘাতিক

১—রঘু, ১৯—২—তত্র তীর্থ-সলিলেন দীর্ঘিকাঃ তল্পমন্তরিত-ভূমিভিঃ কুশৈঃ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ সঞ্চিকায় ফল-নিস্পৃহস্তপঃ॥

২—রঘু, ১৯—৩।

হইয়া উঠিল। বিলাসী অগ্নিবর্ণ, কর্ম্মক্লান্ত মন্ত্রি-বৃদ্ধদিগের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, একেবারে অন্তঃপুরবাসী হইলেন। সভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি রাজ-সিংহাসন,—যে সিংহাসনে দিলীপ, রঘু, রাম প্রভৃতি উপবিষ্ট হইয়া রাজ-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, যে সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন শূন্য পড়িয়া থাকিত! প্রকৃতি-পুঞ্জ রাজ-দর্শন-বাসনায় উপস্থিত হইয়া, শূন্য সিংহাসন দর্শন করিয়া বিষণ্ণ-হৃদয়ে ফিরিয়া যাইত। মহারাজ অগ্নিবর্ণ যদিও কখনও প্রবীণ অমাত্য-বৃন্দের বিশেষ অনুরোধ-ক্রমে শুদ্ধান্তঃ-শয্যা ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেন, কিন্তু অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে কদাচ আসিতেন না। অন্তঃপুর-প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে একখানি চরণ প্রদর্শিত করিতেন; অযোধ্যার চিরানুগত প্রকৃতি-পুঞ্জ, দূর হইতে, রাজার সেই চরণ-পঙ্কজ লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিত। নরপতির মুখ-কমল-সন্দর্শন আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটিত না[১]।

অগ্নিবর্ণ, কখন জলাশয়-মধ্যবর্ত্তি মোহন-গৃহে, কখন অন্তঃপুরের পর্য্যন্ত-বর্ত্তিনী বৃক্ষ-বাটিকায়, কখনও বা নিশান্ত-পরিশোভিনী নৃত্য-শালিকায় কালাতিপাত করিতেন। তিনি এমনই দুর্লভ-দর্শন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারই মহিষীগণ নানাবিধ ছলনা করিয়া, কখনও বা কোন প্রকার মহোৎসবের নাম করিয়া, কদাচিৎ তাঁহাকে স্বকক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন[২]। সাধ্বী মহিষীদিগের ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, তরল-

১—রঘু, ১৯—৪, ৬, ৭—গৌরবাদ্ যদপি জাতু মন্ত্রিণাং দর্শনং প্রকৃতি-কাঙ্ক্ষিতং দদৌ।
তদ্গবাক্ষ-বিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্॥
৮—তং কৃত-প্রণতয়োঽনুজীবিনঃ কোমলাত্ম-নখ-রাগ-রূষিতম্।
ভেজিরে নব-দিবাকরাতপ-স্পৃষ্ট-পঙ্কজ-তুলাধিরোহণম্॥

২—রঘু, ১৯—৯, ২০, ২৩।

হৃদয় অগ্নিবর্ণ যখন দূতী-প্রদর্শিত-পথে কুসুম-শয়ন-ময় লতা-গৃহে গোপনে প্রবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া, অন্তরাল-বর্ত্তিনী অযোধ্যার অধিদেবতা দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত অশ্রুপাত করিতেন। কুমুদাকর যেমন, রাত্রিতে প্রফুল্ল এবং দিবসে নিদ্রিত হয়, তদ্রূপ বিলাস-মগ্ন অগ্নিবর্ণও ক্রমে 'রাত্রি-জাগর-পর' ও 'দিবাশয়' হইতে লাগিলেন[১]। অতিভোগে কদাচিৎ যদি তাঁহার বিমূঢ়-চিত্তে অবসাদ উপস্থিত হইত, তবে, তখন তিনি সৌধমালার বাতায়ন-পথে, একাকী রাজ-হংস-মেখলা সরযূর শোভা দর্শন করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিষয়ীর মনে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায়, তাঁহার আবিল হৃদয়ে স্বভাবের অনাবিল শোভা প্রসাদ উৎপাদন করিতে পারিত না[২]।

পরাজয়-ভয়ে, অন্য কোন পার্থিব অগ্নিবর্ণের বিরুদ্ধে উত্থান করিলেন না বটে, কিন্তু দক্ষের অভিসম্পাত যেমন শশাঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ 'রতি-রাগ-সম্ভব' খল-ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অচিরেই তিনি আত্ম-কৃত অত্যাচারের বিষময় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি কিন্তু, পর্ব্বত-শিখর-চ্যুত বৃহৎ শিলাখণ্ডের ন্যায় স্বকীয় পতিত হৃদয়ের আর গতিরোধ করিতে পারিলেন না। উন্মার্গ-গামী চিত্তের সংযমবিধান তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইল[৩]। পাপের অঙ্কুর দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল! হায়! ক্রমে—

১—রঘু, ১৯—৩৪—যোষিতামুড়ুপতেরিবার্চ্চিষাং স্পর্শ-নির্বৃতিমসাবাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং রাত্রি-জাগর-পরো দিবাশয়ঃ ॥

২—রঘু, ১৯—৪০।

৩—রঘু, ১৯—৪৮—তং প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ শেকুরাক্রমিতুমন্য-পার্থিবাঃ।
আময়স্তু রতিরাগ-সম্ভবঃ দক্ষ-শাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ ॥

৪৯—দৃষ্ট-দোষমপি তন্ন সোঽত্যজৎ সঙ্গ-বস্তু ভিষজামনাশ্রবঃ।
স্বাদুভিস্তু বিষয়ৈর্হৃতস্ততো দুঃখমিন্দ্রিয়-গণো নিবার্য্যতে ॥

তস্য পাণ্ডু-বদনাল্প-ভূষণা
সাবলম্ব-গমনা মৃদু-স্বনা।
রাজ-যক্ষ্ম-পরিহানিরাযযৌ
কামযান-সমবস্থয়া তুলাম্[১] ॥

ক্ষয় রোগে তাঁহাকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। আভরণ ভার বোধ হইতে লাগিল। কণ্ঠস্বর ক্রমশই মৃদু, মদুতর, মৃদুতম হইয়া আসিল। বিনাবলম্বনে গমন করিতে তিনি একান্ত অশক্ত হইয়া পড়িলেন। অসাধ্য রাজ-যক্ষ্মা-রোগে তাঁহার হৃদয়-যন্ত্র জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িল। অযোধ্যার পুণ্যকর্ম্মা রাজ-বংশের সমুজ্জ্বল প্রদীপ ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইল! বৈদ্যগণের সকল যত্ন—সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। দিলীপের রাজ-সিংহাসন এত দিনে শূন্য হইল! অযোধ্যার রাজ-সূর্য্য অস্তমিত হইলেন! সোণার অযোধ্যায় শ্মশানের ক্রন্দন উঠিল! সীতা-নির্ব্বাসনের প্রায়শ্চিত্ত হইল! প্রকৃতি-পুঞ্জ বিষাদের গাঢ় অন্ধতমসে নিক্ষিপ্ত হইল! রাম-রাজ্য অন্ধকার হইল! ভরতের জন্য কৈকেয়ীর চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই অযোধ্যার রাজসিংহাসন নিবিড়-অরণ্য-মধ্যগত শিলাখণ্ডের ন্যায় শূন্য পড়িয়া রহিল!!

১—রঘু, ১৯—৫০।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

এতক্ষণে সংস্কৃত-ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য রঘু-বংশের আলোচনা সমাপ্ত হইল। যে সমাজ-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া, মহাকবি রঘুবংশের সূত্র-পাত করিয়াছিলেন, রঘুবংশের প্রতিসর্গে, প্রতিচরিত্রে, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ কালিদাসের রঘুবংশের উপজীব্য হইলেও কালিদাস রঘুবংশে শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। "বাল্মীকি, রামায়ণ মধ্যে আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা ও আদর্শ পরিবার দেখাইয়াছেন। কালিদাস আরও একটু ছাড়াইয়া উঠিলেন। কালিদাসের উদ্দেশ্য আদর্শ বংশ বর্ণনা। ঐ বংশের যে কোনও ব্যক্তিকে লও, তিনিই কোন না কোন বিষয়ের আদর্শ। রঘুরাজা দিগ্বিজয়ীর আদর্শ, অজরাজা সহৃদয়তার আদর্শ; রাজা দশরথ ব্যসনাসক্তির আদর্শ, কুশ রাজা রুচিমত্তার আদর্শ, অতিথি নীতি-পরায়ণতার আদর্শ; সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য যে অগ্নিবর্ণ, সেও বিলাসিতার আদর্শ। কালিদাস এই আদর্শ-সমূহের ঠিক মধ্যস্থলে বাল্মীকির সেই আদর্শ মনুষ্যকে বসাইয়াছেন। বসাইয়া, রঘুবংশরূপ প্রকাণ্ড চিত্র হইতে প্রকাণ্ডতর চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তাহাতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু প্রকাণ্ড পদার্থ আছে, তৎসমূহ-সংযোগে পূর্ব্বোক্ত আদর্শ চিত্র সমূহের এক প্রকার নূতনত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠকগণ! তোমরা মনে করিও না, কালিদাসের চিত্রসমূহ আলেখ্য-লিখিত চিত্রের ন্যায়। উহারা সবল, উহারা সজীব। কালিদাসের রঘুবংশের ন্যায় জীবনময় গ্রন্থ সংসারে আছে কি না সন্দেহ[১]।"

১—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৯০।

কালিদাস, দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ-প্রভৃতির চরিত্রবর্ণন-কালে দেখাই-য়াছেন যে, জগতে স্থায়ি যশঃ রাখিয়া যাইতে হইলে, ত্যাগ-স্বীকার চাই; বংশ উন্নত করিতে হইলে, বিদ্যালাভ, জ্ঞানলাভ করা চাই; পরহৃদয় জয় করিতে হইলে, বিনীত হওয়া চাই। গুরুজনের প্রতি—পূজ্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলে অশেষ মঙ্গল হয়। পূজ্যের পূজা-বাধে ঘোর অমঙ্গল জন্মে। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার শিক্ষা-দীক্ষা বিধান, দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচন, আর প্রজার কর্ত্তব্য রাজার প্রতি অটল বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করা। রাজা এবং প্রজা—উভয়েরই উভয়ের জন্য ব্যাকুলতা ও পরস্পরের মঙ্গলেচ্ছা উভয়েরই অভ্যুদয়ের কারণ।

কবি দেখাইয়াছেন যে,—"রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ"—প্রকৃতিপুঞ্জের যিনি হৃদয়-রঞ্জন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজ-পদ-বাচ্য। ক্ষমার অধিক সম্পদ্ নাই। সত্যের অধিক ধর্ম্ম নাই। সত্যের জন্য মহাত্মা প্রাণ এবং প্রাণাধিক পুত্রকেও ত্যাগ করিতে পারেন। অতিথি-পূজা গৃহা শ্রমের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি অচলা ভক্তি রাজা এবং রাজ্য—উভয়েরই মঙ্গলের নিদান। ব্রাহ্মণ স্বাধীন-হৃদয়, পরনিরপেক্ষ, কর্ত্তব্যপ্রিয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই নিঃসংকোচ, উদার-হৃদয়, ক্ষমাশীল ও নির্লোভ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের চক্ষে প্রাসাদ-বিলাসী রাজা এবং পর্ণকুটীর-শায়ী ভিক্ষুক—উভয়েই তুল্য। প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাটুকার বৃত্তি করেন না, বা করিতে জানেনও না।—এইরূপে, যে যে বিষয়ের আলোচনায় সমাজের মঙ্গলের সম্ভাবনা, সে সমস্ত, কালিদাস, তদীয় মহাকাব্য রঘুবংশে প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার এই সকলের বিপরীত, অর্থাৎ যে যে কারণে অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যও উৎসন্ন হয়, সোণার সংসারও শ্মশানে পরিণত হয়, দেবমঞ্চেও পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্য হয়, তাহাও তিনি অতি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভোগের নিবৃত্তিই কল্যাণ-দায়িনী, প্রবৃত্তি-সংহারিণী—একথা তিনি অতি প্রাঞ্জল দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বোপরি দেখাইয়াছেন যে, মানব মর্ত্তের জীব, কত উচ্চ, কত অনুপম, কত সুন্দর এবং কত প্রশস্ত-হৃদয় হইতে পারেন। সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মানব কিরূপ দৃঢ়-চিত্তে কর্ত্তব্যের সেবা করিতে পারেন; কর্ত্তব্যের চরণে আত্ম-বলিদান করিতে পারেন। মানবহৃদয়ের বল যে কত অসীম, কত অপরাজেয়, কত দুরধিগম, তাহা কবি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। যে মনস্বীর হৃদয় বলিষ্ঠ, তিনি সহাস্য-বদনে রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারেন, মাতা-পিতার তৃপ্তি বিধানের জন্য অবিচলিত-চিত্তে বনগমন করিতে পারেন। হৃদয়ে বল থাকিলে, নিজের কঠোর কর্ত্তব্যের জ্ঞান থাকিলে, মনস্বী ব্যক্তি নিজের হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া কর্ত্তব্যের চরণে উপহার দিতে পারেন। পরের শান্তির জন্য নিজের শান্তি চিরদিনের মত অতল-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতে পারেন। অথবা একটি একটি করিয়া কত বলিব, পৃথিবীতে যাহা কিছু সদ্‌গুণ, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নির্ম্মল, দেবত্বময়, সে সমস্ত, মহাকবি, তাঁহার প্রিয়কাব্যে অতি উজ্জ্বল-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

রঘুবংশে বর্ণিত নৃপতিগণের মধ্যে দেখিতে পাই দিলীপ হইতে দশরথ পর্য্যন্ত—পর-পর, ক্রমেই যেন রাজগণের গুণাবলীর বৃদ্ধি হইতেছে, অর্থাৎ দিলীপ অপেক্ষা রঘু, রঘু অপেক্ষা অজ, অজ অপেক্ষা দশরথ যেন অধিকতম শৌর্য্যসম্পন্ন। রাজ্যের সুখ-সম্পদ ক্রমেই যেন বর্দ্ধিত হইতেছে, অথবা বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে, শেষে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের সময়ে, যেন রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধির ষোল কলা সম্পূর্ণ হইয়াছে। যেমন রাম, তেমন সীতা, তেমনই অযোধ্যা-রাজ্য। সমস্তই যেন পরিপূর্ণ। কোন অংশেই কোনরূপ অপূর্ণতা নাই। রাম যেন অযোধ্যার রাজ্যাকাশের পূর্ণ চন্দ্র। দিলীপ হইতে এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে যেন রামরূপী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ ও সুশীতল চরিত-চন্দ্রিকায় কেবল অযোধ্যা নহে,

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও স্নিগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের অস্তগমনের পর—অযোধ্যার শুক্ল-পক্ষের চিরকালের মত অবসান হইল। অযোধ্যায় কৃষ্ণা প্রতিপদ উপস্থিত হইয়া, পরবর্ত্তী প্রতিনরপতির সময়েই, এক এক কলা করিয়া ক্ষয় হইতে হইতে, পরিশেষে, অগ্নিবর্ণের সময়ে যেন অযোধ্যায় অন্ধতমস-ভীমা অমানিশার আবির্ভাব হইল। অযোধ্যা গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল! যেমন ক্রমিক বৃদ্ধি, তেমনই ক্রমিক ক্ষয়!

দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি নরপতি ক্রমে কোশল-সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রাম—এই পাঁচ জন রাজার রাজত্বকালেই অযোধ্যার যত কিছু শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইঁহাদেরই রাজত্বকাল নানাবিধ ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সীতা-নির্ব্বাসনের পর, যখন রামচন্দ্র—

কৃত-সীতা-পরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্।
বুভুজে পৃথিবী-পালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্[১]।

শূন্য-হৃদয়ে, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে, অতি দুর্ব্বহ জীবনের ভারের সহিত দুর্ব্বহ পৃথিবীর ভারও ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে অযোধ্যারাজ্যে যেন অশান্তির কীট,—যে কীট ইন্দুমতীর মৃত্যুকালে রাজ-সংসারে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, দশরথের অপমৃত্যু, রামের নির্ব্বাসন প্রভৃতি যে কীটেরই দংশনের ফল, সেই কাল কীট যেন কালান্তক শরীর-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অযোধ্যার সর্ব্বনাশ করিতে সন্নদ্ধ হইতেছিল! রামের তিরোধানের পর হইতেই অযোধ্যার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধি-শালিনী রাজধানী হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যে পরিণত হইল! তার পর, অনেক প্রয়াসে, মহাত্মা কুশ, অযোধ্যার সেই লুপ্ত-গৌরবের উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

১—রঘু, ১৫—১।

তাহাও মুমূর্ষুর শোথজ স্থূলতার ন্যায় অযোধ্যার একেবারে ধ্বংসেরই পূর্ব্বাভাস স্বরূপ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার শেষ জ্বলিয়া উঠিল[১] মাত্র। তার পর কুশের পুত্র অতিথির সময় হইতে অগ্নিবর্ণ[১] পর্য্যন্ত, যে দ্বাবিংশ নরপতি অযোধ্যায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল, কেবল একটা বিশাল রাজ্য, বিপুল সংসার,—সেই বৈবস্বত মনুর রাজত্ব ভগ্ন হইতে হইতেও যে কতদিন থাকিতে পারে, কতটা সময়ের প্রয়োজন, মাত্র তাহারই নিদর্শন। কোন বিশাল সাম্রাজ্য যখন ক্ষয়-দশায় উপনীত হয়, তখন তাহাতে যেমন—একের পর অন্য, তাঁহার পর অন্য, তাঁহার পর অন্য, আর এক জন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন মাত্র, কিন্তু রাজ্যের কোনই উল্লেখ-যোগ্য শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না, অতি দ্রুতভাবে রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের এক একটা নামতঃ অভিষেক হইয়া যায়, তদ্রূপ, অযোধ্যায়, অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ নরপতিও অতিদ্রুতভাবে, পর পর, রাজ-সিংহাসন ভোগ করিয়া গেলেন। কেহ যুদ্ধে নিহত হইলেন, কেহ বিতৃষ্ণ হইয়া শিশু কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন, কেহ বা আত্ম-কৃত অত্যাচারের বিষময় ফলস্বরূপ উৎকট অসাধ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন[১]। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেমন একদিনে ভূমিসাৎ হয় না, অনেক দিন লাগে, তদ্রূপ, প্রকাণ্ড অযোধ্যা রাজ্যটাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে অনেক সময় লাগিল। সীতা-নির্ব্বাসনের সময়ে

১– 'কুশ' 'পুত্র ও অগ্নিবর্ণ'; যথাক্রমে—

রঘু, ১৭—৫—স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্।
　　জঘান সমরে দৈত্যং দুর্জ্জয়ং তেন চাবধি॥

—১৮—৩৩—মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীর্য্য সূনৌ মনীষিণে জৈমিনয়েঽর্পিতাত্মা।
　　তস্মাৎ স যোগাদধিগম্য যোগম্ অজন্মনেঽকল্পত জন্ম-ভীরুঃ॥

—১৯—৬।

অযোধ্যায় যে ভঙ্গের সূত্র-পাত হইয়াছিল, অথিতি হইতে অগ্নিবর্ণের সময় পর্য্যন্ত সেই ভঙ্গ ব্যাপারই চলিতেছিল। ক্রমে ক্ষীণ, জীর্ণ, শীর্ণ হইতে হইতে বিরাট সৌধ ভূমিসাৎ হইল। অযোধ্যা-রাজ্য রাজ-শূন্য বা 'অরাজক' হইল।

কালিদাস, তাঁহার আর একটি উদ্দেশ্য, যাহা কুমারসম্ভব বা মেঘদূতে সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, রঘুবংশে তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কুমারসম্ভবে মাত্র অষ্টাদশটি শ্লোকে পূর্ব্বাপর তোয়নিধি-ব্যাপী প্রকাণ্ড হিমালয়ের যে প্রকাণ্ড বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ আর কোন কবিই করিতে পারেন নাই। মহাকবি মাঘ, তদীয় শিশুপালবধ-কাব্যে, একটি সুদীর্ঘ সর্গে, রৈবতক পর্ব্বতের যে বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাসের অষ্টাদশ-শ্লোকমাত্র-ব্যাপিনী হিমালয় বর্ণনার নিকট তাহা উল্লেখার্হই নহে। কুমারসম্ভবে কবি তাঁহার প্রিয় হিমালয়ের বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতে অন্যান্য যে সমুদয় নয়নরঞ্জন স্থল আছে, মনোহর দৃশ্য-পটের ন্যায় যাহাদের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া কালিদাস নিজে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বর্ণন করা হয় নাই। তাই তিনি, কুমারের পর, প্রথমে, মেঘদূতে, রাম-গিরি হইতে অলকাপর্য্যন্ত মেঘের পথ নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে, উত্তর-ভারতের সম্পূর্ণ বর্ণন করিয়াছেন। তার পর আবার রঘুবংশে, অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে—অনেক দক্ষিণে, ভারতবর্ষের বহির্ভাগে দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তিনী লঙ্কানগরী হইতে রাম যখন সীতার সহিত আকাশ পথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন আর একবার ভারতের অপরাংশের, মেঘদূতে যাহা বর্ণিত হয় নাই, সেই অংশের অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ একবার মেঘদূতে, বর্ত্তমান সেণ্ট্রাল প্রভিন্‌সের অন্তঃপাতী অমরকণ্টক (প্রাচীন রামগিরি) হইতে ভারতের উত্তর সীমান্তবর্ত্তী কৈলাস পর্য্যন্ত, আর একবার, রঘুবংশে দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ হইতে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের

(ইউনাইটেড্ প্রভিন্সের) অন্তঃপাতী অযোধ্যাপর্য্যন্ত ভূ-ভাগের বর্ণন করিয়াছেন। ফলতঃ কবি মেঘদূত এবং রঘুবংশে সমগ্র ভারত-বর্ষের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, অতিস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে, ভারতের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী কৈলাস হইতে দক্ষিণ-সাগরের মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত, যেন কালিদাসের কল্পনারূপ এক গাছি সূত্র লম্বমান করিয়া, সেই সূত্রে ভারতের উত্তর দক্ষিণ—এই উভয় দিকের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের মানচিত্র—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আলেখ্য নিচয়, মালার ন্যায় গ্রথিত করিয়াছেন। মেঘদূত এবং রঘুবংশ—এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে, ভারতের উত্তর-সীমা হইতে দক্ষিণ-সীমা পর্য্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের সুনির্ম্মল প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি, রঘুবংশে, যদি লঙ্কা হইতে ঠিক ঋজু-ভাবে, রাম-সীতাকে আকাশ পথে উত্তর-কোশল-রাজ্যে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। ভারতের মধ্যবর্ত্তী, নয়নরঞ্জন, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রদেশ-সমূহ তাঁহার প্রিয় পাঠকদিগকে দেখাইতে পারিতেন না। এবং বনবাস-কালে প্রথমতঃ রাম-সীতা মিলিত-ভাবে যে সকল স্থানে কালাতিপাত করিয়াছেন, পরে, সীতাহরণের পর, রাম একা একা উন্মত্ত-হৃদয়ে, যে সকল স্থানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, রামের সীতাকেও সেই সকল স্থান আর দেখান হইত না। তাই কবি, লঙ্কা হইতে রাম-সীতার প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, তাঁহাদিগকে সরল-পথে অযোধ্যায় না লইয়া, একটু পশ্চিম-দিক্ দিয়া সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, অমনি কখনো তাঁহাদিগকে একটু উত্তরে মহেন্দ্র পর্ব্বতের নিকটে, আবার তথা হইতে একটু পশ্চিমোত্তরে কিষ্কিন্ধ্যায়, কখনও তাহার একটু পশ্চিমদিক্ দিয়া ক্রমে পম্পায়, তাহার উত্তরদিক্ দিয়া আবার পঞ্চবটীবনে, তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়াগে,—এইভাবে, ক্রমে, শেষে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছেন। রাম-সীতার সহিত পাঠক-

দিগকেও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শস্য-শ্যামলা সমুদ্র-মেখলা ভারতভূমির চির-সুন্দরী নয়নানন্দদায়িনী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রের সহিত যদি মেঘদূত এবং রঘুবংশের ভৌগোলিক অংশ মিলাইয়া পড়া যায়, তবে, কালিদাসের অসামান্য ধী-শক্তির এবং অনুপম কল্পনার সামর্থ্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কালিদাস রাম-সীতার আকাশপথে অযোধ্যা প্রত্যাগমনের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আর একটা রহস্য এই যে, রাম-সীতা যখন অযোধ্যা হইতে বন-বাসে যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা যে যে পথে বনে গিয়াছিলেন, যে যে স্থানে দুইএক দিন বাস করিয়াছিলেন, কবিগুরু বাল্মীকি সে সমুদয় অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই জন্যই কালিদাস রাম সীতার বনগমন-কালের কোন স্থানের বা কোন পথের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। বাল্মীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণনে নিবৃত্ত হইয়াছেন - কিন্তু সেই সেই প্রিয়দর্শন স্থান-সমূহ একেবারে উপেক্ষা করিতেও স্বভাবের কবি কালিদাস প্রস্তুত নহেন। তাই বাল্মীকি যে যে পথে রাম-সীতাকে অযোধ্যা হইতে লঙ্কায় আনিয়াছিলেন, কালিদাস সেই সেই পথে, রাম সীতাকে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে আরও একটু বৈচিত্র্য এই যে, বাল্মীকি যে যে পথে রাম-সীতাকে পদ-ব্রজে বনে লইয়া গিয়াছিলেন, কালিদাস, লঙ্কা হইতে রাম-সীতার প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, সেই সেই স্থানের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া—আকাশ পথ দিয়া তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া গেলেন। সেই 'পূর্ব্বানুভূত' স্থান সমূহ সুখ-দুঃখের সাক্ষিরূপে নিম্নে বিরাজমান। আর আকাশ-পথে, ঠিক ঐ ঐ স্থানের উপর দিয়া, রাম-সীতা নিম্নের সেই সেই স্থান দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। ঊর্দ্ধদেশে অবস্থান-প্রযুক্ত তাঁহারা, নিম্নস্থ সমস্ত পদার্থের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আকৃতি সম্যক্-প্রকারে দেখিতে পাইতেছেন। বিশাল ভারতবর্ষরূপ সুসজ্জিত মনোহর উদ্যান যেন, গগনবিহারী

রাম-সীতার নয়নের নিম্নে, তাহার হৃদয় খুলিয়া শোভার ভাণ্ডার তুলিয়া ধরিয়াছে। আর রাম-সীতা ঊর্দ্ধ হইতে আনত-নয়নে, সেই সকল সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছেন। যাহার জন্য প্রাণ কাঁদে, [১]কোন ভাল বস্তু উপভোগের সময়ে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই কথা মনে পড়ে। তাহাকে লইয়া সুন্দর পদার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। একাকী ভোগ করিলে, তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

"তদারম্যাণ্যরম্যাণি তদা শল্যং প্রিয়াসবঃ।
তদৈকাকী সবন্ধুঃ সন্ ইষ্টেন রহিতো যদা ॥

"But one thing want these banks of Rhine,—
Thy gentle hand to clasp in mine[২] !!"

রাম সীতাকে হারাইয়া একা একা যে সকল স্থানের সৌন্দর্য্য-দর্শনে কাঁদিয়াছিলেন, আজ সীতাকে লইয়া সেই সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে আত্ম-বিহ্বল হইতেছেন। মহাকবি কালিদাস এ অংশেও বাল্মীকির সহিত একপথে না যাইয়া, রঘুবংশের উপাদেয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

রঘুবংশের চতুর্থে, তিনি, পূর্ব্বে কামরূপ, পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তর-প্রান্তে সিন্ধু এবং কম্বোজ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে মলয়—এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তিনী ভূমির বর্ণন করিয়াছেন। এই বিশাল ভূ-ভাগের মধ্যে যত রাজ্য, যত নদ-নদী-পর্ব্বত আছে, সে সমস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এমনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, যখন যে দেশের কথা বলিয়াছেন, তখন, সেই দেশের যাহা যাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, যাহা সেই দেশ ব্যতীত অন্যত্র দুর্ঘট, তাহার বর্ণন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি বঙ্গদেশের বর্ণন-কালে, বঙ্গের প্রধান শস্য যে 'উৎখাত-প্রতিরোপিত'—

১—ভারবি—১১শ   ২—Childe Harolde.

অর্থাৎ প্রথমে একবার ধান্তের চারা দিয়া, পরে ঐ সকল চারা তুলিয়া যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পুনরায় রোপণ করা হয়, ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রকারে, রঘুর চতুর্থ সর্গে, প্রথমে বিশাল ভারতবর্ষের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের বর্ণন-পূর্ব্বক, পরে রঘুর ষষ্ঠে, ভারতের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য-নিবহের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। রঘুর চতুর্থ সর্গে, কোন কোন রাজ্যের যে সমুদয় উল্লেখযোগ্য বিষয় দিগ্বিজয়-বর্ণনার অনুকূল নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ষষ্ঠসর্গে, সেই সেই পরিত্যক্ত বিষয় সমূহের উল্লেখ করিয়া তত্তৎ রাজ্যের বর্ণন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। তবেই দেখিতেছি, মেঘদূতে এবং রঘুবংশের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ সর্গে কালিদাস, সমগ্র ভারতের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে বা তাহার যে কোনও স্থানে, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, সে সকলেরই উল্লেখ-পূর্ব্বক, মহাকবি তদীয় ভারত-ব্যাপিনী কল্পনার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তরঙ্গিণী গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায়, নৃত্য করিতে করিতে, তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা কখনও ভারতের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনও বা ভারতের মধ্যবর্ত্তী সমৃদ্ধি-শালী রাজ্যে—শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন জনপদে উপস্থিত হইয়া, তত্তদ্দেশের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া, পাঠকের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে। কল্পনার এমন বৈচিত্র্যময়ী তরঙ্গ-লহরী কালিদাসের গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না।

তাঁহার কাব্যের আর একটি অনন্য-সাধারণ গুণ এই যে, অপরাপর কবি-গণ, নামোল্লেখ পূর্ব্বক হৃদয়ের যে যে ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন, কালিদাস তদীয় শক্তি-শালিনী ভাষার দ্বারা, সেই সেই ভাবের একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। তিনি শোকের স্থলে 'শোক' এই শব্দের বিন্যাস করেন নাই, কিন্তু এমনই কৌশলে শোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, অন্যান্য কবির শতবার 'শোক' 'শোক' শব্দ প্রয়োগ

অপেক্ষা কালিদাসের এই শোকের নাম-বর্জ্জিত বর্ণন-কৌশলে করুণ-রসের প্রকৃতমূর্ত্তির অধিকতর অভিব্যক্তি হইয়াছে। অন্যান্য কবিগণ, তাহাদের পাত্রদিগকে যে যে স্থলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করাইয়াছেন, কালিদাস তথায়, তাহার পাত্রের নয়নাপাঙ্গে মাত্র একবিন্দু অশ্রু উদ্ভূত করিয়া, বর্ণনার চমৎকারিতা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অথবা এক কথায় বলিলে বলিতে হয়,—অপরাপর কবিগণের রস 'বাচ্য'—অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত, আর কালিদাসের কাব্যের রস 'ব্যঙ্গ্য—অর্থাৎ ভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত। অন্যান্য কবিদিগের কাব্যের চিত্র শব্দ-সাহায্যে পরিব্যক্ত, আর কালিদাসের কাব্যের চিত্র ভাবের সাহায্যে অঙ্কিত। অন্যান্য কাব্য পাঠকালে শব্দাবলীর আবৃত্তি-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের 'ভাবাভাববোধেরও' সমাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে শব্দাবলী আবৃত্তি করিবার পর, হৃদয়ে একটা ভাব চিরদিনের মত থাকিয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, অন্যত্র কবির উদ্দেশ্য শব্দের দ্বারা প্রকাশিত—অর্থাৎ 'বাচ্য' আর কালিদাসের উদ্দেশ্য শব্দের দ্বারা অপ্রকাশিত, অথচ ভাবের সাহায্যে প্রকাশিত,—অর্থাৎ 'ব্যঙ্গ্য'। এই কারণেই কালিদাসের কাব্য সর্ব্বোত্তম 'ধ্বনিকাব্য, 'বাচ্যাতিশায়ী' 'উত্তম কাব্য'[১]।

১—'বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমম্।'—দর্পণ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মালবিকাগ্নিমিত্র।

মহাকবি কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল—এই তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। কালিদাসের সরল রচনা, মধুর ভাবতরঙ্গ এবং অনুপম সৃষ্টি-নৈপুণ্য—এ তিন খানিতেই সম্যকরূপে সুপরিস্ফুট। এ দেশে এমন এক সময় ছিল, যখন মালবিকাগ্নিমিত্রকে, অনেকে, কালিদাসের প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। মালবিকাগ্নিমিত্রের সুন্দর রচনা-প্রণালী, বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এবং প্রসাদ ও মাধুর্য্যগুণের অনুপম অভিব্যক্তি-দর্শনে, এক্ষণে সুধী-সমাজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস ভিন্ন অন্য কেহই এই আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ভাব-সম্পদে বৃহৎ বা বৃহত্তর নাটকের প্রণেতা হইতে পারেন না।

মহাকবি কালিদাসের নাটকাবলীতে এমন একটি অনন্যসাধারণ লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা অতি অল্লায়াসেই, অন্যদীয় নাটক হইতে তাঁহার নাটক পৃথক করিয়া লওয়া যায়। অন্যের নাটক হয়ত পাঠ করিতেই সুন্দর, কিন্তু অভিনয়কালে তত মনোজ্ঞ নহে। তাহাতে অভিনয়োপযোগী গুণ-গরিমার অভাব অনুভূত হয়। আর কালিদাসের নাটকাবলী পাঠ করিবার কালে যত সুন্দর, অভিনয়-কালে তদপেক্ষা অনেক অধিক সুন্দর, অনেক চমৎকারিতাময়। কালিদাসের নাটকের অভিনয় দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কত মধুর, কত অনুপম। কেবল পাঠে, তাহার শতাংশের একাংশ আনন্দও অনুভব করা যায় না। সুতরাং কোন্ নাটক কালিদাসের আর কোন্ খানিই বা অপরের—ইহার নির্দ্ধারণ অতি সহজেই হইতে পারে।

এই নাটকত্রয় আবার একই অদ্বিতীয় মহাকবির লেখনীমুখবিনিঃসৃত হইলেও কিন্তু ঘটনার বৈশিষ্ট্যে তিন খানিই সম্পূর্ণভাবে পৃথক্। আকারে অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকারে অত্যন্ত বিসদৃশ। এক পিতার তিনটি সন্তান, হয়ত আকারে অনেকাংশে সদৃশ হইয়াও যেমন প্রকারে, ব্যবহারে, ক্রিয়ায় বিসদৃশ অর্থাৎ তিন প্রকার হয়, এই নাটকত্রয়ও ঠিক তদ্রূপ। অথবা কোনও চিত্রকর তাঁহার যৌবনকালে যে চিত্র করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার প্রবীণ বয়সের চিত্রের যেরূপ প্রভেদ, এই নাটকত্রয়েও কালিদাসচিত্রের সেইরূপ প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথম বয়সে, যখন হৃদয় জগতের বাহ্য সৌন্দর্য্যেই প্রয়াশঃ বিমুগ্ধ থাকে, যখন সংসারের সকলই সুন্দর মনে হয়, প্রাণে অনন্ত আশার অপরিমিত উন্মাদ থাকে, সেই সময়ে নবীন চিত্রকর যে বস্তু যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, একটু প্রাবীণ্য জন্মিলে, সেই বস্তুই তিনি অন্যভাবে দেখেন। প্রথম বয়সে চিত্রকর যে সকল চিত্র করেন, উহাদের সহিত তাহার পরিণত বয়সের চিত্রের এই জন্যই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয়। চিত্রিত প্রতিমার নাক, মুখ, চক্ষুঃ, কর-চরণাদি সকল সময়েই আকৃতিতে তুল্য হয় বটে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে। প্রথম বয়সের চিত্রিতমূর্ত্তির চক্ষু চঞ্চল, চকিত-হরিণী-নয়নবৎ নিরন্তর চঞ্চল, আর পরিণত-বয়স্ক চিত্রকরের চিত্রিত মূর্ত্তির চক্ষুও চঞ্চল, তবে সেই চাঞ্চল্যের মধ্যে আবার কদাচিৎ গাম্ভীর্য্যও উপলব্ধ হয়। চিত্রকর প্রথম বয়সে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাদের মুখে অতুল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ বয়সের চিত্রিত মূর্ত্তির মুখে অতুল সৌন্দর্য্য এবং হৃদয়নিহিত ভাবের সম্যক অভিব্যক্তি—এই দুইই ফুটিয়া থাকে। ফলতঃ চিত্রকরের চিত্ত-বৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্রিত মূর্ত্তিরও ভাবাভিব্যক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

উপরি-লিখিত কারণ-বশতই আমরা দেখিতে পাই যে, অগ্নিমিত্রকে

বিমুগ্ধ ও একেবারে আত্ম-বিস্মৃত করিবার জন্য, যে কবি মালবিকাকে নৃত্যমঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, সেই কবিই শকুন্তলাকে ভ্রমর-বাধায় চঞ্চল করিয়া, বিটপান্তরিত দুষ্যন্তের মনোমোহন করিয়াছেন। মালবিকা সমস্ত রাজপরিবারের সমক্ষে প্রধানা মহিষী ধারিণীর সমক্ষে, ততোধিক রাজার—তাহার 'চির-প্রার্থিত' অগ্নিমিত্রের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চ-বর্ত্তিনী হইয়া নৃত্য করিতেছেন; আর শকুন্তলা, শান্ত তপোবনে সখীগণের সঙ্গে কুসুম চয়ন করিবার কালে, স্বকীয় মুখ-কমল-পতিত ভ্রান্ত ভ্রমরের সন্ত্রাসে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। মালবিকা নৃত্যের তালে তালে আবার সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতেছেন, নৃত্যশাস্ত্রানুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিক্ষেপ করিতেছেন, রাজ-সভায় এই ব্যাপার হইতেছে। আর শকুন্তলা অতি নির্জ্জনে, পুরুষান্তর-বর্জ্জিত তপোবনে, সঙ্গীতাধিক মনোরম স্বরে, সমস্ত কানন যেন স্পন্দন-শূন্য করিয়া সখীদের সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন; রাজা দুষ্যন্ত বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া, সেই সব শুনিতেছেন, দেখিতেছেন, আর মজিতেছেন। মালবিকা কবির যৌবন-কালের সৃষ্টি—প্রথম বয়সের সৃষ্টি, তাই তাহার সকলই প্রথম বয়সের ভাবে অনুপ্রাণিত। আর শকুন্তল তাহার পরিণত বয়সের সৃষ্টি,—যে বয়সে সৌন্দর্য্যের সহিত পবিত্রতার সমাবেশ দর্শন করিতে বাসনা জন্মে, সেই প্রবীণ বয়সের সৃষ্টি, তাই—মালবিকা ও শকুন্তলায় এত প্রভেদ। কালিদাসের উর্ব্বশীও, এই প্রকারে, শকুন্তলার সহিত তুলনা করিলে, শকুন্তলার পূর্ব্ববর্ত্তিনী বলিয়া অনুমিত হয়। তাই মনে হয়, কালিদাস প্রথমে বিক্রমোর্ব্বশী বা মালাবিকাগ্নিমিত্র, এবং তার পর অভিজ্ঞান-শকুন্তল বিরচিত করিয়াছেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘটনাবলী সমস্তই এই মর্ত্তে ঘটিয়াছিল। বিক্রমোর্ব্বশীর ঘটনার স্থান মর্ত্ত এবং স্বর্গ; আর শকুন্তলার ঘটনাবলীর স্থল—মর্ত্ত, স্বর্গ ও স্বর্গ-মর্ত্তের অন্তর্বর্ত্তী শূন্য-মার্গ। মালবিকাগ্নিমিত্র পার্থিব ঘটনায় পরিপূর্ণ। বিক্রমোর্ব্বশী পার্থিব এবং অপার্থিব ঘটনায়

অলঙ্কৃত। আর অভিজ্ঞানশকুন্তল পার্থিব অপার্থিব এবং এতদুভয়াতিরিক্ত কবির কল্পিত এক নূতন জগতের ঘটনায় বিমণ্ডিত।

• কালিদাস স্বকীয় অধিকাংশ গ্রন্থেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্ত প্রচার করিয়াছেন। রঘুবংশের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই মালবিকাগ্নিমিত্রেও সেই কথা ;—রাজা—প্রজা—যিনি যখন যে কার্য্যই করুন না কেন, সকল সময়ে সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত সকলে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্ত প্রচার করিতে যাইয়া, কোনও ধর্ম্মান্তরের নিন্দা বা বিদ্রূপ করেন নাই! এমন কি, তাঁহার প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরও কোন স্থলে অতি প্রশংসা করিয়া, গূঢ় উদ্দেশ্যের রহস্য-ভেদ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-হিতৈষণারূপ খরস্রোত, তদীয় কাব্যাবলীর মধ্যে সতত-ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে।

দুষ্যন্ত এবং পুরূরবার চরিত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু অগ্নিমিত্রের চরিত্র, মানুষের চরিত্র যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ। ইহার কোন স্থলে কোন প্রকার অতিমানুষ ভাবের সমাবেশ নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য। মালবিকাও ঠিক মর্ত্তের ললনা। উর্ব্বশীর বা শকুন্তলার চরিত্রের ন্যায় ইঁহার চরিত্রে কোন অমানুষ ব্যাপার নাই। ভারতের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারী কন্যার চরিত্র যেমনটি হওয়া সঙ্গত, ঠিক সেইরূপ। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, এই নাটকের সমস্তই মর্ত্তের উপাদানে বিরচিত। সংসারে প্রণয়ব্যাপারে যেমন যেমন ঘটিয়া থাকে, হর্ষ-বিষাদের যে সকল অভিনয় সাধারণতঃ হইয়া থাকে, কালিদাস সেই সকলেরই সুন্দর সুন্দর অংশ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ, যাহা মানুষের স্থূল-নয়নে সহসা উপলব্ধ হয় না, সেই সকল অংশ, অতি সংযত-হস্তে চিত্রিত করিয়া, সামাজিকগণের সম্মুখে এক প্রাতঃসমীর-স্নিগ্ধ নূতন জগতের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। তথায়

প্রবেশ কর, দেখিবে, সে জগতের সবই সুন্দর, সমস্তই মনোজ্ঞ, মধুর বালারুণ-কিরণে তত্রত্য প্রতিপদার্থই সমুদ্ভাসিত।

কালিদাস কোথাও প্রস্ফুটিত কুসুমের বর্ণন করেন নাই। যে কুসুম ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফুটিতেছে—তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য; তিনি উত্তালতরঙ্গ-ভীমা তটিনীর নিকটেও যাইতেন না। যে নদীতে মৃদু সমীরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উঠিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, মিলিতেছে; তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। তিনি কোন বিষয়েই অতিমাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতে লেখা পড়ার চর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভারতের সর্ব্বত্রই তখন বিদ্যা-চর্চ্চার, জ্ঞান-লিপ্সার খরস্রোত প্রবাহিত। তখন ভারতে সুরসিক সুপণ্ডিত সামাজিক অনেক। তখন বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে, কলার গৌরবে ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। ওরূপ সময়ে, ভারতের ঐ প্রকার স্পর্দ্ধার দিনে, কোন দিকে কোন বিষয়ে, কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিলে, বা অতিমাত্রায় কোন কার্য্য করিতে গেলেই যে তৎক্ষণাৎ সুপণ্ডিত-সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে, এ তত্ত্বটা কবিকুলরবি কালিদাস, অতি নিপুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার গ্রন্থাবলীর কুত্রাপি তিনি অযথা 'বিদ্যাপ্রকাশ' করিতে যান নাই। আবশ্যকাতিরিক্ত একটি কথাও বলেন নাই। সর্ব্বত্রই সংযত-হস্তে ও সংযত-হৃদয়ে লেখনী-চালনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, সর্ব্ববিষয়িণী সমৃদ্ধি, তাই তাঁহার কল্পনাও সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, ওজস্বিনী।

মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র ?) রাজ্যলোভে স্বীয় প্রভু বৃহদ্রথকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সেই অদ্বিতীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই

অগ্নিমিত্রের বংশই 'মিত্রবংশ' বা 'সুঙ্গবংশ' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই বংশের নৃপতিবৃন্দ বিলক্ষণ পরাক্রমশালী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদিশা-নগরী ইঁহাদেরই রাজধানী। বিদিশাপতি এই অগ্নিমিত্রই আমাদের আলোচ্য দৃশ্যকাব্যের নায়ক। অগ্নিমিত্র যে সময়ে বিদিশার রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে বিদর্ভ বা অন্ধ্ররাজ্যে ভয়ানক অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়; অগ্নিমিত্র সুযোগ বুঝিয়া, এই সময়ে বিদর্ভ-রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হয়েন। বিদর্ভের বিবদমান রাজগণের অন্যতম মাধবসেন, পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপন আধিপত্য স্থাপন মানসে, তাঁহাকে কনিষ্ঠা সহোদরার সমর্পণ দ্বারা মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, উক্ত সহোদরাকে লইয়া বিদিশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মাধবসেনের পরমবৈরী বিদর্ভের অন্যতম রাজা যজ্ঞসেনের একজন সীমান্ত কর্ম্মচারী হঠাৎ সসৈন্যে আপতিত হইয়া, যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়ে মাধবের সহযাত্রী তদীয় প্রধান মন্ত্রী সুমতি, তাঁহার ভগিনী কৌশিকী ও রাজকুমারী মালবিকাকে লইয়া, কতিপয় অনুচর সহ পলায়নপূর্ব্বক রমণীদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য-নিবন্ধন, পথিমধ্যবর্ত্তী এক গহন অরণ্যে একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রী সুমতি নিহত হয়েন। আর সুমতির ভগিনী কৌশিকী অরণ্যমধ্যেই জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ সুমতির ধন-রত্নাদির সহিত, মাধবসেনের সেই কুমারী সহোদরাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে এই ব্যাপারের আলোচনা দেশের সর্ব্বত্রই হইত। কিছুকাল পূর্ব্বের বৃত্তান্ত হইলেও, যেমন, আমাদের দেশে এখনও পদ্মিনীর উপাখ্যান লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ, কালিদাসের সময়েও ঐ কুমারী-হরণ-কথার যথেষ্ট

প্রচার ছিল। বিদর্ভের রাজকন্যাকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে, এ একটা আন্দোলনের কথাও বটে। ইহা ব্যতীত এই নাটকের ঐতিহাসিকতার আরও কয়েকটি কারণ আছে।

মহারাজ অশোক স্বকীয় রাজত্ব-কালে, অতি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সমাজের উপর যে একটা অযথা আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি খর্ব্ব করিবেন। লোকে ব্রাহ্মণদিগকে যে ঐশী শক্তির আধার বলিয়া মনে করে, লোকের এ ভ্রান্তি তিনি নিরাস করিবেন। প্রকৃতপক্ষে যে সমুদয় ব্যক্তির ঐশী শক্তি আছে, তাঁহারাই পূজার্হ। তাঁহাদেরই সম্মান হওয়া উচিত। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি সর্ব্বপ্রথমেই স্বরাজ্য-মধ্যে যজ্ঞার্থে পশুবধ সম্পূর্ণ-রূপে রহিত করিয়া দিলেন। বিচার-কার্য্যে বা শাসন-বিষয়ে ব্রাহ্মণগণই একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। অশোক ব্রাহ্মণদিগের এ ক্ষমতাও আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত, 'নীতিশিক্ষক' নামে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নিয়োগ-পূর্ব্বক, তিনি, সমাজের উপর ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ-দানের যে একটা অধিকার ছিল, ক্রমে তাহাও বিলুপ্ত করিলেন। অশোক নিজে বৌদ্ধ নৃপতি হইয়া যদিও সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেন যে, সকল ধর্ম্মই তাঁহার অভিমত, কোন ধর্ম্মেরই তিনি বিদ্বেষী নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, তাহার সমূলে ধ্বংস-বিধান।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। বৌদ্ধনৃপতি অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এক নূতন ব্রাহ্মণ-শক্তির অভ্যুত্থান হইল। অগ্নিমিত্র রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণগণ এই নূতন রাজত্বকালে, একপ্রকার 'সর্ব্বে সর্ব্বা' হইলেন। এইবার ব্রাহ্মণগণ সময় পাইয়া, অমিত-বলে, অতি অল্প-কাল-মধ্যেই, তাঁহাদের বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ-শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্পমিত্র

পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াই, মহারাজ অশোক যে মগধে বসিয়া যজ্ঞার্থ পশু-বধ প্রভৃতি রহিত করিয়াছিলেন, সেই মগধেই মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক, ঐ যজ্ঞীয় তুরঙ্গরক্ষণের নিমিত্ত, অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রকে নিযুক্ত করিলেন। কুমার বসুমিত্রের মাতা, পুষ্পমিত্রের পুত্র-বধূ, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের প্রধান মহিষী মহারাণী ধারিণী, তুরঙ্গ-রক্ষক, পুত্র বসুমিত্রের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়নাদি করিবার নিমিত্ত, অনেক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন, এবং বার্ষিক আট শত সুবর্ণমুদ্রা তাঁহাদিগের স্থায়ি-বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য—যাহা বৌদ্ধ-নৃপতি অশোক একবারে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, হিন্দু নৃপতির সময়ে তাহা আবার ফিরিয়া আসিল। মহারাজ অগ্নিমিত্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর দ্বারাই যেন একবারে পরিবৃত হইলেন। তাঁহার বিদূষক ব্রাহ্মণ, কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরবর্ত্তিনী পরম-সম্মাননীয়া পরিব্রাজিকাও ব্রাহ্মণতনয়া। এই সমুদয় দেখিলে মনে হয়, যেন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব-সঙ্কোচকারী নৃপতির সময়ে, লুপ্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আবার পুনরভ্যুত্থান হইল। পুষ্পমিত্রের সময়েই বৈয়াকরণ-কেশরী পতঞ্জলির আবির্ভাব হয়। ঋষি পতঞ্জলিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত-ভাষার সংস্কার-সাধন করেন। বৌদ্ধ-নৃপতিগণের রাজত্ব-কালে, দেশের প্রচলিত ভাষাতেও বৌদ্ধ-প্রভাব প্রচুর-পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তখন, পালি প্রভৃতি ভাষায় দেশের সাহিত্য বিরচিত হইতেছিল। সংস্কৃতের প্রসার যথার্থই সঙ্কোচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পতঞ্জলির অভ্যুদয়ে সে সব যেন একবারে পরিবর্ত্তিত হইল। সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত হইল। কেবল রাজ-পরিষদে নহে, দেশের ভাষাতে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের আধিপত্য অনুপ্রবিষ্ট হইল।

এই নাটকের প্রারম্ভেই আমরা আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিতেছি যে, বিদর্ভপতি যজ্ঞ-সেনের শ্যালক মৌর্য্যনৃপতিদিগের সচিব

ছিলেন। অগ্নিমিত্র ঐ সচিবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন অগ্নিমিত্রের কর্ণগোচর হইল যে, বিদর্ভের অন্যতম রাজপুত্র মাধবসেন তাঁহাকে ভগ্নী-সম্প্রদান করিতে আসিবার কালে পথিমধ্যে যজ্ঞসেনের সীমান্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখন অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনের নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন—'অচিরাৎ মাধবসেনকে সপরিবারে মুক্তিদান কর।' নৃপতি যজ্ঞসেনও স-দম্ভে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! মৌর্য্য-নৃপতিদের সচিব এবং আমার শ্যালক আপনার কারাবদ্ধ, আপনি অগ্রে তাঁহাকে মুক্তিদান করুন, তাহা হইলে আমিও আপনার 'প্রতিশ্রুত-সম্বন্ধ' মাধবসেনকে মুক্তি দিতে পারি। মাধবের সোদরা আমার এখানে নাই, সে বালিকার কোন সংবাদই আমি জ্ঞাত নহি।" যজ্ঞসেনের এই রাজ-নৈতিক উত্তরে, অগ্নিমিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতি বীরসেনকে বিদর্ভ-বিজয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন[১]। বীরসেন বিদর্ভ জয় করিয়া যজ্ঞসেনকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। মহারাজ অগ্নিমিত্র তখন বিজিত বিদর্ভ-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তিনী বরদানদী সীমা-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক, বিদর্ভকে দুইটী স্বতন্ত্ররাজ্যে বিভক্ত করিয়া, একটিতে মাধবসেনকে, অপররাজ্যে যজ্ঞসেনকে স্থাপিত করিয়া, উভয়কেই বিদিশার সামন্ত-নৃপতি করিয়া লইলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে এই সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে, ভারতের তদানীন্তন রাজ-নৈতিক অবস্থার অনেকাংশে পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, এই নাটকের অন্য একটি ঘটনাতেও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কতকটা অস্ফুট চিত্র দেখিতে পাইতেছি।—অগ্নিমিত্রের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তখনও সমাজে বৌদ্ধ-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্মানের সহিত পরিদৃষ্ট হইত। তাই ব্রাহ্মণ-প্রধান

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ১ম অঙ্ক।

রাজ-সংসারে বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকীর অত প্রতাপ। পুষ্পমিত্র মগধের বৌদ্ধরাজত্ব ধ্বংস করিয়াছিলেন, হিন্দু রাজত্বের পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। অথচ, তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজধানীতে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য না করিতেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ দেশে তখনও এত অধিক ছিল। ইহাও এই নাটকের তথা নাটক-রচয়িতার প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নাটকীয় বৃত্তান্ত।

রাজা অগ্নিমিত্র বিদিশানগরীর অধিপতি ছিলেন। রাণী ধারিণী তাঁহার প্রধান মহিষী। ধারিণীর এক পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রের নাম বসুমিত্র, আর কন্যার নাম বসুলক্ষ্মী। ধারিণীর অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম। তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মভাব-পরিপূর্ণ; সহিষ্ণুতাও যৎপরোনাস্তি। আকারে তিনি যেন শরীর-ধারিণী ক্ষমা। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও কুশাগ্রবৎ তীক্ষ্ণ। ধারিণীর সমস্তই সুন্দর, অসুন্দরের মধ্যে তিনি প্রবীণা। তাঁহার এক শ্রীমতী পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম ছিল ইরাবতী। সে নীচ-কুল-সমুৎপন্ন হইয়াও সৌন্দর্য্যে মহারাজ অগ্নিমিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিল! অগ্নিমিত্র তাহার পাণিপীড়ন করিয়া, রাজ্যের দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাহাকে আদর যত্ন করিতেন। প্রৌঢ়া মহারাণী, নবীনা পরিচারিকার এই অভ্যুদয় নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আত্ম-হৃদয়ের উপর তাঁহার এতই প্রভুত্ব ছিল যে, তাঁহার ব্যবহারে মনে হইত, পরিচারিকা ইরাবতীর প্রতি রাজার এই অনুগ্রহে ধারিণীর যেন কতই আনন্দ। লোকে শতমুখে তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিত। পাটরাণীর হৃদয় যেমন হওয়া উচিত, রাজ-সংসারের প্রধান-মহিষীর ব্যবহার যেমন হওয়া উচিত, বহির্ব্যাপারে ধারিণীর ব্যবহারও ঠিক সেইরূপ ছিল। মহারাণী কেবল নীরবে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে যে গুরুদক্ষিণা দিয়াছে, যদি কখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে তিনিও তাহার উপযুক্ত পারিতোষিক-দানে পরিচারিকাকে আপ্যায়িত করিবেন,—এই অভিপ্রায়ে, স্থির-চিত্তে, মহিষী সকল অসহ্যই সহ্য করিতেছিলেন। এমন সময়ে, তাঁহার ভ্রাতা, অগ্নি-মিত্রের সেনাপতি বীরসেন, তাঁহাকে একটি অজ্ঞাত-কুল-শীলা রূপলাবণ্য-

বতী বালিকা উপহার-রূপে অর্পণ করিলেন। রাজ্ঞী ধারিণী তাঁহার ভ্রাতৃ-প্রদত্ত সেই অনর্ঘ রমণীরত্ন অবলোকন করিয়াই, মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই বালিকাকে নৃত্যগীতাদি-বিষয়ে সম্যক্-পারদর্শিনী করিতে পারিলে, কালে, এ, সঙ্গীতাদি-নিপুণা ইরাবতীর গর্ব্ব হয় ত খর্ব্ব করিতে পারিবে। আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তাই ধারিণী অতি যত্নে বালিকার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই কন্যাই সেই দস্যুহৃতা মালবিকা।

ধারিণীর নৃত্য-গীতাচার্য্য আর্য্য গণদাস অতি প্রবীণ ব্যক্তি। নৃত্য-গীতাদি কলায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ধারিণী দেখিলেন যে, এ কন্যা যে প্রকার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের আধার, তাহাতে, ইহার উপর, যদি ইহাকে আবার ইরাবতীর ন্যায় নৃত্যগীতাদিতেও নিপুণ করা যায়, তবে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে। তুচ্ছ ইরাবতী ইহার চরণপ্রান্তেও স্থান পাইবার যোগ্য থাকিবে না। এই বুদ্ধিতে,—এবং এরূপ সুন্দরী বালিকাকে অগ্নিমিত্রের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী করা আপাততঃ সঙ্গত নহে, এই বিবেচনায়, ধীর-বুদ্ধি ধারিণী নাট্যাচার্য্য বৃদ্ধ গণদাসের হস্তে ইহার শিক্ষার ভার দিয়া, বালিকাকে, রাজপ্রাসাদ হইতে একবারে গণদাসের বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। ভাবিলেন, এই রূপবতী যখন অনন্তগুণে গুণবতী হইবে, তখন ইহাকে অবলা-প্রিয় রাজার গোচর করিব, পূর্ব্বে নহে। কিন্তু ভাগ্যবান্ অগ্নিমিত্রের সৌভাগ্যে ধারিণীর এ কৌশল-জাল অচিরাৎ ছিন্ন হইল। একদিন রাজা, অন্তঃপুরের চিত্র-শালিকায় ভ্রমণ কালে, একখানি চিত্রে ধারিণী এবং ধারিণীর পরিচারিকাবর্গের প্রতিকৃতি দর্শন করিতে করিতে, অকস্মাৎ সেই সুন্দর প্রতিকৃতিসমূহের মধ্যবর্ত্তিনী একটি মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ রূপসী পরিচারিকাটি কে? ইহাকে রাণী কোথায় পাইলেন? এ কোথায় থাকে? ধারিণী রাজার কথার কোনই উত্তর না দিয়া, প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্নটা অন্তরিত করিবার অভিলাষ করিতেছেন, এমন সময়ে, তাঁহার

পার্শ্ববর্ত্তিনী সরলহৃদয়া কুমারী বসুলক্ষ্মী বলিয়া দিলেন যে, ঐ পরিচারিকার নাম মালবিকা। রাজা তদবধি মালবিকাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। এ দিকে ধারিণীও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত মালবিকাকে নিয়ত রাজ-নয়নের অন্তরালে রাখিতে লাগিলেন। ক্রমে, রাজার আগ্রহে, রাজ-বয়স্য বিদূষক, নানাবিধ কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার মিলন করাইয়া দিলেন। জন-প্রচার-শূন্য উপবনের মধ্যে রাজা ও মালবিকাকে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া কনিষ্ঠা রাণী ইরাবতী ক্রোধে অধীর হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পাটরাণীর কাছে অভি-যোগ করিলেন। ধারিণীও তৎক্ষণাৎ ইরাবতীর দুঃখে যেন বিগলিত হইয়াই, মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিদূষক আবার নানাকাণ্ড করিয়া মালবিকার উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক রাজার সহিত তাহাকে সম্মিলিত করিলেন। ক্রমে কথাটা দেশময় ব্যাপ্ত হইল। ধারিণী মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, আর গোপন করা চলে না।

ধারিণী মালবিকাকে বলিয়াছিলেন, "মালবিকে! যাও, আমার অশোকতরুতে আজও কুসুমোদ্গম হয় নাই, আমি পারিব না, তুমি যাইয়া দোহদানুষ্ঠান কর, যদি ফুল ফুটে, তবে আমিও তোমার অভি-লাষ পূরণ করিব।" ধারিণী জানিতেন যে মালবিকার কি অভিলাষ? দুঃখিনী মালবিকা মহারাণীর আদেশ-মত দোহদ করিলেন। অশোকে, দেখিতে দেখিতে, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটিল। মালবিকার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সত্য-প্রতিজ্ঞা ধারিণী পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, মালবিকার অভিলাষ-পূরণে উদ্যত হইয়া, রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে, মালবিকাকে বিবাহ করিতে হইবে। রাজা করেন কি? পাটরাণীর অনুরোধেই যেন অগত্যা স্বীকৃত হইলেন!! ধারিণী স্বয়ং বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ করিলেন। বিবাহসভায় সকলেই উপস্থিত। এমন সময়ে, হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে, মালবিকা পরলোকগত বিদর্ভরাজের

কন্যা, বরদা-তীর-বর্ত্তী রাজ্যের অধীশ্বর মাধবসেনের সহোদরা। তখন ধারিণীর আনন্দ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। রাজারও আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, যে ভগ্নীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিবার আশায়, মাধবসেন বিদিশায় আসিতেছিলেন, এবং পথিমধ্যে বিপক্ষ-কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সেই মাধব-সহোদরা মালবিকা। সঙ্কল্পিত বরে কন্যা অর্পিত হইল। বিবাহ-দর্শনের জন্য ধারিণী ইরাবতীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইরাবতী আর আসিলেন না। ধারিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

যতিবেশ-ধারিণী কৌশিকী, পরিব্রাজিকা-রূপে নানাদেশ পর্য্যটন করিতে করিতে, বিদিশায় আসিয়া রাজান্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় মালবিকাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বেশপরিবর্ত্তন-নিবন্ধন, মালবিকা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কৌশিকী রাজসংসারে থাকিয়া, কি উপায়ে রাজার সহিত মালবিকার পরিণয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অতি গূঢ়-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেননা—তিনি, তাঁহার অগ্রজ সুমতি এবং মাধবসেন, এই তিন জনেই মালবিকাকে লইয়া বিদিশায় আসিতেছিলেন; যদি পথিমধ্যে সেই সকল বিপৎপ্রাত না হইত, তবে, এতদিনে মালবিকার পরিণয় কবে সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। তাই, কৌশিকী আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অভিপ্রেতসিদ্ধির পন্থা দেখিতে লাগিলেন। অতি নিগূঢ়ভাবে, মালবিকাগ্নি-মিত্রের মিলনের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধারিণী এবং কৌশিকী—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক হইলেও কিন্তু উভয়ের কেহই কাহাকে নিজের অভিপ্রায় জানিতে দিলেন না। পরিণয়সভায় কৌশিকী আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিলেন। মালবিকা কাঁদিতে কাঁদতে আসিয়া, তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন। রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তির সহিত কৌশিকীর সেবা করিতে লাগিলেন। মালবিকার

পরিণয় হইল। ধারিণী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মালবিকাকে অন্তঃপুরের অধীশ্বরী করিয়া দিলেন। ইরাবতীর সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কবির প্রতিপাদ্যও সম্পূর্ণ হইল।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মালবিকার আত্মোৎসর্গ।

এই নাটকের বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে, মালবিকা, অগ্নিমিত্র, ধারিণী, ইরাবতী, বিদূষক ও পরিব্রাজিকা—এই কতিপয় পাত্রের চরিত্রই অভিনেয় পদার্থের প্রধান সাধন। সুতরাং ইহাদেরই আলোচনা আবশ্যক। ইহার মধ্যে আবার মালবিকা-চরিত্রই সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য।

মালবিকা বিদর্ভ-রাজের কন্যা; অতীব কোমল-প্রকৃতি। বিদর্ভ-পতির মৃত্যুর পর, রাজ্যের মধ্যে যখন অন্তর্বিপ্লবের দাবানল প্রজ্বলিত, সেই সময়ে, মালবিকার অগ্রজ কুমার মাধবসেন, অগ্নিমিত্রের সহিত সখ্যস্থাপনের জন্য বিদিশাভিমুখে আসিতেছিলেন। মালবিকা-কৌশিকী-প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অগ্নিমিত্র তখন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। বৌদ্ধ রাজত্বের তখন পতন হইয়াছে। অগ্নিমিত্র তখন একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিদর্ভপতির পুত্র কুমার মাধবসেন সঙ্কল্প করিলেন যে, অগ্নিমিত্রের হস্তে ভগ্নী মালবিকার সম্প্রদান করিয়া, ভারতেশ্বরকে বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। আর কুলমর্য্যাদাও বর্দ্ধিত করিবেন। একটি প্রধান সহায় হইবে। কিন্তু বিধাতা তাহা হইতে দেন নাই। পথিমধ্যে নানাবিধ বিপৎপাতে, কুমার মাধবের সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে। মালবিকা দস্যু-কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছেন। তাঁহার কোনই উদ্দেশ নাই। আর মাধবও স্বয়ং বিপক্ষ-কারাগারে আবদ্ধ। কে কাহার সন্ধান করে?

অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে, নানা হাত ঘুরিয়া, মালবিকা অগ্নিমিত্রের সংসারে আসিয়া পাটরাণীর পরিচারিকা হইলেন। তিনি রাজার কন্যা, বিধাতা তাঁহাকে পরম সম্মানিত কুলে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, অনন্ত-সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার করিয়াছিলেন, আর সর্ব্বাপেক্ষা অতুল

সম্পদ্—কোমল অন্তঃকরণ দিয়া, বিধাতা তাঁহাকে মর্ত্তে পাঠাইয়াছিলেন। মালবিকা বিধিপ্রদত্ত সেই অতুলসম্পদ্ অতি সংগোপনে রক্ষা করিয়া, মহিষীর পরিচারিকাবৃত্তি পালন করিতেছিলেন। তিনি কদাচিৎ নির্জ্জনে বসিয়া সেই বিদর্ভের অতীত গৌরব—পিতার ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতেন, মনের বেদনা মনোমধ্যেই রাখিতেন, বাহিরের কেহ তাঁহার হৃদয়-নিহিত কোন ভাবই জানিতে পারিত না। তিনি জানিতে দিতেন না। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই যেন একটা কি গভীর বেদনার ছায়া লক্ষিত হইত। অন্তঃপুর-বাসিনীরা সকলেই সেই সরল-হৃদয়ার ম্লান মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া ব্যথিত হইত। তাঁহাকে অকৃত্রিম ভাল বাসিত। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। আচার্য্য গণদাসের নিকটে নৃত্যগীতাদি শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেরণ করার পর, রাণী ধারিণী যখন বকুলাবলিকাকে জানিতে পাঠাইলেন যে, মালবিকা আচার্য্যের উপদেশ-গ্রহণে কতদূর সমর্থা, তখন বকুলাবলিকার প্রশ্নের উত্তরে গণদাস বলিয়াছিলেন, "বকুলাবলিকে! দেবীকে বলিও, মালবিকা সকল বিষয়েই 'পরমনিপুণা', তিনি অতিশয় 'মেধাবিনী'। তাঁহাকে আমি যে বিষয়েরই উপদেশ-প্রদান করি, অচির-কাল-মধ্যেই তিনি তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তিনি প্রতিভাবলে এমন অনেক বিষয় শিখিয়াছেন, যাহা আমিও জানিনা[১]।" আচার্য্য গণদাসের এই প্রশংসা-শ্রবণে, বকুলাবলিকা মনে মনে বলিয়া উঠিল,—'এত অল্পকালের মধ্যেই, দেখিতেছি, মালবিকা রূপে ত ইরাবতীকে পূর্ব্বেই জয় করিয়াছে, গুণেও তাহাকে অতিক্রম করিল।' মালবিকার সম্বন্ধে নাটকে এই প্রথম কথাবার্ত্তা। সামাজিকগণ বুঝিলেন

১—মালবিকাগ্নিমিত্র,—১ম অঙ্ক,—"গণদাসঃ। 'বিভাবাতা' দেবী, পরম-নিপুণা মেধাবিনী চেতি। কিং বহুনা,—

যদ্ যৎ প্রয়োগ-বিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে তস্যৈ।
তত্তদ্ বিশেষকরণাৎ প্রত্যুপদিশতীব মে সা বালা।"

যে, বিদিশার রাজধানীতে মালবিকার প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর কেহই নাই। ইরাবতী, যিনি রূপে গুণে ধারিণীকেও পশ্চাৎপদ করিয়া রাজার হৃদয় জয় করিয়াছেন, অথবা করিয়াছেন আর বলি কেন, করিয়াছিলেন, বকুলাবলিকা বলিয়া দিল যে, সে ইরাবতীও আর এখন কলা-নিপুণা মালবিকার কাছে দাঁড়াইতে পারে না[১]। বকুলাবলিকার এই কথাটিতে অনেক তাৎপর্য্য নিগূঢ়। যে চিত্রে বিদিশার রাজ-সংসার বিমুগ্ধ হইবে, রাজা অগ্নিমিত্র আত্ম-বিস্মৃত হইবেন, কবি এই স্থলে, নাটকের সেই ভবিষ্যৎ চিত্রের রেখাপাত করিলেন। নিপুণ-দৃষ্টি দর্শক, কবির এই কটাক্ষে, এই নাটকের পরিণাম যে কীদৃশ হইবে, তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এই সকল কৌশল কালিদাসের নিজস্ব।

মালবিকা নাট্যাচার্য্যগৃহে কলাশিক্ষা করিতেছেন। এদিকে, রাজাও, অন্তঃপুরের একখানি আলেখ্যে তাঁহার প্রতিকৃতি দর্শন করা অবধি, চঞ্চলমনাঃ হইয়াছেন। সেই প্রতিকৃতির অধি-দেবতাকে দেখিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। বিদূষক আচার্য্যদিগের মধ্যে একটা বিষম কলহ বাধাইয়াছেন। উদ্দেশ্য,—এই কলহের ফলে তাঁহার প্রিয় বয়স্য অগ্নিমিত্রকে একবার সেই সুন্দরী মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইবেন। রাজার নাট্যাচার্য্যের নাম হরদত্ত। তাঁহার সহিত ধারিণীর নাট্যাচার্য্য গণদাসের পাণ্ডিত্য লইয়া বিষম বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছে। পরিশেষে, তাঁহাদের মধ্যে কে বড়, কাহার পাণ্ডিত্য অধিক, ইহা নির্দ্ধারণের জন্য, উভয়েই রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রার্থনা, যে, মহারাজ তাহাদের গুণ-দোষের বিচারপূর্ব্বক, গুরু-লাঘব নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। রাজা অগ্নিমিত্র, দেবী ধারিণীর এবং পণ্ডিত কৌশিকার আহ্বান-পূর্ব্বক, কৌশিকীর উপর কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের ভার অর্পণ করিলেন। পরিব্রাজিকা কৌশিকী অমনি আচার্য্যদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আপনারা উভয়েই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ,

১—মালবিকাগ্নিমিত্র ১ম অঙ্ক,—বকুলাবলিকাঃ 'অতিক্রমন্তীমিব ইরাবতীং পশ্যামি।"

সুতরাং, আপনাদের আর কি পরীক্ষা করিব? আর সে যোগ্যতাও আমাদের নাই। আপনাদের স্ব স্ব ছাত্রের নৃত্যগীতাদির আলোচনা দ্বারাই আমরা আপনাদের গুরু-লাঘব বিবেচনা করিতে পারিব। তাহাই করুন।' পরিব্রাজিকার বাক্যশ্রবণে রাজা মনে মনে পরম আনন্দিত হইলেন। আচার্য্যদ্বয় কৌশিকীর এই উক্তি প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিলেন পরিব্রাজিকা বলিয়া দিলেন যে, অভিনয়ে অঙ্গসৌষ্ঠবাদির সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি আবশ্যক, অন্যথা অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয় না, সুতরাং আপনাদের শিষ্যগণ যেন অধিক সাজ-সজ্জা করিয়া না আসেন। নেপথ্য-বাহুল্যে 'অঙ্গহার' উপলব্ধ হয় না। রাজাও এই কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন পরিব্রাজিকার উদ্দেশ্য,—তাঁহার কান্তিমতী মালবিকার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একবার রাজাকে দেখাইয়া, তাঁহার অভিলষিত মালবিকা-পরিণয়-বিষয়ে আনুকূল্য করিবেন! আর রাজার ত সম্মতি দিবারই কথা।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নৃত্য-শালায় মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল। সকলেই সেই দিকে চলিলেন। উৎকণ্ঠা-পূর্ণ-হৃদয় রাজা একটু দ্রুত-পদে যাইতেছিলেন, বিদূষক অমনি তাঁহাকে গোপনে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দ্রুত-গমনে রাণীর সন্দেহ জন্মিতে পারে, ধীরে অগ্রসর হওয়াই ঠিক রাণী ধারিণীর কিন্তু এই ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হয় নাই। তিনি প্রথম হইতেই অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। কি একটা যেন ঘোর ষড়যন্ত্রের আভাস তাঁহার নয়ন-পথে ভাসিতেছিল। অভিনয়-দর্শনে রাজার আগ্রহ দেখিয়া, তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, আর্য্যপুত্র! আজ আচার্য্যদ্বয়ের অভিযোগ মীমাংসায় আপনার যাদৃশ অনুরাগ, যেরূপ কৌশল-নৈপুণ্য দেখিতেছি, আহা! রাজ-কার্য্যেও যদি আপনার এইরূপ অনুরাগ থাকিত, তবে কতই না সুন্দর হইত[১]! মৃদঙ্গ-ধ্বনি উত্থিত হইলে, যখন রাজা

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ১ম অঙ্ক, "দেবী। রাজানং বিলোক্য। 'যদি রাজ-কার্য্যেষ্বপি ঈদৃশী উপায়-নিপুণতা আর্য্যপুত্রস্য, তদা শোভনং ভবেৎ।"

দেবীকে বলিলেন 'দেবি! চল, অভিনয় দেখিতে যাই', তখন দেবী, রাজার এই অবিনয়-দর্শনে, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উপায় নাই, রাজার আদেশ, স্বামীর আজ্ঞা, অবনত মস্তকে সাধ্বী ধারিণী পালন করিলেন। পরিব্রাজিকা আচার্য্যদ্বয়ের এই কলহবৃত্তান্ত অবগত হইয়াই, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাজা মালবিকাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক, এ সমস্ত তাহারই অনুযোগী কারণ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধূর্ত্ত বিদূষকের চক্রান্তেই আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে এই কলহ বাধিয়াছে। তাই তিনি, যতদূর সাধ্য রাজার অভিপ্রায়-সাধনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। মালবিকা রাজার রাণী হইবে, ইহা ত তাঁহারই আন্তরিক অভিলাষ। সন্ন্যাসিনীর বেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া, পরিশেষে বিদিশার রাজ-সংসারে আসিয়া এই যে অবস্থান, আত্মগোপন, চক্রান্ত,—এ সমস্তই ত মালবিকার জন্য। কিন্তু প্রতিভাবতী ধারিণীর সম্মুখে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, নতুবা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না, তাই তিনি, উদাসীনভাবে, ন্যায্য-বিচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন আচার্য্যদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে বিবাদ করিতে করিতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তখন রাজা, বিদূষককে বলিয়াছিলেন, 'সখে! তোমার নীতি-পাদপের বোধ হয়, এই প্রথম কুসুমোদ্গম।' চতুর বিদূষক প্রত্যুত্তরে অমনি বলিলেন, 'ভয় নাই, এই সবে ফুল, ফলও অচিরাৎ দেখিতে পাইবে'।' রাজা ও বিদূষক, এই দুইটি কথায় সমস্ত ব্যাপারটা একবারে খুলিয়া বলেন। রসজ্ঞ সামাজিকগণ এই কলহ রহস্য বুঝিয়া লইলেন। ধারিণী প্রথম হইতেই বিরক্ত। তাঁহার বিরক্তির কারণ এই যে, এখনও সময় হয় নাই, যে অস্ত্রে ইরাবতীর সুখতরুর মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, সেই

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ১ম অঙ্ক। "রাজা। 'সখে! ত্বন্নীতিপাদপস্য পুষ্প মুদ্ভিন্নং।" বিদূষক। 'ফলমপি দ্রক্ষ্যসি।' "

অস্ত্র এখনও সম্যক প্রকারে শাণিত হয় নাই। এখন—এত পূর্ব্বাহ্নে এই অস্ত্রের প্রয়োগ, হয়ত, ব্যর্থও হইতে পারে, কিন্তু আর কিছুদিন পরে এ অস্ত্র অমোঘ হইবে। আর তার পর, তিনি পাটরাণী, তাঁহার সম্মুখে রাজার এতটা অবিনয়, রাজ-চিত্ত-বিনোদীদিগের এতটা ধৃষ্টতা একান্ত অসহ্য। তিনি স্বয়ং যে কার্য্য করিতে কৃত-নিশ্চয়া, অসহিষ্ণু রাজার তাহাতে ব্যগ্রতা প্রকাশ অনুচিত। এই প্রকার নানাকারণে, এই অভিনয়ে তাঁহার অমত। কিন্তু আর অমতে কি হইবে? সকলেই নিজের নিজের মনোভাব গোপন করিয়া নৃত্যশালার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গণদাস এবং হরদত্ত—উভয়েই স্বাস্ব শিষ্যাসহ উপস্থিত। চতুরহৃদয় পরিব্রাজিকা ব্যবস্থা করিলেন যে, মালবিকা-গুরু গণদাস হরদত্ত অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, অতএব তাঁহার পরীক্ষাই অগ্রে কর্ত্তব্য[১]। অমনি গণদাস তাঁহার শিষ্যা মালবিকাকে নৃত্যমঞ্চে উপস্থিত করিলেন। অগ্রে মালবিকা, আর তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে আচার্য্য গণদাস। সম্মুখে রাজাসনে অগ্নিমিত্র উপবিষ্ট, তাঁহার বামপার্শ্বেই রাণী ধারিণী, আর দক্ষিণ দিকে পরিব্রাজিকা ও বিদূষক। বালিকা মালবিকা ভীত-চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাকবি কালিদাস, কি অপূর্ব্ব কৌশলে, রাজা ও মালবিকা উভয়কে উভয়ের সম্মুখীন করিলেন!

মালবিকা বহু পূর্ব্ব হইতেই অগ্নিমিত্রের নাম শুনিয়াছেন, অগ্নিমিত্রের সহিত তাঁহার পরিণয়ের প্রস্তাব হইয়াছিল—একথাও শুনিয়াছিলেন মনে মনে, অগ্নিমিত্রের কত অনন্ত রূপের কল্পনা করিয়াছিলেন মালবিকা হিন্দুর ঘরের কন্যা, বিদর্ভের সর্ব্বপ্রধান হিন্দুরাজার কন্যা। তাঁহার অন্তঃকরণ যে দিন জানিয়াছিল যে, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্র তাহার সঙ্কল্পিত আশ্রয়, তদবধি সে হৃদয় অগ্নিমিত্রের ধ্যানেই মগ্ন। ঘটনাচক্রে রাজার কন্যা পথের ভিখারিণী হইয়া, সেই অগ্নিমিত্রেরই সংসারে

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২য় অঙ্কের প্রারম্ভ।

আসিয়াছেন, অন্তঃপুরের কত আলেখ্যে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়াছেন, কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্য্যন্ত, সেই চিরপ্রার্থিত দেবতার বাস্তবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে পান নাই। আজ দেবতার কৃপায়, তাঁহারই সম্মুখে দুঃখিনী মালবিকা উপস্থিত। মনের মধ্যে যাঁহার প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া কখনো ধ্যানের দ্বারা, কখনো নয়নজলের দ্বারা পূজা করিতেন, আজ সেই বাঞ্ছিত দেবতা সম্মুখে বিদ্যমান, আর তাঁহারই সম্মুখে মালবিকা নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে আহূত। তাই রাজকুমারী লজ্জায় এবং বালা-জন-সুলভ ভয়ে আকুল। ইহার উপর আবার, রাজার যিনি প্রধান মহিষী, মালবিকা যাঁহার পরিচারিকা, সেই দেবী ধারিণীর সম্মুখে, এবং পরিব্রাজিকার ও বিদূষকের সম্মুখে, আজ নৃত্য করিতে হইবে, গান করিতে হইবে, এতদিন মনে মনে যাঁহার গান অভ্যাস করিয়াছেন, আজ তাঁহারই সম্মুখে গাইতে হইবে, সুতরাং মালবিকার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশী, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। আজ নৃত্য-গীত করিতে হইবে বলিয়া মালবিকা যত আকুল,—তাঁহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে যে কথা লুক্কায়িত, পাছে সেই কথা আজ প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর কেহ তাহা জানিতে পারে, তিনি—সেই আরাধ্য দেবতা পাছে ঘুণাক্ষরেও তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন, এই ভাবনায়, মালবিকা ততোধিক আকুল। তাই তিনি, সভয়ে, সলজ্জভাবে পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া নৃত্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া আছেন।

এ দিকে রাজা, অন্তঃপুরের আলেখ্যে যাঁহার প্রতিকৃতি দর্শন মাত্রেই, এবং বসুলক্ষ্মীর মুখে 'মালবিকা' এই নামটি শ্রবণ মাত্রেই এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছিলেন, একবার মাত্র যাঁহার দর্শন-লাভের জন্য, বিদূষকের দ্বারা এই এত কাণ্ড করাইয়াছেন, সেই লাবণ্য-তরঙ্গিণী প্রতিমা তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত, রাজা চিত্রে যাঁহার কান্তির ছায়া মাত্র দেখিয়াছিলেন, তিনি সশরীরে উপস্থিত, রাজা অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহাকে

দেখিতেছেন। অনিমেষ-নয়নে দেখিবার সাধ্য নাই, মহারাণী ধারিণীর সমক্ষে রাজার অত দুঃসাহস হয় না, তিনি দেখিতেছেন, অথচ না দেখার ভান করিতেছেন। সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে কোন্ পুরুষসিংহ ভয় না করেন? রাজাও ভয়ে ভয়ে দেখিতেছেন। মালবিকার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ-মাত্রেই, রাজা এক নিমেষে, একবার তাঁহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, মালবিকার যে প্রতিকৃতি ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাহা কিছুই নহে, সে চিত্রের যিনি চিত্রকর, তাঁহার চিত্র-বিদ্যায় নৈপুণ্য নাই। রাজা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, মাধবসেন সহোদরাকে লইয়া বিবাহ দিতে আসিবার কালে, পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়াছিলেন। এই বালিকাই যে সেই মাধব-সহোদরা, তাহা রাজা জানিতেন না। জানিলে চমৎকারিতার হানি হইত। এই প্রথম সন্দর্শন এত সুন্দর হইত না। মালবিকা জানিতেন, কিন্তু তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন। আর প্রকাশ করিয়াই বা লাভ কি? এ নির্ব্বান্ধব রাজপুরীতে কে তাঁহার বেদনার অংশ গ্রহণ করিবে? তিনি এখন ভিখারিণী, তাঁহার এই রত্নলাভের বাসনা যত প্রচ্ছন্ন থাকে, ততই মঙ্গল। বামনের চন্দ্র-স্পর্শের আশার ন্যায়, তাঁহার এ দুরাশার কথা যে শুনিবে, সেই ত তাঁহাকে উপহাস করিবে। তাই তিনি অতি গোপনে, মনের ভাব মনের মধ্যেই রাখিয়াছিলেন।

নৃত্যমঞ্চে মালবিকার ভীতিবিহ্বল অবস্থা দর্শনে, প্রবীণ আচার্য্য গণদাস বুঝিতে পারিলেন যে, বালিকার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, কোমল হৃদয়ে ভয়-সঞ্চার হইয়াছে। তিনি অমনিই অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"বৎসে! মুক্ত-সাধ্বসা সত্ত্বস্থা ভব[১]।"

'বৎসে! ভয় পরিত্যাগ কর, স্থির হও, চিত্ত-বিকলতা দূর কর।' মালবিকা আচার্য্যের আদেশে চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন,—'এ কি?

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২য় অঙ্ক।

আমার এমন হইল কেন ? আচার্য্যের সম্মুখে, পাটরাণীর সম্মুখে, পণ্ডিত কৌশিকীর সম্মুখে আমার এ বিচলিত ভাব কি ভাল ?' তিনি তৎক্ষণাৎ হৃদয় স্থির করিয়া, নৃত্য এবং সঙ্গীত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে মুখচ্ছবি ছিল, সহসা তাহার পরিবর্ত্তন হইল। আর কেহ তাহা বড় না দেখিলেও রাজা কিন্তু দেখিলেন।

কালিদাস, এই স্থলে, এক নূতন প্রণালীতে পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন। প্রথমে মালবিকা নর্ত্তিকার বেশে রঙ্গমঞ্চে আসিলেন, আসিয়াই ভয়ে, লজ্জায় যেন বিবর্ণ-কান্তি হইয়া গেলেন ; পরক্ষণেই আবার আচার্য্যের কথায় নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া, যেন একটু দৃঢ়তার সহিত, মেঘ দর্শনে উন্নত-গ্রীবা ময়ূরীর ন্যায়, দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে, তাঁহার এই সকল ভাবান্তর ঘটিল। রাজা একটি একটি করিয়া মালবিকার সে ভাব-শবলতা দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তাহার উপর আবার যেমন তরঙ্গ আসে, তদ্রূপ সেই সময়ে, মালবিকার ক্ষণে ক্ষণে, সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য, তাহার উপর আবার যে সৌন্দর্য্য আসিতেছিল, রাজা নিজ মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই নীরব। আচার্য্যের আদেশ-মতে, মালবিকা নৃত্যের সহিত গান আরম্ভ করিলেন—

> দুর্লভঃ প্রিয়স্তস্মিন্ ভব হৃদয়। নিরাশম্।
> অহো অপাঙ্গকো মে পরিস্ফুরতি কিমপি বামকম্।
> এষ স চিরদৃষ্টঃ কথমুপনেতব্যঃ।
> নাথ! মাং পরাধীনাং ত্বয়ি গণয় সতৃষ্ণাম্[১] ॥

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২য় অঙ্ক।—হৃদয়! তোমার সে প্রিয়বস্তু একান্ত দুর্লভ, তবে কেন আর বৃথা আশা ? হায়, আমার বাম অপাঙ্গ কেন বার বার স্পন্দিত হইতেছে ; চির-দুঃখিনী আমি, আমার আবার সৌভাগ্য-সম্ভাবনা কোথায় ?

যে স্থানে যে রসের অভিব্যক্তি হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ করিয়া, অথবা তদপেক্ষাও যেন অধিকতর রসাভিব্যক্তি করিয়া, মালবিকা মধুর-কণ্ঠে এই গান গাহিলেন। চিত্রার্পিতের ন্যায়, অরবিন্দ-নিবিষ্ট ভ্রমর-পঙ্‌ক্তির ন্যায়, সকলে নিস্পন্দভাবে, তাঁহার এই গান শুনিলেন, এবং অভিনয় দর্শন করিলেন। গানের এমনই পদ-বিন্যাস যে, ইহার প্রথম চরণে মালবিকার হৃদয়ের বৈরাগ্য, বাঞ্ছিত-লাভে নৈরাশ্য; দ্বিতীয়ে আবার ঔৎসুক্য, যাঁহাকে পাইব না, তাঁহাকেই পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা; তৃতীয়ে সঙ্কল্প, এতদিন যাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছেন, আজ তাঁহাকে পাইয়াছেন, কি করিলে তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন, কি করিলে সেই চির-প্রার্থিতের দাসী হইতে পারিবেন, এই বাসনা; আর চতুর্থে আত্ম-সমর্পণ, তাঁহারই চরণে, সেই আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ,—মালবিকা পরাধীনা, রাজার নন্দিনী হইয়াও পরিচারিকা, নিজের উপর তাঁহার কোনই কর্তৃত্ব নাই, যাঁহাকে চিরকাল অনিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিলেও নয়নের তৃপ্তি জন্মে না, সেই অতৃপ্ত-দর্শন আজ সম্মুখে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই,—কি করিয়া তোমাকে দেখিব? আমি পরাধীন, তোমার দাসী-পদ-কাঙ্ক্ষিণী,—এই প্রকার আত্ম-সমর্পণ। গানের চরণচতুষ্টয়ে, এইভাবে, যথাক্রমে, বৈরাগ্য, ঔৎসুক্য, সঙ্কল্প ও আত্ম-সমর্পণ—এই চারিটি ভাব সুপরিস্ফুট।

রাজা অনন্য-মনে মালবিকার নৃত্যগীতাদি অনুভব করিলেন। পূর্ব্বে—মালবিকার রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশের সময়ে, যে প্রতিমার দর্শন করিয়াছিলেন, রাজা, এতক্ষণে, তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন। বিদূষক টীকা করিয়া আবার, সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্ররূপী সঙ্গীতটি বুঝাইয়া দিলেন[১]।

১—মালবিকাগ্নিমিত্রে ২য় অঙ্ক। বিদূষক। জনান্তিকং। 'চতুষ্পদং বস্তু দ্বারীকৃত্য উপস্থাপিত ইব আত্মা অত্রভবত্যা।'

রাজা বুঝিলেন, কিন্তু, ধারিণীর 'সন্নিকর্ষ'-হেতু, বুঝিয়াও যেন বুঝেন নাই, এইরূপ ভান করিলেন[১]।

গান সমাপ্ত হইলেই মালবিকা গমনোদ্যত হইলেন। তাঁহার দেহটা লঘুবোধ হইল। মনের কথাগুলি বাহির করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের একটা গুরুভার যেন কমিয়া গিয়াছে। ক্ষণকালের জন্য একটা হর্ষের আভাস তাঁহার মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার,—যাঁহার কাছে হৃদয়ের কবাট খুলিয়াছেন, তিনি সে দিকে চাহিলেন কি না? কার্যটা সঙ্গত হইল কি না? যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, শত চেষ্টাতেও আর যাহা ফিরিবে না, সে কার্য্যের পরিণামই বা কিরূপ দাঁড়াইবে? গান ত আরও অনেক ছিল, 'চতুষ্পদ ছলিক' ত তিনি আরও অনেক জানিতেন, তবে সে গুলি না গাইয়া কেন এ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা দুঃখিনী মালবিকার পক্ষে ভাল হইল না মন্দ হইল?—এইরূপ চিন্তায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে, উৎকণ্ঠামিশ্রিত একটা ভয়ের উদয় হইল। তিনি একটু অবাক্ হইলেন। চিত্তে একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল। মালবিকা সেই আন্দোলিত হৃদয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। আর অবস্থানই বা কেন? যাঁহার জন্য এই দীর্ঘকাল তপস্যা, সেই বিদর্ভের রাজধানী পরিত্যাগ, গহনবনে দস্যুহস্তে লাঞ্ছনা, যাঁহার জন্য অহর্নিশ অশ্রুবিসর্জ্জন, পরিচারিকা-বৃত্তি-স্বীকার ও এক প্রকার কারাগার-বন্ধন, তাঁহার দর্শনলাভ হইয়াছে, তাঁহাকে মনের বেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাঁহার চরণে তাঁহারই জ্ঞাতসারে আত্মোৎসর্গ হইয়াছে, তবে আর অবশিষ্ট রহিল কি? কিসের জন্য

১—ঐ। রাজা, জনান্তিকং।

'জনমিমমনুরক্তং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে, বচনমভিনয়ন্ত্যা স্বাঙ্গ-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বম্।
প্রণয়-গতিমদৃষ্ট্বা ধারিণী-সন্নিকর্ষাৎ অহমিব সুকুমার-প্রার্থনা-ব্যাজমুক্তঃ॥'

আর বিলম্ব? মালবিকা তাই ধীরে চরণ উত্তোলন করিলেন। রাজা দেখিয়াছেন, সেই প্রথমে, প্রবেশ সময়ে একবার মালবিকার শান্ত-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তার পর সঙ্গীতকালে তাঁহার নৈরাশ্যময়ী, উৎকণ্ঠাময়ী, সঙ্কল্পময়ী মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন, আর তাঁহার—'আমি পরাধীন, তোমার দাসী-পদ-কাঙ্ক্ষিণী' বলিয়া মালবিকা যখন সঙ্গীত-শেষের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার আত্মোৎসর্গরূপ মহাব্রতেরও উদ্‌যাপন করেন,—তখনকার সেই কাতরমুখচ্ছবিও রাজা দেখিয়াছেন। এ সমস্তই মালবিকার বিষাদময়ী মুখচ্ছবি। কিন্তু সে মুখের হাস্য দেখেন নাই, সে শারদগগনে চন্দ্রমার উদয় দর্শন করেন নাই। বিষাদে যে সে মুখ কত সুন্দর, তাহা রাজা দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু মৃদু-মন্দ হাস্যে যে, সে মুখ কত সুন্দরতর, তাহা অগ্নিমিত্র দেখেন নাই, তাই কবি এবার রাজাকে সে সৌন্দর্য্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মালবিকা প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন, অমনি রাজ-বয়স্য বিদূষক ব্রাহ্মণ, গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, 'দাঁড়াও মালবিকে! তুমি একটা বিশেষ অনুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়াছ, সে সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।' মালবিকার আচার্য্য গণদাসও তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'বৎসে! একটু দাঁড়াও, পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, পরীক্ষায় অগ্রে উত্তীর্ণ হও, পরে গমন করিও।' মালবিকা নিবৃত্ত হইয়া, প্রস্তর-প্রতিমার মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইলেন।

পূর্ব্বে—সেই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করিয়া, মালবিকা আসিয়া এমনই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার এখনও দাঁড়াইলেন। রাজাকে প্রদর্শন করাই যদি কবির উদ্দেশ্য হয়, তবে দুইবার একই প্রকারের অনুষ্ঠান কেন?—মালবিকার স্থির হইয়া দাঁড়ানো দুইবার এক রকম বটে, কিন্তু মালবিকা এক রকম নহেন। পূর্ব্বের মালবিকা,—যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু একটি কথাও বলেন নাই, বা হৃদয়ের একটি তপ্ত নিশ্বাসও বাহির হইতে দেন নাই, তখনকার মালবিকা,

আর এখনকার মালবিকা,—এতদিন নির্জ্জনে বসিয়া যে গান রচনা করিয়াছেন, যাঁহার জন্য রচনা করিয়াছেন, আজ তাঁহারই সম্মুখে সেই গান নিজে গাহিয়াছেন, মনের মধ্যে যাহা গুপ্ত ছিল, জগতের কেহই জানিত না, আজ সেই চিরসঞ্চিত, চিরনিগূঢ় বাসনা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং এখনকার মালবিকা এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ। বসন্তের প্রারম্ভে সম্ভাবিতমুকুলা লতিকা আর পরিণত বসন্তের বিকশিত-কুসুমা লতিকায় যেমন প্রভেদ, পূর্ব্বের মালবিকা আর এখনকার মালবিকায় তেমনই প্রভেদ। সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু কালিদাস, মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্তরগুলি যেন দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইতেন। মালবিকার মুগ্ধ হৃদয়ের স্তরনিচয়, তাই একটি একটি করিয়া খুলিয়া খুলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, একবার পূর্ব্বে প্রবেশকালে দেখিয়াছেন, তার পর নৃত্যকালে দেখিয়াছেন, আবার এখন দেখিলেন। আনত-মুখী মালবিকার এইবারকার সৌন্দর্য্যে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বেকার দুইবারের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা এবারকার সৌন্দর্য্য আরও অধিক।

ধারিণীর ইহা ভাল লাগিল না। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আর বিলম্ব কেন? মালবিকার এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন কি? তিনি গণদাসকে ইঙ্গিতে বলিলেন—'মালবিকাকে পাঠাইয়া দাও।' গণদাস দেবীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বিদূষকের প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে, তিনি, মালবিকাকে যাইতে দিলেন না। প্রত্যুত তিনি, অতি বিরক্তির সহিত বিদূষককে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গৌতম! কি ত্রুটি হইয়াছে! আমার শিষ্যার নৃত্য গীতের কোন্ অংশে তুমি দোষ দেখিলে, প্রকাশ করিয়া বল। বিদূষক ব্রাহ্মণ, অমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আচার্য্য! প্রথম উপদেশ প্রদর্শন-কালে, ব্রাহ্মণের পূজা দিতে হয়, আপনারা সেই প্রধান দৈবকার্য্যই বিস্মৃত হইয়াছেন।'

বিদূষকের উক্তিতে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। পুরোবর্ত্তিনী মালবিকাও মন্দ মন্দ হাসিতে লাগিলেন। রাজা তাহা দেখিলেন 'আয়তাক্ষী' মালবিকার সেই 'কিঞ্চিদভিব্যক্ত-দশন শোভি', 'অসমগ্রলক্ষা-কেসর', 'উচ্ছ্বসিত পঙ্কজবৎ' সুন্দর মুখখানি রাজা দেখিতে লাগিলেন[১] এ আর এক নূতন রূপ। মালবিকার এ রূপ, রাজা, পূর্ব্বে আর দেখেন নাই। পরিব্রাজিকা বলিলেন, 'বেশ হইয়াছে, শিষ্যা অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছে।' চতুর বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিল, 'তবে কিছু পারিতোষিক দেওয়া বিধেয়, অন্যথা ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে কেন?' এই বলিয়াই, সে রাজার হস্তস্থিত সুবর্ণবলয় মোচন করিতে উদ্যত হইল। ধারিণী এতক্ষণও কোনমতে, এই সব কাণ্ড কারখানা সহ্য করিতেছিলেন কিন্তু এবার তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি ঈষৎ ক্রোধের সহিত কহিলেন, 'গৌতম! বিরত হও, অন্য কোন গুণ না জানিয়া, কেবল একটু অভিনয় দর্শন করিয়াই, কেন তুমি মালবিকাকে রাজাভরণ অর্পণ করিতে যাইতেছ?' বিদূষক ঠকিবার পাত্র নহে। সেও অমনি বলিল, 'দেবি! পরের জিনিস বলিয়াই দিতে যাইতেছি, নিজের হইলে কি আর দিতাম?' মালবিকার মুখে এই কথায়, আবার হাসির রেখা ফুটিল। ধারিণী তখন বিদিশার অধীশ্বরীর কণ্ঠে কহিলেন, 'গণদাস,! আপনার শিষ্যার পরীক্ষা এখনও কি শেষ হয় নাই?' গণদাস কোন উত্তর না দিয়া, মালবিকাকে লইয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিদূষকও রাজার কাণে কাণে বলিল 'সখে! আমার যতটুকু সাধ্য, তাহা করিলাম, এখন তোমার ভাগ্য[২]!

১—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২য় অঙ্ক। রাজা। আত্মগতম্। 'আত্ত-সারশ্চক্ষুষা স্ববিষয়ঃ। মদনেন স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্ত-দশন-শোভি মুখম্। অসমগ্র-লক্ষ্য-কেসরং উচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্॥'

২—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২য় অঙ্ক। বিদূষক। জনান্তিকং। রাজানং বিলোক্য 'এতাবান্ এব মে মতি-বিভবঃ ভবন্তং সেবিতুম্।'

হরদত্ত এতক্ষণ, নীরবে, গণদাস-শিষ্যার অভিনয় দেখিতেছিলেন। কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যে যে আবার কি অভিনয় হইয়া গেল, শাস্ত্র-জ্ঞান-মগ্ন বৃদ্ধ আচার্য্য তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যেমন অভিনয় শেষ হইল, অমনি, হরদত্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন 'মহারাজ! এইক্ষণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার শিষ্য-কৃত অভিনয় দর্শন করুন।' রাজা অস্ফুরবে নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, 'আর কেন? যে জন্য অভিনয় দর্শন, তাহা ত হইয়াছে, তবে আর বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?' কিন্তু নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য প্রকাশ্যে বলিলেন, 'হরদত্ত! তোমার প্রয়োগ-দর্শনের নিমিত্ত আমরা সকলেই একান্ত পর্য্যুৎসুক[১]। দেখিব বই কি?' এমন সময়ে, বৈতালিকগণ, মধ্যাহ্নকালোচিত সঙ্গীতের দ্বারা নরপতিকে স্নানাহারের সময় উদ্বোধিত করিয়া দিল। সকলেরই চমক ভাঙ্গিল। বেলা অধিক হইয়াছে, সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১—ঐ ঐ। রাজা। আত্ম-গতম্। 'অবসিতে. দর্শনার্থঃ।' প্রকাশঃ। দক্ষিণ-মবলম্ব্য। 'হরদত্ত। পর্য্যুৎসুকা এব বয়ম্।'

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

উপবনে মালবিকা।

মালবিকা, আশা এবং নৈরাশ্য, উভয়ের অধীন হইয়া, আচার্য্যগৃহে সুদীর্ঘ দিনযামিনী কোনমতে অতিবাহিত করিতেছেন। নব বসন্তের আবির্ভাবে উৎসবময়ী বিদিশা-নগরীর সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নগরের উপবন সমূহ কুসুমাভরণে সুসজ্জিত। নাগরিকগণের হৃদয়ের সহিত, উপবন-রাজিও যেন আনন্দে পরিপূর্ণ। নগরের মধ্যে রাজার যেমন উদ্যান, রাণী ধারিণীরও তেমনই এক মনোহর উদ্যান আছে মহারাণী স্বয়ং সেই উদ্যান-বাটিকার তত্ত্বাবধান করেন। বালপাদপে জল-সেচন করেন। উদ্যানের উপর তাঁহার এতই যত্ন। বসন্তের সমাগমে, সকল বাসন্তী তরু-লতিকাই কুসুমের সাজ-সজ্জা পরিয়াছে। বসন্ত-তরুর এক প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে প্রথমে কুসুমোদ্গম হয়, পরে তাহার নূতন পল্লব জন্মে। অন্য ঋতুর তরুতে অগ্রে পল্লব, পরে কুসুম জন্মে। বসন্তের এই বিশেষ ধর্ম্মে সকল তরুই কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত। কিন্তু মহারাণীর বড় আদরের এক অশোকবৃক্ষে ফুল ফুটে নাই। তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। প্রসিদ্ধি আছে, সাধ্বী প্রমদার চরণস্পর্শে অশোকের ফুল ফুটিয়া থাকে। ধারিণীর প্রিয় অশোক-তরু সেই প্রমদার পাদাঘাতরূপ দোহদ করিলে, হয়ত, তাহাতেও ফুল ফুটিতে পারে। কিন্তু ধারিণীর সে সামর্থ্য নাই। চঞ্চল বিদূষক, সে দিন দোলাধিরোহণ কালে, ধারিণীকে 'দোলা-পরি-ভ্রষ্ট' করিয়াছিল, তাই তাঁহার চরণ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। সুতরাং তাঁহার দ্বারা দোহদানুষ্ঠান অসম্ভব। ধারিণী, সত্য সত্যই, মালবিকাকে বড় ভালবাসিতেন। মালবিকার নির্ম্মল-চরিত্রে তিনি একান্ত বিমুগ্ধ ছিলেন। মালবিকার উপর তাঁহার পর্য্যাপ্ত বিশ্বাস ছিল। তিনি মালবিকাকেই, তাঁহার প্রতিনিধি

করিয়া, দোহদ করিতে পাঠাইয়াছেন। মালবিকা একাকিনী, প্রাসাদের উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সেই বসন্তরমণীয়া উদ্যান-বাটিকায় আসিয়াছেন। উদ্যানে আসার পর হইতেই, রাজকুমারীর অন্তঃকরণের যাতনা অতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদিন, আচার্য্য-গৃহে, জন-সমক্ষে, প্রাণ ভরিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসও ছাড়িতে পারেন নাই। সতত সভয়ে অতি কষ্টের সহিত কাল কাটাইয়াছেন। আজ নির্জ্জন স্থান পাইয়াছেন। উপবনের সর্ব্বত্র বসন্তের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যামৃত ক্ষরিত হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর, সে দিক হইতে নয়ন আর ফিরাইতে পারিবে না। এমন সুন্দর উদ্যানের মধ্যে মালবিকা, বন-দেবতার ন্যায়, ধীরে ধীরে উপনীত হইয়াছেন। আজ উদ্যানের সমস্তই স্নিগ্ধ, সমস্তই আনন্দময়, কিন্তু সেই উদ্যান-বর্ত্তিনী দুঃখিনী মালবিকার হৃদয় নিরানন্দ! তিনি সে দিন, রাজার সম্মুখে, যে আত্ম-নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা, তদবধি সর্ব্বদাই, তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। রাজা তাহাতে কি ভাবিলেন, কি করিলেন, কৈ! এত দিনেও ত তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না! এই একান্ত কাতর-চিত্তে, মালবিকা নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,— 'কেন এত দুঃসাহস করিলাম? কেন আমি 'অবিজ্ঞাত-হৃদয়' নরপতিকে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেখাইলাম? কেন এমন আত্ম-বিমূঢ় হইলাম? বালা-জন-সুলভ লজ্জাবরণ উন্মোচন করিয়া, কেন আমার হৃদয়ের গুপ্তধন বিসর্জ্জন দিলাম? সে দিন যে গান গাইয়াছিলাম, আজ তাহা ভাবিতেও লজ্জা হয়। স্নেহময়ী সখীর নিকটে যে মনের বেদনার কারণ জানাইব, এমন সামর্থ্যও আমার নাই। জানি না, বিধাতা কতদিন আমাকে, এই প্রকারে সন্দেহের সূচি-শয্যায় ফেলিয়া রাখিবেন?" মালবিকা এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এতই বিমনায়মানা হইয়াছিলেন যে, তিনি কি জন্য উদ্যান-বাটিকায় আসিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি নিজে নিজেই বলিতেছেন,

'আমি কোথায় যাইতেছি? কেন যাইতেছি?'—এমন সময়ে তাঁহার মনে পড়িল। অমনি বলিতে লাগিলেন—"দেবী ধারিণী আমাকে বলিয়াছিলেন, মালবিকে! আমি 'তপনীয়' অশোকের দোহদ করিতে পারিব না, তুমি যাও, দোহদ কর গিয়া। যদি 'পঞ্চ-রাত্রি-মধ্যে,' অশোক বৃক্ষে কুসুমোদ্গম হয়, তাহা হইলে'—বলিতে বলিতে মালবিকার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল,—'তাহা হইলে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব'— আমার অভিলাষ?"—মালবিকার অভিলাষ মালবিকাই জানেন, অন্যে তাহা জ্ঞাত নহে, সে অভিলাষ অপূরণীয়। তাই মালবিকার দীর্ঘ নিশ্বাস, তাই 'আমার অভিলাষ' বলিতে বলিতেই মালবিকার কণ্ঠরোধ এই ভাবে, সেই বিজন উপবনে, মালবিকা একা একা নিজের সুখ দুঃখের স্বপ্নের আলোচনা করিতেছেন। মালবিকার এ অবস্থা রাজা না দেখিলে কে দেখিবে? তাই কালিদাস, সেই নির্জ্জন উপবন-মধ্যে রাজাকে পূর্ব্বেই প্রবেশ করাইয়াছেন।

আজ মালবিকা দোহদ করিতে আসিবেন, এ কথা, ধূর্ত্ত বিদূষক পূর্ব্ব হইতেই জানিত, তাই সে পূর্ব্ব হইতেই রাজাকে লইয়া উদ্যানের এক লতাগৃহে আসিয়া প্রচ্ছন্ন ছিল। মালবিকা বনমধ্যে একাকিনী উপস্থিত, অদূরে রাজা, তিনি যে মালবিকাকে দেখিতেছেন, তাহার করুণ পদাবলী শুনিতেছেন, মালবিকা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। রাজা, সেই একদিন, নৃত্যমঞ্চে মালবিকাকে দেখিয়াছিলেন, ধারিণীর সমক্ষে সে দর্শন অদর্শন-তুল্য। আজ জন-সঞ্চার বিহীন উদ্যানে রাজা নিঃসঙ্কোচে মালবিকাকে দেখিতেছেন। সে এক মালবিকা, আজ, এ আর এক মালবিকা। অদ্যকার মালবিকার সে উল্লাস নাই, সে উৎসাহ নাই; অদ্যকার মালবিকা 'শর-কাণ্ড-পাণ্ডু গণ্ডস্থলা,' 'পরিমিতাভরণা'; অদ্যকার মালবিকা বসন্তের 'পরিণত-পত্র' 'কতিপয়-কুসুমা' 'কুন্দ-লতিকার' ন্যায় মলিন-কান্তি। ধীরে ধীরে পাদ-চা

করিতে করিতে আসিয়া, মালবিকা সেই প্রতিবন্ধ-প্রসূন অশোকের ছায়া-শীতল তলদেশে একখানি শিলাফলকে উপবেশন করিলেন। সমস্ত তরু কুসুম মণ্ডনে বিমণ্ডিত, কেবল এই অশোক কুসুম-হীন, বিষণ্ণ, তাই বুঝি কবি, বিষণ্ণ তরুর তলে বিষণ্ণ-হৃদয়া রাজকুমারীকে লইয়া আসিলেন। মালবিকার উৎকণ্ঠার সীমা নাই, তিনি এক এক বার এখনও মনকে প্রবোধ দিবার প্রয়াস করিতেছেন। কখনো বলিতেছেন— 'হৃদয়! বিরত হও, কখনো বলিতেছেন 'দীন তুমি, কেন তোমার এ উচ্চাভিলাষ, কেন আমাকে আর যাতনা দাও?' রাজা 'লতান্তরিত' হইয়া এ সমস্তই শুনিতেছেন। এমন সময়ে মালবিকার সখী বকুলাবলিকা অলঙ্কার এবং অলক্তক লইয়া মালবিকাকে বিভূষিত করিতে তথায় উপস্থিত হইল। মালবিকা আদর করিয়া, তাহাকে নিকটে বসাইলেন। সে যখন মালবিকার চরণে অলক্তক এবং নূপুর পরাইতে চাহিল, তখন, দুঃখিনী রাজ-কন্যা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আজ আমার জীবন-মরণের সন্ধিস্থল। যদি অশোক কুসুমিত হয়, তবে এ অলঙ্কার-ধারণ সার্থক হইবে, অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অন্যথা ইহাই আমার 'মৃত্যু-মণ্ডন', এই অলঙ্কার পরিয়াই প্রাণত্যাগ করিব। বকুলাবলিকা মালবিকাচরণে অলক্তক-রাগ করিতেছেন, আর অদূরে লতা-পিহিত রাজা তাহা দেখিতেছেন। মালবিকা ও বকুলাবলিকা দুই জনে, সেই বিজন উদ্যানে কত কথা কহিলেন, হৃদয়ের কত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। মালবিকার অভিলাষ-পূরণে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে বকুলাবলিকা প্রতিশ্রুত হইল। চতুর বিদূষক বহুপূর্ব্ব হইতেই মালবিকার এই পরম বিশ্বস্ত সখীটিকে অনুকূল করিয়া লইয়াছিল। মালবিকা যখন বকুলাবলিকার হাত দুইখানি ধরিয়া, সজল-নয়নে বলিলেন, 'সখি! আমার এই ঘোর বিপদে, যতটুকু পারিস, তুই আমার সাহায্যতা করিস,' তখন সে বলিল, 'মালবিকে! তুমি জান

না, বকুলের মালা যত বিমর্দ্দ করিবে, তাহার সৌরভ ততই বাড়িবে। আমি বকুলাবলিকা, আমাকে যত কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, আমার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাইবে।' বকুলাবলিকা এই একটি কথাতেই মালবিকার প্রাণটি নিজের হাতের মধ্যে করিয়া লইল। তার পর, নিমেষে নিমেষে, যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে বকুলাবলিকা সে প্রাণ ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিল। রাজা অন্তরালে থাকিয়া, সে সব দেখিতে লাগিলেন, শুনিতে লাগিলেন। বকুলাবলিকা রাজকুমারীকে লতার বলয়ে, পল্লবের অবতংসে, সাজাইল। নিসর্গসুন্দরী কুমারী বন-কুসুম-পল্লবে সজ্জিত হইয়া বনদেবীর ন্যায় দাঁড়াইয়া যখন অশোকের গাত্রে পাদপ্রহার করিলেন, তখন তাঁহার নূপুরারাবে সমস্ত উদ্যান-বাটিকা মুখরিত হইয়া উঠিল। পদাঘাত করিয়া, মালবিকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়, অবসর বুঝিয়া, বিদূষককে লইয়া, রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন।

এদিকে, ইরাবতী তাহার পরিচারিকা নিপুণিকার সহিত রাজাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই বৃক্ষবাটিকায় আসিয়াছেন, অনেকক্ষণ যাবৎ, তিনি, দূর হইতে, মালবিকা ও বকুলাবলিকার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন প্রধান মহিষীর উদ্যানে পরিচারিকা মালবিকা সজ্জিতদেহে কাহার অপেক্ষা করিতেছে?—ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বকুলাবলিকার সহিত, যখন অগ্নিমিত্রের সম্বন্ধে মালবিকার কত কথা হইতেছিল, তখন, নিপুণিকা, একটি একটি করিয়া সে সব কথা, অভিমানিনী ইরাবতীকে বুঝাইয়া দিতেছিল। মালবিকা ও বকুলাবলিকার গুপ্ত মন্ত্রণা-শ্রবণে ইরাবতীর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। ক্রোধে দেহ কম্পিত হইতেছিল। এমন সময়ে আবার স্বয়ং রাজা তথায় প্রবেশ করিলেন। নিপুণিকা দেখাইলেন,—'ঐ রাজা'। ইরাবতী দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় শতখণ্ডে যেন চূর্ণবিচূর্ণ হইল। ইরাবতী বৃক্ষান্তরিত হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

সহসা রাজার উপস্থিতিতে মালবিকার বড়ই ভয় হইল। বিশেষতঃ বিদুষক যখন বলিল, 'তুমি পরিচারিকা হইয়া কেন মহারাজের অশোক বৃক্ষে বাম চরণাঘাত করিলে?'—তখন, সত্য সত্যই মুগ্ধা মালবিকা একান্ত অপ্রতিভ এবং ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাজা অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু মালবিকা নির্ব্বাক্। রাণী ইরাবতী ক্রোধোত্তোলিত-ফণা বিষধরীর ন্যায়, গ্রীবা উন্নত করিয়া, তাঁহার অবিনীত রাজার ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত অসহ্য হইল। রাজা যখন বলিলেন, 'অশোক কুসুম-হীন ছিল, তাহার দোহদ করিলে, কুসুমোদ্গম হইবে। আমারও ত অভিলাষ-কুসুম অপ্রস্ফুটিত, মালবিকে! আমার কি দোহদ হইবে না?' গর্ব্বিতা ইরাবতী তখন আর আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখে, সহসা, দৃপ্ত সিংহীর ন্যায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, 'হইবে বৈ কি? তোমার দোহদ অবশ্য পূর্ণ হইবে। অশোকের দোহদে তাহাতে মাত্র ফুল ফুটিবে, তোমার দোহদে, মহারাজ! তোমাতে ফুল ও ফল দুইই হইবে, ছি ছি!!'—

সকলেই অপ্রস্তুত হইলেন। বকুলাবলিকা কম্পিতাঙ্গী মালবিকার হস্তধারণপূর্ব্বক, ত্বরিত-চরণে চলিয়া গেল। রাজা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, মূঢ়-নয়নে ইরাবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইরাবতী কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "হায়! 'ব্যাধগীতা—রক্তা হরিণীর ন্যায়, আমি এত দিন তোমার চাটুবচনে আত্মবিস্মৃত ছিলাম, তুমি আমায় বঞ্চনা করিয়াছ, আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি বিদিশার অধিপতি, তোমার যে এতাদৃশ বিনোদ বস্তু লাভ হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না; জানিলে কি আর আমি হত-ভাগিনী তোমার অন্বেষণে এস্থলে আসিতাম?"

মালবিকা পরিচারিকা, তাই ইরাবতী 'এতাদৃশ বিনোদ বস্তু' বলিয়া রাজাকে শ্লেষ করিলেন। কিন্তু বিদূষকের ইহা সহ্য হইল না। সে অমনিই বলিয়া বসিল 'রাজ্ঞি! পরিচারিকার সহিত সরলভাবে কথাবার্ত্তায়

যে কোন দোষ নাই, তুমিই ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—আজ ইরাবতী রাণী, কিন্তু একদিন তিনিও মালবিকার ন্যায় পরিচারিকা ছিলেন।

বিদূষকের এই তীব্র উক্তিতে ইরাবতীর আরও ব্যথা লাগিল। 'বেশ ত, তবে কথাবার্ত্তাই চলুক' বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। 'না, তুমি অবিশ্বাসী' বলিয়া যেমন ইরাবতী ক্ষিপ্র চরণে ছুটিয়া চলিলেন, অমনি তাহার হৈমী মেখলা স্খলিত হইয়া চরণে বিজড়িত হইল। রোষ-কষায়িতাক্ষী ইরাবতী গমনের বিঘ্নভূত এই রশনা হাতে লইয়া, পশ্চাদ্ধাবমান বিদিশেশ্বরকে তাড়না করিতে গেলেন। রাজা আরও অনুনয় করিলেন। ইরাবতীর তখন যেন একটু চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, 'কেন আমায় আর অপরাধিনী কর? আমার কাছে তোমার কি অত অনুনয় শোভা পায়? আমি কি মালবিকা?'—এই বলিয়াই সখীর হস্তধারণপূর্ব্বক, তিনি তরস্বিনী কেশরিণীর ন্যায়, দম্ভের সহিত চলিয়া গেলেন। রাজা কুপিতা ইরাবতীর চরণে পতিত হইয়াছিলেন, সে চরণপাত ব্যর্থ হইল। তিনি ভূমিতেই পড়িয়া রহিলেন। বিদূষক বলিল, 'সখে! আর কেন? এখন উঠ।' রাজার এবার ক্রোধের উদ্রেক হইল, বিরক্তির উদয় হইল। রাজা যাহাকে পরিচারিকা হইতে রাজ্ঞীপদে আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই রাজার প্রতি তাহার এই ব্যবহার! এত অবিনয়! রাজা ভাবিলেন 'বাঁচিলাম, আমি ইরাবতীকে ভুলিব।' মালবিকার সৌভাগ্যগগনে যে একটু কালো মেঘের রেখা ছিল, তাহা দূর হইল।

ইরাবতী রুগ্ন-চরণা মহারাণী ধারিণীর সকাশে উদ্যানের সমস্ত ঘটনা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন, ধারিণী তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে, মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে 'সারভাণ্ডগৃহে' আবদ্ধ করিয়া রাখা হউক। রাজ্ঞীর আদেশ অচিরাৎ পালিত হইল। মালবিকা বুঝিলেন যে, তাঁহার সকল আশার মূলোচ্ছেদ হইল। পরিব্রাজিকা বিদূষককে

জানাইলেন। বিদূষক আবার রাজার নিকটে বলিল। রাজা অতীব বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু কোন প্রতিকার-বিধান করিতে পারিলেন না। ধারিণীর আদেশের প্রতিকূলে যাইতে তাঁহার আর সাহস হইল না। একবার ইরাবতীর নিকটে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছেন, আবার কি করিতে কি হইবে, তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বিদূষকেরই শরণাপন্ন হইলেন। বিদূষক অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি, তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাজার কাণে কাণে বলিল। রাজা প্রসন্ন-হৃদয়ে অন্তঃপুরে পীড়িতা ধারিণীকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, বিদূষকের পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে, রাজা, প্রতিহারী-দর্শিত 'গূঢ় পথে' প্রমদ-বনে প্রবেশ-পূর্ব্বক, বিদূষকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিদূষক আসিয়া বলিল, "সখে! কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, মালবিকার উদ্ধার করিয়াছি, সত্বর চল, 'সমুদ্রগৃহে' মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে রাখিয়া, তোমাকে লইতে আসিয়াছি, বিলম্ব করিও না।"

সমুদ্রগৃহ রাজা ও রাজ্ঞীদের অন্যতম প্রধান প্রাসাদ। নানাবিধ আলেখ্যে, নানাবিধ দৃশ্যপটে সমুদ্র-গৃহ-ভিত্তি সজ্জিত। রাজা বা রাণীদের কেহ ব্যতীত তথায় অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। সেই স্থানে বকুলাবলিকাকে লইয়া মালবিকা অবস্থান করিতেছেন। সখী বকুলাবলিকা মালবিকাকে কত সুন্দর সুন্দর ছবি দেখাইতেছেন। কোথাও রাজার মৃগয়া-বেশের প্রতিকৃতি, কোথাও রাজবেশের প্রতিকৃতি, কোথাও অন্তঃপুর-মহিলাদের সহিত রাজা কথোপকথন করিতেছেন—এই ছবি চিত্রিত। দেখিলে মনে হয়, সত্যই বুঝি রাজা বসিয়া আছেন। বকুলাবলিকা সে সব এক এক খানি করিয়া মালবিকাকে দেখাইতে লাগিলেন। মালবিকা নিয়ত রাজ-মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে, একবারে যেন তন্ময়ী হইয়া পড়িলেন। বাহিরে দেখেন রাজা, ভিতরে মনের মধ্যে দেখেন রাজা, রাজা ব্যতীত তাঁহার যেন একটা পৃথগস্তিত্বই রহিল

না। কালিদাস এই প্রকার চিত্র-দর্শনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রঘুবংশের কত স্থানে, চিত্রশালিকায় লইয়া গিয়া, সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। মেঘদূতে যক্ষ ও যক্ষ-বধূর চিত্র-নির্ম্মাণ-প্রিয়তার পর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। আবার এই নাটকেও, চিত্রশালিকায় আনিয়া, তাঁহার মুগ্ধা মালবিকার চিত্ত-বিনোদন করিতেছেন। তিনি নিজে অসাধারণ চিত্রকর ছিলেন, স্বর্গ-মর্ত্তের চিত্র করিয়া গিয়াছেন। এক একটি কথায়, এক একটি কবিতায়, এক এক খানি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি নিজে চিত্র করিতে ভাল বাসিতেন, চিত্র দেখিতে ভাল বাসিতেন, অন্যকেও চিত্র দেখাইতে ভাল বাসিতেন : তাই তাঁহার প্রতি গ্রন্থেই আমরা কত প্রকার চিত্র দেখিতে পাই।

ধারিণীর আদেশে মালবিকা অবরুদ্ধ ছিলেন। বিদূষক তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছে। সমুদ্র-গৃহে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছে, মালবিকা অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কাহার অপেক্ষায় যে বসিয়া আছেন, তাহা তিনি জানেন না। আর বিদূষকও তাহা বলিয়া যায় নাই : মালবিকা সে দিন ইরাবতীর সমক্ষে যে লজ্জা পাইয়াছেন, যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে, তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর বুঝি রাজ-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে নাই। তাই আজ সেই দুর্লভ দেবতার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া উত্তপ্ত হৃদয়ের কথঞ্চিৎ শান্তি করিতেছেন। চিত্রাবলী দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ, এক খানি আলেখ্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি স্থির হইল। সে চিত্রখানি রাজা অগ্নিবর্ণের অন্তঃপুরের প্রতিকৃতি। তাহাতে রাজ-পরিবারের অনেকেই আছেন, রাজাও আছেন। কিন্তু রাজা অনিমেষ-নেত্রে, একধ্যানে, একটি অন্তঃপুর-ললনার দিকে চাহিয়া আছেন, আর সেই ললনা, বদন ঈষৎ পরিবৃত্ত করিয়া আনত-নয়নে বসিয়া আছেন। মালবিকার নয়নে এই দৃশ্যটি পতিত হওয়ামাত্রেই, তিনি সমীপ-বর্ত্তিনী সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহা কোন্ ললনার প্রতিকৃতি?

তাহার নাম কি? বকুলাবলিকা বলিল 'ইঁহারই নাম ইরাবতী।' সরল-প্রাণা মালবিকা অমনি বলিলেন, 'সখি! এব্যবহার ত মহারাজের দাক্ষিণ্যের পরিচায়ক নহে; সমস্ত মহিষীদিগকে উপেক্ষা করিয়া, একজনের উপর অনুগ্রহাতিশয় প্রদর্শন কি উদার প্রকৃতির লক্ষণ?' ইরাবতী যখন ধারিণীর পরিচারিকা ছিলেন, ইহা সেই সময়ের ছবি।' মালবিকার এই কথায়, বকুলাবলিকা, সত্য সত্যই, তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা এবং উদারতা অনুভব করিয়া একান্ত প্রীত হইলেন। কিন্তু বকুলাবলিকা বুঝিলেন যে, মালবিকা চিত্রগত অগ্নিমিত্রকে প্রকৃত অগ্নিমিত্র ভাবিয়াছেন। তাই একটু রহস্য করিবার জন্য কহিলেন, 'সখি! ঐ রমণী মহারাজের প্রণয়ভাজন।' অমনি মালবিকা 'কেন তবে আমার ব্যথিত প্রাণে আবার নূতন ব্যথা দিতে যাইতেছি?' বলিয়া ঈষৎ রোষভরে সে চিত্র-দর্শন হইতে বিরত হইলেন, এবং অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রোষাবির্ভাবে তাঁহার মুখকান্তি রক্তাভ হইল। বকুলাবলিকা মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বিদূষক তাঁহাদিগকে এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই ভাবে কাল কাটাইতেছেন! আর না কাটাইয়াই বা করিবেন কি? যাইবেন কোথায়? রাজ-সংসারে আর মালবিকার স্থান নাই। ধারিণী এত দিন প্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে, ইরাবতীর অভিযোগে তিনিও বিরূপ হইয়াছেন। সুতরাং মালবিকার আর গন্তব্য স্থান কোথায়? এ দিকে ধূর্ত্তচূড়ামণি বিদূষক, অনেকক্ষণ হইল, রাজাকে লইয়া, নিগূঢ়ভাবে, সমুদ্র-গৃহের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা অন্তরালে থাকিয়া মালবিকার কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন। মালবিকার উক্তি-প্রত্যুক্তি গুলি তন্ময়-চিত্তে শুনিতেছেন। রাজা, ইতিপূর্ব্বে কয়েকবারে, মালবিকার কয়েক প্রকার মূর্ত্তি দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার রোষারুণ মূর্ত্তি দেখেন নাই। কবিশ্রেষ্ঠ এবার তাঁহাকে সে কমনীয় মূর্ত্তিও দেখাইলেন।

মালবিকার কোপরক্ত, মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া রাজা আর আত্মগোপন অথবা আত্ম-বঞ্চনা করিতে পারিলেন না, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অগ্নিমিত্র-হৃদয়া মালবিকা, সহসা হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি 'চিত্রগত ভর্ত্তাকে' যথার্থ ভর্ত্তা ভাবিয়া, তাঁহার উপর বৃথা কোপ করিতেছিলেন। মালবিকার আর লজ্জার অবধি রহিল না। তিনি ব্রীড়ানতবদনে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদিশেশ্বরের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজার অন্তঃকরণ-বাহিনী প্রীতিধারা যেন শতমুখে নির্গত হইয়া, মালবিকাকে পরিস্নাত করিল। রাজকুমারী ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে, চিত্রপুত্তলিকার প্রায়, স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিপুণ বিদূষক বকুল বলিকাকে লইয়া হরিণ তাড়াইতে ছুটিয়া গেল।

মালবিকার প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। সেই এক দিন এমনি সময়ে, ধারিণীর উদ্যান-বাটিকায় ইরাবতী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে, এত দিন অবরুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। তাই আজ রাজার কোন কথার আর তিনি উত্তর দিতে সাহস করিলেন না। কথা কহিতে আদৌ তাঁহার সাহসই হইল না। তিনি যেন অন্তরে বাহিরে, সেই দৃপ্ত সিংহী ইরাবতীকে দেখিতে পাইলেন। রাজার যত সামর্থ্য, তাহা ত সেই দিন, উদ্যানবাটিকায় যখন ইরাবতী আসিয়াছিলেন, তখনই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে কাহার বলে তিনি কথা কহিবেন? তাই তিনি নির্ব্বাক্ এবং সাচী-কৃত-বদনে দণ্ডায়মানা। আর তাঁহার পুরোভাগে অনুনয়-তৎপর বিদিশাপতি। এমন সময়ে, তথায় সত্য সত্যই ইরাবতী উপস্থিত হইলেন।

সে দিন, উদ্যানে, ইরাবতী ক্রোধবশে রাজার অবমাননা করিয়াছেন, কত অপ্রিয় বচন বলিয়া, তাঁহাকে,—যিনি এক দিন কত ভাল বাসিতেন, সেই অগ্নিমিত্রকে ব্যথা দিয়াছেন; রশনা দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ক্রোধোন্মত্তা ইরাবতীর তখন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান

ছিল না। পরে ইরাবতী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সে সব ভাল করেন নাই। রাজার চরণে ঘোর অপরাধ করিয়াছেন। এ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক। কিন্তু কাহার কাছে ক্ষমা চাহিবেন? অগ্নিমিত্র ত এখন আর সে অগ্নিমিত্র নাই, সে ইরাবতী-বল্লভ নাই। তাই ইরাবতী আজ সমুদ্র-গৃহে আসিয়াছেন। তিনি যে দিন সর্ব্বপ্রথমে রাজার নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিলেন, সেই দিনকার সেই অবস্থার একখানি চিত্র এই সমুদ্র-গৃহে আছে। সেই চিত্রের দিকে চাহিয়াই, কিয়ৎপূর্ব্বে মালবিকা অভিমান করিতেছিলেন। এই সমুদ্র-গৃহে ইরাবতীর জীবনের সেই প্রথম উষার আলোক ফুটিয়াছিল। রাজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অভিমানিনী ইরাবতী আজ জন্মের মত ক্ষমা চাহিতে এবং বিদায় লইতে, এই সমুদ্র-গৃহে উপনীত হইয়াছেন। যে চিত্রখানিতে, তাঁহার দিকে রাজা অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, সেই চিত্রের—সেই চিত্রিত রাজমূর্ত্তির নিকট, ইরাবতী আজ ক্ষমা চাহিয়া অপরাধ লাঘব করিবেন। সেই চিত্রিত রাজ-মূর্ত্তির নিকট আজ জন্মের মত বিদায় লইবেন। যে আলেখ্যে তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রথম রেখার ছায়া অঙ্কিত আছে, সেই আলেখ্যের সম্মুখে আজ জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের কথাগুলি কহিয়া যাইবেন। তাই ইরাবতী উপস্থিত। চিত্র-গত ভর্ত্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন, শুনিয়া, যখন পরিচারিকা নিপুণিকা কহিল 'দেবি! চিত্রে কেন? ভর্ত্তার সম্মুখে গেলে ক্ষতি কি ছিল?' তখন বিষাদিনী ইরাবতী দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "মুগ্ধে! 'চিত্র-গত' আর 'অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয়'—এতদুভয়ে প্রভেদ কি? আমি তাঁহার অসম্মান করিয়াছি, তাই আমার এই উদ্যম, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

রাজা ও মালবিকাকে রাখিয়া, হরিণ তাড়নার ছল করিয়া, বিদূষক অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনও সে ফিরে নাই, বহির্দ্বারে বসিয়া বসিয়া ঘুমাই-

তেছে। সে হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখিয়া, 'সাপ! সাপ!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। তাহার চীৎকারে রাজাও, চকিত-হৃদয়ে, 'ভয় নাই' বলিয়া সেই দ্বারের দিকে ছুটিয়াছেন। এমন সময়ে মালবিকা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া রাজাকে বাধা দিলেন। সাপের নাম শুনিয়া মালবিকার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কেমন করিয়া রাজার গমনে সম্মতি দিবেন? এরূপ সময়ে সাধ্বী ললনার হৃদয়ের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, মালবিকারও তাহাই হইল। তিনি লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া, পরিণত-বয়স্কার ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন—'ভট্টা! মা দাব, সহসা নিক্কম, সপ্পোত্তি ভনাদি।' মহাকবি এইবার মালবিকার অপরিমিত-স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়খানি, একবারে যেন খুলিয়া দেখাইলেন যে, সে পতিপ্রাণার অন্তঃকরণ কত সুন্দর, কত মমতাময়। পশ্চাদ্ধাবমানা মালবিকার প্রতিষেধে তত্টা কর্ণপাত না করিয়া, বন্ধু-বৎসল রাজা, দ্রুতপদে বিদূষকের নিকটে উপনীত হইলেন। এদিকে ইরাবতীও আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ত!' এই ব্যাপারে, ইরাবতীর এই অকস্মাদাগমনে, সকলেই অবাক্ হইলেন। মালবিকা ও বকুলাবলিকা একান্ত ভীত হইলেন। রাজা, ইরাবতী, নিপুণিকা, বকুলাবলিকা, বিদূষক প্রভৃতির কত আলাপ হইল, কিন্তু দুঃখিনী রাজনন্দিনী মালবিকা একটি কথাও কহিলেন না। বাতাহত লতিকার ন্যায়, কেবল একপার্শ্বে, কম্পিত-দেহে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময়ে, হঠাৎ 'ধারিণীর কন্যা বসুলক্ষ্মী বড়ই বিপন্ন' এই প্রকার একটা রব উঠিল। তাহাতে সকলেই চঞ্চল হইলেন। ইরাবতী ক্রোধ, অভিমান, সমস্ত ভুলিয়া, মাতৃধর্ম্মের অতিপ্রভাবে, অবশ-চিত্তে, রাজাকে লইয়া কুমারী বসুলক্ষ্মীর নিকটে ছুটিয়া গেলেন। কেবল বকুলাবলিকা ও মালবিকা—এই দুইজনে, সেই সমুদ্র-গৃহে পড়িয়া রহিলেন মালবিকা সজল-নয়নে, বকুলাবলিকাকে কহিলেন, 'সখি! দেবী ধারিণী

কথা ভাবিয়া, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। একবার, সেই অশোক কুঞ্জের ঘটনার পর, যে কি লাঞ্ছনা সহিয়াছি, তাহা ত তুই জানিস্, এবার যে আবার কি দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা বলিতে পারি না' ছিন্ন-সূত্রিকা মুক্তা-মালিকার ন্যায় ঝর্ ঝর্ করিয়া, মালবিকার অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে, দূর হইতে কে বলিয়া উঠিল, 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এখনও পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে অশোকে গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধন্য মালবিকা! তোমার দোহদ সার্থক, যাই, দেবীর নিকটে এ সংবাদ বলি গিয়া।' বকুলাবলিকা প্রমদবন-পালিকার এই হর্ষসংবাদ শুনিয়াই, কাতর-হৃদয়া মালবিকাকে কহিল 'প্রিয়সখি! আশ্বস্ত হও, ঐ শুন, তোমার দোহদ সার্থক হইয়াছে। আমি জানি, দেবী ধারিণী সত্যপ্রতিজ্ঞা, তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা মনে আছে ত?'—

উদ্যান-পালিকা এই আনন্দের সংবাদ দিবার নিমিত্ত পাটরাণীর প্রাসাদে ছুটিল। আর মালবিকা এবং তাঁহার সখীও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মালবিকার পরিণয়।

আজ ধারিণীর প্রাসাদে বড় আনন্দ। অশোকে ফুল ফুটিয়াছিল না। দেবী স্বয়ং দোহদ করিতে পারেন নাই। প্রতিনিধি করিয়া মালবিকাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দোহদ করিয়াছেন। কথা ছিল, যদি 'পঞ্চরাত্রাভ্যন্তরে' অশোক কুসুমিত হয়, তবে দেবী ধারিণী মালবিকার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। ফুল ফুটিয়াছে। আজ মালবিকার অভিলাষ পূরণের দিন।

ধারিণী, এত দিন তটস্থ হৃদয়ে, রাজার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আসিতেছিলেন, বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ইরাবতীর একান্ত আগ্রহে, সেই একবার মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তার পর রাজার কোন কার্য্যেই আর বাধা দেন নাই। প্রত্যুত তিনি আনন্দ সহকারে মনে মনে রাজার কার্য্যাবলীর অনুমোদনই করিতেছিলেন। যে জন্য তাঁহার এত প্রয়াস, মালবিকাকে গণদাসের বাটীতে প্রেরণ, দূরে দূরে মালবিকাকে রাখা, ধীরে ধীরে অভিপ্রেত সিদ্ধির চেষ্টা, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ আকৃষ্ট হইয়াছে। ধারিণীর আহ্লাদের সীমা নাই। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, মালবিকা যখন সকল বিষয়ে সমান পারদর্শিনী হইবেন, তখন তাঁহাকে রাজার নয়নগোচর করিবেন। ক্রমে ক্রমে, রাজাকে একবারে মালবিকাময় করিয়া, পরে, যথাসময়ে মালবিকাকে অর্পণ করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। ধারিণীর ন্যায় পরিব্রাজিকারও ঐ অভিপ্রায় ছিল, বিদূষকেরও ছিল। রাজার সহিত যাহাতে সত্বর মালবিকার সম্মিলন ঘটে, এ বিষয়ে সকলেই সত্বপর ছিলেন। তাই সমবেত চেষ্টার ফলে, তাঁহাদের মিলন হইয়াছে।

ধারিণীর বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর বিলম্ব কেন? কাহার অপেক্ষায় বিলম্ব? তাই আজ ইরাবতীর পারিতোষিকের সমস্ত আয়োজন মহারাণী ঠিক করিয়াছেন। আজ রাজাকে লইয়া ধারিণী অশোককুঞ্জে চলিলেন। অশোকের ফুল পাটরাণী একাকী দেখিবেন না, রাজার সহিত মিলিত হইয়া দেখিবেন। আর যে এই অকুসুমিত অশোকতরু কুসুমগুচ্ছে পরিপূর্ণ করিয়াছে, আজ আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া তাহাকেও একবার রাজাকে দেখাইবেন। রাজা এ সব জানেন না। তিনি দেবীর নির্দেশ মতে অশোক কুঞ্জে উপস্থিত। এদিকে, ধারিণীর কথানুসারে, পরিব্রাজিকা নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া, মালবিকাকেও তথায় লইয়া গিয়াছেন। মালবিকা জানেন না, কেন আবার আজ তাঁহার এই নূতন সাজসজ্জা। অশোককুঞ্জে সকলে সমবেত হইয়াছেন, এমন সময়ে মহারাণী সহাস্যবদনে মহারাজকে কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! আজ এই অশোককুঞ্জে তোমার 'বিবাহবাসর' করিব।' রাজা বুঝিতে পারিলেন না। ধারিণীর মুখের দিকে অপ্রবুদ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময়ে দুইজন সঙ্গীতনিপুণা বালিকা তথায় উপস্থিত হইয়া, পরিচারিকা হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। দেবী ধারিণীর আদেশে তাহার সমীপে আনীত হইল। আসিয়াই তাহারা, পার্শ্ববর্ত্তিনী মালবিকার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মালবিকাও তাহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পণ্ডিত কৌশিকী ব্যতীত, আর কেহই ইহার রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, এই বালিকাদ্বয় মালবিকার সহচরী ছিল। মাধবসেন যখন ইহাদিগকে লইয়া বিদিশায় আসিতেছিলেন, তখন পথি-মধ্য-বৃত্ত সেই বিপ্লবে ইহারাও হারাইয়া যায়। রাজা কৌতূহলবশতঃ বালিকাদ্বয়কে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহারাও যথাজ্ঞাত বিবৃত করিল। তখন ধারিণী এবং রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, যে

বিদর্ভ-রাজপুত্রী পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়াছিলেন, এই মালবিকাই তিনি। রাজার আর আনন্দের অবধি রহিল না। ধারিণী কিন্তু লজ্জিতা হইলেন। রাজার কন্যাকে পরিচারিকা করিয়াছিলেন, অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাবিয়া মহারাণী লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন।

এদিকে মালবিকার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। যে বালিকা গহন বনে দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, যাহাকে রাজার করে অর্পণ করিবার জন্য মাধবসেন লইয়া আসিতেছিলেন, এই সেই মালবিকা, ইহা শুনিয়া রাজা কি বলেন, মালবিকা এখন গ্রাহ্যা না ত্যাজ্যা, কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, শুনিবার জন্য মালবিকা উদ্বিগ্নচিত্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজার এই একটি কথার উপর এখন মালবিকার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। দুঃখিনী রাজকুমারী থাকিয়া থাকিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন। রাজা কিন্তু অতিশয় প্রীত হইয়া সেই নবাগত বালিকাদ্বয়কে পারিতোষিক দিলেন। এমন সময়ে ধারিণী অবসর বুঝিয়া পরিব্রাজিকাকে কহিলেন, 'ভগবতি! আপনার অগ্রজ মন্ত্রিবর আর্য্য সুমতির একান্ত বাসনা ছিল যে, মালবিকাকে আমার আর্য্যপুত্রের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি এখন পরলোকে। আমি আজ আপনার জ্যেষ্ঠের সেই অভিলাষ পূরণ করিতে চাই। মালবিকাকে আর্য্যপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে বাসনা করি, আপনি অনুমতি করুন।' ধীরবুদ্ধি পরিব্রাজিকা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'দেবি! মালবিকার তুমিই কর্ত্রী, যাহা ইচ্ছা করিতে পার!'—

ধারিণী ইরাবতীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখন বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম, অশোকে ফুল ফুটিলে মালবিকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিব; ফুল ফুটিয়াছে, এখন ভগ্নি! তুমি আসিয়া আমার প্রতিশ্রুতি পালনের সাহায্য কর। ইরাবতী আর আসিলেন না, তিনিও পরিচারিকার মুখে বলিয়া পাঠাইলেন, 'দিদি! তুমিই কর্ত্রী, যাহা

অভিলাষ করিয়াছ, তাহাই কর, প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্য পালন করিও।'—ইরাবতীর সব ফুরাইল!

ধারিণী রাজাকে বলিলেন যে, এখনই মালবিকাকে বিবাহ করিতে হইবে। রাজা করেন কি? মহারাণীর কথা না রক্ষা করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়, তাই যেন অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালবিকাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। তখন রাজ্ঞী সালঙ্কারা মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া, মন্থর-পদ-বিক্ষেপে, রাজার নিকটে লইয়া গিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন 'আর্য্যপুত্র! বিদিশেশ্বর! গ্রহণ কর!'—'দেবি! তোমার শাসন সর্ব্বথা পালনীয়' বলিয়া রাজা মালবিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরিচারিকাগণ অমনিই প্রধান মহিষী ধারিণীর সন্নিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ত্বরিতচরণে মালবিকার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল! ধারিণী উদাসীন-নয়নে, চিরপরিচিত সেই প্রিয় পরিচারিকাগণের এই ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন। পরিব্রাজিকাও অমনি মালবিকার নিকটে যাইয়া, 'রাণি! তোমার জয় হউক' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। ধারিণী স্থির-নয়নে, পরিব্রাজিকার এই আকস্মিক সম্মান-প্রদর্শনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় ইরাবতীর পরিচারিকা আসিয়া বলিল, 'রাজন্! ইরাবতী বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনার নিকট তিনি সে দিন ঘোর অপরাধ করিয়াছেন। আজ আপনি পূর্ণ-কাম হইয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।' রাজা কোন কথা কহিলেন না। ধারিণী বলিলেন—'আচ্ছা'।

ধারিণী এতদিন একটা গুরুতর আবেগভরে ক্লান্ত ছিলেন। সেই আবেগের কারণ, রাজার সহিত মালবিকার পরিণয় আজ। তাহা সম্পন্ন হইল। ধারণীর হৃদয়ও আবেগ-শূন্য হইল। নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন বিশীর্ণবক্ষঃ তটিনীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় যেন একবারে স্থির ও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। উৎসাহের অবসানে প্রাণে একটা অবসাদ আসিল।

আর মালবিকা,—মালবিকা রাজার কন্যা হইয়া পথে পথে, বনে বনে, নগরে নগরে, ভিখারিণীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে রাজবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ভ্রাতা মাধবসেন যদি কারারুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে এতদিন কবে রাজার করে মালবিকা অর্পিত হইতেন। তাহা হয় নাই। সেই সঙ্কল্পিত রাজার প্রাসাদেই মালবিকা আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাজ-কন্যা-ভাবে আসেন নাই, দাসী-ভাবে আসিয়াছেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ত আর দাসীর উপযুক্ত নয়। সে হৃদয় রাজকন্যার হৃদয়। বিদর্ভের অধিপতির আত্মজার হৃদয় যেমন হওয়া উচিত, তদ্রূপ। আজ বিদর্ভের পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু মালবিকার বাল্যকালে, এই বিদিশার ন্যায় বিদর্ভের রাজ-সংসারেও কত আমোদ ছিল, কত উৎসব ছিল। বিদিশার আজ কুমারী বসুলক্ষ্মীর যেমন আদর যত্ন, যেমন পরিচারিকা, বিদর্ভে মালবিকারও এক দিন এইরূপ ছিল। সে সমস্ত আজ স্বপ্নের বিষয় হইয়াছে। মালবিকা রাজবাড়ীতে পরিচারিকা সাজিয়া আছেন। প্রাণ যতক্ষণ মানুষের দেহ ছাড়িয়া না যায়, ততক্ষণ মানুষ না থাকিয়া পারে না, এক ভাবে না এক ভাবে মানুষকে থাকিতে হয়, তার হৃদয়ে জ্বালা, যন্ত্রণা, অবসাদ, দুঃখ যাহাই থাকুক না কেন, সে সমস্ত বক্ষে চাপিয়া তাহাকে হাসিতে কাঁদিতে হয়। রাজকন্যা মালবিকাও সেই ভাবে ছিলেন। কখনো কোন কূট চিন্তা কি নীচ ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। রাজা অগ্নিমিত্রের উপর যখন তাঁহার দীন-হৃদয়ে অনুরাগের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত অগ্নিমিত্রের সহিত পরিণয় পর্য্যন্ত, কোন সময়ে, কোন অবস্থায়, তিনি কোন প্রকার অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার উপর যত বিপদই পতিত হউক, তিনি আপন দুরদৃষ্ট-স্মরণ-পূর্ব্বক, সে সমস্তই নীরবে বক্ষ পাতিয়া লইতেন। কিছুতেই বিচলিত হইতেন না : যখন হৃদয়ের বেদনা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন তিনি নির্জ্জনে

বসিয়া একাকিনী কাঁদিতেন ও বিলাপ করিতেন। রাজার কন্যা তিনি, রাজার সঙ্গেই ত পরিণয় হইবার কথা, কিন্তু ভাগ্যবশে, রাজরাণী না হইয়া তিনি রাজরাণীর পরিচারিকা হইয়াছিলেন। তাহার অতি সুলভ বস্তুও একান্ত দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা কিছু জীবনের অনুকূল ছিল, সে সমস্তই প্রতিকূল হইয়াছিল। বিধাতার সৃষ্টিতে এমন বস্তু নাই। ইহা মহাকবির এক নূতন সৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টিতে স্বর্গের পারিজাত স্বর্গেই থাকে, মর্ত্তে আসে না; মর্ত্তের কুসুমও স্বর্গে যায় না। ভিন্ন লোকের সমস্তই বিভিন্ন। আর কবির এই নূতন সৃষ্টিতে স্বর্গের পারিজাতকে তিনি, মর্ত্তের দুঃখময়, অবসাদময়, পঙ্কিল সংসারে লইয়া আসিয়া, আবার তাহাকে তাহার সেই স্থানে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কবির এ চিত্র বিধাতার চিত্র অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, অনেক সুন্দর, অনেক মনোহর।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নিমিত্র।

অগ্নিমিত্র যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতের এক সুদিন। তখন বৌদ্ধ রাজত্বের পতন হইয়াছে। পিতা পুষ্পমিত্র শেষ বৌদ্ধ-নৃপতি বৃহদ্রথকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুত্র অগ্নিমিত্রকে বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্ করিয়াছেন। ভারতে বহিরুপদ্রবের শান্তি হইয়াছে। কোথাও অন্তর্বিপ্লব নাই। পিতা পুষ্পমিত্র, মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে, বিরাট সেনার অধিনায়করূপে রাজত্ব করিতেছেন, ওদিকে অগ্নিমিত্রকে মধ্যভারতে বিদিশার সিংহাসনে ভারতেশ্বরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সম্রাট্ অগ্নিমিত্র, পিতৃ-নির্ব্বাচিত বিশ্বস্ত মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শানুসারে দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রও একজন অপ্রতিরথ বীর। যে স্থানে প্রয়োজন, কুমার বসুমিত্র অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা শত্রু দমন করিতেছেন। এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। পিতা পুষ্পমিত্র জগদ্বিখ্যাত বীর, মৌর্য্যবংশের প্রকৃত উচ্ছেদ-কর্ত্তা; স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত নৃপতি; আর পুত্র বসুমিত্র দৃপ্ত সিংহশাবকবৎ অপরাজেয় সৌর্য্য-সম্পন্ন! তিন পুরুষ এতাদৃশ ক্ষমতাশালী হইয়া, যুগপৎ বিদ্যমান থাকার কথা, ভারতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। অগ্নিমিত্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা. তিনি সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই রাজ-কার্য্য করিতেন। আমোদ প্রমোদের মধ্যে, সঙ্গীত-চর্চ্চার মধ্যে, অন্তঃপুরে অবস্থানের সময়ে পর্য্যন্ত, রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্য উপস্থিত হওয়া মাত্রেই তাহার সুব্যবস্থা করিতেন। রাজকার্য্যের কোন অংশ ভবিষ্যতের জন্ত স্থগিত রাখিতেন না। তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি এবং মনের দৃঢ়তা এত অদ্ভুত ছিল যে, কোন সময়ে কোন কার্য্য করিয়া, কোন কারণেই তাহার আর পরিবর্ত্তন করেন নাই।

গথচ প্রত্যেক কার্য্যই অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বিচার-শক্তি অতি প্রখর ছিল। কোন একটা দুরূহ বিষয় আপতিত হইলেই তিনি তাহার তৎক্ষণাৎ চরম মীমাংসা করিতে পারিতেন। ক্ষিপ্রতা তাঁহার চরিত্রের একটা প্রধান ধর্ম্ম ছিল। রাজকার্য্যে তিনি যেমন ক্ষিপ্র ছিলেন, প্রণয়-ব্যাপারেও তাঁহার তাদৃশী ক্ষিপ্রতা পরিদৃষ্ট হইত। যেমন একটা কোন কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অমনি তাহা একবারে শেষ করিয়াছেন। যদি কোন কারণে, তাহা শেষ করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিত, তবে তাঁহার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত এক প্রকার বন্ধ হইত। তাঁহার হৃদয় যেন স্নেহের প্রস্রবণ। সকল রাণীর উপরই তাঁহার প্রচুর স্নেহ। প্রত্যেকেই মনে করিতেন, "মহারাজ তাঁহাকেই অধিক ভালবাসেন।" পরিচারিকাটি পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহ-ভাগিনী ছিল। তাঁহার এতাদৃশ স্নেহময় অন্তঃকরণেও কিন্তু কর্ত্তব্য-প্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল। তিনি একবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অচিরাৎ সম্পন্ন করিতেন। কোন প্রকারেই, কেহ তাঁহাকে সে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি যখন বুঝিলেন যে, দাম্ভিক 'বৈদর্ভ যজ্ঞসেন' সহজে বশীভূত হইবে না, তখন অমনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য অনুমতি করিলেন। রাজ-সম্মান ও রাজাদেশ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে পক্ষে তাঁহার প্রাণান্ত পণ ছিল। তিনি কর্ত্তব্যের চরণে অতি প্রিয়বস্তুও উৎসর্গ করিতে পারিতেন। রাজ্ঞী ইরাবতী যে তাঁহাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, ইরাবতীর অন্তঃকরণ অগ্নিমিত্রময়, ইরাবতীর জীবন অগ্নিমিত্রময়। তিনি আরও জানিতেন যে, জগতে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা অগ্নিমিত্রের প্রীত্যর্থে ইরাবতী পরিত্যাগ করিতে না পারেন। বিধাতা যে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমময় করিয়া ইরাবতীর হৃদয় নির্ম্মিত করিয়াছেন, অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় সে গভীর ইরাবতী-হৃদয়ের প্রেমেরও যে অন্ত ছিল না, ইহাও তিনি

সুপরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত জানিয়াও যখন তিনি দেখিলেন, যে, শত অনুনয় করিয়াও তিনি ইরাবতীর দুরভিমান ভঞ্জন করিতে পারিলেন না, পরন্তু পত্নী ইরাবতী, দাসীপদ হইতে রাজ্ঞীপদে উন্নীত ইরাবতী, স্বামী বিদিশাপতির সম্মুখে অতি কদর্য্য ব্যবহার করিলেন, অবিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, পতির সমক্ষে ভার্য্যার যে মর্য্যাদা, তাহা লঙ্ঘন করিলেন, প্রকৃত পক্ষে রাজাকে অবমানিত করিলেন, তখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। রাজার রাজ-মর্য্যাদায় যেন আঘাত লাগিল। তিনি অহিনির্ম্মোকের ন্যায়, ইরাবতীকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। অথবা 'মনস্থ' বলি কেন, যেমন মনন, অমনি তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। দু'দিন পূর্ব্বে যে অগ্নিমিত্র ইরাবতীগত-প্রাণ ছিলেন, যে মুহূর্ত্তে সেই অগ্নিমিত্র দেখিলেন যে, না, এতদিন যে প্রণয় বিশুদ্ধ প্রণয় ছিল, এক্ষণে সে প্রণয়ের সহিত অবজ্ঞা মিলিত হইয়াছে, অমনি সেই প্রণয়বতী ইরাবতীকে পরিহার করিলেন। মহচ্চরিত্রের এ একটা প্রধান দিক্। যাহাতে আত্ম-সম্মানের হানি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ বস্তু একান্ত প্রণয়াস্পদ হইলেও, মহাপুরুষ অম্লান-বদনে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন। চরিত্রের এই মহা শক্তি-বলেই এক দিন রামচন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ অগ্নিমিত্র প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অত পূর্ব্বেও যে ভারতেশ্বরের মন্ত্রি-পরিষদ্ কিরূপ দক্ষতার সহিত, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এবং সেই পরিষদের অধিনায়করূপে মহারাজ অগ্নিমিত্র যে কি প্রণালীতে অতি কঠিন কঠিন রাজনৈতিক সমস্যা-সমূহেরও সমাধান করিতেন, তাহা তদীয় চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ধারিণী।

ধারিণী বিদিশেশ্বর অগ্নিমিত্রের প্রধান মহিষী। প্রধান মহিষীর হৃদয় যাদৃশ উদার, স্নেহময়, দাক্ষিণ্যময়, হওয়া উচিত, ধারিণীর হৃদয়ও ঠিক তদ্রূপ ছিল। রাজ্যের মধ্যে তাঁহার যে কত সম্মান, ভারত সিংহাসনের তিনি যে কোন স্থানের অধিকারিণী, সে সমস্তই তিনি জানিতেন ; কিন্তু তবুও সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় বিনয়ভূষণে বিভূষিত ছিল। রাজা অগ্নিমিত্র শত দোষ করিলেও তাঁহার স্বামী, ইহকাল ও পরকালের দেবতা, সুতরাং ক্ষমার্হ, এ কথা তিনি নিয়তই মনে রাখিতেন। তিনি জানিতেন যে, যাঁহাকে ভাল বসিয়াছি, তাঁহার অত্যাচার, অবিনয়, আমি ব্যতীত কে সহ্য করিবে ? তাই তিনি, রাজার সকল ব্যবহারই অবনতমস্তকে মানিয়া লইতেন। ইরাবতী আর ধারিণীতে এই অংশেই প্রভেদ। ইরাবতী মাত্র ভোগের সামগ্রী, তাই কবি, ভোগের ব্যাঘাত ঘটাইয়া সে ভোগ্য বস্তুও ব্যাহত করিলেন। আর ধারিণী ভোগের নহে, ভোগ অপেক্ষা অনেক উচ্চ, অনেক অনুপম, গভীর প্রণয়ের মূর্ত্তি, তাই ধারিণী, তাঁহার প্রণয়াস্পদের প্রধান অভীষ্ট পূরণ করিয়া, আপন প্রণয়-ব্রতের উদ্‌যাপন করিলেন।

প্রৌঢ়া মহারাণী ধারিণী জানিতেন যে, মালবিকার সহিত রাজার পরিণয় হইলে, প্রকৃতপক্ষে, তরুণী মালবিকাই বিদিশার অধীশ্বরী হইবেন, অগ্নিমিত্রের হৃদয়ের অধিদেবতা হইবেন। তবুও তিনি যেমন বুঝিলেন যে, মালবিকা ব্যতীত তাঁহার উপাস্য দেবতার হৃদয়-রঞ্জন অসম্ভব. অমনিই, আত্ম-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মহারাণী হাসিতে হাসিতে মালবি-কাকে ধরিয়া রাজার হাতে তুলিয়া দিলেন। ধারিণী বাধা দিলে, অগ্নিমিত্রের মালবিকালাভ হয়ত অত সহজে হইত না, অথবা হইতই না। ধারিণী

নিজে পাটরাণী, আর তাঁহার শ্বশুর যিনি অগ্নিমিত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি এখনও জীবিত, পুত্র দিগ্‌বিজয়ী বীর, আভিজাত্যবতী জননীর উপযুক্ত সন্তান, সুতরাং ধারিণীকে যে, রাজা অগ্নিমিত্র, এক কথায় ইরাবতীর ন্যায় ত্যাগ করিতে পারিতেন না, এসমস্ত ধারিণী বেশ বুঝিতেন। কিন্তু তথাপি, তিনি স্বামীর সুখের অন্তরায় হয়েন নাই। বরং যখন যতটুকু পারিয়াছেন, পতির অভিপ্রেত-সিদ্ধির সহায়তাই করিয়াছেন।

ধারিণী ইরাবতীকে এক সময়ে বড় ভালবাসিতেন। ইরাবতী রাজার অনুকম্পায় যখন অন্যতরা মহিষী হইলেন, ধারিণী তখনও কিছু বলেন নাই। রাজ-বাসনায় কোন প্রকার বাধা দেন নাই। প্রত্যুত সোদরার ন্যায় ইরাবতীকে আদর যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন। ধারিণী নিজে পাটরাণীর রত্নময় কিরীট মস্তকে পরিতেন বটে, কিন্তু অগ্নিমিত্রের প্রণয়-রত্নে ক্রমশই বঞ্চিত হইতেছিলেন। ইহাতেও তিনি কথা কহেন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, রাজার ঐরাবত উন্মাদ দিন দিন অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আর ভূতপূর্ব্ব-পরিচারিকা ইরাবতীও ক্রমে নিজের পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইতেছে, ইহাতে রাজ্যের ঘোর অমঙ্গলের সম্ভাবনা, তাঁহার পুত্র শূরোত্তম বসুমিত্র আর দু'দিন পরে যে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন, সে সিংহাসনেরও ক্ষতির সম্ভাবনা, তখন তিনি প্রতিকার-কল্পে একান্ত যত্নবতী হইলেন। তিনি, তাঁহার জীবিতেশ্বর অগ্নিমিত্রের হৃদয়ের কোন্ অংশ সবল, কোন্ অংশ দুর্ব্বল, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন; অভিমানিনী ইরাবতীর হৃদয়ই বা কতদূর বলিষ্ঠ, তাহাও সম্পূর্ণরূপে জানিতেছিলেন। তাই যখন দেখিলেন যে, আর সময় নাই, এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, আর তাঁহার হৃদয়েশ্বরের পতিত হৃদয়ের উদ্ধার করিতে পারিবেন না, তখন ধীরে ধীরে, মালবিকারূপী তীব্র ঔষধের—যে ঔষধ সেবন করিবার নিমিত্ত, তাঁহার স্বামী স্বতই অভিলাষী, সেই

অমোঘ ঔষধের প্রয়োগ করিলেন। ইরাবতী তাঁহার সত্যই অতিশয় প্রিয় ছিলেন, কিন্তু রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছিলেন, তাই প্রিয়তমের হিতার্থে, আত্ম-সুখের তথা প্রিয় ইরাবতীর বিসর্জ্জন দিলেন।

কবি, তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে নানারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত রূপই ভারতেশ্বরীর অনুরূপ। তিনি যখন শুনিলেন যে, পুত্র বসুমিত্র তুরঙ্গ-রক্ষায় নিরত, যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে ব্যস্ত, তখন, ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করুন, আপনাদের মাসিক আটশত সুবর্ণমুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।' কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, নিজেই যেন তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়ী! আত্ম-গৌরব, আত্ম-পদ-মর্য্যাদা তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করিতে জানিতেন: যখন ইরাবতী আসিয়া তাঁহার নিকটে মালবিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন, তখন ধারিণী, অবিচারিতহৃদয়ে, মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যেন তিনিই রাজ্যের তথা রাজা অগ্নিমিত্রের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্রী।

মালবিকার নৃত্য-কালে, যখন পরিব্রাজিকা ধারিণীকে রাজার প্রতিকূলে উত্তেজিত করিবার আশায় বলিয়াছিলেন যে, উনি যেমন রাজা, দেবি! তুমিও ত তেমনই মহারাণী, তুমি কম কিসে? তখন ধারিণী, কোনই উত্তর দেন নাই, বরং মনে মনে বলিয়াছিলেন 'মূঢ়ে পরিব্রাজিকে! আমি জাগরিত, আর তুমি ভাবিতেছ যে আমি সুপ্ত? অর্থাৎ তুমি আমাকে আমার পতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাও? তোমাদের অভিপ্রেত মালবিকা-নর্ত্তন আমার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাও? আর তোমার নিজের নিরপেক্ষতার ভান দেখাইতে চাও?

বিদূষকের কৌশলে, গণদাস ও হরদত্তের বিবাদ বাধিলে, যখন পরিব্রাজিকা শিষ্যবিদ্যাদ্বারা আচার্য্যের গুণবত্তা পরীক্ষা করিতে মনন করিলেন, এবং তদনুসারেই গণদাস-শিষ্যা মালবিকার নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান

হইল, তখন মহারাণী বুঝিয়াছিলেন যে, কি একটা যেন গভীর ষড়যন্ত্র হইয়াছে; রাজা, বিদূষক, পরিব্রাজিকা, এমন কি, পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ধারিণী ইচ্ছা করিলেই মালবিকার নৃত্যে বাধা দিতে পারিতেন, সকলেরই গূঢ় অভিপ্রায় অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি যে চক্রান্তটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কবি, মধ্যে মধ্যে, ধারিণীরই কথা দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাজার সহিত মালবিকার মিলন হউক, ইহা ধারিণীর আন্তরিক বাসনা ছিল। ইরাবতী নৃত্য-গীতাদি-কলায় সম্যক্ পারদর্শিনী ছিলেন, মালবিকা যদি, ঐ সকল বিদ্যায় তাদৃশী ব ততোধিক পারদর্শিনী না হয়েন, তবে অগ্নিমিত্রের ইরাবতী-বিমুগ্ধ হৃদয় আকৃষ্ট করা যে বড়ই কঠিন, এ তত্ত্ব ধারিণী সবিশেষ বিদিত ছিলেন। তাই তিনি, অসহিষ্ণু অগ্নিমিত্রের মালবিকা-দর্শন-ব্যগ্রতায় অত বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন।

ধারিণী রাজ-সংসারের প্রবীণ গৃহিণী, তাঁহার চরিত্রের কোন স্থলেও কোন প্রকার তারল্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি প্রথমে যে প্রকার ধীর, শেষে—অর্থাৎ যখন রাজার করে বধূ-বেশা মালবিকাকে সমর্পণ করেন, তখনও সেই প্রকার ধীর। তিনি, যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার জীবিতেশ্বর অগ্নিমিত্র তাঁহাকে লুকাইয়া, মালবিকার সহিত সম্মিলিত হইতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, মালবিকাও সরল-হৃদয়ে ছায়ার ন্যায়, রাজার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন, তখন তাঁহার অতুল আনন্দ হইল। তখন মালবিকাও নানা বিদ্যায় নিপুণা হইয়াছেন, এ দিকে নবীন বয়ঃক্রমের গুরুভারে মালবিকার দেহ-মন সকলই আনত হইয়াছে, রাজা এবং মালবিকা উভয়েই উভয়ের সন্দর্শনার্থে একান্ত আকুল, তখন ধারিণী মালবিকাকে অশোকের দোহদ করিতে পাঠাইলেন। পাটরাণী স্বয়ং যে কার্য্য করিবেন, তাহাতে মালবিকাকে প্রতিনিধি

নিযুক্ত করিলেন। প্রধান মহিষীর প্রতিনিধি হইয়া মালবিকা প্রধান মহিষীরই উদ্যান-বাটিকায় গেলেন। মহারাণী জানিতেন যে, মালবিকাকে তিনি একটা অবসর বা সুযোগ করিয়া দিলেন। তিনি আরও জানিতেন যে, তাঁহার উদ্যানে মালবিকার গমনে কতদূর কি ঘটিতে পারে, ইহার পরিণাম কি, কিন্তু জানিয়াও তিনি মালবিকাকে বলিয়া দিলেন, 'যদি তোমার দোহদে অশোকে ফুল ফুটে, তবে আমিও তোমার অভিলাষ পূরণ করিব।' মালবিকার যে কি অভিলাষ, তাহা প্রবীণা মহারাণী বুঝিয়াছিলেন, এবং সে অভিলাষ পূরণে তিনি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মালবিকাকে কদাচ সে সঙ্কল্পের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে দেন নাই। তাঁহার ভয়ে দুঃখিনী মালবিকা সততই কাতর, মালবিকা প্রাণ ভরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসটিও ছাড়িতে পারেন না। ধারিণী এ সমস্তই বুঝিতেন। এখন সময় হইয়াছে, তাই, মালবিকাকে আভাসে জানাইলেন যে, তোমার আকাঙ্ক্ষা আমিই পূর্ণ করিব। আর দুই দিন পরে, ধারিণী স্বয়ং যাহাকে বিদিশার রাণী করিবেন, আজ তাহাকে প্রথম নিজের প্রতিনিধি করিলেন। মালবিকা সত্য সত্যই যেন, এত দিন পরে, কতকটা অগ্রসর হইলেন।

ধারিণী নিজে অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি বয়সে প্রবীণা, তাঁহার পুত্র উপযুক্ত, সুতরাং সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধারিণীর হৃদয়, রাজ্যের শুভানুধ্যানেই নিয়ত তৎপর ছিল। শান্ত-হৃদয়া মহারাণী নিয়ত অবলা-প্রিয় অগ্নিমিত্রের ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু সে সমস্তই অগ্নিমিত্রের প্রীতির জন্য, অগ্নিমিত্রের সুখের জন্য; নতুবা তাঁহার সার-প্রবীণ হৃদয়ে, আপনার জন্য কোন প্রকার চাঞ্চল্য ছিল না, ভোগের তাড়নায় তাঁহার প্রাণ আকুল ছিল না।

তিনি হর্ষিত-হৃদয়ে, রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পরই, যখন, পরিচারিকাবৃন্দ, এমন কি তাঁহার নিয়ত-সঙ্গিনী

পরিব্রাজিকাও আসিয়া মালবিকাকে 'রাণী' বলিয়া অভিবাদন করিল, মালবিকার মুখাপেক্ষিণী হইয়া, যখন সকলে মালবিকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আর পাটরাণী ধারিণী একাকিনী সভার এক কোণে পড়িয়া রহিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে ক্ষণকালের জন্য একটা ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি শূন্য-নয়নে পরিজনের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ; এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, কি একটা যেন গুরুতর ব্যাপার ঘটিল, যাহার ফলে, কাল যাহারা তাঁহার আপনার জন ছিল, আজ তাহারাও তাঁহার 'পর' হইয়া গেল।

অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয়ের পর, অগ্নিমিত্র-গত-হৃদয়া ধারিণীর মনের যদি এই ভাবান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে, স্ত্রী-চরিত্রের ব্যাহানি হইত, রমণী সৃষ্টি অস্বাভাবিক হইত। তাই কবিকুলোত্তম সকল দিক্ রক্ষা করিলেন। ধারিণীর 'পরিজনমবেক্ষতে'—এইটুকু পরিচয় দিয়া, সমগ্র ধারিণী-চরিত্রটি উজ্জ্বলতর করিয়া দিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ইরাবতী।

এই নাটকের মধ্যে, একদিকে মালবিকা-চরিত্র যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ, অন্যদিকে ইরাবতী চরিত্রও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সম্পূর্ণ। অথবা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, মনে হয়, এই নাটকের স্ত্রী-চরিত্র-সমূহের মধ্যে ইরাবতীচরিত্রই বুঝি উৎকৃষ্ট। ইরাবতী এক সময়ে ধারিণীর সহচরী ছিলেন। চিত্রবিদ্যা, গীতবিদ্যা ও নৃত্যাদিবিষয়ে তাঁহার অশেষ দক্ষতা ছিল। বিধাতা তাঁহাকে অতুল সৌন্দর্য্যের আধার করিয়াছিলেন। বয়ঃক্রমও তত অধিক নহে। তাঁহার হৃদয় অতিশয় সরল, স্বচ্ছ দর্পণবৎ নির্ম্মল। তিনি কোন প্রকার চক্রান্তে বা রাজ-সংসারের কোনরূপ কূট-পরামর্শে কদাচ থাকিতেন না, ও সব তিনি জানিতেনই না। রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আর তিনিও রাজাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রাজ-কৃত অনুকম্পার প্রতিদান করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চবংশোদ্ভবা না হইলেও, তাঁহার হৃদয় কিন্তু সমুচ্চ-গুণ-সম্ভারে অলঙ্কৃত ছিল। সেই গুণের দ্বারাই তিনি বিদিশেশ্বরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্রের অনুগ্রহে রাজ-সংসারে তাঁহার অপার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কখনও তিনি কাহারও কোনরূপ দুঃখ কষ্টের হেতু হয়েন নাই। তাঁহার ব্যবহারে কেহ সন্তুষ্ট বই ব্যথিত হইত না। এতই সুন্দর তাঁহার চরিত্র। রাজা অগ্নিমিত্র ব্যতীত তাঁহার জগতে অন্য কিছুই চিন্তনীয় ছিল না। তিনি অন্য কোন কার্য্যেই থাকিতেন না; রাজবাড়ীতে আমোদ প্রমোদ, নিত্য উৎসব, এ সমুদয়ে তাঁহার কোনই রতি ছিল না। উদ্যানের একপার্শ্বে, সূর্য্যমুখী যেমন, সূর্য্যের উদ্দেশে ফুটিয়া থাকে, তদ্রূপ ইরাবতীও জনতাময় রাজ-প্রাসাদের এক প্রান্তে রাজা অগ্নিমিত্রের ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন।

তাঁহার সে সরল হৃদয়ের প্রণয়-সম্পদ্ যেন এ মর্ত্তের উপযোগিনী নহে। অনেকাংশে তাহা দিব্য-ভাবাপন্না। ধারিণী মনে মনে ইরাবতীর উপর একটু অসূয়াবতী ছিলেন সত্য, কিন্তু ইরাবতী কদাচ ধারিণীর উপর বিরক্ত ছিলেন না। তিনি ধারিণীকে সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠ-সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সংসারের প্রধান কর্ত্রীকে যেমন সম্মান করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ সম্মান করিতেন। ইরাবতী রাণী হইয়াও ধারিণীকে অভিভাবিকার মত দেখিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। অগ্নিমিত্র-বিষয়িণী মমতা তাঁহার অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু ধারিণীর উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ধারিণী-কর্ত্তৃক যে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন না। তাই অশোককুঞ্জে রাজার সহিত মালবিকার সাক্ষাৎকারের কথা, তিনি আসিয়া ধারিণীকেই বলিয়া দিলেন। সরলপ্রাণা জানিতেন যে, ইহাতেই উপযুক্ত প্রতিবিধান হইবে। তাঁহার হৃদয়ের এই সারল্যেই রাজা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইরাবতীর কেবল এই সকল সদ্গুণেই যে রাজা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন তাহা নহে, সেই ভালবাসার সঙ্গে, তাঁহার উপর রাজার একটা সম্মান বুদ্ধিও ছিল। রাজা তাঁহাকে সর্ব্বদা স-সম্মানে দেখিতেন। রাজা জানিতেন যে, ইরাবতী সমস্ত সহ্য করিতে পারেন, কেবল একটি বিষয় ইরাবতীর অসহ্য। প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ওরূপ কল্পনাতেও তিনি উন্মাদিনী হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার আর জ্ঞান থাকে না। তিনি প্রাণ দিয়া রাজাকে ভাল বাসিতেন; রাজা ব্যতিরিক্ত সংসারে তাঁহার অন্য আকর্ষণ ছিল না, তিনি ভ্রমক্রমেও কখনো ভাবেন নাই যে, তাঁহার হৃদয়-দেবতা অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয় হইতে পারেন, ইরাবতী-বল্লভ তদীয় অর্পিত হৃদয়ের অন্যত্র পুনর্দান করিতে পারেন। নারী-হৃদয়ের এই কমনীয়তায় রাজা অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যখন ইরাবতী ধারিণীর সহচরী, তখন বিদূষকের কৌশলেই তিনি প্রথমে রাজ-নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, বিদূষকই তাঁহার বাঞ্ছিত পূরণ করিয়াছিলেন; এইজন্য, তিনি, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সতত লোলুপ বিদূষক ব্রাহ্মণকে কত প্রকার মিষ্টান্ন প্রদান করিতেন, হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। হতভাগিনী সরল-প্রাণা ইরাবতী বুঝিতেন না যে, যে গড়িতে পারে, সে ভাঙ্গিতেও পারে। তিনি বুঝিতেন না যে, যে বিদূষক তাঁহাকে পরিচারিকা হইতে রাণী করিতে পারিয়াছে, তাহার ক্ষমতা কত, প্রয়োজন বোধ করিলে, সেই বিদূষকই যে আবার তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, ইহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তিনি সকলকেই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। সংসারে তাঁহার সুখের পথে কণ্টক জন্মিতে পারে, এ কল্পনাও তিনি করিতে পারিতেন না। ধারিণীর সহচরী যখন বলিয়াছিল যে, মালবিকা দেখিতেছি, ইতিমধ্যেই সকল বিষয়ে ইরাবতীকে অতিক্রম করিল, তখন হইতেই সামাজিকগণ বুঝিয়াছেন যে, ইরাবতীর সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু মুগ্ধা ইরাবতী ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারেন নাই। তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার জেষ্ঠসোদরাবৎ পরম সম্মাননীয়া ধারিণীই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি যেমন ছিলেন, সেই ভাবেই পরম সুখে আছেন। আপনার ভাবে আপনি ডুবিয়া আছেন। তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের জন্য, রাজ-বাড়ীতে যে এত বড় একটা চক্রান্ত চলিয়াছে, ইহার গন্ধও তিনি বিদিত নহেন। রাকা রজনীতেই যে রাহুর উপদ্রব হয়, ইহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য ছিল।

ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজধানী উৎসব-সাগরে নিমগ্ন। ইরাবতী পরম আগ্রহে রাজাকে আহ্বান করিয়াছেন, বাসনা, রাজার সহিত একত্রে দোলাধিরোহণ করিবেন। কিন্তু রাজা এখন আর সে রাজা নাই। রাজা দেখিলেন যে, ইরাবতীর প্রকৃতি যে প্রকার কোমল,

তাহাতে কোনমতে কথাবার্ত্তায়, বা অন্য কোন রূপে, তিনি যদি জানিতে পারেন যে, মালবিকা রাজার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তবে আর ইরাবতীর অভিমানের অবধি থাকিবে না। পরন্তু হৃদয়ের অতি-বেদনায় তিনি মৃতপ্রায় হইবেন। তাই রাজা ইরাবতীর নিমন্ত্রণ রক্ষায় অমত করিলেন। ইরাবতীর আহ্বানে ঔদাসীন্য অবলম্বন রাজার এই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ঘটে নাই। ইরাবতী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়, এবারেও রাজাকে আহ্বান করিয়াই পরিচারিকার সহিত উদ্যানের দোলাগৃহে উপনীত হইলেন। তিনি জানেন, তাঁহার আহ্বানে রাজা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কোন দিন পারেন নাই। তাই ইরাবতীর ধারণা যে, রাজা নিশ্চয়ই তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে আসিয়া, দোলাগৃহে, পূর্ব্বের ন্যায়, তাঁহার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। পরিচারিকা নিপুণিকাকে লইয়া দোলাগৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক, ইরাবতী দেখিলেন যে, সে গৃহ শূন্য, তথায় রাজা নাই। তাঁহার বক্ষের পঞ্জর যেন শতধা ভগ্ন হইল। তাঁহার জীবনে এই প্রথম নৈরাশ্য! এই প্রথম আহ্বানভঙ্গ! তিনি প্রথমতঃ কত প্রকারে মনকে প্রবোধ দিলেন, ভাবিলেন, 'হয়ত' আর্য্যপুত্র আমাকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশে কোথাও অন্তরিত হইয়া আছেন', তাই রাণী রাজার অন্বেষণে তৎপর হইলেন, কিন্তু তাঁহার মদবিহ্বল চরণ বার বার স্খলিত হওয়ায় অধিক দূরে যাইতে পারিলেন না।

বিদূষক পূর্ব্ব হইতেই রাজাকে উদ্যানে আনয়ন করিয়াছিলেন; কেননা, তিনি জানিতেন যে, আজ মালবিকা অশোকের দোহদ করিতে আসিবেন। রাজা আসিয়াছেন, মালবিকার দোহদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা মালবিকার সম্মুখে অনুনয়-পর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে রাজান্বেষিণী ইরাবতী, মন্থরপদে আসিতে আসিতে, দূর হইতেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন।

তাহার প্রিয়তম, আজ অন্য রমণীর সহিত, বিশেষতঃ একটি পরিচারিকার সহিত, নির্জ্জনে, রাণীদের উদ্যান-বাটিকায় কেন উপস্থিত ?—ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তিনি রাজাকে তিরস্কার করিলেন! কোথায় রাজা তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া, দোলাগৃহে পূর্ব্বের ন্যায় অপেক্ষা করিবেন, আর কিনা তিনি অন্য ললনার সহিত অশোককুঞ্জে রহস্যালাপ করিতেছেন, এ ব্যাপারে, ইরাবতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। "তুমি রাজা, পরিচারিকার সহিত কথা কহিবারই বা তোমার প্রবৃত্তি হইবে কেন ?" বলিয়া যেমন তিনি রাজাকে ধিক্কার দিলেন, অমনি ধূর্ত্ত বিদূষকও বলিল, "রাণি! তুমিও একদিন পরিচারিকা ছিলে!" একে রাজার ব্যবহারে ইরাবতীর বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার ক্রূর বিদূষকের এই মর্ম্মচ্ছেদিনী শ্লেষোক্তি,—ইরাবতীর একপ্রকার সংজ্ঞালোপ হইল। তিনি বেদনার গুরুভারে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তবে আর কেন ? যত পার, তোমরা বার্ত্তালাপ কর, আমার হৃদয়কে কেন আর যাতনা দিই!"—বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার সুখ-শশী এ জন্মের মত রাহু-গ্রস্ত হইয়াছে; আর মুক্ত হইবে না। তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতেই যেন ধ্বনি উঠিল, "হায়, পুরুষ প্রতারক, অবিশ্বাসী"। রাজার শত অনুনয় উপেক্ষা-পূর্ব্বক ভগ্নহৃদয়া ইরাবতী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি এতদিন পরে বুঝিলেন যে, তাঁহার মত নিঃস্ব জগতে আর দ্বিতীয় নাই; আজ তিনি এক গাছি তৃণ অপেক্ষাও দুর্ব্বল। তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাঁহার কেহই নাই, তিনি নিঃসম্বল, হৃতসর্ব্বস্ব।

ইরাবতীর প্রাণে বড়ই বেদনা লাগিল। কিন্তু সে বেদনা, তিনি

নীরবে ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্য কাহাকেও জানিতে দিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না। আর কেনই বা দেখাইবেন? তিনি পরিচারিকা ছিলেন, আপনার অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট ছিলেন। পৃথিবী-পতি তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ আশা জাগাইয়া, তাঁহাকে উচ্চস্থানে আরূঢ় করিয়া, অতর্কিতে ফেলিয়া দিয়াছেন; পূর্ব্বে যে স্থানে ছিলেন, তথায় নহে, তদপেক্ষা অনেক নিম্নে ফেলিয়া দিয়াছেন। তাই নিঃসম্বলা নিরাশ্রয়া ইরাবতী আর জগদ্‌বাসীর সমক্ষে মুখ দেখাইতে বাসনা রাখিলেন না। তিনি স্থির করিলেন যে, অতীত সুখের স্মৃতি বক্ষে লইয়া, গহন কাননজাত কুসুমের ন্যায় অবিজ্ঞাত ভাবে বিশুষ্ক হইবেন। যখন এই সঙ্কল্প করিলেন, তাহার পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে একটু বল আসিল। যতক্ষণ তৃষ্ণা, ততক্ষণই যাতনা, তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে, যাতনা কিসের? তাই দেখিতে পাই, যখন, সমুদ্রগৃহে, চিত্রলিখিত অগ্নি-মিত্রের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইয়া, তথায়ও ইরাবতী রাজা, মালবিকা এবং সেই ঘটকচূড়ামণি বিদূষককে আবার সমবেতভাবে দেখিতে পাইলেন, তখন কিন্তু তিনি কোন প্রকার ক্রোধের ভাব দেখান নাই, বেশী কথা কহেন নাই। যেখানে জীবনের প্রথম সুখের ছবি চিত্রিত রহিয়াছে, সেই সমুদ্র-গৃহে, সেই চিত্রের নিকটে ইরাবতী জীবনের সুখের চিরবিসর্জ্জন-কাহিনী কহিতে আসিয়াছেন, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, অতীত প্রণয়ের স্মৃতি-ব্রতে দীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন। সেখানে আসিয়াও যখন দেখিলেন সেই ত্রিমূর্ত্তি রাজা, মালবিকা ও বিদূষক, তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশ, তাহা সহৃদয়সম্বেদ্য। বর্ণনীয় নহে। কালিদাস অতি ভয়ানক ক্ষেত্রে ইরাবতীকে উপস্থিত করিয়াছেন, ওরূপ স্থলে অধিকক্ষণ থাকিলে অতি কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। মানুষ মরিয়া যায়। ইরাবতীর কথাই নাই; তিনি অতি । . ; বিগ্রহবতী অ

দেবতা। তাই কবি তাঁহাকে অধিকক্ষণ, ঐ মর্ম্মবিদারক ব্যাপারে লিপ্ত রাখেন নাই। রাজা মালবিকা প্রভৃতির সমক্ষে, সমুদ্রগৃহে, তিনি অধিকক্ষণ থাকেন নাই। সমুদ্রগৃহে আসিয়াও, যখন তিনি ঐ ত্রিমূর্ত্তিকে একত্র দেখিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই সেই অশোককুঞ্জের ঘটনার পর হইতেই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এবারকার মত তাঁহার সাধের বিপণি ভাঙ্গিয়াছে, এবার আর হইবে না। ওরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকা যায় না। প্রাণ-দণ্ডের আদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবন-কাল নিরবচ্ছিন্ন কষ্টেরই কারণ। ইরাবতীর অবস্থাও সমুদ্রগৃহে আগমনের সময়ে ঠিক তদ্রূপ। তাই মহাকবি, হঠাৎ বসুলক্ষ্মীর বানরাক্রমণের ব্যাপার অবতারণা করিয়া, ঐ কষ্টময়, বেদনাময় দৃশ্য অন্তরিত করিলেন। সরলা ইরাবতী, যেমন শুনিলেন যে, বসুলক্ষ্মীর বিপদ, অমনি সমস্ত ভুলিয়া, রাজাকে লইয়া ক্ষিপ্র-পদে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। যে ধারিণী তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন, বসুলক্ষ্মী তাঁহারই কন্যা; কিন্তু ইরাবতী সে সমস্ত মনেও করিলেন না। তাঁহার এই সর্ব্বনাশের জন্য তিনি আপন অদৃষ্টকেই দোষী করিয়াছিলেন, পরের উপর দোষ দিতেন না। এতই উদার তাঁহার অন্তঃকরণ।

যখন মালবিকার বিবাহ, তখন ধারিণী ইরাবতীর মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কাতরপ্রাণা ইরাবতী শান্তভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি মহিষী, যাহা ইচ্ছা, অম্লান-হৃদয়ে করুন, আমি কে? আমার মতামতে আসে যায় কি?"

যখন রাজা নব-পরিণয়োৎসবে উন্মত্ত, সেই সময়ে, দুঃখিনী ইরাবতী তাঁহার শেষ কথা রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আমি অপরাধিনী, আপনার যথোচিত সম্মানরক্ষা করি নাই; আপনি এখন অভিপ্রেত লাভে

পরম আনন্দিত, তাই আমার শেষ প্রার্থনা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অভিমানী বিদিশেশ্বর, ইরাবতীর এই শেষ প্রার্থনারও কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু সফলাভিলাষা গর্ব্বিত মহারাণী বলিলেন, "আমার স্বামী অবশ্যই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।" আজ ধারিণী গর্ব্বভরে বলিলেন, "আমার স্বামী।" ইহার পর ইরাবতীর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উপেক্ষিত বন-কুসুমের ন্যায় তিনি কোথায় পড়িয়া রহিলেন, কে জানে?

—০—

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিদূষক।

এই নাটকের বিদূষক অতি বিচিত্র প্রকৃতির লোক। সংস্কৃত অন্য কোন নাটকে, এতাদৃশ চতুর, প্রত্যুৎপন্নমতি, কার্যদক্ষ রাজ-বয়স্য দেখিতে পাই না। রাজধানীতে এমন কেহ ছিল না, যে, বিদূষককে ভয় না করিত। বিদূষকের কৌশলে কে কখন কি বিপদে পড়িবে, এই ভয়ে সকলেই শশব্যস্ত। এক দিকে বিদূষকের যেমন প্রবল প্রতাপ, অন্যদিকে আবার তাঁহার কৌতুক-প্রিয়তাও তদ্রূপ। সে কৌতুকপ্রিয়তা আবার এমন তীব্র, এমন শ্লেষ-বহুল যে, যাহার উপর সে তীক্ষ্ণ কৌতুকবাণ নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার প্রাণপক্ষী 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত। রাজা, রাণী, গুরু, পুরোহিত, মন্ত্রী, সেনাপতি, পরিচারিকা—কেহই সে নিশিত শায়কের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। যাহার যে অংশে যখন যে কোন দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইত, বিদূষক অমনি তাহা ধরিয়া ফেলিতেন। কাহারই অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই বিদূষকের প্রধান লক্ষ্য ছিল, রাজার চিত্তবিনোদন-সাধন। সে ব্রাহ্মণ, রাজা ব্যতীত অন্যকে জানিতেন না। রাজার প্রীত্যর্থে তাঁহার অকরণীয় কিছুই ছিল না। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অগ্নিমিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তখন ভারতের রাজ-প্রাসাদ নিয়ত চক্রান্তময় ছিল। কি রাজকার্য্য কি প্রণয়কার্য্য, সর্ব্বত্রই ষড়যন্ত্রের একান্ত প্রাবল্য ছিল। এতাদৃশ মহাত্মারাই সেই সকল বিষয়ে এক প্রকার ধুরন্ধর ছিলেন।

আমরা প্রথম অঙ্কে দেখিতেছি যে, মহারাণী ধারিণীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, বিদূষক, মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের নয়ন-পথবর্ত্তিনী করিবার উদ্দেশ্যে, এক বিচিত্র কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছেন। ধারিণী মালবিকাকে আচার্য্য গণদাসের গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন, আর

বিদূষক, গণদাস এবং হরদত্ত—দুই আচার্য্যের মধ্যে কৌশলে এমন বিবাদ বাধাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা প্রতিকার-বাসনায় রাজার নিকটে বিচারার্থী হইলেন। এই বিবাদের ফলেই, বিদূষক, মালবিকাকে রাজার গোচর করিলেন।

নৃত্যাবসানে যখন মালবিকা গমনোন্মুখী হইয়াছেন, তখন বিদূষক, কেমন এক কৌশলে মালবিকাকে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা করিয়া, রাজাকে আরও আশা মিটাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার অবসর করিয়া দিলেন। মালবিকার নৃত্য ও আকৃতি দর্শন করিয়া রাজা যে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন, ইহা মালবিকাকে উত্তমরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত, এবং মালবিকা হাসিলে কেমন দেখায়, তাহা রাজাকে দেখাইবার নিমিত্ত, বিদূষক রাজার হস্তস্থিত সুবর্ণবলয় নৃত্যের পারিতোষিক বা উপহার দিবার জন্য, যখন তাহা খুলিতে যান, তখন অসূয়াবতী ধারিণী বাধা দিলেন বিদূষকও এমন একটি কথা বলিলেন, যাহাতে তত্রত্য সকলেই হাসিয়া পড়িলেন। কুন্দ-কোরক-দশনা মালবিকাও হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না। বিদূষকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

নৃত্য-শেষে, যখন মালবিকা চলিয়া গেলেন, আর রাজা বিষণ্ণ-হৃদয়ে হরদত্ত-শিষ্যের অভিনয় দর্শনের জন্য, বিরক্তির সহিত বসিয়া রহিলেন, তখন চতুর বিদূষক, বৈতালিকদিগের মধ্যাহ্নকালসূচক স্তুতিপাঠ শ্রবণ মাত্রেই, কত প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে, সময়ে স্নানাহারের উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। যেন আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা বিধেয় নহে; করিলেই স্বাস্থ্যভঙ্গ নিশ্চিত। বিদূষকের উদ্দেশ্য ছিল—রাজাকে মালবিকা প্রদর্শন, তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তবে আর কেন? হরদত্তের পরীক্ষা প্রয়োজন কি?

ধারিণী নিকটে ছিলেন বলিয়া, নৃত্যের দিন, রাজা মালবিকাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আর একবার দেখিবার অভিলাষ। কিন্তু

ধারিণীর ভয়ে সে অভিলাষ প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও নাই। বিদূষক অমনি সন্নদ্ধ হইলেন। রাজাকে আশা দিলেন। মালবিকার পরিচারিকা বকুলাবলিকাকে হস্তগত করিয়া সাক্ষাৎকারের সকল ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সে সাক্ষাৎকারের এক প্রধান অন্তরায় আছেন ধারিণী। যদি তিনি কোনরূপ বিড়ম্বনা ঘটাইয়া বসেন, তাই চতুর বিদূষক পূর্ব্বাহ্নেই সে পথ রুদ্ধ করিলেন। ধারিণী একদিন দোলারোহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে চঞ্চল বিদূষক যেন আরও একটু চঞ্চলতর হইয়া, ধারিণীকে দোলা হইতে ফেলিয়া দিলেন। স্থূলাঙ্গী মহারাণী দোলাস্খলিত হইয়া চরণে আঘাত-প্রাপ্ত হইলেন ও কতিপয় দিবস শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন। এই অবসরে, বিদূষক, উদ্যানে দোহদকারিণী মালবিকার সহিত রাজার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন।

ইরাবতী-কৃত-অভিযোগে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই, মহারাণী ধারিণী যখন মালবিকাকে 'সার-ভাণ্ডাগৃহে' আবদ্ধ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, আমার এই অঙ্গুরীয়ক-প্রদর্শন ব্যতীত যেন ইহাকে কেহ মুক্ত না করে, তখন এই বিদূষকই কেতকী-কণ্টক-দ্বারা অঙ্গুলী ক্ষত করিয়া, সর্পাঘাত বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজিকার সহিত পূর্ব্বেই পরামর্শ ছিল। পরিব্রাজিকা বলিলেন, 'এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় 'নাগমণি।' নাগমণি স্পর্শে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়। কোথায় নাগমণি মিলিবে ?' দয়াবতী ধারিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'কেন, আমার এই অঙ্গুরীয়কেই ত নাগমণি আছে, ইহা লইয়া যাও, গৌতমের অগ্রে প্রাণ রক্ষা কর, তারপর অন্য কার্য্য'। ধারিণী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন, আর ধূর্ত্তপ্রবর গৌতম অমনি, সেই অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করিয়া অবরুদ্ধ মালবিকার উদ্ধার সাধন করিলেন। এইরূপে, যখন যে স্থানে রাজার অভিপ্রায় সাধনের পথে কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, তখনই বিদূষক স্বীয় অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অপরিচ্ছেদ্য নৈপুণ্য বলে,

তাহার তিরোধান করিয়াছেন। বিদূষকের সম্মুখে যেরূপ প্রতিবন্ধকই আপতিত হউক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অপসারণ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে কি হইবে, এ চিন্তা তাঁহার ছিল না। তিনি করিতেও জানিতেন না। অথবা যাঁহারা পরভাগোপজীবী, তাঁহাদের চিত্তে বুঝি বা ভবিষ্যৎ চিন্তার উদ্রেকই হয় না। বর্ত্তমান লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। বিদূষকও বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কালিদাস এমন কৌশলেই বিদূষক-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যে, এই নাটকের প্রতিকার্য্যে, প্রতি বৃত্তান্তে, সে চরিত্রের স্ফুরণ হইয়াছে। সে চরিত্রের আলোকে নাটকের সর্ব্বাংশই আলোকিত। যে স্থানে অদ্ভুত ব্যাপার, যে স্থানে রহস্য-কৌতুক, যে স্থানে সঙ্কট, সেই স্থানেই সে চরিত্র প্রধান আলম্বন স্বরূপ। মনে হয়, বিদূষককে বাদ দিলে, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের নাটকত্বই ব্যাহত হয়। নাটকীয় বস্তুর এমন উপযোগী বিদূষক কালিদাসের অন্য কোন দৃশ্যকাব্যে উপলব্ধ হয় না।

—— o ——

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পরিব্রাজিকা।

এই নাটকের অন্যতম পাত্র পরিব্রাজিকা বা 'পণ্ডিত কৌশিকীর' চরিত্রও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্য কোথাও, নাটকের অপ্রধান পাত্রের এমন সম্পূর্ণ চরিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পরিব্রাজিকার তুলনা পরিব্রাজিকা স্বয়ং। তাঁহার চরিত্রের অনুকরণে, মহাকবি ভবভূতি কামন্দকী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু যতি-বেশ-ধারিণী পরিব্রাজিকার সমক্ষে সে কামন্দকী-সৃষ্টি উল্লেখযোগ্যই নহে।

পরিব্রাজিকা ভারতের তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের কন্যা। ধনবান্ ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের কন্যার শিক্ষা দীক্ষা সে কালে যে কিরূপ হইত, তাহার কতকটা আভাস, আমরা এই পরিব্রাজিকা চরিত্রে দেখিতে পাই। সকল বিষয়েই তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যে স্বয়ং নৃত্যগীতাদি করিতে পারিতেন, এরূপ কোন নিদর্শন আমরা নাটকে পাই না বটে, কিন্তু নৃত্যগীতাদিবিষয়ক শাস্ত্রে যে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, ইহার প্রমাণ এই নাটকের প্রথম অঙ্কেই পাওয়া যায়।

কি উপায়ে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষভাবে জানিতেন। তিনি বিদর্ভ হইতে, তদীয় অগ্রজ মন্ত্রী সুমতির সহিত, মালবিকাকে লইয়া বিদিশায় আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বিপৎপাত হওয়ায়, কে কোথায় চলিয়া গেল! তাহার অগ্রজ মন্ত্রিবর সুমতির বিনাশ হইল, এসমস্তই তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার মনে কেমন একটা নির্বেদ উপস্থিত হইল, তিনি আর বিদর্ভে ফিরিলেন না। পরিব্রজ্যা-গ্রহণ-পূর্ব্বক, বিদিশায় উপনীত হইলেন। ইহা যে সময়ের ঘটনা, তখন ভারতের অবস্থা আর এক প্রকার ছিল। তখন দেবতা-ব্রাহ্মণে মানুষের অগাধ ভক্তি ছিল। পরিব্রাজিকার ন্যায় শুদ্ধশীলা দেবীকে পাইয়া,

বিদিশেশ্বর আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিয়া, ইষ্টদেবীর মত সম্মান করিয়া, তাঁহাকে রাজ-সংসারে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। পরিব্রাজিকার ভোগোপতর হৃদয়ে রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকুটীর, উভয়ই তুল্য। তিনি রাজার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তাঁহার উপর মহারাণী ধারিণীর অপার বিশ্বাস। পরিব্রাজিকার অনুমতি ব্যতীত, পরিব্রাজিকার পরামর্শ ব্যতীত, মহারাণী কোন কার্য্যই করিতেন না। এইভাবে, রাজা ও রাজ্ঞীর পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া, পরিব্রাজিকা মহা সম্মানের সহিত, রাজ-প্রাসাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিগ্-দর্শন যন্ত্রের শলাকা যেমন নিয়ত উত্তরমুখী, কোন অবস্থাতেই তাহার ব্যত্যয় হয় না, তদ্রূপ, তাঁহারও চিত্ত, প্রতিনিয়ত পরিচারিকা মালবিকার উপর স্থির ছিল। কোনক্রমেই সে হৃদয় মালবিকা-পরাঙ্মুখ হইত না। রাজ-নন্দিনী মালবিকা অদৃষ্টবশে পরিচারিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার সৌভাগ্য-দেবতা যেন ছদ্মবেশে রাজসংসারে আসিয়া, তাঁহারই শুভানুধ্যানে রত রহিয়াছেন। রাজ-সংসারের কেহই জানিত না যে, তাঁহার সহিত মালবিকার কি সম্বন্ধ।

পরিব্রাজিকা নিয়ত নির্লিপ্ত-ভাবে থাকিতেন সত্য, কিন্তু রাজ-সংসারের কোথায় কখন কি ব্যাপার ঘটে, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। কোন কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। প্রতিভাবলে, তিনি, রাজ-প্রাসাদের সর্ব্ববিষয়ের এক প্রকার কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নতুবা, ভারতেশ্বরের নাট্যাচার্য্যগণের বিবাদ-মীমাংসায় তিনি রমণী হইয়াও মধ্যস্থ হইবেন কেন? তাঁহার বিদ্যাবত্তায়, তাঁহার নিরপেক্ষতায় এবং ততোধিক তাঁহার অলুব্ধতায় রাজ-সভার তথা অন্তঃপুরের সকলেই বশীভূত ছিলেন! যখনই মালবিকা বিপন্ন হইয়াছেন, তখনই তিনি সে বিপদের প্রতিবিধান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। মালবিকার অবরোধের কথা তিনিই প্রথমে বিদূষককে

জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, নাগমণির দ্বারা যে সর্পবিষের ধ্বংস, এ রহস্য তিনিই প্রকাশ করিয়া ধারিণীর অঙ্গুরীয়ক-লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। আবার তিনিই ধারিণী-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, পরিণয়কালে মনের মত করিয়া মালবিকাকে সাজাইয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদের নানাবিধ কূটচক্রান্তের মধ্যে থাকিয়াও, পরিব্রাজিকা স্বীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগত অগ্রজ সুমতির পরামর্শানুসারে মাধবসেন মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের সহিত বিবাহ দিতে আসিতেছিলেন, দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অগ্রজের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। সোদরা পরিব্রাজিকা এই দীর্ঘকাল আত্ম-গোপন করিয়া, কত কষ্টে থাকিয়া, অগ্রজের সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। মাধবসেনের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ভারতেশ্বরের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিয়া দিলেন। অন্তর্বিপ্লবানল-দগ্ধ বিদর্ভে মাধবের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন।

মালবিকাকে রাজার করে সমর্পণ করার পর, যখন ধারিণী বুঝিলেন, এতদিনে তাঁহার আত্ম-বলিদান হইল, ইরাবতীও যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পূর্ণ হইল, রাজ-সংসারে ধারিণীর থাকা এখন প্রতিপদে বিড়ম্বনাময়,—তখন, ধারিণীর মুখচ্ছবি-দর্শনেই পরিব্রাজিকা তদীয় হৃদয়-ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন—"সাধ্বী পতিবৎসলা কামিনীরা পরম শত্রুর দ্বারাও পতির সেবা করিয়া থাকেন, রাজ্ঞি! 'সাগর-গামিনী স্রোতোবহা' যেমন নিজে সাগরের সহিত সঙ্গত হয়, তেমন আর দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীকেও লইয়া সমুদ্রে মিলাইয়া দেয়। সুতরাং তুমি বিমনা হইও না।" পরিব্রাজিকা যেন কিছুই জানেন না। সকলই যেন ধারিণী করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, ধারিণী-চরিত্র অপেক্ষা পরিব্রাজিকা-চরিত্র অধিকতর চমৎকারিতাময়, নিপুণ ও প্রতিভাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

ধারিণী মালবিকাকে ভাল বাসিতেন, কন্যাধিক স্নেহ করিতেন। ইরাবতীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে যাইয়া, তিনি নিজেও অনেকটা খর্ব্ব হইলেন। আর পরিব্রাজিকাও মালবিকাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, সে ভাল বাসার পরিচয়স্বরূপ তিনি মালবিকাকে পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া, স্বয়ং অক্ষত-চরিত্রে বাহির হইলেন। ধারিণীর স্নেহে একটু স্বার্থ ছিল। পরিব্রাজিকার স্নেহ নিঃস্বার্থ। স্বার্থপূর্ণ স্নেহের পরিণাম যে মঙ্গলজনক নহে, মালবিকার পরিণয়ান্তে ধারিণী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। অক্ষ তখন হস্তচ্যুত। ধারিণীর স্বার্থ-গন্ধি স্নেহের পরিণাম দুঃখময়; আর পরিব্রাজিকার নিঃস্বার্থ স্নেহের পরিণাম সুখময় মঙ্গলময়, তিনি যে রাজ্যের অধিবাসিনী, সেই বিদর্ভের অশেষ কল্যাণময়। যে স্থানে নিঃস্বার্থ স্নেহের নির্ঝর প্রবাহিত, সে স্থানের অভ্যুদয় নিশ্চিত। বিদর্ভ নন্দিনী-সোদরা কৌশিকীর হৃদয়ে সেই নির্ঝর প্রবাহিত ছিল, তাই অগ্নিমিত্রের করে বিদর্ভ-রাজ-কুমারী অর্পিত হইলেন, বিদর্ভের অশেষ কল্যাণ হইল। বিদর্ভের বহুকাল-লুপ্ত শান্তি ফিরিয়া আসিল। মাধবসেন ও যজ্ঞসেন উভয়ে, নির্ব্বিবাদে, অগ্নিমিত্রের ব্যবস্থা গুণে, দ্বিধা-বিভক্ত বিদর্ভরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত কৌশিকীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। মালবিকার দুঃখময় জীবন-নাটিকার পটপরিবর্ত্তন হইল। তিনি বিদিশেশ্বরী-রূপে, উভয় রাজ্যের মঙ্গলকামনায় রত রহিলেন

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

এতক্ষণে মালবিকাগ্নিমিত্রের পাত্রাবলীর চরিত্র-সমালোচনা শেষ হইল। উল্লিখিত কতিপয় চরিত্র ব্যতীত, নিপুণিকা বকুলাবলিকা প্রভৃতি আরও কয়েকটি অপ্রধান পাত্রের চরিত্রও বিশেষ দ্রষ্টব্য। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার পাত্রাবলীর প্রত্যেকটিই স্ব স্ব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে অদ্বিতীয়। কোন পাত্রের চরিত্রেই কোন প্রকার অভাব বা অপূর্ণতা উপলব্ধ হয় না। প্রতি চরিত্রই স্ব-প্রকাশ।

এই নাটক কালিদাসের প্রথম বয়সে বিরচিত বলিয়া মনে হয়। মহাকবি গ্রন্থের প্রস্তাবনায় এ কথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন। এই নাটকের সর্ব্বত্রই কালিদাসের অনুপম কবিত্ব লহরী, উপলাহত নির্ঝরিণীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও সে কবিত্বের কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটে নাই। তবে কালিদাসের অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের ন্যায়, ইহাতে, তিনি, তাঁহার চির-প্রিয় স্বভাবের তেমন উন্মাদিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই, বা তাহার অবসরও পান্ নাই। সেই বন্যবরাহ, চকিত-নয়ন মৃগ-মিথুন, বনময়ূর,—সেই তপোবন, তুষারস্নাত পর্ব্বত, কলবাহিনী তটিনী, আর সেই তটিনীর বক্ষে মরাল ক্রীড়া, চক্রবাক-চক্রবাকীর সায়ংকালীন শেষ সম্ভাষণ, এবং তটিনীর সৈকতে হংসমিথুনের নর্ত্তন, অমর-বালিকার কন্দুক ক্রীড়া,—এ সমুদয় তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রাচীন ভারতের একটি সর্ব্বপ্রধান প্রাচীন রাজ-বংশের যে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছে।

তাঁহার বর্ণিত বিদিশা, ভারতে, বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে, যে, একটি অতি সমৃদ্ধি-শালিনী মহানগরী ছিল, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিনি স্বকীয় মেঘদূত কাব্যে একবার বিদিশার অভ্যুদয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন, বিদিশা যে চিরদিন আমোদ-পূর্ণ, উল্লাস-পূর্ণ ও উৎসব-পূর্ণ নগরী, একথা মেঘদূতের বর্ণনা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান করা যায়।

এই নাটক আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে মহাকবির বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে, ইহাকে অন্যান্য অনেক নাটক অপেক্ষা বৃহত্তমও বলা যাইতে পারে। নাটকখানি একবার পড়িলেই, বুঝা যায় যে, কালিদাস, ইহাকে রসজ্ঞ, শিক্ষিত ও বিশিষ্ট সামাজিকদিগের উপযোগী এবং রুচিকর করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার কোন স্থলে কোন প্রকার কল্পনা-মান্দ্য পরিলক্ষিত হয় না। কোথাও পুনরুক্তি দোষ নাই, বা কোন স্থানে, নিরর্থক কোন বিষয়ের অবতারণা পূর্ব্বক, সামাজিকগণের বিরক্তির উদ্রেক করা হয় নাই। ইহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বৃত্তান্তই সুচারু ও চমৎকারিতা-পূর্ণ। নাটক খানি সর্ব্বাংশে নিরবদ্য। অপরাপর সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ইহার ঘটনাবলী দীর্ঘকালব্যাপী নহে। আবার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ক্ষিপ্রতাদ্বারাও ইহার কোন ঘটনাকে বিকলাঙ্গ করা হয় নাই। যেমন একটা অঙ্কুর, বিধাতার অব্যর্থ নিয়মে, আপনিই দিনে দিনে বাড়িতে বাড়িতে, ক্রমে ছায়া-প্রধান মহীরুহে পরিণত হয়, তদ্রূপ, এই নাটকের ঘটনাও যেন, প্রকৃতিবশে আপনা আপনি ঘটিতে ঘটিতে, শেষে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। অতিপ্রকৃতিক কোন ব্যাপারই ইহাতে নাই। মহাকবি, তদীয় বলিষ্ঠ কল্পনা-প্রভাবে, সামাজিকগণের হৃদয়ে, এই নাটক-বর্ণিত বৃত্তান্তের একটা স্থায়ী সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন। যিনি ইহা একবার পাঠ করিবেন, বা ইহার অভিনয় একবার দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই চিরদিনের মত, ইহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ থাকিতে হইবে। কখনও এই নাটকের বিষয় বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ইহা সর্ব্বতোভাবে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবিরই উপযুক্ত।

তিনি যে সকল রসজ্ঞ, 'অভিরূপ' সামাজিকের উদ্দেশে এই নাটক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই সকল শিক্ষিত কলাবিৎ মনস্বিগণেরও সর্ব্বাংশে হৃদ্য এবং আনন্দ-প্রদ হইয়াছে! এই নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্রকে তিনি আদর্শ পুরুষরূপে সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্যও তাহা ছিল না; যে অভিপ্রায়ে তাঁহার এই নাটক প্রণয়ন, মহাকবির সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে।

তাঁহার রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, এই নাটক পড়িতে পড়িতে, ততোধিক ইহার অভিনয় দর্শন করিতে করিতে মনে হয়, যেন সেই বিদিশার উদ্যান-বাটিকায় উপস্থিত হইয়াছি, কখনো বা রাজসভাস্থলে বিবদমান সেই নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের কলহমীমাংসা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আর রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ধূর্ত্ত বিদূষকের গূঢ়াভিপ্রায়-দ্যোতিকা মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া, মনে মনে হাসিতেছি। তাহার রচনার এমনই তন্ময়তা-বিধায়িনী শক্তি! তাঁহার রচনা-পাঠান্তে যথার্থই মনে হয়ঃ—

কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ
মাহিষং দধি স-শর্করং পয়ঃ।
এনমাংসমভিরূপসঙ্গমঃ
সম্ভবন্তু মম জন্ম-জন্মনি॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

বিক্রমোর্ব্বশী।

বিক্রমোর্ব্বশী মহাকবি কালিদাস প্রণীত নাটকত্রয়ের অন্যতম। এই ত্রোটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন, পুরূরবা, তাঁহার অন্বেষণ নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এ বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর, যে, কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।[1]

কালিদাসের নাটক-ত্রয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য-বিচার করিলে, বিক্রমোর্ব্বশীকেই তদীয় প্রথম নাটক বলিয়া মনে হয়। কেননা, তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায়—

> পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
> ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
> সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে।
> মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয় বুদ্ধিঃ[2] ॥

১—বিদ্যাসাগর।

২—যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই নির্দ্দোষ, এবং যাহা নূতন, তাহাই দোষযুক্ত—এ প্রকার নির্দ্দেশ একান্ত অসঙ্গত। পণ্ডিতেরা স্বয়ং পরীক্ষা-পূর্ব্বক উহাদের যেটি নির্দ্দোষ তাহাই গ্রহণ করেন। যাহারা মূঢ়, সদসদ্বিচারে অসমর্থ, তাহারাই পরের বুদ্ধিতে পরের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়।

এই যে শ্লোক চরনা করিয়াছেন, তৎপাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্ব্বে তিনি অন্য কোনও নাটক নিশ্চিতই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নতুবা মালবিকাগ্নিমিত্রে ঐ প্রকার শ্লোক রচনার অবসরই হইত না। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক, হয়ত, রসজ্ঞ-সমাজে যাদৃশ অভ্যর্থিত হয় নাই, তাই পরবর্ত্তী নাটকে তাঁহাকে ঐ শ্লোকদ্বারা সামাজিকদিগের হৃদয়াকর্ষণ করিতে হইয়াছে। মহাকবি ভবভূতিও, প্রথমে 'বীরচরিত' প্রণয়ন করেন। বীরচরিতের প্রতি তৎকালীন সামাজিকবৃন্দ যাদৃশ অবধানানুগ্রহ প্রদান করিয়াছিলেন না, তাই কবি ব্যথিত-হৃদয়ে, তাঁহার মালতী-মাধবে—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী[১] ॥

—বলিয়া সামাজিকদিগের নিকটে, মনের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালিদাসের পূর্ব্বে ভাস-সৌমিল্ল কবিপুত্রাদির বিশিষ্ট বিশিষ্ট কাব্য বিরচিত হইয়াছিল। পরে, যখন কালিদাস, বিক্রমোর্ব্বশী বিরচন করিলেন, তখন, বিদ্বদ্বৃন্দ ঐ সকল বিশিষ্ট কাব্যাবলীর প্রতি উদাসীন হইয়া, তদীয় কাব্যে আদরাতিশয় প্রদর্শন করেন নাই। তাই তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে, ঐ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। নতুবা ঐ কবিতা তাঁহার গর্ব্বের উক্তি নহে। মালবিকাগ্নি-

১—যাঁহারা আমার এই গ্রন্থে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, উঁহারাই জানেন যে তাঁহাদের অবজ্ঞার কারণ কি? তাঁহাদের জন্য আমার এ গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। পৃথিবীর কোন স্থানে হয়ত আমার সমানধর্ম্মা কেহ থাকিতে পারেন, অথবা এখন নাই, কিন্তু কালে উৎপন্ন হইবেন, কেন না কাল অনন্ত, আর পৃথিবীও বিপুল।

মিত্রই যদি তাঁহার প্রথম নাটক হইবে, তবে, তাহার প্রস্তাবনায় তিনি হঠাৎ ঐ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবেন কেন? তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র সুধীসমাজে আদৃত হইবে, না উপেক্ষিত হইবে, ইহা নাটকের প্রস্তাবনা লিখিবার সময়েই বা তিনি বুঝিবেন কি প্রকারে? কেবল সংশয় করিয়াই যে তিনি ঐ রূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহা বলিলে তাঁহার ন্যায় অলৌকিক ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাকবির বিবেচনা-শক্তির অমর্য্যাদা করা হয়। সুতরাং মনে হয়, তিনি প্রথমে বিক্রমোর্ব্বশী প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা সুধী-সমাজে তাদৃশ আদরের সহিত প্রথম প্রথম পরিগৃহীত হয় নাই, তাই তিনি পরে দ্বিতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ঐরূপ খেদোক্তি করিয়া, গতানুগতিক, প্রাচীনানুরক্ত সমাজিকগণের সম্মুখে স্বীয় কাব্যের গুণ-দোষ-পরীক্ষার প্রার্থনা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে মালবিকাগ্নিমিত্রই কালিদাসের প্রথম নাটক। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিস্ফল। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র, এই উভয় নাটকের রচনানৈপুণ্য ও কল্পনাপ্রাবীণ্য বিচার করিলেই, সুধীসমাজ এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারিবেন।

শকুন্তলা ব্যতীত, সংস্কৃত সাহিত্যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের সমকক্ষ অন্য নাটক নাই। উহার সর্ব্বাংশই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। অস্বাভাবিক একটি কথাও, অথবা একটি বর্ণও মালবিকাগ্নিমিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। যিনি একবার মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় স্বাভাবিক-ঘটনালঙ্কৃত নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি যে, পরে আবার বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় অতিপ্রকৃতিক-ঘটনা-বহুল নাটক রচনা করিবেন, ইহা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যদি বুঝিতাম যে, বিক্রমোর্ব্বশীতে মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষা অধিকতর সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি বুঝিতাম যে, নাটকত্বের অনুসারে অভিজ্ঞান-শকুন্তল যেমন উৎকৃষ্টতম, সেইরূপ বিক্রমোর্ব্বশীও অন্ততঃ মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তাহা

হইলেও না হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রকে বিক্রমোর্ব্বশীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশী কোন কোন কবির কাব্য হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও, উহাতে এমন কোনই বিশেষ গুণ নাই, যাহাতে, উহা মালবিকাগ্নিমিত্রকে অতিক্রম করিতে পারে।

কুমারসম্ভবের সমালোচনা কালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রথম কবিই অতিপ্রকৃতিক ঘটনার আশ্রয়ে কাব্য নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বকীয় নির্ম্মাণ-কৌশলের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, কোন মনস্বীই নিত্য পরিদৃশ্যমান জগতের কোন বস্তু বর্ণন করিতে অগ্রসর হয়েন না। দৃষ্ট অপেক্ষা অদৃষ্ট পদার্থের বর্ণন অল্পায়াস-সাধ্য। পরিণত কল্পনা ব্যতিরেকে, নিত্যানুভূত বস্তুর বর্ণন করিলে, তাহা কদাচ চমৎকারী হয় না। বিক্রমোর্ব্বশীতে অদৃষ্ট বস্তুর বর্ণন, আর মালবিকাগ্নিমিত্র দৃষ্ট পদার্থের—জগতের নিত্যানুভূত পদার্থের বর্ণনার লীলাতরঙ্গে সমুল্লসিত। এই সকল বিবেচনা করিলে, বিক্রমোর্ব্বশীই কালিদাসের প্রথম নাটক বলিয়া মনে হয়।

যে বৃত্তান্ত উপজীব্য করিয়া, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ বেদে পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু, পদ্ম, মৎস্য প্রভৃতি অনেক পুরণাদিতেও উহার নির্দ্দেশ আছে। তবে প্রতি পুরাণেই অংশ-বিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই নাটক সম্পূর্ণরূপে বৈদিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে বিরচিত। তবে মহাকবি-কালিদাসের অপ্রতিম কল্পনালোকে সেই সকল প্রাচীন ঘটনা এক অতি চমৎকারিণী ও নয়ন-রঞ্জিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি যত দূর পারিয়াছেন, বর্ণনীয় বস্তুকে স্বভাবের অনুকূল করিয়া আনিয়াছেন। যাহা অতিরঞ্জিত সুতরাং অস্বাভাবিক, তাহা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই এই নাটকের উপজীব্য বৈদিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত, কোন কোন স্থলে ইহার প্রভেদ ঘটিয়াছে।

কল্পনার চমৎকারিতায় এবং রচনার মনোহারিতায় এই নাটক শকুন্তলা, উত্তরচরিত এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের পরই উল্লেখযোগ্য। পুরুষের অন্তঃকরণ যে কত কোমল হইতে পারে, তাহা মহাকবি, পুরূরবার চরিত্রে উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রণয়ের এক মূর্ত্তি বিরহে যে সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করে, মিলনের সময়ে, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে যাহাকে পৃথক্ করিয়া হৃদয়ে রক্ষিত করা যায়, নয়নের একমাত্র দ্রষ্টব্য করা যায়, বিরহকালে, সেই এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টব্যই যে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া উঠে, পৃথিবীর তাবৎ পদার্থে যে তাহারই মূর্ত্তি উপলব্ধ হয়, বিরহীর তন্ময় হৃদয়ে, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই যে, সেই বিরহিত ব্যক্তির প্রতি মূর্ত্তি জাগাইয়া দেয়, ইহা কবি, এই নাটকে অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই নাটকের উপজীব্য বৃত্তান্তটি এক প্রকার দিব্য; কেননা উর্ব্বশী স্বর্গের বাসিনী, পুরূরবা মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও দেব প্রভাব-সম্পন্ন। ঘটনার স্থানও, অধিকাংশ স্থলে, স্বর্গে চৈত্ররথ উদ্যানে, কখনো বা গন্ধমাদন পর্ব্বতে। কিন্তু তথাপি কালিদাস এমন কৌশলে, সেই উর্ব্বশী এবং পুরূরবার প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, যে, তাহা পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলেই মনে হয়, যেন সত্য সত্যই মর্ত্ত্যের কোন প্রণয়চরিত্র, যাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, এমন চিত্র দেখিতেছি।

এই নাটকের কি শ্লোকে, কি গদ্যে, সর্ব্বত্রই প্রাকৃতের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ চতুর্থ অঙ্কের অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত, এবং ঐ অঙ্কের শ্লোকাবলীও নানাবিধ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত। সংস্কৃত অন্য কোন নাটকে এত অধিক ছন্দের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। কালিদাসের সময়েও প্রাকৃতের প্রচলন যে কত অধিক ছিল, ইহা তাহারই নিদর্শন।

পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৃত্তান্ত।

জাহ্নবীর পবিত্র তটে বিরাজমান, পবিত্রতম প্রয়াগতীর্থের অন্তঃপাতী, 'প্রতিষ্ঠান' নামক নগরে, চন্দ্রবংশাবতংস বিখ্যাতকীর্ত্তি পুরূরবা নামে এক পরম-পরাক্রমশালী নরপতি বাস করিতেন। একদা রথারোহণে আকাশ-মার্গে বিচরণ [illegible], তিনি দেখিলেন যে, একটি পরম সুন্দরী যৌবনবতী ললনাকে এক বিশালবপুঃ দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাহার সখীগণ দূরে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। রাজা অগ্রসর হইয়া [illegible] যে, ঐ অপহ্রিয়মাণা লাবণ্যবতী কামিনীর নাম উর্ব্বশী, আর ঐ অসুরের নাম কেশী। উর্ব্বশী, অলকা-পতি কুবেরের ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, পথিমধ্যে এই দুরন্ত অসুর-কর্ত্তৃক বিপন্ন হইয়াছেন [illegible] পুরূরবা, তৎক্ষণাৎ, বাহুবলে কেশীকে নিহত করিয়া, [illegible] করুণ-পরিদেবিনী অমর-ললনার উদ্ধার-সাধন পূর্ব্বক তাহাকে [illegible] সখীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। উর্ব্বশী, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ [illegible], একবার সেই কন্দর্পকল্প মহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া [illegible] তাঁহার অন্তঃকরণে অনুরাগ জন্মিল। তিনি তদবধি, একান্ত [illegible], সেই পরমোপকারী পুরূরবার শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির ধ্যান করিতে [illegible]। উর্ব্বশী যখন বীরবর পুরূরবার চিন্তায় এইরূপ বিমূঢ়-হৃদয়া, [illegible] সুরপতি ইন্দ্রের সভায়, নাট্যশাস্ত্রের আদি কর্ত্তা ভরতমুনির প্রণীত [illegible] লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামক নাটক অভিনীত হইতেছিল। সেই অভিনয়ে উর্ব্বশী [illegible] ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরাবতীর রঙ্গমঞ্চে, যখন স্বর্গের [illegible] লোকপালগণ, এমন কি, বিষ্ণু পর্য্যন্ত সমাসীন হইয়াছেন, [illegible] বারুণী-ভূমিকা-ধারিণী মেনকা, স্বয়ং-বরার্থিনী, পরিগৃহীত-লক্ষ্মী-বেশা, উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মি! কোন্

কল্পনার চমৎকারিতায় এবং রচনার মনোহারিতায় এই নাটক শকুন্তলা, উত্তরচরিত এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের পরই উল্লেখযোগ্য। পুরুষের অন্তঃকরণ যে কত কোমল হইতে পারে, তাহা মহাকবি, পুরূরবার চরিত্রে উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রণয়ের এক মূর্ত্তি বিরহে যে সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করে, মিলনের সময়ে, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে যাহাকে পৃথক্ করিয়া হৃদয়ে রক্ষিত করা যায়, নয়নের একমাত্র দ্রষ্টব্য করা যায়, বিরহকালে, সেই এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টব্যই যে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া উঠে, পৃথিবীর যাবৎ পদার্থে যে তাহারই মূর্ত্তি উপলব্ধ হয়, বিরহীর তন্ময়-হৃদয়ে, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই যে, সেই বিরহিত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি জাগাইয়া দেয়, ইহা কবি, এই নাটকে অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই নাটকের উপজীব্য বৃত্তান্তটি এক প্রকার দিব্য ; কেননা উর্ব্বশী স্বর্গের কামিনী, পুরূরবা মর্ত্তবাসী হইয়াও দেব প্রভাব-সম্পন্ন। ঘটনার স্থানও, অধিকাংশ স্থলে, স্বর্গে চৈত্ররথ উদ্যানে, কখনো বা গন্ধমাদন পর্ব্বতে। কিন্তু তথাপি কালিদাস এমন কৌশলে, সেই উর্ব্বশী এবং পুরূরবার প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, যে, তাহা পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলেই মনে হয়, যেন সত্য সত্যই মর্ত্ত্যের কোন প্রণয়চরিত্র, যাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, এমন চিত্র দেখিতেছি।

এই নাটকের কি শ্লোকে, কি গদ্যে, সর্ব্বত্রই প্রাকৃতের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ চতুর্থ অঙ্কের অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত, এবং ঐ অঙ্কের শ্লোকাবলীও নানাবিধ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত। সংস্কৃত অন্য কোন নাটকে এত অধিক ছন্দো সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। কালিদাসের সময়েও প্রাকৃতের প্রচলন যে কত অধিক ছিল, ইহা তাহারই নিদর্শন।

পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৃত্তান্ত।

জাহ্নবীর পবিত্র তটে বিরাজমান, পবিত্রতম প্রয়াগতীর্থের অন্তঃপাতী, 'প্রতিষ্ঠান' নামক নগরে, চন্দ্রবংশাবতংস বিখ্যাতকীর্ত্তি পুরূরবা নামে এক পরম-পরাক্রমশালী নরপতি বাস করিতেন। একদা রথারোহণে আকাশ-মার্গে বিচরণ কালে, তিনি দেখিলেন যে, একটি পরম সুন্দরী যৌবনবতী ললনাকে এক বিশালবপুঃ দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাহার সখীগণ দূরে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। রাজা অগ্রসর হইয়া জানিলেন যে, ঐ অপহ্রিয়মাণা লাবণ্যবতী কামিনীর নাম উর্ব্বশী, আর ঐ অসুরের নাম কেশী। উর্ব্বশী, অলকা-পতি কুবেরের ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, পথিমধ্যে এই দুরন্ত অসুর-কর্ত্তৃক বিপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া পুরূরবা, তৎক্ষণাৎ, বাহুবলে কেশীকে নিহত করিয়া, সেই ভয়কাতরা করুণ-পরিদেবিনী অমর-ললনার উদ্ধার-সাধন পূর্ব্বক তাহাকে রোরুদ্যমানা সখীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। উর্ব্বশী, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-নয়নে, একবার সেই কন্দর্পকল্প মহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার অন্তঃকরণে অনুরাগ জন্মিল। তিনি তদবধি, একান্ত অনন্যমনে, সেই পরমোপকারী পুরূরবার শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী যখন বীরবর পুরূরবার চিন্তায় এইরূপ বিমূঢ়হৃদয়া, তখন সুরপতি ইন্দ্রের সভায়, নাট্যশাস্ত্রের আদি কর্ত্তা ভরতমুনির প্রণীত 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নামক নাটক অভিনীত হইতেছিল। সেই অভিনয়ে উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরাবতীর রঙ্গমঞ্চে, যখন সুরগণ এবং লোকপালগণ, এমন কি, বিষ্ণু পর্য্যন্ত সমাসীন হইয়াছেন, তখন বারুণী-ভূমিকা-ধারিণী মেনকা, স্বয়ং-বরার্থিনী, পরিগৃহীত-লক্ষ্মী-বেশ, উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মি! কোন্

অমরের উপর তোমার হৃদয় অভিনিবিষ্ট হইয়াছে? অন্যমনস্কা উর্ব্বশী মেনকা কর্ত্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, 'পুরুষোত্তমের উপর' এই কথা বলিতে যাইয়া, 'পুরূরবার উপর', এই কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন। ভরতমুনি স্বয়ং অভিনয়স্থলে উপস্থিত থাকিয়া, অভিনেয় পদার্থের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি উর্ব্বশীর মুখে এই প্রকার প্রস্তুত-বিরোধিনী কথা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধ-পর-বশ-চিত্তে, তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন, 'তুমি অচিরাৎ মানুষী হও, অপ্সরা কুলের তুমি কলঙ্কিনী।'

বীরশ্রেষ্ঠ পুরূরবা, অনেক সময়ে, অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিতেন; তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যে সুরনাথ অত্যন্ত বিমুগ্ধ ছিলেন। ভরতের অভিশাপ শ্রবণে, ইন্দ্র বলিলেন যে, উর্ব্বশী মানুষী হউক, কিন্তু যাহার জন্য উর্ব্বশীর এই নিগ্রহ, তিনি আমার পরম সুহৃদ, উর্ব্বশী মানুষী-দেহ ধারণ করিয়া, তাঁহাকেই ভজনা করুক। অভিশপ্তা উর্ব্বশী, ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইভাবে কথঞ্চিৎ অনুগৃহীতা হইয়া, মর্ত্তে পুরূরবার নিকটে আসিয়া মানুষীভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, কালিদাস এই অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। তবে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে, কালিদাস যেমন ঐ প্রাচীন বৃত্তান্তের অনেক অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ চমৎকারিতার পরিপন্থী বিষয়ের ত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি, মূলবৃত্তান্তের অঙ্গহানি না করিয়া, সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন-মানসে, অনেক নূতন ঘটনারও সমাবেশ করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা মূলবৃত্তান্তকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

ষট্-চত্বারিংশ অধ্যায়।

উর্ব্বশীর মুক্তি ও পুনর্বন্ধন।

উর্ব্বশী, মালবিকা বা শকুন্তলার ন্যায়, সংসারবৃত্তান্তানভিজ্ঞা মুক্ত-হৃদয়া বালিকা নহেন। তিনি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সভার অলঙ্কাররূপিণী, অপ্সরাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সুতরাং তাঁহার পরিপক্ক-হৃদয়ের পুরূরবা বিষয়ক অনুরাগের বর্ণন বড়ই দুষ্কর। উর্ব্বশী, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অমরগণের নিত্য-নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী। স্বর্গের নন্দন কানন, পারিজাত-তরুর শীতল ছায়া, মন্দাকিনীর সুরম্য পুলিন, তাঁহার বিনোদস্থান। দেবতার অনুগ্রহে, তাঁহার যৌবন চিরস্থির। তাঁহাদের ভোগ্যের অভাব নাই। কেবল আকাঙ্ক্ষার অভাব। মনে, যখন, যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাঁহারা তখনই তাহা পূর্ণ করেন। কত মহা মহা তপস্বী, যে বিনোদময় স্থানে যাইবার জন্য, দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর তপস্যা করিয়া, শরীরপাত করেন, উর্ব্বশী সেই আনন্দময় উৎসবময় স্থানের অধিবাসিনী। সুতরাং তাঁহার হৃদয় যে কীদৃশ প্রণয়-প্রবণ, কীদৃশ উল্লাসময়, তাহার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গাধিপতির সভা-বিলাসিনী তাদৃশী কামিনীকে, সজ্ঞান অবস্থায়, মর্ত্তের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাঁহার সেই স্বর্গ-রাজ্যের যথেচ্ছ-ভোগ-তৃপ্ত হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনে মহাকবি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাই কালিদাস, উর্ব্বশীকে, প্রথমে অজ্ঞান অবস্থায় রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। দুরন্ত অসুর, তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ;—সেই মহেন্দ্রসভা, নন্দন কানন, চিত্ররথ উদ্যান ;—সেই কল্পপাদপ, চিরবসন্ত সমাগম, মন্দাকিনী-সৈকত ;—সেই অপ্রার্থিতোপনত ভোগ্য-সম্ভার, আনন্দ, উৎসব, উল্লাস ;—আর সেই চিত্রলেখা, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি প্রিয় সখীগণ,—এ সমস্ত চিরদিনের মত শেষ হইল! উর্ব্বশীর

অনন্ত জীবনে এ সকলের সন্দর্শন আর ঘটিবে না! তাই উর্ব্বশী ভয়ে, বিষাদে, মর্ম্মবেদনে মূর্চ্ছিত। দূরে সখীগণ রোরুদ্যমান। এমন সময়ে রাজা পুরূরবা সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুরের বিনাশ করিয়া উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিলেন। মূর্চ্ছিত উর্ব্বশী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। রাজা উর্ব্বশীকে লইয়া, করুণবিলাপিনী সখীদিগের নিকটে আসিলেন। চিত্রলেখা কত প্রকারে, তাঁহার সন্তর্পণ করিলেন। উর্ব্বশী তখনও হতচেতনা! অনেক পরে, তাঁহার জ্ঞান হইল। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রলয়ান্ত সমুদ্রবক্ষের ন্যায় শান্ত, একবারে নিস্তরঙ্গ। সে স্বর্গের ভাবনা এখন আর তাঁহার নাই। তাঁহার হৃদয় এখন সর্ব্বপ্রকার ভাবনা-শূন্য, মেঘমুক্ত গগনের ন্যায় নির্ম্মল। যখন হৃদয়ের এবম্ভূত অবস্থা, সে হৃদয় নাতিপ্রফুল্ল, নাতিবিষণ্ণ, নিষ্কম্প প্রদীপকলিকার ন্যায় স্থির, তখন তাঁহার প্রিয়সখী চিত্রলেখা বলিলেন, 'সখি! আশ্বস্ত হও, ভয় নাই, বিপন্নের সহায় মহারাজ কর্ত্তৃক, সেই সুরবিদ্বেষী দানবগণ নিহত হইয়াছে। দানবভয়ে উর্ব্বশী তখনও নয়ন উন্মীলন করেন নাই। চিত্রলেখার কথায় ঈষদাশ্বস্ত হইয়া, তিনি নেত্রোন্মীলন-পূর্ব্বক, অবসন্নকণ্ঠে কহিলেন 'কে? এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া, দানবহস্ত হইতে আমাকে কি মহেন্দ্র উদ্ধার করিলেন?' উর্ব্বশী জানিতেন, তাঁহার অসময়ের বন্ধু, তাঁহার বিপদের সহায়—মহেন্দ্র। তাই চৈতন্য-লাভের পরই সর্ব্বপ্রথমে, তাঁহার মহেন্দ্রের কথা মনে পড়িল। চিত্রলেখা বলিলেন, 'না, মহেন্দ্র নয়, মহেন্দ্র-তুল্য প্রভাবশালী রাজর্ষি পুরূরবার অনুগ্রহে, তোমার উদ্ধার হইয়াছে[১]।' সখী চিত্রলেখার কথায়, উর্ব্বশী একবার শান্ত-নয়নে সেই মহেন্দ্রতুল্য-রাজার দিকে চাহিলেন। রাজা পুরূরবা সাক্ষাৎ মহেন্দ্র নহেন বটে, কিন্তু চিত্রলেখা বলিয়া দিয়াছেন যে, ইনি মহেন্দ্র-তুল্য-প্রভাবশালী। উর্ব্বশী

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ১ম অঙ্ক। চিত্রলেখা। "ন মহেন্দ্রেণ, মহেন্দ্র-সদৃশানুভাবেন অনেন রাজর্ষিণা।"

স্বর্গের পরিণত-হৃদয়া অপ্সরা হইলেও কিন্তু, এখন তাঁহার হৃদয় পূর্ব্ব-সংস্কার-বর্জ্জিত। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তাবৎ বৃত্তান্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। চিত্রলেখার আশ্বাস-বাণীতে, একবার মহেন্দ্রের কথা,—যিনি চিরদিন উর্ব্বশীর সুখ-দুঃখের সাথী, সেই অমরেশ্বরের কথা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাও ভুলিলেন, চিত্রলেখা কথিত 'মহেন্দ্রতুল্য-প্রভাবশালী রাজর্ষি'—এই ঝঙ্কারে, তাঁহার মহেন্দ্রভাবনা, সেই মহেন্দ্র-কল্প রাজর্ষির উপর ন্যস্ত হইল। তিনি ভাবনান্তর-শূন্য-চিত্তে রাজার দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার সেই শান্ত-নির্ম্মল হৃদয়, রাজ-দর্শন-লব্ধ প্রীতিতে একবারে ভরিয়া গেল। মূর্চ্ছাপগমে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, তিনি, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন উৎসবময় জগৎ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সর্ব্বচিন্তা-বিমুক্ত হৃদয়, রাজর্ষি-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন, 'দানব আমার পরম উপকার করিয়াছে [১]।'

স্বর্গের সর্ব্বোত্তমা অপ্সরাকে মর্ত্তবাসীর উপর অনুরক্ত করিতে হইবে, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতির আকিঞ্চনেও যাহার হৃদয় স্থির-ধীর, তাঁহার সেই হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতে হইবে, তাই মহাকবি, উর্ব্বশীকে মূর্চ্ছিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই দিব্য কান্তি, দিব্য যৌবন—সমস্তই ছিল, সে দিব্য হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ ছিল, ছিল না কেবল সেই দিব্য লোকের স্মৃতি। তাহা থাকিলে, উর্ব্বশী কদাচ একপদে পুরূরবাময় হইতে পারিতেন না। উর্ব্বশীর মূর্চ্ছা সৃষ্টি করিয়া,মহাকবি যেন বিধাতৃসৃষ্টিকেও পরাস্ত করিলেন।

রাজর্ষি পুরূরবা, সেই মূর্চ্ছিত প্রতিমাকে, একবার পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন, এখন আবার সেই স্বর্ণপ্রতিমার প্রাণসংযোগ হইতেছে, তাহাও দেখিতে লাগিলেন। তার পর—ক্রমে, সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু, প্রতিষ্ঠানপতি পুরূরবাকে, মহাকবি কালিদাস, একটি একটি করিয়া,

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ১অঙ্ক। উর্ব্বশী। "রাজানং বিলোক্য। আত্মগতং। 'উপকৃতং খলু দানবৈঃ।'

উর্ব্বশীর শান্তহৃদয়ের স্তরগুলি দেখাইলেন। সে এক নিরুপম দৃশ্য! উর্ব্বশীর প্রতিকথায়, প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে, রাজার মনে এক একটা নূতন ভাব জাগরূক হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা, উভয়ে, উভয়ের সৌন্দর্য্যে, উভয়ের ভাবনায় ডুবিয়া গেলেন। এমন সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার সম্মতিক্রমে, তিনি, উর্ব্বশী প্রভৃতিকে লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়, উর্ব্বশীর কণ্ঠ-মালা লতা-বিটপে সংসক্ত হইল, তিনি সেই মালা মোচন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া সাধ মিটাইয়া, আর একবার সেই 'উর্ব্বীতল-শীতল-দ্যুতি' পুরূরবাকে দেখিয়া লইলেন। হার মোচন আর হইল না! তিনি তখন অন্যমনস্কভাবে, চিত্রলেখাকে বলিলেন, 'সখি! তুমি ইহাকে মোচন কর।' চিত্রলেখা উর্ব্বশীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'উর্ব্বশি! বড়ই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে, ইহা মোচন করা আমার কর্ম্ম নয়, আমার মনে হয়, কখনও ইহার মোচন হইবে না[১]।' কিঞ্চিদ্ দূরবর্ত্তী রাজর্ষি পুরূরবাও এই অবসরে, সেই 'অরাল-নেত্রা' 'পরিবৃত্তার্দ্ধমুখীকে' আর একবার দেখিলেন। রাজা ও উর্ব্বশীর প্রথম সন্দর্শন এইভাবে সমাপ্ত হইল।

মহাকবি, স্বর্গের ললনাকে মর্ত্তের অধিবাসীর প্রতি অনুরক্ত করাইয়া দেখাইলেন যে, মর্ত্তেও স্বর্গের কমনীয় বস্তু আছে, থাকিতে পারে। রাজর্ষি পুরূরবার সৌন্দর্য্য অপাপ-বিদ্ধ, হৃদয়ে অগাধ-স্নেহ, তাই তাহা স্বর্গ-বিলাসিনীরও প্রার্থনীয় হইল। যদি উভয়ের হৃদয় অনাবিল এবং নিষ্পাপ হয়, বিধাতার কৃপায় যদি উভয় হৃদয়েই উভয়ের জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে, তবে, তাহা স্বর্গ, অথবা স্বর্গাদপি রমণীয়তর। তাই দানবহস্ত-মুক্তা উর্ব্বশী রাজার গুণ-রাশিদ্বারা পুনরায় আবদ্ধ হইলেন।

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ১ম অঙ্ক, উর্ব্বশী। অহো! লতাবিটপে মৈকাবলী লগ্না। চিত্রলেখে। মোচয় তাবদেনাম্। —চিত্রলেখা। সস্মিতম্। দৃঢ়ং খলু লগ্না। দুর্মোচনীয়েব প্রতিভাতি।'

সপ্ত-চত্বারিংশ অধ্যায়।

অভিশপ্তা

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর, যখন উর্ব্বশী বুঝিলেন যে, ইনিই আমার ত্রাণ-কর্ত্তা এবং প্রাণ-দাতা, তখন তাঁহার কোমল নারীহৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইল, এক অনুপমভাবে মগ্ন হইল। এমন সময়ে, ধীরে ধীরে, সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, কবি, অনুরাগের অরুণ-রেখা, অতি সন্তর্পণে অঙ্কিত করিলেন। প্রথমতঃ, মূর্চ্ছারূপী মহাপ্রলয়ে, যেন, উর্ব্বশীকে বিলুপ্ত করিয়া পরে—মূর্চ্ছাপগমে, নবচৈতন্যের দ্বারা নূতন উর্ব্বশীর গঠনপূর্ব্বক, সৌন্দর্য্যস্রষ্টা মহাকবি, সেই নবীন ললনার নবীন, অনন্য-পরায়ণ, অন্তঃকরণে নূতন প্রণয়ালোক জ্বালিয়া দিলেন। তামসী নিশার অবসানে প্রাণী যেমন উষার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, প্রভাতের বিমুক্ত সমীরণে গাত্রনির্ব্বাণ লাভ করে, তদ্রূপ, উর্ব্বশীও তাঁহার তমোময়ী মূর্চ্ছার অবসানে, নবীন প্রভাতে যেন নবজীবন লাভ করিয়া, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন স্বর্গের দর্শন পাইলেন। মহাকবির এই নূতন স্বর্গের নিকটে, মহেন্দ্রের সেই পুরাতনী অমরাবতীও তুচ্ছ! উর্ব্বশী অবশ-হৃদয়ে, যেন কাহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে, সেই নূতন স্বর্গে প্রবেশ করিলেন।

চিত্ররথ যখন তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন, তখন, তাঁহার বাহ্য দেহ—স্থূল দেহ গেল বটে, কিন্তু তাঁহার আন্তর দেহ—সূক্ষ্ম দেহ ঐ লতাবিটপে সংলগ্ন হইয়া, চিরদিনের মত, মর্ত্তে মহীপতি পুরূরবার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

উর্ব্বশী স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ ত মর্ত্তে রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি অধিক দিন স্বর্গবাস করিতে পারিলেন না! সত্বরই তাঁহাকে মর্ত্তলোকে আসিতে হইল। মনই স্বর্গ, মনই নরক। যদি মনের মত বস্তু লাভ হয়, তবে, আর স্বর্গের প্রয়োজন কি?

বিশেষতঃ, কবির স্বর্গ কবির সৃষ্ট পাত্রের হৃদয়। কবি স্থূল স্বর্গ অপেক্ষা সূক্ষ্ম স্বর্গরূপী মানুষের হৃদয়কে অধিক ভাল বাসেন। তাই, তিনি, স্থূল-স্বর্গ-বাসিনী উর্ব্বশীকে পুরূরবার সূক্ষ্ম-স্বর্গ-রূপী হৃদয়ের অন্বেষণের নিমিত্ত, আবার মর্ত্তের দিকে লইয়া আসিলেন। উর্ব্বশী যখন মর্ত্তে আসেন, তখন পথিমধ্যে, আকাশে চিত্রলেখার সহিত দেখা হইল। উর্ব্বশী ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলেন, 'সখি! চলিয়াছি ত, আবার কোনও অসুরে বাধা না জন্মায়!' একবার, সেই যখন অলকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন, দুরন্ত দানব কেশী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, রাজা পুরূরবা সে যাত্রায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই পুরূরবার উদ্দেশেই যাইতেছেন, আবার যদি পথিমধ্যে কোন বিপদ্ ঘটে, তবে কে রক্ষা করিবে? তাহা হইলে ত, যাঁহার জন্য স্বর্গ-রাজ্য-পরিত্যাগ, তাঁহার সন্দর্শন আর ঘটিবে না। তাই উর্ব্বশী, ব্যাকুলপ্রাণে, চিত্রলেখার শরণ লইলেন। মুগ্ধ-হৃদয়ার মনে ছিল না যে, নির্ঝরিণী যখন সিন্ধুর উদ্দেশে বাহির হয়, তখন, পাহাড়, পর্ব্বত—কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না।

উর্ব্বশীর মূর্চ্ছার সময়ে রাজা তাঁহাকে দেখিয়াছেন; তার পর, লতা-বিটপলগ্না একাবলীর বিমোচন-কালে, আবার রাজা তাঁহাকে দেখিয়াছেন; মধ্যে, উর্ব্বশীর সহিত, কখনো বা চিত্রলেখার সহিত, রাজার কথাবার্ত্তাও হইয়াছে। কিন্তু উর্ব্বশীর ভাগ্যে ত তাহা ঘটে নাই। প্রথমতঃ ত্রাস, তারপর মূর্চ্ছা, পরে যদি বা মূর্চ্ছাপগম হইয়াছিল, কিন্তু আতঙ্কে প্রাণ তখনও আকুল ছিল, তার পর যখন সময় আসিল, তখনই হঠাৎ বিঘ্নরূপী চিত্ররথ আসিয়া, তাহা নষ্ট করিলেন। রাজার নিকট হইতে উর্ব্বশীকে লইয়া তিরোহিত হইলেন! প্রকৃতপক্ষে, উর্ব্বশী, বিশেষভাবে রাজাকে দেখিতে বা রাজ-হৃদয়ের প্রণয়-গতির বৈচিত্র্য উপলব্ধ করিতে অবসর পান নাই। তাই কবি, এবার উর্ব্বশীকে অন্তরালবর্ত্তিনী করিয়া, উর্ব্বশী-হৃত-চিত্ত রাজার তদানীন্তন অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন।

সুন্দর বসন্ত কাল। সমস্ত বনভূমি উল্লাসময়ী। বিরহখিন্ন রাজা পুরূরবা, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কিয়ৎকালের জন্য, একবার সেই সকৃদ্ দৃষ্টা উর্ব্বশীর চিন্তা করিতে প্রমদ-বনে আসিয়াছেন। সেই উপবনে একটি মাধবী-লতা-মণ্ডপ আছে, নীলকান্তমণিরাশির দ্বারা তাহার মধ্যস্থল বিমণ্ডিত। উন্মত্ত ভ্রমরের চরণ তাড়নে লতাকুঞ্জ হইতে রাশি রাশি কুসুমের বৃষ্টি হইতেছে, আর উর্ব্বশী-বল্লভ রাজা পুরূরবা, সেই স্থানে তাপিত হৃদয়ের শান্তি-কামনায় উপবেশন করিয়া আছেন। সঙ্গে নিত্য সহচর বিদূষক। যে স্থানে প্রবেশমাত্রে, হৃদয়ে কত পুরাতন কথা জাগিয়া উঠে, জীবনের সকল স্বপ্নের কাহিনীই একটি একটি করিয়া মনে পড়ে, বিরহী পুরূরবা তাদৃশ উদ্দীপক স্থানে উপনীত। ঔষধ-ভ্রমে তিনি কুপথ্য-সেবনে উদ্যত। তাঁহার রাজ-কার্য্য-ব্যাকুল অন্তঃকরণে, যে অনল স্ফুলিঙ্গাকারে ছিল, এক্ষণে, তাঁহার ভাবনান্তর বিমুক্ত হৃদয়ে সেই অনল প্রচণ্ড দাবানলের আকার ধারণ করিল। ইহ জন্মে আর উর্ব্বশীর সহিত দেখা হইবে না—ভাবিয়া, রাজা কত বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত একান্ত অধীর হইয়াছে। পার্শ্বে উর্ব্বশী দণ্ডায়মানা। তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে, তিনি লোক-নয়নের অদৃশ্যা। তিনি রাজার সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছেন, সমস্ত কথা শুনিতেছেন। পূর্ব্বে—সেই প্রথমবারে, উর্ব্বশীর যে আশা অপূর্ণ ছিল, এবার তাহা পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। রাজার কাতরতাদর্শনে, কোমল-প্রাণা উর্ব্বশীর আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি অগ্রে মেনকাকে রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরেই, মেনকা উর্ব্বশীর নিকটে যাইয়া যখন বলিল যে, রাজার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তিনি উন্মত্তপ্রায়, তখন উর্ব্বশীর আর জ্ঞান রহিল না। তিনি অনেক প্রয়াসে, চিত্ত স্থির করিয়া, দিব্য কান্তি-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক, ব্যগ্রভাবে পুরূরবার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আকাঙ্ক্ষিত-লাভে তাঁহারা উভয়েই পরম প্রীত হইলেন। কবি এই ভাবে, দ্বিতীয়বার রাজার সহিত উর্ব্বশীর মিলন

করাইলেন। পুরাণ-কর্ত্তৃগণ, এই সকল স্থলে, যে সমুদয় সুদীর্ঘ ঘটনার বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাস অতি কৌশলে, তাহা সংশোধিত করিয়া লইলেন।

উর্ব্বশী রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র, ইতিমধ্যেই স্বর্গ হইতে দেবদূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহর্ষি ভরত লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, দেবরাজ-সভায় তাহার অভিনয় হইবে, উর্ব্বশীকে সেই অভিনয়ে অভিনেত্রী সাজিতে হইবে, সুতরাং এখনই স্বর্গে প্রস্থান আবশ্যক! উর্ব্বশীর তথা উর্ব্বশীবল্লভ পুরূরবার হৃদয়, এ সংবাদে ভাঙ্গিয়া গেল। উর্ব্বশী, তাঁহার সেই ভগ্ন হৃদয় খানি, যেন রাজার চরণ-প্রান্তে ন্যাসবত্ গচ্ছিত রাখিয়া, দেবেন্দ্রের অপরিহার্য্য আদেশে, শূন্য-মনে স্বর্গযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্ব-সম্ভূত হৃদয়ানল এবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হইলে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। রাজার উর্ব্বশী-দর্শন-বাসনাও অত্যন্ত বলবতী হইল। মহাকবি, এইভাবে রাজা এবং উর্ব্বশীর প্রণয়ের ক্রমস্ফূর্ত্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক, শেষে এক অনির্ব্বচনীয় চিত্রের অঙ্কন করিয়া, সামাজিকদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ এবং রস-সাগর-নিমগ্ন করিয়াছেন।

কবি, তৃতীয় অঙ্কে, রাজা, বিদূষক ও প্রধান মহিষী দেবী ঔশীনরীকে এক মণিময় প্রাসাদে সমবেত করিয়াছেন। দেবী ঔশীনরী কাশী-রাজের দুহিতা, উদার-হৃদয়া; তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহারাণী একটি বড় ব্রত লইয়াছিলেন, আজ তাহার উদ্যাপনের দিন। ব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন।' এ দিকে, উর্ব্বশী, ভরতমুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, স্বর্গরাজ্য হইতে মর্ত্তে আসিয়াছেন। সঙ্গে চিত্রলেখা। তাঁহারাও উভয়ে ঐ 'মণিপ্রাসাদে' উপস্থিত। তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অদৃশ্য। রাজার নিকটে দেবীর উপস্থিতি-দর্শনে উর্ব্বশীর হৃদয় অবসন্ন

হইল। তাঁহার স্বর্গ-রাজ্য-স্খলন হইয়াছে, এখন বুঝি, মর্ত্তে যে স্থানটুকু ছিল, তাহাও যায়,—ভাবিয়া, তিনি, দুঃখে, বেদনায়, অবসাদে, একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন।

যখন মহিষী প্রবেশ করিলেন, এবং রাজা ক্ষিপ্রভাবে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসনে বসাইলেন, তখন উর্ব্বশী এক দৃষ্টে, সেই সৌভাগ্যবতী মহিষীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, স্বর্গের শচী অপেক্ষাও যেন এই মর্ত্তের রাণী অধিকতর ওজস্বিনী[১]। রাজা ও রাজ্ঞীর কত কথাবার্ত্তা হইল। উর্ব্বশী উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সে সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এইক্ষণ, দেবীর কথোপকথন শ্রবণে তাহা বিদূরিত হইল। দেবী যখন কথাপ্রসঙ্গে বিদূষককে বলিলেন যে, মূঢ়! তুমি জাননা যে, আমি আমার স্বামীর সুখের জন্য, আমার নিজের সমস্ত সুখ, অম্লান-বদনে বিসর্জ্জন দিতে পারি; স্বামীর সুখসম্পাদন ব্যতীত আমার অন্য কোনও প্রিয় কার্য্য নাই; তখন অন্তরাল-বর্ত্তিনী উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে বলিয়াছিলেন, 'সখি! যাঁহার এমন ভার্য্যা, আর যিনি এতাদৃশী দেবী রমণীর স্বামী, আমি তাঁহাকে, কেন কামনা করিলাম? হায়! আমার হৃদয় এখন আর আমার নাই, আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস বৃথা[২]!'

দেবী পরিচারিকা সমভিব্যাহারে, নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা উর্ব্বশীময় চিত্তে আবার কত আশার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একবার এইরূপ প্রমোদ-বনে উর্ব্বশী আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, আর কি তেমন হইবে?

১—বিক্রমোর্ব্বশী ৩য় অঙ্ক। উর্ব্বশী। 'হলা, ইয়ং স্থানে দেবীশব্দেন উপচর্য্যতে।
ন কিমপি পরিহীয়তে শচ্যা ওজস্বিতয়া॥'

২—ঐ। দেবী। অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেন আর্য্যপুত্রং নির্বৃ তশরীরং কর্ত্তু মিচ্ছামি।
এতাবতা চিন্তয় তাবৎ, প্রিয়ো নবেত্তি?

—উর্ব্বশী। 'হলা! প্রিয়কলত্রো রাজর্ষিঃ। ন পুনর্হৃদয়ং নিবর্ত্তয়িতুং শক্নোমি।'

এইরূপে—রাজা সেই অতীত সুখের মুহূর্ত্ত ভাবিতেছেন, এমন সময়ে, ছায়াময়ী উর্ব্বশী স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক, রাজার পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আসিয়া, করপল্লবে, তাঁহার নয়ন আবরণ করিয়া ধরিলেন। বহুকাল পরে উভয়ের আবার মিলন হইল।

অষ্ট-চত্বারিংশ অধ্যায়।

লতাময়ী উর্ব্বশী।

অনেক দিন হইল, উর্ব্বশী অপ্সরাদিগের দল ছাড়িয়া মর্ত্তে আসিয়াছেন। রাজা পুরূরবা তাঁহার সমাগমে যেন কৃতকৃতা হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যই যেন পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি অমাত্যগণের উপর বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া, উর্ব্বশীর আকাঙ্ক্ষানুসারে, তাঁহার সহিত, কৈলাসপর্ব্বতের শিখরোদ্দেশবর্ত্তী গন্ধমাদন বনে চলিয়া গিয়াছেন। উর্ব্বশী উর্দ্ধতন প্রদেশের অধিবাসিনী, অধোদেশবর্ত্তিনী পৃথিবীর জন-কোলাহলময় স্থান তাঁহার রুচিকর নহে। তাই তিনি, তাঁহার চিরপরিচিত প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। চন্দ্রবংশ. অবতংস, মহীপতি পুরূরবা, উর্ব্বশীর জন্য, আপন কর্ত্তব্য রাজ্য-পালন বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজার পবিত্র ধর্ম্মে অবহেলা করিয়া, তিনি রাজধানী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

মহাকবি, অতিকৌশলে প্রতিপাদন করিলেন যে, যাঁহার হৃদয় একবার স্খলিত হইয়াছে, তাঁহার পতন যে কতদূরে শেষ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। উর্ব্বশী রাজার জন্য, চিরানন্দময় স্বর্গরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। রাজাও উর্ব্বশীর জন্য স্ব-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় কোন্ পার্ব্বত্য অরণ্যে আশ্রয় লইলেন। উভয়েরই ত্যাগ-স্বীকার অদ্ভুত। উর্ব্বশী বাসনার প্রতিমূর্ত্তি। বাসনার ধর্ম্ম এই যে, সে সৌধগাত্রে বটবৃক্ষবৎ অঙ্কুররূপে প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়া, পল্লবিত হইতে হইতে, ক্রমে তাহার আশ্রয়কেই একবারে আত্ম-সত্তায় আবৃত করিয়া ফেলে, সে আশ্রয়ের আর পৃথগস্তিত্ব রাখে না। রাজা পুরূরবারও এখন সেই অবস্থা। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে উর্ব্বশীময়। তাঁহার পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং সে অবস্থায়, তাঁহার পক্ষে, রাজধানীতে অবস্থান বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহা এখন

রাজধানী আর অরণ্য, উভয়ই তুল্য। উর্ব্বশী-বিহীন নগর তাঁহার পক্ষে মহারণ্যকল্প, আবার উর্ব্বশীযুক্ত অরণ্যানী তাঁহার নয়নে জনস্রোতোময়ী মহানগরীর তুল্য।

কৈলাস-শিখর-বর্ত্তিনী গন্ধমাদন-বনভূমির প্রান্তবাহিনী মন্দাকিনীর তীরে, একদিন রাজা ও উর্ব্বশী ভ্রমণ করিতেছিলেন, আর দূরে মন্দাকিনী-সৈকতে উদকবতী-নাম্নী এক বিদ্যাধর-দারিকা সিকতার ক্রীড়া-পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া খেলিতেছিল। রাজর্ষি পুরূরবা, একবার মুহূর্ত্তের জন্য, সেই কন্যার অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতেই উর্ব্বশীর অভিমান জন্মে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী 'কুমারবন' নামক প্রসিদ্ধ অরণ্যে অভিমান-ভরে প্রবেশ করেন ভরতের অভিশাপে উর্ব্বশী মানুষী হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে গন্ধর্ব্বজন-সুলভ স্মৃতি পর্যান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। কুমারবনে কন্যার প্রবেশ নিষিদ্ধ—একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। উর্ব্বশী যেমন সেই প্রতিষিদ্ধ-প্রবেশ কুমার বনে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি অভিমানিনী উর্ব্বশীর সেই অমরপ্রার্থিত রূপরাশি নিমেষমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। তিনি সেই কাননের উপান্তবর্ত্তিনী এক লতার রূপে পরিণত হইলেন।

তিনি প্রথম ছিলেন স্বর্গের প্রধান অপ্সরা, হইলেন মানুষী, কিন্তু তাহাও তাঁহার রহিল না। শেষে একবারে, অচেতন লতার আকার ধারণ করিলেন। একবার যাহার পরিভ্রংশ ঘটে, তাহার চরম পরিণতি যে কোথায়—কত দূরে, বোধ হয়, তাহা বিধাতারও অনির্দ্দেশ্য।

কালিদাস—এই স্থলে, দুইটি চরিত্রের দুই প্রধান অংশ প্রদর্শন করিলেন। প্রথমে রাজার চরিত্র। রাজা ঔশীনরীর ন্যায় দেবী সহধর্ম্মিণীকে অনাদর করিয়া, উর্ব্বশীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা আদর্শ রাজচরিত্র নহে। পরে আবার, সেই উর্ব্বশী,—যাঁহার জন্য, রাজা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য—সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, দূর গন্ধমাদন-বনে চলিয়া

[৩] চৈত্রের উর্ব্বশী

Mohila Press, Calcutta.

গিয়াছেন—সেই উর্ব্বশীর সমক্ষে আবার, অন্য এক বালিকার প্রতি অনুরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। এ সমস্ত পুরূরবার রাজোচিত—চন্দ্রবংশীয় প্রধান পুরুষোচিত কার্য্য হয় নাই। কবির এই চিত্রে দেখিতেছি যে, একবার মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইলে, পরে আর হৃদয়ের বন্ধন থাকে না। বন্ধন রাখা যায় না। বন্ধনচ্যুত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। তাহার অশেষ দুর্গতি ঘটে।

আর উর্ব্বশী—তাহার জন্য রাজা রাজসিংহাসন ছাড়িয়াছেন, রাজ্য-সুখ ছাড়িয়াছেন, এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাজ্য দেবী ঔশীনরীকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছেন। আজ সেই উর্ব্বশী, রাজার সামান্য ত্রুটিতে অম্লান-হৃদয়ে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অভিমানভরে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। কোথায় ঔশীনরী, আর কোথায় উর্ব্বশী! উভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ঔশীনরী তাঁহার প্রিয়তম পুরূরবার চিত্ত-প্রসাদনের জন্য, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে বস্তুই আমার প্রিয়তমের প্রার্থনীয় হইবে, আমি তাহা অনুমোদন করিব। এমন কি, যদি অন্য কোন রমণীকেও তিনি তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের রাণী করিতে চাহেন, তবে তাহাও আমার সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। তাহার সুখই আমার সুখ, তদতিরিক্ত সুখ আমার অভিপ্রেত নহে। রাজা পুরূরবা এমন দেবীকে যাঁহার জন্য উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই উর্ব্বশীর আজ এই ব্যবহার। অদ্ভুত প্রতিদান!

কুমারবনে যদি কখন কোন কন্যকা প্রবেশ করিতেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ বনের লতারূপে পরিণত হইতেন। গৌরী-'চরণ-রাগ-সম্ভব' 'সঙ্গমমণির' স্পর্শ ব্যতীত, ঐ লতাময়ী কন্যকার আর উদ্ধার হইত না। উর্ব্বশী অভিমান-ভরে সেই বনে প্রবেশ করিয়া লতাময়ী হইয়া আছেন। এ দিকে রাজা উন্মত্ত। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত। তিনি সেই বনের কুঞ্জে কুঞ্জে, লতায় লতায়, তন্ন তন্ন করিয়া উর্ব্বশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক পরে রাজগৃহীত

'সঙ্গমমণি'-স্পর্শে উর্ব্বশীর উদ্ধার হইল। রাজা, একদিন, উর্ব্বশীর জন্য উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছেন, লতায় পাতায় উর্ব্বশীকে খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে এক অতি সমুজ্জ্বল মণি দেখিতে পাইলেন অমনি অপ্রবুদ্ধভাবে সেই মণি কুড়াইয়া লইয়া, তাহাকে কত আদর করিলেন, কত কথা কহিলেন। তাঁহার উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু মণি কোনই উত্তর দিল না। তখন ক্রোধোন্মত্ত নরপতি, সেই মণিটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন, মণি যাইয়া এক লতার উপরে পতিত হইল। অমনি দেখিতে দেখিতে, সেই লতা হইতে রাজার সেই অভিমানিনী উর্ব্বশী, হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন। কুসুম সম্ভারে তাঁহার দেহ-লতিকা সুসজ্জিত, হস্তে কুসুমের গুচ্ছ, কণ্ঠে কুসুমের স্রক্। যেন কুসুমময়ী বন দেবতা, উন্মত্ত নৃপতিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, সহসা লতাদেহ পরিহার করিয়া, মানুষীরূপে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন।

উর্ব্বশী রাজার সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। রাজার উন্মাদ দূর হইল। অনেক দিন প্রতিষ্ঠান নগরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন, রাজার সেদিকে লক্ষ্যই নাই। আজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, উর্ব্বশী বলিলেন, 'আর এখানে থাকা ভাল নহে, প্রকৃতি-পুঞ্জ হয় ত, ক্রমে আমার উপর অসূয়া-পরবশ হইয়া উঠিবে! অতএব চল সাজন্, প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যাই।' রাজার ত আর পৃথক সত্তা ছিল না, তিনি অমনি বলিলেন—'যদাহ ভবতী'—যাহা বল, অর্থাৎ 'চল।' কোথায় কৈলাসশিখরে গন্ধমাদন বন? আর কোথায় কত দূরে, প্রয়াগোপকণ্ঠবর্ত্তিনী সেই প্রতিষ্ঠান নগরী? যখন আসিয়াছিলেন, তখন রাজা এবং উর্ব্বশী—উভয়েই একটা বিষম উন্মাদের অধীন ছিলেন, একটা অপরিচ্ছেদ্য মোহে বিমুগ্ধ ছিলেন। তখন গন্তব্যস্থানের দূরত্ব চিন্তার তাঁহাদের অবসরই ছিল না,

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ৪র্থ অঙ্ক। উর্ব্বশী। 'মহান্ খলু কালস্তব প্রতিষ্ঠানাৎ নির্গতস্য অসূয়িষ্যন্তি মাং প্রকৃতয়ঃ। তদেহি নিবর্ত্তাবহে।'

বা সে চিন্তার উদয়ও হয় নাই। মোহে যখন টানিয়া লইয়া যায়, তখন 'কোথায় যাইতেছি'—এ জ্ঞান থাকে না। এখন মোহ অনেকটা কাটিয়াছে, সে তন্দ্রা, সে অবশতা আর তেমনটি নাই, আর তাহা থাকেও না। থাকিলে কখন আজ উর্ব্বশীর মনে একথা জাগিত না, যে, অনেক দিন রাজা রাজধানীতে অনুপস্থিত, ইহা আমার পক্ষে মঙ্গল-জনক নহে।

উর্ব্বশী রাজাকে লইয়া আসিয়াছেন, নতুবা রাজার এত দূরে, এ অগম্য স্থানে আসিবার সামর্থ্য ছিল না। আজ ফিরিয়া যাইতে হইবে,—ইহাতেও রাজার সামর্থ্য নাই। রাজা শূন্য-নয়নে উর্ব্বশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উর্ব্বশী কহিলেন, 'মহারাজ! কি উপায়ে আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহেন?'—রাজা বলিলেন 'খেল-গমনে! তুমি মেঘময়ী হও, আমি সেই মেঘযানে প্রতিষ্ঠানে যাত্রা করি।' কামরূপিণী উর্ব্বশী 'আচ্ছা' বলিয়া মেঘের আকার ধারণ করিয়া রাজাকে লইয়া, সেই কৈলাস-শিখর হইতে, আকাশপথে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত দিন, তবুও, রাজা এবং উর্ব্বশী দুইজনের অন্তত: নামতঃ একটা পৃথগ্‌ভাব ছিল, আজ উভয়ে একবারে সত্যসত্যই এক হইয়া গেলেন।

মহাকবি, বিশ্বকর্ম্মার বিচিত্র বিশ্বের কোন পদার্থে তাঁহার নায়ক নায়িকার যান প্রস্তুত করিলেন না। তিনি, বিশ্বাতীত এক নূতন পুষ্পকে রাজাকে লইয়া আসিলেন। যখন কবির এই বিরাট্ সৃষ্টির কথা মনে ভাবি, তখন বিস্মিত হই, কবির বিচিত্র-সৃষ্টি-কৌশল দর্শনে স্তম্ভিত হই। নিম্নে বিশাল ধরণী, 'সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা' বসুধা, আর উর্দ্ধে মেঘময়ী প্রিয়তমার আশ্রয়ে সঞ্চরমাণ রাজা, এ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কালিদাসের এই গ্রন্থে, এই যে বিচিত্র কল্পনার উন্মেষ দেখিতেছি, ইহাই, মনে হয়, তদীয় রঘুবংশের ত্রয়োদশে, রাম-সীতার আকাশপথে অযোধ্যাগমনের বর্ণনে পরিপক্কভাব ধারণ করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, কিয়ৎকাল অতিবাহনের পর, যখন

উর্ব্বশী জানিলেন যে, তিনি তাঁহার যে সদ্যোজাত সন্তানকে রাজার অজ্ঞাত-সারে, চ্যবনাশ্রমে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সেই পুত্র এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি, ইন্দ্রের আদেশ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন! ভরতের অভিশাপের পর, ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'যাও উর্ব্বশী! যত দিন রাজা পুরূরবা তোমার পুত্রের মুখ না দেখিবেন, তত দিন তুমি মর্ত্তে থাকিও; রাজা যখন তোমার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া আসিও।' সুতরাং আজ উর্ব্বশীর মর্ত্তবাস শেষ হইল। উর্ব্বশী চলিয়া যাইবেন। সমস্ত রাজধানী বিষাদে মগ্ন। এমন সময়ে, হঠাৎ নারদ ইন্দ্রের আদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র নারদমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, 'উর্ব্বশীর আর স্বর্গে আসিয়া প্রয়োজন নাই, সে মর্ত্তেই থাকুক। পুরূরবা আমার পরম সুহৃদ্, তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিবে।' উর্ব্বশীর আর যাইতে হইল না। তিনি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—

'অম্ম হে! সল্লং বিঅ হিঅআদো অবনীদং!' 'আহা! আমার হৃদয়ের শল্য যেন অপনীত হইল। উর্ব্বশী পুত্রোৎসঙ্গবতী হইয়া হর্ষিত-হৃদয়ে, পুরূরবার পার্শ্বে চিরস্থায়িনী হইলেন। চপলা এত দিনে অচলা হইল। উর্ব্বশীকে আর স্বর্গে গমন করিতে হইল না। আর তিনিও, পুরূরবা যে স্বর্গে নাই, সে স্বর্গে যাইতে ভ্রমেও বাসনা করিলেন না।

মহাকবি কালিদাসের সৃষ্ট এই উর্ব্বশী-চরিত্রে দেখিলাম, মানুষের হৃদয়,—স্বর্গ-নরক উভয়ই গঠন করিয়া লইতে পারে। উর্ব্বশী বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে মর্ত্তেও স্বর্গসুখ পাইয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রের অমরাবতী, মন্দাকিনীসৈকত, নন্দনবন, কল্পপাদপ, সব ভুলিতে পারিলেন। যদি মনের মত মানুষ পাওয়া যায়, তবে পৃথিবীই স্বর্গ, অন্যথা জগৎ নরকাধিক ভীষণ, দুঃসহ-যাতনাময়।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুরূরবার উন্মাদ।

পুরূরবা চন্দ্রবংশের অবতংস, সসাগরা ধরণীর অধিপতি। স্বর্গের যেমন ইন্দ্র, মর্ত্তের তেমন পুরূরবা। তাঁহার অমিত পরাক্রম। স্বয়ং সুরনাথ, অসুর-দমন-মানসে, প্রায়ই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার হৃদয় দয়ার নির্ঝর-স্বরূপ। আর্ত্তত্রাণে তিনি সতত সমুদ্যত-কার্ম্মুক। তিনি সূর্য্যের উপাসনান্তে, যখন শূন্যপথে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, তখন দূরে রমণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে অগ্রসর হইয়া সখী-মুখে উর্ব্বশীর বিপদের বার্ত্তা বিদিত হইয়াই, অসুরের কবল হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। উর্ব্বশীর উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে যে পতিত হইলেন, ইহা তখন বুঝিতে পারেন নাই। অথবা তিনি কেন, পৃথিবীতে এমন অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন, যাঁহারা, যথাসময়ে, আত্মপতন বুঝিতে পারেন। তিনি প্রাণ দিয়া উর্ব্বশীকে ভাল বাসিয়াছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা রাজার হৃদয় সর্ব্বসাকল্যে অপহরণ করিয়াছিল। রাজার অগাধ-প্রেমপূর্ণ অন্তঃকরণ যখন উর্ব্বশীর দিকে হেলিয়া পড়িল, তখন উর্ব্বশী ত্রিলোক-প্রার্থিত স্বর্গের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যদি সত্য সত্যই প্রাণ দিতে পারা যায়, তবে এমন কেহই নাই, যাহাকে আপন করা না যায়। রাজা সমস্ত প্রাণটা উর্ব্বশীর জন্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন, উর্ব্বশীও তাঁহার 'আপনার' হইলেন। মহাকবির অনুকম্পায় দেখিলাম, আত্মোৎসর্গে অসম্ভবও সম্ভব হয়, দেবতাকেও মানুষের মত ঘরে বাঁধিয়া রাখা যায়।

কবি, রাজাকে, প্রথম প্রথম উর্ব্বশীর, নিকটে অধিকক্ষণ রাখেন নাই। প্রথমবার ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতেই চিত্ররথ আসিয়া, উর্ব্বশীকে লইয়া গেলেন। রাজার দুঃখের আর অবধি রহিল না। দ্বিতীয় বার,

যখন রাজা উর্ব্বশী-বিরহে অতীব কাতর, তখন যদিও কবি উর্ব্বশীকে একবার রাজার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও অতি অল্পকালের জন্য। উর্ব্বশী আসিতে না আসিতেই, স্বর্গের দেবদূত আসিয়া, লক্ষ্মী-স্বয়ংবর-অভিনয়ের জন্য, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। এবারেও, রাজার ভাগ্যে, পর্য্যাপ্ত-রূপে, উর্ব্বশীদর্শন ঘটিল না। কবি, এইভাবে ধীরে ধীরে, পুরূরবাকে একটু একটু অগ্রসর করিয়া, ক্রমে, একবারে, উর্ব্বশীময় করিয়া তুলিলেন। রাজা প্রতিবারেই ভাবেন যে, আর একবার দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হইবে। তাই আবার দেখেন। অমনি আবার দেখিতে বাসনা জন্মে।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।'

এই মহাসত্যের প্রমাণ, কবি, রাজ-চরিত্রের, প্রতিকার্য্যে দেখাইয়া দিলেন। তার পর, অনেক দিন পরে, যদিও উর্ব্বশীর সহিত, রাজার সাক্ষাৎ-কার হইল, উভয়ে গন্ধমাদনে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহাদের মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। আবার উর্ব্বশীর অভাব ঘটিল তিনি অভিমান-ভরে কোথায় লুকাইলেন। তাঁহার প্রাণ রাজার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, আর প্রাণ-শূন্য উর্ব্বশী অচেতন লতার রূপ ধারণ করিলেন। কবির সকলই অদ্ভুত! আলঙ্কারিকগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, কবিসৃষ্টি 'নিয়তি-কৃত-নিয়ম-রহিতা, অনন্য-পরতন্ত্রা ও হ্লাদৈকময়ী।'

রাজার চরিত্র এতই কোমল যে, তাঁহাকে কতকটা স্ত্রীধর্ম্মাক্রান্ত বলা যাইতে পারে। তিনি এত বড় পৃথিবীর শাসনকার্য্য-ভার মন্ত্রি-পরিষদের উপর ন্যস্ত করিয়া, কেবল আত্ম-প্রসাদ-বাসনায়, উর্ব্বশীর নির্দ্দেশমতে, গন্ধমাদন-বনে চলিয়া গেলেন। ইহা তদীয় রাজ-চরিত্রের অনুকূল হয় নাই। তিনি উর্ব্বশীকে পাইয়া, একপদে, দেবী ঔশীনরীর কথা বিস্মৃত

হইলেন, ইহাও তাঁহার ন্যায় প্রয়ণবান্ ভূপতির উপযুক্ত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় উর্ব্বশীর প্রতি কিরূপ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাই প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, কবিকে ঐ সকল প্রতিকূল চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। ঐ সকল চিত্রের সমালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, পুরূরবার হৃদয়ে এমন একবিন্দু স্থানও ছিল না, যেখানে উর্ব্বশীর প্রভাব প্রবেশ করে নাই। তিনি নামতঃ পুরূরবা, কিন্তু কার্য্যতঃ উর্ব্বশীর ছায়ামাত্র। যখন কুমারবনে উর্ব্বশী লতারূপিণী হইলেন, আর রাজা তাহা না জানিয়া, তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখনকার বৃত্তান্ত সত্য সত্যই পাষাণ-বিদারক! রাজার সে উন্মাদাবস্থার বর্ণনা পাঠ করিলে কাহার নয়ন না অশ্রুভারাপ্লুত হয়? মনে হয়, অমন একাগ্রতা ছিল বলিয়াই তাঁহার জন্য স্বর্গবাসিনী উর্ব্বশী স্বর্গের মায়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারিয়াছিলেম। তাঁহার যে প্রকার হৃদয়, তাহার যদি যৎকিঞ্চিৎ অংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে স্বর্গ ত তুচ্ছ, যদি স্বর্গাধিক অন্য কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহাও পরিত্যাজ্য।

উর্ব্বশী মানভরে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রাজা উন্মত্ত। উর্ব্বশীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত। তিনি কখন বনতরুর কুসুম-কিসলয়ে দেহ বিভূষিত করিয়া, লতা-বেষ্টিত-শুণ্ড করী যেমন বনে করিণীর অন্বেষণ করে, সেই ভাবে উর্ব্বশীব অন্বেষণ করিতেছেন। কখন আকাশে নবজলধর দর্শন করিয়া, তাহাকে, তাঁহার উর্ব্বশীর অপহারক কেশী দানব ভ্রমে, বাণ মারিতে উদ্যত হইতেছেন। কখন বা, ঘন-কৃষ্ণ মেঘ-দর্শনে উন্নত-কণ্ঠ ময়ূর পুচ্ছভার বিস্তার করিয়া কেকারব করিতেছে,—দেখিয়া, উন্মত্ত রাজা, তাহার নিকটে উর্ব্বশীর সন্ধান করিতে যাইতেছেন। কি জানি, যদি ময়ূর উর্ব্বশীকে চিনিতে না পারিয়া থাকে, তাই রাজা তাহাকে বুঝাইতেছেন যে, শুন শিখণ্ডিন্! আমার উর্ব্বশীর বদন মৃগাঙ্ক-সদৃশ, আর সে মরাল-গমনা। ময়ূর

পৃথিবীপতির এই উন্মাদ-দর্শনে যথার্থই কাঁদিয়া ফেলিতেছে। রসাল-শাখায় পরভৃতা বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া, রাজা যুক্তকরে, এক এক বার উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর সে কুহুস্বরে কাননভূমি কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। আকাশে কালো মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া, রাজহংসগণ, মানস-সরোবরে যাইবার জন্য, উৎসুক-হৃদয়ে, কূজন করিতেছে, আর উর্ব্বশী-বল্লভ রাজা, সেই কূজিতকে তাঁহার প্রিয়ার নূপুর-শিঞ্জিত-মনে করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইতেছেন। রাজা উন্মত্ত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার এ উন্মাদের মধ্যেও আবার বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে। উর্ব্বশী মন্থর-গমনা, হংসগণও মন্থর-গতি, রাজার ধারণা, উর্ব্বশীর একটা চিহ্ন যখন হংসশ্রেণীর মধ্যে আছে, তখন উর্ব্বশী-হরণ তাহাদেরই কার্য্য। অমনি তস্করের দণ্ড-দাতা রাজা উর্ব্বশী-তস্করের দণ্ডদানে উদ্যত হইয়াছেন!

দূরে চক্রবাক চক্রবাকী বসিয়া আছে, তাহারা যদি উর্ব্বশীকে দেখিয়া থাকে, এই আশায়, উন্মত্ত পুরূরবা ছুটিয়া তাহাদের দিকে যাইতেছেন, কত অনুনয়-বিনয় করিয়া, উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চক্রবাক 'ক ক' করিয়া ডাকিয়া উঠিল, রাজা ভাবিলেন, পাখী বুঝি তাঁহার পরিচয়-জিজ্ঞাসা করিতেছে তিনি অমনি বলিলেন,—

'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য মাতামহ-পিতামহৌ।
স্বয়ংবৃতঃ পতির্দ্বাভ্যাং উর্ব্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ[১] ॥'

এস্থলেও রাজার উক্তি বেশ শৃঙ্খলা-পূর্ণ। তিনি উর্ব্বশী এবং পৃথিবী উভয়েরই পতি, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে, উর্ব্বশীই তাঁহার প্রধান পত্নী, পরে পৃথিবী, তাই প্রথমেই উর্ব্বশীর নাম।

১—বিক্রমোর্ব্বশী। ৪র্থ অঙ্ক। সূর্য্য যাঁহার মাতামহ এবং চন্দ্র যাঁহার পিতামহ, উর্ব্বশী এবং পৃথিবী যাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তি।

সম্মুখে পদ্ম প্রস্ফুটিত, তাহার মধ্যে ভ্রমর নিষণ্ণ হইয়া, মধুবর্ষী গুণ্-গুণ্ রবে সরসী-বক্ষে কেমন একটা আবেশময় ভাবের আনয়ন করিয়াছে। রাজা সেই 'অন্তঃকণিত-ষট্পদ' পদ্মের দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া আছেন, তাঁহার ধারণা, শতদল বুঝি অস্ফুট কুসুমের ভাষায়, তাঁহার উর্ব্বশীর সন্ধান বলিতেছে।

কখনো 'উর্ব্বশী! উর্ব্বশী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আর রাজা 'উর্ব্বশী' নাম শুনিয়া, সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতেছেন; কিন্তু কোথায় উর্ব্বশী? —অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছেন।

কখনো রাজা, বীচি-মালিনী, বিহগ-শ্রেণি-রশনা, ধবল-ফেন-বসনা, ললিত-গতি, কলবাহিনী, তটিনীর তীরে যাইয়া বসিতেছেন, উর্ব্বশীর ভ্রূ-নর্ত্তন-তুল্য সেই বীচি-বিক্ষোভ, রশনা-তুল্য বিহগ পঙ্ক্তি, ধবল-বসন-সদৃশ ফেন-পুঞ্জ, আর উর্ব্বশীর সেই বিলাস গতিবৎ তটিনীর ললিত গমন প্রভৃতি অনিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, উন্মত্ত নৃপতির ধারণা, তাঁহার উর্ব্বশীই বুঝি, এই নদী-রূপে পরিণত হইয়াছেন, নতুবা নদী এসব সম্পদ্ কোথায় পাইল?

হরিণী তরুচ্ছায়ায় হরিণের ক্রোড়ে নিষণ্ণ, রাজা তথায় উপস্থিত। হরিণীর চকিত-নয়ন-দর্শনে, উর্ব্বশীর সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচনযুগল তাঁহার মনে পড়িল। কত অনুনয় করিলেন,—যদি হরিণ-মিথুন, তাঁহার উর্ব্বশীর কোনও সন্ধান বলিতে পারে[১]।

উন্মত্ত মহীপতি, এইভাবে, বনের প্রতিবৃক্ষে, প্রতিলতায়, উর্ব্বশীর সন্ধান করিলেন। মিলনকালে, উর্ব্বশী একাকিনী ছিলেন, আর এই বিরহকালে তিনি যেন শতমূর্ত্তি হইয়া রাজনয়নে ইতস্ততঃ প্রতিভাত

১—এসমস্তই ৪র্থ অঙ্কে বিবৃত আছে।

হইলে লাগিলেন। রাজা যাহা কিছু দেখেন, তাঁহার মনে হয়, সে সবই যেন তাঁহার উর্ব্বশী। বিরহের এমন সুন্দর চিত্র, উন্মাদের এমন প্রকটচ্ছবি অন্যত্র বিরল।

দয়াবতী বীণাপাণি, তাঁহার কল্পনার অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার বুঝি উন্মুক্ত করিয়া কবির সমক্ষে ধরিয়াছিলেন। কবি, সেই সারস্বতী কল্পনার প্রভাবে, যখন যেটি ধরিয়াছেন, সেইটিকেই তখন সর্ব্বোত্তম করিয়া তুলিয়াছেন। আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর, তরু-লতা-পশু-পক্ষী, বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত—সকলের নিকটে, তাঁহার ব্যথিত-হৃদয়ের জন্য সমবেদনা প্রার্থনা করিতেছেন; তিনি কখনো বসিতেছেন, কখনো কৃতাঞ্জলি-পুটে ভিক্ষা চাহিতেছেন, কখনো বা অগ্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া, সরসী-বক্ষঃ-প্রতিবিম্বিত, তরঙ্গ-চঞ্চল, শতদলের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, প্রিয়া-ভ্রমে, ধরিতে যাইতেছেন। ময়ূর-ময়ূরী, ভ্রমর-ভ্রমরী, হরিণ-হরিণী, করী-করিণী—সব, স্থির-নয়নে, উন্মত্ত নরনাথের কার্য্যাবলী অবলোকন করিতেছে। যেন সমস্ত বনস্থলী একটা বিষম বেদনায় ব্যথিত হইয়া 'অন্তঃস্তম্ভিত-বাষ্পবৃত্তি' হইয়াছে। রাজার আজ অন্তর্ বাহির, সর্ব্বত্রই উর্ব্বশী। বিরহের এমন চিত্র সংস্কৃত অন্য কোন নাটকে নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

যখন উর্ব্বশী লতারূপ-বিচ্যুত হইয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন, এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহারাজ! তুমি কি ভাবে রাজধানীতে যাইতে চাও?' তখন রাজা বলিলেন 'চল উর্ব্বশী! যে মেঘে অচিরপ্রভার পতাকা পরিশোভিত, সুরম্য ইন্দ্রধনুর নয়ন-রঞ্জন আলেখ্যে যে মেঘ-গাত্র সুরঞ্জিত, সেই নবীন মেঘময় বিমানে আমাকে লইয়া চল। খেল-গমনে! তুমিত কতরূপ খেলা খেলিতে জান, আজ মেঘের খেলা খেল।'

অনেক দুঃখ কষ্টের পর, অনেক উন্মাদের পর, দুই জনের আবার

মিলন, ঘটিয়াছে। আজ তাঁহাদের যে সুখ—যে উল্লাস উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা মর্ত্তের নহে। মর্ত্তে অত সুখ, অত উল্লাস জন্মে না, জন্মিলেও ক্ষণকাল বই থাকে না। উহা স্বর্গের বস্তু। নির্ম্মল সুখ, নিরাবিল উল্লাস স্বর্গের পদার্থ। আজ উর্ব্বশী-পুরূরবার হৃদয়ে সেই স্বর্গ-সম্পদ উদিত হইয়াছে। ধরায় ও সম্পদের স্থান নাই, ধরাতলের উষ্ণদাহে উহা ঝলসিয়া যায়, তাই কবি তাঁহাদিগকে উপর দিয়া—অনেক উপর দিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা আনন্দে—মোহে অবশ হইয়া, দুইজনে যেন এক হইযা আকাশ-পথে চলিলেন, আর জড় জগৎ—পঙ্কিল সংসার তাঁহাদের নীচে—অনেক নীচে পড়িয়া রহিল

কবিকুলোত্তম কালিদাস, এই উর্ব্বশী-পুরূরবার মিলন, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন এবং পরিশেষে মেঘময়ী উর্ব্বশীর আশ্রয়ে রাজার প্রস্থান, যেরূপ অনুপম-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এই বর্ণনায় তাঁহার স্বর্গমর্ত্ত-ব্যাপিনী কল্পনার যে অদ্ভুত লীলাতরঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। হৃদয় বিমল আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়।

রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্তির পরে যখন তনয়-মুখ দর্শনান্তে রাজা বুঝিলেন যে, উর্ব্বশী আর থাকিবেন না, তাঁহার স্বর্গ-প্রস্থানের কাল উপস্থিত। তখন তিনিও মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন “আমার পুত্র এই ঔর্ব্বশেয় ‘আয়ুকে’ আপনারা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন, অদ্যই ইহার অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হউক। আমি বনগমন করিব।” রাজা বুঝিলেন যে, তাহার পক্ষে উর্ব্বশী-শূন্য রাজ্য কেবল বিড়ম্বনাময়।

পুরূরবার চরিত্রে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যখনই কোন ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে, তখনই রাজা দেখাইয়াছেন, তিনি উর্ব্বশীর জন্য

সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, প্রাণ—উর্ব্বশীর তুলনায় এ সমস্তই অতি তুচ্ছ। প্রণয়ের এ এক বিচিত্র অবস্থা। এ অবস্থা সকল প্রণয়ে ঘটে না। সকলের ভাগ্যে ঘটে না। প্রণয়ীর সখা কালিদাস, বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে, প্রণয়ের এই অপরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত ভাষার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

রাজা পুরূরবাকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাঁহার এই অলৌকিক প্রণয়-সম্পদের এবং অমরদুর্লভ হৃদয়ের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

দেবী ঔশীনরী।

ঔশীনরী কাশীরাজের দুহিতা, মহারাজ পুরূরবার মহিষী। এই নাটকের মধ্যে দুই স্থলে,—একবার দ্বিতীয় অঙ্কে, আর একবার তৃতীয় অঙ্কে, তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি চন্দ্রবংশের প্রধান নরপতির পাটরাণী, কাশীরাজের কন্যা, পিতৃকুল, পতিকুল' উভয়ের গৌরবেই গৌরবান্বিতা। কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ, নিয়ত, সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ রমণীর হৃদয়ের মত সরল, গর্ব্বশূন্য। মালবিকাগ্নিমিত্রের ধারিণীকে দেখিয়াছি, ইরাবতীকে দেখিয়াছি, ঔশীনরীর নিকটে তাঁহারা উল্লেখযোগ্যই নহেন। ঔশীনরীর হৃদয় উদার, দয়া-পূর্ণ, ক্ষমা-প্রবণ। অথবা তিনি যেন শরীরিণী ক্ষমা। কিন্তু সে ক্ষমার মধ্যেও, তাঁহার সতীকুলের আভরণস্বরূপ, পতিকৃত-ব্যভিচার-বিদ্বেষ প্রবল। তবে সে বিদ্বেষের বশে, তিনি, পরের সর্ব্বনাশ করেন না, করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই জন্মে না। তিনি আপন হৃদয়ানলে আপনাকেই ভস্মীভূত করিয়া, তাঁহার প্রিয়তমের প্রণয়-মার্গ নিষ্কণ্টক করেন। বিদিশার রাণী ধারিণী, প্রতিপক্ষরূপিণী ইরাবতীর সর্ব্বনাশের জন্য, মালবিকারূপী শাণিত অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ধারিণী নিজেত মজিলেনই, অন্যকেও মজাইলেন। তাঁহার নিজের সুখ অনেক দিন ঘুচিয়াছিল, পরের সুখের পথেও কণ্টক রোপণ করিলেন। আর ঔশীনরী যখন বুঝিলেন যে, এবারকার মত তাঁহার জীবনের প্রণয়-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তখন শান্তহৃদয়ে আসিয়া, তাঁহার সেই প্রাণাধিকের চরণে, আপন প্রণয়ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। তিনি নিজের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া সেই শোণিতে, তাঁহার প্রাণাধিকের নব প্রণয়-প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন। হিন্দুর আদর্শ রমণী মনের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা, বা শরীরের দ্বারাও কখনো পতির প্রতিকূল

আচরণ করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, ঔশীনরী ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিলেন। আর্য্যবংশের আদর্শ রমণী হইতে হইলে, তাঁহার কিরূপ ক্ষমা, তিতিক্ষা, নিস্বার্থপরতা ও আত্ম-সুখে স্পৃহাশূন্যতা থাকা চাই, তাহা ঔশীনরী আত্ম-দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করিলেন। আর্য্যবংশের সাধ্বী ললনা যে, আত্মভোগে নিয়ত অনুৎসেকিনী থাকিয়া কিরূপ ভাবে পতির চরণ-পরিচর্য্যা করেন, পতিরূপী পরম দেবের প্রীত্যর্থে জগতে আর্য্য-ললনার অনুৎসর্জ্জনীয় যে কিছুই নাই, প্রয়োজন হইলে আর্য্য-ললনা আপন হৃৎপিণ্ড আপনি উৎপাটিত করিয়াও যে, প্রাণাধিকের চরণে সহাস্য-বদনে উপহার প্রদান করিতে পারেন, একথা ঔশীনরী আত্ম-দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ করিলেন। এরূপ উন্নতহৃদয়া দাক্ষিণ্যবতী, পতি-প্রীতি-মাত্র-সম্বলা, সরলা, রমণী-দেবীর পরিচয়, আমরা সংস্কৃত অন্য কোন দৃশ্যকাব্যে দেখিতে পাই না। আত্ম-ত্যাগের এতাদৃশ দৃষ্টান্ত অন্য কোন রমণী দেখাইতে পারেন নাই। বিধাতৃ-সৃষ্টিতে এরূপ মানবী দেবী দুর্লভ। কবি-সৃষ্টিতে কদাচিৎ সম্ভব। তাই কবি-সৃষ্টি বিধাতৃ-সৃষ্টির অতিবর্ত্তিনী। এইরূপ একটি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কবি সমাজের যে পরিমাণে উপকার করেন, শত বৎসর যাবৎ শত সহস্র বাগ্মী, তারকণ্ঠে বক্তৃতা করিয়া, তাহার কিয়দংশও সাধিত করিতে পারেন না। যে দেশের সমাজে ঐরূপ রমণী-চরিত্র আলোচিত হয়, সে দেশ এবং সেই সমাজ সর্ব্বথা সম্মাননীয়; আবার যে সকল মহাত্মা ঐরূপ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সমাজে আদর্শের পূজা প্রবর্ত্তন করেন, সেই বিধাতৃবর কবিগণও সর্ব্বতোভাবে পূজার্হ। কবিগণ চরিত্র সৃষ্টি করেন, লোকে সেই আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে স্ব স্ব সমাজ গঠন করিয়া লয়। পরোক্ষ ভাবে কবিগণই সমাজের গঠন-কর্ত্তা, মানুষের পরম হিতৈষী।

উর্ব্বশীর প্রথম দর্শনাবধি, রাজা কেমন যেন শূন্য-হৃদয়, নিয়ত ঔদাসীন্যময় হইয়াছেন। তাঁহার নয়ন-মন, পুত্তলিকার ন্যায় বিষয়ে

স্বরূপ্যাববোধে যেন অক্ষম। তাঁহার চক্ষে, বদনে, অথবা সমস্ত দেহে, সমস্ত কার্য্যে, যেন কি একটা বিষম অনাসক্তি, বিষম উদাস আসিয়াছে। কিছুতেই আর পূর্ব্ববৎ রতি নাই। রাজা পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্যই করেন সত্য, কিন্তু সে সমুদয়ে যেন প্রাণের অভাব। তিনি বাতাপহৃত তৃণের ন্যায় অবশ-ভাবে কর্ত্তব্যের অনুসরণ করেন মাত্র, কিন্তু নিয়তই নিরুৎসাহ, বিমূঢ়, একবারে জড়বৎ। রাজ্যের অন্য কেহ রাজার চিত্তের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিলেও, ইহা কিন্তু রাজমহিষী সাধ্বী ঔশীনরীর চক্ষু এড়াইতে পারিল না। তিনি ছায়ার ন্যায় রাজার অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া, তাঁহার এই বৈমনস্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুতেই যখন কারণ-নির্দ্দেশে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন দেবী, পরিচারিকাকে বলিলেন 'নিপুণিকে! আর্য্য মানবক রাজার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, তুমি যাও, যে ভাবে পার, সেই বিদূষকের নিকট হইতে রাজার এই ঔদাসীন্যের কারণ জ্ঞাত হইয়া আইস'[১]।

দেবীর নির্দ্দেশানুসারে, চতুরা নিপুণিকা, বিদূষকের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত,—কেন রাজার এমন ঔদাসীন্য, কাহার জন্য তাঁহার এতাদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য,—জানিয়া আসিয়া, দেবীকে বলিল। দেবী, প্রথমতঃ, মনে মনে বিষম প্রমাদ গণিলেন। শেষে দেখিলেন, অধীর হইলে চলিবে না। যদি পারা যায়, তবে ধীর ভাবে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। কিন্তু সহসা পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স্থির করিলেন, যে, একদিন নির্জ্জনে রাজার সহিত এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিবেন। দেবীর আদেশ-মতে নিপুণিকা লক্ষ্য রাখিল যে, রাজা কখন্ উদ্যান-বাটিকার লতা-গৃহে শ্রান্তি বিনোদনার্থে গমন করেন। একদিন, নিপুণিকার কথায়

১—বিক্রমোর্ব্বশী,—২য় অঙ্ক। প্রথম অংশ।

দেবী লতা-গৃহের দিকে চলিলেন, সঙ্গে পরিচারিকা-বৃন্দ। নিপুণিকা সন্ধান পাইয়াছে যে, আজ রাজা বিদূষকের সহিত লতামণ্ডপে যাইবেন। দেবী চলিলেন, বাসনা,—যে ভাবে হউক, তাঁহার হৃদয়েশ্বরের মনোবেদনা দূর করিবেন। লতামণ্ডপের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেবী এক লতাবিতানের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। ইচ্ছা, রাজার কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করেন।

কেশি-দানবের হস্ত হইতে, রাজা যখন মূর্চ্ছিতা উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন, মূর্চ্ছাভঙ্গের পর, উর্ব্বশী, ত্রাণকর্ত্তা নরপতির প্রতি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কিয়ৎ কাল নিরীক্ষণ করিতে না করিতেই, গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্ররথ আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। উর্ব্বশী, সেই কন্দর্প-কান্তি পুরূরবাকে আশা মিটাইয়া দেখিতেও পান নাই। তাই স্বর্গে যাইয়াও উর্ব্বশীর স্বস্তি নাই। তিনি, আর একবার রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত মর্ত্তে আসিয়াছেন। সঙ্গে চিত্রলেখা। প্রভাববলে তাঁহারা জানিয়াছেন যে, বিরহখিন্ন রাজা এখন বয়স্যের সহিত লতাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। অন্যের অদৃশ্যভাবে, তাঁহারা তথায় উপস্থিত। লতামণ্ডপে আসিয়া রাজা যখন উর্ব্বশী-বিরহে উন্মত্ত-প্রায়, তখন চিত্রলেখার পরামর্শানুসারে উর্ব্বশী, ভূর্জ্জপত্রে একখানি প্রণয়পত্রিকা লিখিয়া সমীরণ-ভরে রাজার সম্মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন। রাজা সেই পত্রখানা পাইয়াছেন, তাঁহার পরম আনন্দ। রাজা আবার বিদূষকের হস্তে সেই পত্রিকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন। ক্রমে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা রাজার সহিত সেই লতামণ্ডপে সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু এবারেও উর্ব্বশী অধিকক্ষণ মর্ত্তে থাকিতে পারিলেন না। সহসা দেবদূত আসিয়া 'লক্ষ্মী স্বয়ংবর' প্রয়োগাভিনয়ের জন্য, তাহাদিগকে স্বর্গে ডাকিয়া লইয়া গেল। উর্ব্বশীর অদর্শনে এবার রাজার উন্মাদ আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখন বিদূষকের নিকটে সেই পত্র চাহিলেন। চঞ্চল বিদূষক অনেক

ক্ষণ, সে পত্র হারাইয়াছে! সে রাজাকে প্রথম প্রথম অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে রাজার মনে ঐ পত্রের কথা না উদিত হয়, সে পক্ষে স্থূল-বুদ্ধি বিদূষক অনেক কৌশল করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। রাজা সেই পত্রের জন্য বার বার আগ্রহ করিতে লাগিলেন। উভয়ে 'তন্ন তন্ন' করিয়া নানাস্থানে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও পাইলেন না। রাজা যখন পত্রান্বেষণে, এইরূপে, অতিশয় ব্যগ্র, তখন সেই লতাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী লতাবিতানে আসিয়া দেবী ঔশীনরী দাঁড়াইলেন। তিনি অন্তরালে থাকিয়া, পত্রের জন্য রাজার সেই উন্মাদ আকুলতা—একে একে সব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল। এমন সময়ে ধূর্ত্ত দক্ষিণ সমীরণ কোথা হইতে উড়াইয়া আনিয়া সেই পত্র দেবীর নূপুর-সংলগ্ন করিল। দেবী পরিচারিকাকে তাহা কুড়াইয়া লইতে বলিলেন। পরিচারিকা লইয়া দেবীকে তাহা অর্পণ করিতে গেল, কিন্তু দেবী স্পর্শও করিলেন না। বলিলেন, 'তুই আগে পড়িয়া দেখ, যদি আমার পড়ার মত হয় তবে আমাকে শুনাইবি, আমি পড়িব না।' সে পড়িল। পত্রের মর্ম্ম দেবীকে বলিল। তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেবী বলিলেন, 'পত্রের কথাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিস্।'—দেবীর এই ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ধারিণী বা ইরাবতী হইলে, হয়ত, এই পত্রব্যাপারে একটা খণ্ডপ্রলয় করিয়া বসিতেন! কিন্তু দেবী দেবীর ন্যায় স্থির-চিত্তে কেমন সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন! পরিচারিকা, দেবীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, হয়ত, কত অলঙ্কার-সহযোগে পত্রবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিল, কিন্তু দেবী তাহাতে মহারাণীর মর্য্যাদা বিস্মৃত হইলেন না।

রাজা, যখন পত্রের জন্য যুক্তকরে বসন্তানিলের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তখন দাসী দেবীকে কহিল, 'দেখুন মহারাণি!! রাজার ভাবটা

দেখুন।' অমনি দেবী বলিলেন—'দেখিতেছি, তুই চুপ্ কর্।' দেবী যেন নিস্তরঙ্গ সাগরবক্ষের ন্যায়, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির—অবিচলিত। ক্রমে রাজার ব্যগ্রতা, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। তিনি 'হা হতোস্মি' বলিয়া একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণও দেবী স্থির ছিলেন, কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অভীষ্ট-দেবতার কাতরতাদর্শনে, তাঁহার ধৈর্য্যের সেতু ভগ্ন হইল। তিনি, ঐ পত্র হস্তে লইয়া, সহসা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! শান্ত হউন্, এই আপনার সেই পত্র[১]।'

অকস্মাৎ দেবীকে দেখিয়া রাজা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, এবং সজলনয়নে ও কম্পিতবচনে কহিলেন 'দেবি! এস, কতক্ষণ তোমার শুভাগমন?' দেবী ধীরভাবে বলিলেন 'রাজন্! শুভাগমন নহে, এসময়ে আমার আগমন অশুভেরই কারণ।' রাজা প্রথমে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। তখন রাজা অপরাধ স্বীকার করিলেন। দেবী বলিলেন 'না আর্য্যপুত্র, আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনার আবার অপরাধ কি? বরং আমিই অপরাধিনী, কেননা, আমার দর্শন আপনার একান্ত অনভিপ্রেত জানিয়াও, আমি এখনও আপনার সম্মুখে রহিয়াছি।'—বলিয়াই, ঔশীনরী পরিচারিকাকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন[২]। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। পরিশেষে দেবীর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। তখন দেবীর হৃদয় 'ক্ষত-সেতুবন্ধন জলসঙ্ঘাতের ন্যায়, প্রবল-বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সতীর বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ২য়-অঙ্ক;—দেবী। উপেত্য। আর্য্যপুত্র! অলমাবেগেন। এতৎ তৎ ভূর্জ্জপত্রম্।

২—ঐ, ঐ,—দেবী। 'নাস্তি ভবতঃ অপরাধঃ। অহমেবাত্র অপরাদ্ধা। যা প্রতিকূলদর্শনা ভূত্বা অগ্রতস্তে তিষ্ঠামি। অতোঽহং গমিষ্যামি।'

'রাজন্! আমি নীচ-হৃদয়া, আমার নিকটে কি তোমার অনুনয় শোভা পায়? এই অপকার্য্যের জন্য, তোমাকে অনেক অনুশোচনা করিতে হইবে, আমার ভয় হয়,' সেই সময়ে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে[১]!' দেবীর অভিমান কথায় এই প্রথম এবং এইই শেষ। তিনি সজল-নয়নে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দেবীর এই অভিমান দোষাবহ নহে। ইহা আর্য্যরমণীর অলঙ্কার, সতীর শিরোভূষণ। মণিহারা ফণিনীর রোষ উন্মাদ প্রকৃতি-সিদ্ধ। এ অভিমান দম্ভের কার্য্য নহে। এ অভিমান হৃদয়-দেবতার চরণে আপন হৃদয় বেদনার অভিব্যক্তি মাত্র।

দেবী চলিয়া গেলেন। রাজার অনুনয়-বিনয়—সমস্তই বিফল হইল। বিদূষক রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—'বর্ষার অপ্রসন্না স্রোতস্বতীর ন্যায়, দেখিতেছি, দেবী চলিয়া গেলেন। আর কর্ত্তব্য কি? আপনি গাত্রোত্থান করুন।' অমনি রাজা বলিলেন—"সখে! দেবীর অপরাধ নাই। দেখ, 'কৃত্রিম-রাগ-যোজিত' মণি যেমন, তাহার কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে দক্ষ মণিকারের হৃদয় মুগ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ, 'অন্য-সংক্রান্ত হৃদয়' দয়িতের রস-হীন প্রিয়-বচনময় শত অনুনয়েও মনস্বিনী রমণীর অভিমানী হৃদয় কদাচ বিমুগ্ধ হয় না। আমার মন উর্ব্বশী-ময় হইলেও, কিন্তু, দেবী ঔশীনরীর প্রতি এখনও সে মন পূর্ব্ববৎ আছে, তবে দেবী আজ আমার এই যে 'প্রণিপাত লঙ্ঘন' করিলেন, ইহার প্রতিফল-স্বরূপ আমিও কিয়ৎকাল দেবী সম্বন্ধে বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন করিব। দেখি, দেবীর হৃদয় কেমন দৃঢ়[২]?

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ২য় অঙ্ক। শেষ অংশ।

২—বিক্রমোর্ব্বশী ২য় অঙ্ক। রাজা। উত্থায়। বয়স্য। নেদমুপপন্নম্। পশ্য—

প্রিয়-বচন-শতোঽপি যোষিতাং দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে।
প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং মণিরিব কৃত্রিম-রাগ-যোজিতঃ॥

—উর্ব্বশী-গত-মনসোঽপি মে স এব দেব্যাং বহুমানঃ। কিন্তু প্রণিপাতলঙ্ঘনাৎ অহমস্যাং ধৈর্য্যমবলম্বিষ্যে।

দেবী প্রস্থান-কালে বলিয়া গিয়াছেন, 'তুমি আজ যে অনল-কুণ্ডে ঝাঁপ দিলে, কালে ইহার জন্য অনেক অনুতাপ করিতে হইবে, আমার ভয় হয়, তখন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে'। দেবীর এ উক্তি দেবীর উপযুক্ত, চন্দ্রবংশের কুললক্ষ্মীর অনুরূপই বটে। তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব রত্ন অন্যে অপহরণ করিল, ইহাতে তাঁহার যত না দুঃখ, সেই রত্নের পরিণামে যদি কোন 'অত্যাহিত' সংঘটন হয়, এই ভয়ে, তাঁহার ততোধিক দুঃখ, ততোধিক ভাবনা। দেবীর এস্থলে যেন একটা পৃথক্ সত্তা নাই; রাজার সত্তাই দেবীর সত্তা। তিনি রাজার কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে চাহেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে, রাজার এ স্খলিত হৃদয়ের হয়ত পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন, তবে তাহাতে রাজার প্রাণে অনেক বেদনা লাগিত। দেবী তাহা করিলেন না। তাঁহার সে প্রবৃত্তিই হইল না। তিনি সতী, সাধ্বী, পতিদেবতা ললনা, পতির অপ্রিয় অনুষ্ঠানে তাঁহার রুচি হইল না। তবে, তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, যে, ভবিষ্যতে, এই জন্য, রাজাকে ঘোর অনুশোচনা করিতে হইবে, তাঁহার অশেষ কষ্ট হইবে। বাস্তবিক হইয়াছিলও বটে। চন্দ্রবংশের অবতংস, সাগরাম্বরা বসুন্ধরার একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও, তাঁহাকে রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, বনে বনে কত কাল উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। পশু, পক্ষী, তৃণ, লতা—এমন কেহই অবশিষ্ট ছিল না, যাহার নিকট সেই পৃথিবীপতি যুক্ত করে কৃপা-প্রার্থনা না করিয়াছিলেন। দেবী ঔশীনরী যেন পূর্ব্বাহ্নেই সায়ংকালের এই গম্ভীর মূর্ত্তির ছায়া দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন, তাই সে সতীর মুখ হইতে ঐরূপ ভয়ের কথা বহির্গত হইল। তাঁহার প্রিয়তমের ভবিষ্যচ্চিন্তায় তদীয় কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। রাজা ও দেবীতে পরস্পর সাক্ষাৎ নাই। অভিমানী রাজা ইচ্ছা-পূর্ব্বক, দেবীর সহিত সাক্ষাৎকার পরিবর্জ্জন করিয়া চলিতেন। পতিব্রতা ঔশীনরীর প্রাণে

ইহাতে যারপর নাই বেদনা লাগিল। এরূপ ঘটনা, তাঁহার জীবনে এই প্রথম। রাজা পুরূরবার অন্য অবলম্বন ছিল, অন্য চিন্তা ছিল, কিন্তু রাজময়-জীবিতা ঔশীনরীর ত আর অন্য কোন ধ্যানের বিষয় ছিল না,—তিনি রাজার এই কর্ম্মের ব্যবহারে, বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি এতদিনে বুঝিলেন যে, অভিমান বৃথা। যাঁহার উপর তাঁহার এই অভিমান, তিনি ত আর এখন সে তিনি নাই; তবে আর এ অভিমানে লাভ? জগতে, যাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার কেহ নাই, তাহার আবার অভিমান কেন? তাই সাধ্বী মহারাণী আপন অভিমানের শিরে আপনিই পদাঘাত করিয়া, স্থির করিলেন, রাজার সহিত, নিজে উপযাচিকা হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন। যে দিন রাজার অনুনয়ে কর্ণপাত করেন নাই, স্বামীর 'প্রণিপাত লঙ্ঘন' করিয়াছেন,—ঘোর অন্যায় কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন, সেই অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। এ প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত যতই গুরুতর হউক না কেন, কিন্তু তাহা অসাধ্য নহে, আর এ নবীন প্রায়শ্চিত্ত, অন্যের পক্ষে অসাধ্য, মাত্র ঔশীনরীর ন্যায় আদর্শ সতীরই সাধ্য। ইহার দণ্ড, চিরদিনের মত আত্ম-সুখে বিসর্জ্জন! তিনি চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক, রাজমহিষী-সমুচিত বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া, সংযমিনী ব্রহ্মচারিণীর পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া ব্রত-গ্রহণ করিলেন। ব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন।' উদ্দেশ্য, প্রিয়জনের প্রসন্নতা-বিধান। এই সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া, দেবী, পরিচারিকা নিপুণিকার মুখে মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি এক ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সম্পাদনকাল নিকটবর্ত্তী, একটিমাত্র দিনের জন্য আমি মহারাজের দর্শনার্থিনী। অভিমান-গর্ব্বিত পুরূরবা মহিষীর এ কথার কোনই উত্তর দিলেন না। কয়েক দিন কাটিয়া গেল। মহিষী আবার বৃদ্ধ কঞ্চুকীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্রত সম্পাদনের নিমিত্ত আজ মহিষী সন্ধ্যা-বন্দনাদি সম্পন্ন করিয়া রাজার নিকটে যাইবেন। দেখিতে

দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে আশ্রয় লইলেন। সায়ংকালের রক্তবসনের অবগুণ্ঠন ঈষদুন্মোচিত করিয়া, ক্রমে বিশ্ববিমোহিনী রজনী, ললাটে যেন ইন্দুরূপী স্নিগ্ধ সিন্দূরবিন্দু পরিয়া, হাসিতে হাসিতে, সহচরী নিদ্রার সহিত, মৃদুমন্দ-পদ-ক্ষেপে ভুবনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে দেবীর নির্দ্দেশানুসারে পৃথিবী-পতি পুরূরবাও, বয়স্য সমভিব্যাহারে, সুরম্য মণিহর্ম্ম্য-প্রাসাদে গমন করিলেন। প্রাসাদে উপনীত হইয়া, পুরূরবা স-প্রত্যাশ-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, এক এক বার, তাঁহার হৃদয়ে উর্ব্বশীর কথা জাগিতেছে, বিদূষকের সহিত তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, আবার পর মুহূর্ত্তেই দেবীর আপতনভয়ে, কথান্তরে সে প্রসঙ্গ গোপন করিতেছেন ;—এমন সময়ে, দেবী ঔশীনরী ব্রহ্মচারিণীর বেশে, সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। পরিজনবর্গ, নানাবিধ ব্রতোপহার লইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপনীত হইল।

প্রাসাদে প্রবেশকালে, দেবী, একবার নীলগগনের বিমল শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রোহিণীর সহিত সম্মিলিত হওয়ায়, সে দিন চন্দ্রের শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই মিলনের ছবি দেখিতে দেখিতে, বিয়োগিনী দেবী বলিলেন 'আহা! রোহিণী-যোগে, মৃগাঙ্কের আজ কি অপূর্ব্ব শোভাই জন্মিয়াছে!' অমনি তাঁহার প্রগল্‌ভা পরিচারিকাও বলিল, 'দেবীর সহযোগে আজ আমাদের ভর্ত্তারও এইরূপ শোভা জন্মিবে।' দেবী পরিচারিকার কথা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। একবার অলক্ষ্যে তাঁহার একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পতিত হইল! দেবী যখন প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন পুরূরবা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, আজ দেবীর আর সে ভুবন-মোহিনী মহিষী-মূর্ত্তি নাই। আজ দেবী—

> সিতাংশুকা মঙ্গল-মাত্র-ভূষণা
> বিচিত্র-দূর্ব্বাঙ্কুর-লাঞ্ছিতালকা[১]।

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ৩য় অঙ্ক।

আজ দেবীর পরিধানে ধবল বসন, কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত, অলক-দাম 'বিচিত্র-দুর্ব্বাঙ্কুর' শোভিত। রাজা ভাবিলেন, বুঝি ব্রতের ব্যপদেশে, মহিষী আজ রাজার অভিমান ভঞ্জন করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতি সমাদরের সহিত হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক, দেবীকে বসাইলেন। মহিষী ঔশীনরীও কাল-বিলম্ব না করিয়া, রাজাকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! আজ আপনাকে সম্মুখে রাখিয়া, আমার একটি বিশেষ ব্রত সম্পাদন করিতে হইবে। ক্ষণকালের জন্য আমার এই উপরোধ সহ্য করুন।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ব্রত?' দেবী নীরব। তিনি রাজার কথার কোনই উত্তর দিলেন না,—দিতে পারিলেন না। কেবল একবার, অবসন্ন-নয়নে নিপুণিকার দিকে চাহিলেন। অমনি নিপুণিকা বলিল, "প্রভো! মহিষীর এ ব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন।'" দেবীর ইঙ্গিতমতে, কুমারী-গণ পূজোপহার আনয়ন করিল, দেবী, তদ্দ্বারা প্রথমে জগদানন্দ চন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিলেন, পরে কহিলেন 'আর্য্যপুত্র! এইবার আসুন।' রাজা যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকাবৎ আসিয়া, আসনে বসিলেন। তখন দেবী পতির পাদ-পূজা-পূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতে করিতে, বাষ্প-স্তম্ভিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'ঐ নির্ম্মল গগনে সমুদিত রোহিণী মৃগ-লাঞ্ছনকে সাক্ষী করিয়া, আজ আর্য্যপুত্রের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আর্য্যপুত্র যাঁহাকেই কামনা করিবেন, যে রমণীই আর্য্যপুত্রের সমাগম-প্রণয়িনী হইবেন, আমি তাঁহার সহিত নির্ব্বিরোধে বাস করিব। আর্য্যপুত্রের সুখের পথে আমি কণ্টক হইব না[১]।'

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ৩য়-অঙ্ক। দেবী। 'রাজ্ঞঃ পূজামভিনীয় প্রাঞ্জলিঃ প্রণিপত্য।—এষাহং দেবতা-মিথুনং রোহিণীমৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্য্যপুত্রমনুপ্রসাদয়ামি। অদ্যপ্রভৃতি যাং স্ত্রিয়ং আর্য্যপুত্রঃ প্রার্থয়তি, যা আর্য্যপুত্রস্য সমাগম-প্রণয়িনী তয়া ময়া অপ্রতিবন্ধেন ভবিতব্যমিতি।'

বিদূষক দেবীর এই ব্রত-ব্যাপারে একটু উপহাস করিল, বলিল, 'দেবি! আপনি ত ব্রত করিলেন, কিন্তু আমার সখা যে একেবারে উদাসীন, ব্যাপার কি?' দেবী অমনি পদদলিত ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিলেন—'মূঢ়! আমি নিজের সুখের অবসান করিয়া, আমার আর্য্যপুত্রের সুখ-কামনা করিতেছি, ইহাতেই আমার সুখ; এই কামনার অতিরিক্ত কিছুই আমার প্রার্থনীয় নহে। আর কিছুই আমি দেখিতে চাই না[১]!

রাজা এতক্ষণে বুঝিলেন যে, দেবীর ব্রতের উদ্দেশ্য কি? ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মোহময় হৃদয়েও বিবেক-ধারা উদিত হইল। তিনি দেবীকে, সঙ্কল্পিত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এখন চেষ্টা বৃথা। প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছে, আর তাহার উত্তোলনের প্রয়াস কেন? দেবী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন 'পরিচারিকাগণ! আমার প্রিয়-প্রসাদন ব্রত সম্পন্ন হইয়াছে, চল, গৃহে যাই।' সেই রাত্রি 'মণি-হর্ম্ম্য-প্রাসাদে' অবস্থান করিবার নিমিত্ত, রাজা দেবীকে অনুরোধ করিলেন। দেবী কৃতাঞ্জলিপুটে ও বাষ্প-স্খলিত-কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র! আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি সংযমিনী, ক্ষমা করুন।'—এই বলিয়া দেবী ঔশীনরী চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের সুখতারা অস্তমিত হইল! তিনি স্বামীর হৃদয়ের প্রসাদ-বিধান-মানসে, নিজের হৃৎপিণ্ড উচ্ছিন্ন করিলেন। রাজা পুরূরবা, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, অন্যত্র চিত্ত-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি প্রতিকূলচারিণী থাকিলে, পদে পদে রাজার আকাঙ্ক্ষা বাধিত হইবে, তাঁহার প্রিয়তমের প্রাণে আঘাত লাগিবে, তাই তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন, কাজ কি এ সকল বিড়ম্বনায়?

১—বিক্রমোর্ব্বশী, ৩য় অঙ্ক। দেবী। 'মূঢ়। অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেন আর্য্যপুত্রং নির্বৃতশরীরং কর্ত্তুমিচ্ছামি। এতাবতা চিন্তয় তাবৎ, প্রিয়ো নবা—ইতি।'

যাহা যাইবার তাহা ত চিরদিনের মত গিয়াছে, শত ঔশীনরীর বিনিময়েও আর সে রাজ-হৃদয় ফিরিয়া আসিবে না। তবে কেবল হৃদয়েশ্বরের সুখের পথে কণ্টক হইয়া ফল কি? তাঁহার জীবনের সুখ ত ফুরাইয়াছে, তবে আর রাজার সুখের অন্তরায় হইয়া লাভ কি? দুই জনেই বেদনা ভোগ করা অপেক্ষা, এক জনে ভোগ করিলে যদি, অপরের মুক্তি হয়, তবে তাহাই ত বিশেষ, বিশেষতঃ স্বামী,—একদিন যিনি আদর করিয়া ভারতের অধীশ্বরীর পদে বসাইয়াছিলেন, জগতে কত সুখের, মোহের, আবেশের চিত্র দেখাইয়াছিলেন, আজ তাঁহারই প্রীতির জন্য যদি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিতে না পারিলাম, তবে আর আমার হৃদয়ের সামর্থ্য কি? যাঁহাকে ভালবাসি, প্রাণ দিয়াও যাহার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, সেই প্রাণাধিকের প্রীতির জন্য জীবনের কয়েকটি পরিমিত দিনের সুখও যদি ত্যাগ করিতে না পারি, তবে আমার এ ভালবাসার মূল্য কি? দেবী বুঝিয়াছিলেন যে প্রণয় একটি প্রধান যজ্ঞ, এ মহাযজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, দক্ষিণা অভিমান। তাই আজ তিনি সেই মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া, বাত-বিকম্পিত বিশীর্ণ লতিকার ন্যায়, কাঁপিতে কাঁপিতে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিলেন। ইহার পর আর কেহ, কখনও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল না। সতী ললনার হৃদয় যে কত কোমল, কত সুন্দর, সতীর চিত্তে পতির জন্য যে কত আকুলতা, ঔশীনরীর চিত্র তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে দেশের রমণী, পতির প্রজ্বলিত চিতায়, হাসিতে হাসিতে আরোহণ করিতেন, ইহা সেই দেশের সতীর চিত্র। সে দেশের রমণী—

"আর্ত্তার্ত্তে, মুদিতে হৃষ্টা, প্রোষিতে মলিনা কৃশা,
মৃতে ম্রিয়তে—পত্যৌ"—

ইহা সেই দেশের সতীর চিত্র। যে দেশের সাহিত্যে এতাদৃশী

দেবীর চিত্র অঙ্কিত, সেই দেশ, সে সাহিত্য এবং সেই প্রতিমার যিনি চিত্রকর—তিনি,—সকলেই পূজার্হ। সংস্কৃত সাহিত্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি কতিপয় চিত্র ব্যতিরেক, এতাদৃশী মূর্ত্তি আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এক-পঞ্চাশ অধ্যায়।

উপসংহার।

এতক্ষণে সাধারণ-ভাবে, বিক্রোমোর্ব্বশী ত্রোটকের চরিত্র-সমালোচনা এক প্রকার, শেষ হইল। মহাকবি, এই কাব্যে দেখাইয়াছেন যে, প্রণয়োন্মত্ত হৃদয়ের গতি কত অধোমুখী। আবার সেই সঙ্গে, ইহাও দেখাইয়াছেন যে, মানব-হৃদয়ের পরিসর কত, সে হৃদয় কত বিশাল, সে হৃদয়ে কত অপরিমিত প্রেম থাকিতে পারে। মনের মত হৃদয় পাইলে, সুখময় স্বর্গের চিরসুখী অধিবাসীও, স্বর্গ ছাড়িয়া এই তাপ-পূর্ণ মর্ত্ত্যে বাস করিতে চায়। প্রেমের পরিপূর্ত্তি হইলে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই আত্ম-প্রেমের ছায়া লক্ষিত হয়; সর্ব্বত্রই আপনার হৃদয়ের কমনীয় বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয়। প্রেমের পরিপূর্ত্তি হইলে, সেই সীমাবদ্ধ হৃদয়-নিহিত প্রেম, অসীম বিশ্বের অনন্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 'আমিত্বের' তখন 'প্রসার' হয়। তখন জলে, স্থলে, শূন্যে বৃক্ষবল্লরীর পত্র-পুষ্প-কিসলয়ে, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-পর্য্যন্তে আত্ম-হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়। অন্তরে বাহিরে আপনার ধ্যেয় বস্তুর সন্দর্শন ঘটে। কবি দেখাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ প্রেমের চরম পরিণতি আত্ম-ত্যাগ আত্ম-বলি। ভোগ প্রণয়ের কীট, আত্ম-ত্যাগ প্রণয়ের সঞ্জীবন। ঔশীনরীর চরিত্র ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

উর্ব্বশী অপ্সরা, রাজার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধা। সে রাজার আর কিছুই দেখে না। দেখিবার প্রয়োজনও নাই। সৌন্দর্য্যমাত্রই তাহার দ্রষ্টব্য। সে রাজার সৌন্দর্য্য-ভোগের জন্য, আপন পুত্রকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল। পুরূরবা যখন উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ দেখিবেন, তখন উর্ব্বশীর রাজ-সহবাস ফুরাইবে, দেবতাদের এই আদেশ স্মরণ করিয়া, উর্ব্বশী আপনার পুত্র আয়ুকে' তপোবনে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

রাজার প্রতি তাহার যে অনুরাগ, তাহা ভোগ-মূলক। আর ঔশীনরীর অনুরাগ ত্যাগমূলক। কবি পরস্পর সম্মুখীন করিয়া, প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির দুইটী পরিস্ফুট মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রবৃত্তিময়ী মূর্ত্তি স্বর্গের, আর নিবৃত্তিময়ী মূর্ত্তি মর্ত্তের। প্রবৃত্তির কোথাও সুখ নাই, তার সাক্ষী উর্ব্বশী। তাহার একবার স্বর্গে, একবার মর্ত্তে যাতায়াত করিতেই প্রাণান্ত প্রায় হইল। মুনিরূপী বিধাতার প্রবল অভিশাপে, তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিল। আর নিবৃত্তির সুখ সর্ব্বত্র। তাহার দৃষ্টান্ত ঔশীনরী। তিনি নিবৃত্তির বলে স্বকীয় মর-হৃদয়েও অমরদুর্লভ শান্তিস্থাপন করিলেন। যতদিন হৃদয়ের ঈষৎ প্রবৃত্তিও ছিল, ততদিন তাঁহাকে দুঃখ-কষ্টময় সংসারে পাদচারণ করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু যে দিন হইতে সর্ব্ব-ক্লেশ-নাশিনী নিবৃত্তির যথার্থ সেবা করিতে পারিয়াছেন, সেই দিন হইতেই, তাঁহার যাতনাময় দেহের যেন বিলোপ ঘটিল। তিনি নূতন শান্তোজ্জ্বলদেহ ধারণ করিলেন। তাই তাঁহাকে নাটকের অন্যত্র আর দেখিতে পওয়া যায় না।

প্রবৃত্তির কার্য্য অনন্ত, কিন্তু তাহার ফল অতি অল্প। নিবৃত্তির কার্য্য অতি অল্প বটে, কিন্তু ফল তাহার অনন্ত। প্রবৃত্তিপরায়ণা উর্ব্বশী তাই সারা জীবন, ঝটিকা-পরিচালিত পর্ণের ন্যায় অবশ-ভাবে, কত দুর্গম স্থানে, কত পাহাড়ে, পর্ব্বতে, গহন বনে, তৃপ্তি ভিক্ষা করিয়া ছুটাছুটি করিল, কত দুষ্কর কার্য্য করিল, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তির সন্দর্শন পাইল না। আর নিবৃত্তিমতী দেবী ঔশীনরী ইচ্ছামাত্রেই, আপন অভিপ্রেত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। অশান্ত হৃদয়ে চিরদিনের মত, শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া লইলেন। প্রবৃত্তি-রাক্ষসীর তাড়নে উর্ব্বশীর স্বর্গ-চ্যুতি ঘটিল। মর্ত্তেও একস্থানে দু'দিন সে স্থির হইয়া নিশ্বাস ছাড়িবার অবসর পাইল না। আর নিবৃত্তি-দেবীর আশ্বাস-বাণী সম্বল করিয়া, ঔশীনরী এক প্রকার মোক্ষ লাভ করিলেন। প্রবৃত্তির গতি প্রখর, নিবৃত্তির গতি মন্থর। তাই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তিমতী উর্ব্বশীর

ছায়া, আর কেবল দুইটি স্থলে নিবৃত্তিমতী রাজ্ঞীর আবির্ভাব। উর্ব্বশীর কার্য্যে রাজার তথা রাজ্যের কোনই মঙ্গল হইল না। বরঞ্চ অমঙ্গলই ঘটিল। আর মহিষীর আত্মত্যাগে, রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইল, রাজসংসারে আপতিষ্যমাণ অন্তঃ-কলহের মূলোচ্ছেদ হইল; প্রবৃত্তির এমনই কঠোর শাসন যে, সে শাসনে উর্ব্বশী রমণী হইয়াও মাতা হইয়াও, পুত্রকে অভিনন্দিত করিতে পারিল না। উপেক্ষিত পুত্রের বহুকাল পরে দর্শন-লাভ করিয়াও বিন্দুমাত্র আনন্দানুভব করিল না, পরন্তু পুত্রের উপস্থিতিতে তাহার আত্মসুখের অবসান হইবে—এই ভাবনায়, সে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সমক্ষেই কাঁদিয়া ফেলিল। লালসাময়ীর অতিলালস হৃদয়ে ভোগ-সুখের পরিবর্ত্তে পুত্রপ্রাপ্তি বাঞ্ছিত হইল না। আর নিবৃত্তির মধুর বংশীরবে উন্মাদিনী হইয়া দেবী ঔশীনরী তাঁহার চির-পরিচিত, অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয়, প্রণয়ীর সুখার্থে সহাস্যবদনে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। প্রবৃত্তি তামসী শক্তির আধার, তাই তমোময়-হৃদয়া উর্ব্বশীর স্বর্গ-স্খলন হইল। নিবৃত্তি সাত্ত্বিকী শক্তির কেন্দ্র, তাই সত্ত্ব-গুণময়ী দেবী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রবৃত্তির পরিণাম বন্ধন। স্বর্গবিহারিণী মুক্তপক্ষিণী উর্ব্বশীকে তাই সংসারে আসিয়া সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠাননগরে আবদ্ধ থাকিতে হইল। নিবৃত্তির পরিণাম মুক্তি। রাণী ঔশীনরী তাই সংসারের জটিল গহনজালময় সংসারে থাকিয়াও, যথেচ্ছবিচারিণী বন-বিহগীর ন্যায় বিমুক্ত হইলেন। মহাকবি কালিদাস, এই রূপে, এই নাটকে, অনেকগুলি অমীমাংসিত রহস্যের উদ্ঘাটন এবং মীমাংসা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত আদর্শ রমণীচরিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শ পুরুষের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, তাহা তাঁহার প্রতিপাদ্যও ছিল না।

দ্বি-পঞ্চাশ অধ্যায়।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা।

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব্ব বোধ হইবেক। ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্যন্তের, এবং মহর্ষি কণ্বের পালিত-তনয়া শকুন্তলার, বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের আদি পর্ব্বে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টিগোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনা-শক্তি ও চিত্ত-হারিণী রচনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তল! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য! এই কালিদাস তোমার বয়স্য ও সভাসদ্ ছিলেন; এই অভিজ্ঞান শকুন্তল, তোমার পরিতোষার্থে সর্ব্বপ্রথম উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল[১]।"

"ভারতবর্ষীয়েরাই যে স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে, দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা

১—বিদ্যাসাগর।

ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষ-দেশ-ভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া, এমন প্রীত হইয়াছেন যে, কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং জর্ম্মনি দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফষ্টর কৃত জর্ম্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

'যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল-লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতি-জনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।'—যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন[১]।

"এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয়ে রাজার বিদূষকের সহিত শকুন্তলা-বিষয়ক কথোপকথন ও কণ্বাশ্রমবাসী ঋষিগণ কর্ত্তৃক রাজার নিকটে, কতিপয় রাত্র আশ্রমে আতিথ্য-স্বীকার প্রার্থনা। তৃতীয়ে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার পতিগৃহে প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্যন্ত সমীপে গমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, এবং সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন[২]

১—বিদ্যাসাগর।

২—বিদ্যাসাগর।

শকুন্তলা-প্রণয়নের পূর্ব্বে, কালিদাস, বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচিত করিয়াছেন। একখানি স্বর্গ এবং মর্ত্তের ঘটনায় পরিপূর্ণ অপর খানির ঘটনা-স্থল কেবল মর্ত্ত। এক খানির নায়ক মর্ত্তে অধিবাসী হইয়াও স্বর্গের দেবতার প্রায় সমকক্ষ, দেব-প্রভাব সম্পন্ন, নায়িকাও স্বর্গ-বাসিনী, অপ্সরাদিগের সর্ব্বোত্তমা। আর একখানি নায়ক, মর্ত্তের—ভারতের সম্রাট, নায়িকাও মর্ত্তের সমৃদ্ধি-শালী বিদর্ভ রাজ্যের রাজকন্যা। এক খানিতে অমানুষ বৃত্তান্তই অধিক; দেখি দেখিতে, একটি রমণী মেঘের আকার ধারণ করিতেছে, নায়কও কখন করিরূপে, কখন হংসাকারে, কখন বা মৃগরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন; বিরহের কালে জগতের তাবৎ পদার্থের সহিত আত্ম-সত্ত্ব মিশ্রিত করিয়া, কোন প্রকারে আত্মনির্ব্বাণ প্রার্থনা করিতেছেন। আর একখানির নায়ক, নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিক ঘটনায়, স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপে সামাজিকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহার চরিত্রের কোথাও কোন প্রকার দৈবশক্তির প্রভাব নাই। দৈববলে তাঁহার কোন কার্য্যের সমাধান করিতে হয় নাই। অভিসম্পাতের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয় নাই। ফলতঃ, বিক্রমোর্ব্বশী এবং মালবিকাগ্নিমিত্র দুই খানিই উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য, মহাকবির অলৌকিক কবিত্বতরঙ্গে দুই খানিই তরঙ্গিত, সহৃদয় হৃদয়-গ্রাহী। কিন্তু উহার কোন খানিতেই আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি নাই।

বিক্রমোর্ব্বশীর প্রধান পুরুষ, প্রতিষ্ঠান-পতি পুরূরবা, অপ্সরা সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ নায়ক। সৌন্দর্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার নয়ন-গোচর হয় না। গুণের গণনা তিনি করিতে চাহেন না। বহিঃ-সৌন্দর্য্য চরণে, তিনি অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের বলিদান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বহির্জগৎ তাঁহার প্রধান বিনোদ বস্তু, অন্তর্জগতের শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির কমনীয় ছায়া তদীয় হৃদয়-দর্পণে মুদ্রিত হয় না। তাই তিনি গুণবতী, হৃদয়বতী,

সাধ্বী, পতিদেবতা ঔশীনরীকে উপেক্ষা করিয়া, লালসাময়ী অপ্সরা উর্ব্বশীকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাসনার আপাতরমণীয় মধুর বংশীরবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আত্ম-সত্তায় একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। পুরূরবা ভারত-সম্রাট হইয়াও, আর্য্য-নরপতি হইয়াও রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য-পালন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কদাচ আদর্শ পুরুষ বলিতে পারা যায় না।

আর একজন, মালবিকাগ্নিমিত্রের যিনি নায়ক, সেই অগ্নিমিত্রও ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট, পরম পরাক্রমশালী, অথচ ক্ষমাময়, আত্ম-মর্য্যাদার, তথা ভারত-সাম্রাজ্যের মহনীয় সিংহাসনের অলঙ্ঘ্য মর্য্যাদার রক্ষণে, তিনি নিয়ত তৎপর। তাঁহার অনেক গুণ, অনেক সৎপ্রবৃত্তি। কিন্তু তিনিও প্রণয়ময় হৃদয়। প্রেমময়-হৃদয় তাঁহাকে বলিতে পারি না। বলিতে সাহস হয় না। অমর প্রার্থিত প্রেমরত্নের ঐ প্রকার নিদ্দেশে অবমাননা না হউক, প্রেমের সম্মান করা হয় না। পুরূরবার ন্যায় তাঁহারও প্রণয়োন্মাদ অত্যধিক। কিন্তু তিনি, পুরূরবার মত, প্রণয়ের চরণে আত্মকর্ত্তব্য—রাজার কর্ত্তব্য উপহার দিতেন না। তবে, বহিঃ-সৌন্দর্য্যের অতি-প্রভাবে, প্রতিষ্ঠান-পতির ন্যায় তিনিও বিমূঢ় ছিলেন। বহিঃ-সৌন্দর্য্য তাঁহার এতই সেবনীয় ছিল যে, তিনি, নৃত্যাদি-নিপুণা রূপসী ইরাবতীকে,—যিনি ধারিণীর পরিচারিকা ছিলেন, রাজ-পরিণয়োচিত বংশোদ্ভবা না হইলেও, সেই ইরাবতীকে, মহিষী-পদে সমারূঢ় করিয়াছিলেন। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—এই শাস্ত্রাদেশের অপব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি বিশাল রাজ্যের নিয়ন্তা হইয়াও, পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনটিকে, কেবল আত্ম-সুখের এবং আত্মতৃপ্তির কারণ মনে করিয়াছিলেন। নরনারীর পরিণয়, শুধু সেই পরিণীত দম্পতির নহে, সমাজেরও যে অশেষ-কল্যাণকর, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহাকে আদর্শ-

পুরুষ বলা যায়, যাঁহার চরিতাদর্শে, আত্মদেহের প্রতিবিম্বন করিয়া, সমাজ আপনার দোষ-গুণের, ক্ষতিবৃদ্ধির এবং ত্রুটি ও পরিপূর্ত্তির সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, তাদৃশ আদর্শ চরিত্র অগ্নিমিত্রে নাই। যে উদার এবং মহনীয় চরিত্রের প্রভাবে, সমাজ আপনিই মহনীয় হইয়া উঠে, যাদৃশ চরিত্রের গুণবত্তা-দর্শনে, সমাজে স্বতঃ-প্রবৃত্ত অনুচিকীর্ষার উদয় হয়, এবং ঐ অনুচিকীর্ষা-প্রভাবে, সমাজও ক্রমে 'আদর্শ-সমাজে পরিণত হয়,' তাদৃশ আদর্শ চরিত্র অগ্নিমিত্রে দেখিতে পাই না। যে দেশের এবং যে সমাজের আদর্শ পুরুষ রাম-যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম, কর্ণ-দিলীপ-দুষ্যন্ত, পুরূরবা বা অগ্নিমিত্র সেই দেশের সেই সমাজের আদর্শ পুরুষ হইবার যোগ্য নহেন। আবার যে দেশ, পার্ব্বতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, লোপামুদ্রা, চিন্তা, শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শ রমণী-গণের বরণীয় চরিতালোকে সমুদ্ভাসিত, সেই দেশে পুরূরবার উর্ব্বশীর, বা অগ্নিমিত্রের ধারিণী, ইরাবতী এবং মালবিকার স্থান অনেক নিম্নে। তবে পুরূরবার প্রধান মহিষী দেবী ঔশীনরী আদর্শ-রমণী-শ্রেণির অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও, কিন্তু, তিনি কাব্যের তথা কাব্যোল্লিখিত প্রধানপুরুষের 'উপেক্ষিতা' প্রতিনায়িকামাত্র তাহার চরিত্র কাব্যের উপজীব্য নহে। কেবল প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

পুরাণকর্ত্তাদের গঠিত মূর্ত্তির সহিত, পৌরাণিক কালের পরবর্তী কবিদের নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুলনা করা যদিও অসঙ্গত, তাদৃশ তুলনায় পুরাণ কর্ত্তৃগণের মহিমা যদিও খর্ব্ব করা হয়, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যদি পুরাণকর্ত্তাদিগের রচিত মূর্ত্তির সহিত অন্য কোনও কবির রচিত মূর্ত্তির তুলনা সম্ভবপর হয়, তবে তাহা একমাত্র মহাকবি কালিদাসের অঙ্কিত মূর্ত্তির, অন্যের নহে। পুরাণ-কর্ত্তৃগণ যে সকল সৃষ্টি করিতেন, তাহা বিরাট্, অখণ্ড, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। পূজনীয় ঋষিগণ 'ক্রান্তদর্শী' ছিলেন। যোগবলে, ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেন। হৃদয় তাঁহাদের স্বার্থ-মুক্ত ছিল। আত্ম-পর-ভেদ ছিল না।

এতাদৃশ সমুন্নত হৃদয়ের সুচিন্তাপ্রসূত কল্পনা যেরূপ হইবে, সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ-শীল অপর কোনও ব্যক্তির কল্পনা তাদৃশী হইতেই পারে না। তাই, পুরাণ-কর্ত্তৃগণের পরম আদরের মূর্ত্তি সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা প্রভৃতির তুলনা নাই। ঐ সকল চিত্র ঋষিসৃষ্টির যেমন চরমোৎকর্ষ, একাংশে মালবিকাও তেমনি, পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী কালের কবিসৃষ্টির পরম উৎকর্ষ। সীতা-সাবিত্রী যেমন পৌরাণিক যুগের আদরের মূর্ত্তি, মালবিকাও তেমনি, তৎপরবর্ত্তী কালের কবিদিগের আদরের মূর্ত্তি। মালবিকা যে সময়ের ললনা, তখন ভারতে বিলাসের স্রোতঃ খরতরভাবে প্রবাহিত, ভারত বহিঃশত্রুর আক্রমণভয় হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। তৎকালের কি রাজা, কি প্রজা, কি রাজ-কর্ম্মচারী—বিলাস-মাধুরী সকলেরই একমাত্র অবকাশ-রঞ্জিনী। সুতরাং তৎকালের ললনা মালবিকা, কালানুযায়িনী শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিনী, নৃত্য-গীতাদি-কলা-বিদ্যায় পরম-বিদুষী ছিলেন। সেই সময়ে, তাদৃশ কলাবতী নারীদিগের মধ্যে, মালবিকা অতিউচ্চ-স্থান-ভাগিনী হইলেও কিন্তু, আর্য্য-সমাজের আদর্শরমণীর মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না।

সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে, বিক্রমোর্ব্বশী বা মালবিকাগ্নিমিত্রে, সমাজের হিতকর আদর্শ চরিত্র নাই। মহাকবি, তাদৃশ চরিত্র-চিত্রণে প্রয়াসও করেন নাই। ঐ সকল কাব্যে, কবির প্রতিপাদ্য ছিল প্রণয়-বর্ণনা এবং প্রণয়োন্মাদ-বর্ণনা। মানবহৃদয়ে প্রণয়ের উন্মাদ যে কতদূর চরম-সীমায় উপনীত হইতে পারে, প্রণয়ীর নয়নে প্রণয়ানুকূল পদার্থ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই যে প্রতিবিম্বিত হয় না, হইতে পারে না, প্রণয়ের স্বরূপ, তুমি যতই বড় কল্পনা কর না কেন, তাহা যে তদপেক্ষাও অনেক বড়, অনেক উচ্চ, কল্পনার দ্বারা অপরিমেয়,—ইহাই কবি, ঐ দুই কাব্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রণয়-ধারা আবার যে ভাবে প্রবাহিত হইলে, শুধু প্রণয়ীর নহে, সমাজেরও অশেষ মঙ্গল হয়, প্রণয় যে কেবল প্রণয়ীর নহে,

সুবিশুদ্ধ প্রণয় জগতেরও যে অশেষ তৃপ্তির এবং হিতের সাধন,—ধর্ম্ম-ভাব-শূন্য প্রণয়ে, অথবা প্রণয়চ্ছদ্ম পাশ-বন্ধনে প্রণয়ীর তথা সমাজের এবং জগতের যে পরিমাণে অমঙ্গল, ধর্ম্মভাবময় প্রণয়ে, প্রণয়ীর তথা সমাজ ও জগতের আবার যে তত, অথবা ততোধিক মঙ্গল, এ তত্ত্ব কবি, ঐ দুই কাব্যে উদ্‌ঘাটন করেন নাই। তাই বিক্রমোর্ব্বশী এবং মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচনের পর, মহাকবি, তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রণয়ন করিয়াছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভার, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী কল্পনার ও সর্ব্বাতিশায়িনী রচনার চরম নিকষোপল! স্বরচিত বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে, কবি যে সমুদয় দিব্য দৃশ্যের, দিব্য মূর্ত্তির অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ত শকুন্তলায় আছেই, পরন্তু, শকুন্তলায় আরও এমন অনেক মূর্ত্তি, অনেক বস্তু আছে, যাহা নিজে নিজেই কেবল অনুভব করা যায়, অপরকে অনুভূত করান যায় না, নিজে বুঝা যায়, কিন্তু ভাষার সাহায্যে অপরকে বুঝান যায় না! অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তাই, কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। রসিক সামাজিক যথার্থই বলেন 'কালিদাসস্য সর্ব্বস্বং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।' অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বস্ব, তাঁহার অপার্থিব-কল্পনা-রূপিণী উদ্যান-বাটিকার অমৃতময়ী পারিজাত-লতিকা। প্রেম এবং ধর্ম্ম—উভয়ের সম্মিলনে জগতে যে মধুর আনন্দের উৎস উত্থিত হয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলরূপী স্বচ্ছ দর্পণে তাহাই প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা মহাকবির চরম সৃষ্টি, 'বাণীর বরপুত্রের' অক্ষয় আলেখ্য!

ত্রি-পঞ্চাশ অধ্যায়।

কল্পনা।

কালিদাসের অন্যান্য কাব্য-সম্বন্ধে, তত অধিক না হইলেও শকুন্তলা-সম্বন্ধে, বঙ্গ ভাষায়, এপর্য্যন্ত, অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা প্রভৃতিকে অনেক মনস্বী, অনেকভাবে দেখিয়াছেন, অন্যকেও দেখাইয়াছেন। সুতরাং এই অধ্যায়ে আমি, প্রথমতঃ সংক্ষেপে, সাধারণ-ভাবে, একবার অভিজ্ঞান শকুন্তলের বর্ণিত চরিত্র-সমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শকুন্তলা সম্বন্ধে আমার যাহা যাহা বক্তব্য, এই আলোচিত অংশকে তাহারই সূত্ররূপে ধরিয়া, পরে এই সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিব। আমার ধারণা, ইহাতে মাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির অভিপ্রায়-প্রকাশের সৌকর্য্য হইবে। আর এই অংশ, প্রচলিত শকুন্তলা-সমালোচনা-সমূহের সহিত, মিলাইয়া পাঠ করিবার পক্ষেও বিদ্যার্থি-গণের বিশেষ সুবিধা ঘটিবে।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, পরম শ্রদ্ধেয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছিলেন যে, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা কাব্যের 'উপেক্ষিতা।' কবির ঝঙ্কার বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়, মুহূর্ত্তমধ্যে দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তখন অনেকেরই মুখে ঐ এক কথা—'কাব্যের উপেক্ষিতা।' আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কথাটার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম,—অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র, যেমন গিরিজায়ার পর্য্যন্ত বিবাহ দিয়াছেন, কালিদাসও যদি, তেমনি, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার পর্য্যন্ত বিবাহ দিতেন, গিরিজায়ার ন্যায়, তাঁহাদিগকেও দুইটি ছোট ছোট নায়িকা সাজাইতেন, তবে তাহাই কি আমাদের বর্ত্তমান সুধী-সমাজের রুচি-সঙ্গত হইত? সখীদ্বয়ের 'উপেক্ষিতত্বের' নিরাস হইত? শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, তাহা হইলে কবিরও প্রমাদ, পাঠকেরও প্রমাদ।

দেখিলাম, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহে, বিলক্ষণ অপেক্ষিতা। মহাভারতের শকুন্তলা বড় মুখরা, প্রগল্‌ভা, যেন পরিণত-বয়স্কা কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী গৃহিণী। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের চক্ষে, তদীয় সর্ব্বোত্তম নাটকের প্রধান নায়িকার এ মূর্ত্তি অতি বিষম এবং অসুন্দর বোধ হইল। পৌরাণিক শকুন্তলার ন্যায়, কালিদাসের শকুন্তলাও যে নিজেই রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিবে, নিজের দূতী সাজিয়া অভিসারে যাইবে, কালিদাসের ইহা সুন্দর বোধ হইল না। তাই তাঁহাকে, মহাভারতের শকুন্তলা ভাঙ্গিয়া, স্বকীয় অনুপম কবিত্বের উপযোগিনী করিয়া, নূতন শকুন্তলা গঠন করিতে হইল। সৌন্দর্য্যের অনুরোধে, তাঁহাকে, মহর্ষি-ক্ষুণ্ণ-পথ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, এক নূতন পথে যাত্রা করিতে হইল। এক শকুন্তলার চিত্র নিরবদ্য করিবার নিমিত্ত, দুইটি সখীর সৃষ্টি করিতে হইল। মনে করুন, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা যেন নাই, আর শকুন্তলা একাকিনী, জনহীন আশ্রমে, রাজার পুরোবর্ত্তিনী হইয়া, প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়েই আপনি আপন পরিচয় প্রদান করিতেছেন, সেই বসন্তকালবৃত্ত মেনকা-বিশ্বামিত্র সংবাদ, রাজাকে নিজেই গাহিয়া শুনাইতেছেন, তাহা হইলে সে গান মিষ্ট লাগিত কি? স্বাভাবিক হইত কি? সৌন্দর্য্য-বিকাশের অনুকূল হইত কি? যদি না হয়, তবে একজন সখী বা দূতীর প্রয়োজন। কুমারসম্ভবেও দেখিয়াছি, কালিদাস, চন্দ্রশেখরের সম্মুখে, পার্ব্বতীর একজন সখীর দ্বারাই পার্ব্বতীর অনেক কথা বলাইয়াছেন। পার্ব্বতীকে বেশী কথা বলিতে দেন নাই।

আচ্ছা স্বীকার করিলাম যে, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইলে, এক জন সখী বা দূতীর প্রয়োজন, কিন্তু দুজন কেন? এবার সমস্যা কিছু কঠিন। কালিদাস কিন্তু দেখিলেন, যে, একজন সখীতে, প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। একজন সখীতে, চরিত্রে শবলতা-দোষ জন্মিবে। কালিদাসের শকুন্তলা ব্যাসের শকুন্তলার ন্যায় ঋষিকন্যা নহেন।

তিনি অপ্সরার কন্যা। কন্যার উপর মাতৃ-প্রভাব বড়ই প্রবল। অপ্সরার কন্যা না হইলে অত রূপ, অমন 'প্রভা-তরল' দেহ-জ্যোতিঃ 'বসুধাতলে' কদাচ সম্ভবিতে পারে না। অপ্সরার আত্মজা হইলেই শকুন্তলাকে পদে পদে মোহে আত্মবিস্মৃত হইতে হইবে। আত্ম-বিস্মৃতির পরিণাম বিপৎসঙ্কুল। সুতরাং শকুন্তলার সেই ঘোর আত্ম-বিস্মৃতির সময়ে, সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে পারে, এমন একজন লোকের প্রয়োজন। যদিও শকুন্তলার পিতা কণ্বের আশ্রমেই গৌতমী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অগ্রজ কণ্বকে লইয়াই ব্যস্ত, অগ্রজের সেবা ও তাঁহার গুণ-গান লইয়াই গৌতমী-চরিত্র। তিনি তপঃকৃশ কণ্বের প্রতি উদাসীন হইয়া কদাচ শকুন্তলার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতে পারেন না।

তাহা হইলেই দেখিতেছি, কালিদাসের শকুন্তলাকে লোকের নয়ন-পথবর্ত্তিনী করিতে হইলে, তাঁহার সহিত একজন দূতী এবং একজন তত্ত্বাবধায়িকার আনয়নও একান্ত অপেক্ষিত। এই দুইজনের মধ্যে যিনি দূতী, তিনি যে কেবল প্রেমের দূতী, তাহা নহেন। তিনি দূতী, সকলের নিকটেই দূতী। তিনি তাত কাশ্যপের দ্বারা শকুন্তলার পরিণয় অনুমোদিত করাইয়া, সেই সংবাদ লইয়া, অনসূয়ার নিকটে দৌত্য করেন। অসৎকৃত অতিথি দুর্ব্বাসা যখন শাপ দিয়া চলিয়া যান, তখন তিনিই কোপ-রক্তনয়ন দুর্ব্বাসার নিকটে শকুন্তলার দুঃখের দূতীরূপে উপনীত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সম্পদে, বিপদে, যখনই আবশ্যক, তিনি দূতীর কার্য্য করেন। আবার যিনি তত্ত্বাবধায়িকা, তিনিও সর্ব্বত্রই শকুন্তলার রক্ষণতৎপরা। শকুন্তলার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত তাঁহার যেন অন্য কার্য্যই নাই। অপ্সরার কন্যা শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া অবধি আত্ম-বিস্মৃতা, আশ্রম-বিরোধী বিকার-গ্রস্তা, কিন্তু তত্ত্বাবধায়িকার তাঁহার প্রতি আদ্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রথম অঙ্কে, তৃতীয়ে, ও চতুর্থে—সর্ব্বত্রই তিনি বিমুগ্ধা শকুন্তলার মঙ্গলার্থিনী তত্ত্বাবধায়িকা, স্নেহময়ী পরিপালিকা। দুষ্যন্তের নিকট,

কণ্বের নিকট, দেবতাদের নিকট, সর্ব্বত্রই তিনি শকুন্তলার তত্ত্বাবধায়িক শকুন্তলার সন্তোষ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষিকা। সুতরাং কালিদাসে শকুন্তলায়, এই দুইটি সহচরীই একান্ত অপেক্ষিতা, দুইটির কোনটিঃ 'উপেক্ষিতা' নহে। 'উপেক্ষিতা' নহে বলিয়াই, 'গিরিজায়া' নহে বলিয়াই, কণ্বমুনি, তাঁহাদিগকে শকুন্তলার সঙ্গে হস্তিনা-পুরের রাজবাড়ীতে প্রেরণ করিলেন না। বলিলেন—'ইমে অপি প্রদেয়ে১।'

কালিদাস নামের দ্বারাই, এই দুইটির প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়াছেন, দূতী যিনি, তিনি 'প্রিয়ংবদা', বড়ই মিষ্টভাষিণী, সরস আলাপিনী কিন্তু তাঁহার সে সরসালাপে তীব্রতা নাই। সে সরসতা আমোদিনী কিন্তু মর্ম্ম-ভেদিনী নহে। তাহার রসিকতায় রসের ভাগই অধিক, ব্যঙ্গের ভাগ তাহাতে একেবারেই নাই। আর যিনি তত্ত্বাবধায়িকা বা পরিরক্ষিকা, নিরন্তর শকুন্তলার ভাবনাতেই যিনি আকুল, তাঁহার নাম অনসূয়া। অনসূয়ার অর্থ, পরের মঙ্গলে যাঁর দ্বেষ নাই, পরে ভাল দেখিলে, যাঁহার চক্ষে যন্ত্রণা হয় না, যিনি গুণে গুণই দেখেন, দোষ দেখেন না, নিরর্থক দোষারোপ করেন না।

বল দেখি, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টির প্রতি কালিদাসের সমধিক আদর? নিশ্চয়ই অনসূয়ার প্রতি। কারণ, শকুন্তলার সর্ব্বে সকল কার্য্যেই অনসূয়া অগ্রবর্ত্তিনী আর প্রিয়ংবদা তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী। শকুন্তলা 'ইদো ইদো সহীয়ো,'—বলিয়া ডাকিবার পরই, অনসূয়া প্রথম কথা কহিলেন। রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলা অন্যমনস্কা হইলে, অনসূয়াই তাহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারিলেন। তৃতীয় অঙ্কেও বিরহ কাতরা শকুন্তলার শোচনীয় অবস্থা-দর্শনে তাঁহারই প্রথম ভাবনা। তিনিই প্রথমে শকুন্তলাকে, তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। চতুর্থ অঙ্কেও, শকুন্তলার শুভানুধ্যান-পরা অনসূয়ার

১—৪র্থ অঙ্ক, ইহাদিগকেও সম্প্রদান করিতে হইবে।

প্রথম, উপস্থিত হইয়া, দেবার্চ্চনার জন্য কুসুম-চয়ন করিতে গেলেন। শকুন্তলার মনের বেদনা তিনিই ভাল বুঝেন, তিনিই ভাল জানেন। তাই বলিতেছিলাম, অনসূয়া কবির সমধিক আদরিণী।

আবার দূতীকর্ম্মে প্রিয়ংবদাও কম দক্ষা নহেন! 'এ গাছটিতে জল দাও, এইখানে এম্‌নি ভাবে একবার সোজা হইয়া দাঁড়াও, ভ্রমরের অত্যাচার, আমি কি করিব? দুষ্মন্তের দোহাই দাও,'—এ সমস্তই মঞ্জু-ভাষিণী-প্রিয়ংবদার উক্তি। রাজার সমক্ষে, শকুন্তলাকে দণ্ডায়মানা করিয়া, তাঁহার জন্মবৃত্তান্তের 'প্রত্নতত্ত্বটাও' প্রিয়ংবদাই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। প্রিয়ংবদার অপত্রপ আলাপে, শকুন্তলা যখন চলিয়া যাইতে চান, তখন আবার, প্রিয়ংবদা নিজেই নিষেধ করিয়াছিলেন, নিষেধ না মানিলে, তিনিই গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। আতিথ্যের যদি কোনও ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনিই রাজার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ফুলের মধ্যে লুকাইয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন, গান্ধর্ব্ব বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। আপন্ন আশ্রমবাসীর আপন্-নিবারণ রাজার প্রধান কর্ত্তব্য—বলিয়া, এই বালিকা প্রিয়ংবদাই প্রবীণ ভারতেশ্বরকে রাজ-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার অবসর বুঝিয়া, 'হরিণ ধরিতে চল' বলিয়া এই প্রিয়ংবদাই সরলপ্রাণা অনসূয়াকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রিয়ংবদা-চরিত্রের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, প্রবাস-প্রত্যাগত কণ্বের অগ্নি-শরণ-গৃহে যে দৈববাণী হইয়াছিল, যে দৈববাণীর উপর বিশ্বাস করিয়া, কণ্ব শকুন্তলার গুপ্ত পরিণয়-ব্যাপার অনুমোদন করিয়াছিলেন, সেটিও বুঝি বা প্রিয়ংবদারই কীর্ত্তি!

তার পর শকুন্তলা। এ জাতীয় প্রেমের কথা কালিদাস আর লেখেন নাই। তাঁহার মালবিকা বালিকা হইয়াও বেশ প্রাধান্যময়ী, হৃদয়ের ভাব-গোপনে বিশেষ পারদর্শিনী। মালবিকার মুখ দেখিয়া

মনের ভাব বুঝিবার সাধ্য নাই। বিদূষক কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, বকুলাবলিকা অনেক প্রয়াসে, তাঁহার মনের কথা বাহির করিয়াছিলেন। আর শকুন্তলার মাত্র মুখ দেখিয়াই, অনসূয়া, শকুন্তলার হৃদয়খানি পর্যান্ত বুঝিয়া লইলেন। কালিদাসের উর্ব্বশী পুরূরবার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তিনি প্রৌঢ়া, আপন অভিপ্রায় সাধন করিতে তিনি কদাচ বিস্মৃত হইতেন না। আর শকুন্তলা এসব কিছুতেই নাই। তিনি প্রথম হইতেই একবারে যেন গলিয়া পড়িলেন। তাই বলিতেছিলাম, এ জাতীয় প্রেমের কথা কালিদাস আর লেখেন নাই।

মহাভারতের যে শকুন্তলা, ভারতেশ্বরের ঋদ্ধিমতী পরিষদে প্রগল্ভার ন্যায় বক্তৃতা দ্বারা, পরিণয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্বীকৃত রাজাকে অপ্রস্তুত করিয়া, 'আপনার' 'সত্ব' সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই শকুন্তলার কমনীয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে, মহর্ষি কণ্বের দুইটি শিষ্য ও বর্ষীয়সী ভগিনীকে প্রেরণ করিয়াছেন। এবং রাজার চরিত্র রক্ষার নিমিত্ত দুর্ব্বাসার শাপের সৃষ্টি করিয়াছেন।

মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার প্রকৃতি, পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এমন আত্মহারা মেয়ের অদৃষ্টে দুঃখ অনিবার্য্য। তাই তিনি, তাঁহার 'দ্বিতীয় উচ্ছ্বসিত'-রূপিণী শকুন্তলার গ্রহ-শান্তির জন্য, সোমতীর্থে গিয়াছিলেন।

সংসারে বাল-বিধবাদিগকে অন্য-মনস্ক রাখিবার জন্য, শোকার্ত্ত পিতামাতা যেমন, তাহাদিগকে গৃহকার্য্য এবং দেব-সেবায় নিযুক্ত করেন, সেই প্রকার, মহর্ষি কণ্ব, তীর্থপ্রয়াণ কালে, নবনীত হৃদয় শকুন্তলাকে আশ্রমের কর্ত্রী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম যে অতিথি-সেবা, তাহাতেই শকুন্তলাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, আশ্রম-কর্ম্মে নিরত থাকিলে, শকুন্তলা হয় একটু শক্ত-সমর্থ হইবেন, তাঁহার শরীর একটু কষ্ট-সহিষ্ণু হইবে, আশ

মোচিত তপঃক্ষাম হইবে, আর সেই সঙ্গে শকুন্তলা নিজেও, কাজকর্ম্মে, কতকটা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিবেন। হৃদয় শূন্য পাইলেই তাহাতে নানাবিধ চিন্তা উদিত হইবার অবসর পায়। কর্ম্মঠ হৃদয়ে সে অবসর প্রায়ই ঘটে না। তাই কবি এই ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মহর্ষির এ গণনায় ভুল হইল। তিনি ঋষি, চিরদিন কঠোর তপশ্চর্য্যাই করেন, প্রেমের প্রভাব ত তিনি বিদিত নহেন! তাই তাঁহার এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। শকুন্তলা সব ফেলিয়া, আত্মহারা হইলেন। অতিথি-সৎকার, যেটি আশ্রমের প্রধান ব্রত, সেটিকে পর্য্যন্ত ভুলিলেন। কিন্তু সমাজের কঠোর শাসন বড়ই নির্দ্দয়, বড়ই নির্ম্মম। সেই কঠোর শাসনের নিষ্করুণ মূর্ত্তি—দুর্ব্বাসা। তিনি বালিকা শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিলেন না, শকুন্তলার মনের কোমলতা বুঝিলেন না। শকুন্তলা আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, আপনার চিন্তায় সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, আত্মার্থে সমাজকে অবমানিত করিয়াছেন, তাই সমাজের প্রতিনিধি-রূপী দুর্ব্বাসা, তাঁহাকে কঠোর শাস্তি দিলেন,—'তুই যাহার চিন্তায় আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলি, সে তোকে বিস্মৃত হইবে।'

কণ্ব মুনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সব শুনিলেন, অথবা দেখিয়াই বুঝিলেন, বুঝিলেন যে, এ মেয়েকে আশ্রমে রাখা আর উচিত নহে। তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু মহর্ষি গম্ভীর-প্রকৃতি ও করুণাময়। তাই বিরক্তির কোনরূপ চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। বরং 'উত্তম হইয়াছে, আমি যেরূপ পাত্র চাহিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। শকুন্তলা সৎপাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। রমণীর পতিগৃহে, পতির সমীপে থাকাই সঙ্গত''—বলিয়া তিনি, শকুন্তলাকে আশ্রম হইতে বিদায় করিলেন। তার পর, শকুন্তলার আর কোন সংবাদ লইলেন না। তাঁহার করুণাময়ী মূর্ত্তির উপাসক শারদ্বত, প্রত্যাখ্যান-কালে, শকুন্তলাকে বলিয়া দিলেন—

১—শকু, ৪র্থ অঙ্ক।

'পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্'[১]।

সেই সঙ্গে আরও বলিলেন—

'—কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া'[২] ?'

এতক্ষণে শকুন্তলার মোহভঙ্গ হইল। তখন আবার, কণ্বের কঠোর মূর্ত্তির সেবক, সেই রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—

'আঃ পুরোভাগিনি !
অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাত-হৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্'[৩] ॥

অভাগিনী শকুন্তলার ক্রন্দন ভিন্ন আর গতি রহিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজ-পুরোহিতের সহিত তাঁহার বাটীতে চলিয়া গেলেন ! রাজবাটীতে কণ্বদুহিতার একটু স্থান হইল না !!

১—শকু, ৫ম অঙ্ক ;—পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি-গ্রহণও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য।

২—ঐ, ৫ম অঙ্ক ;—কুলত্যাগিনী তুমি, তোমার দ্বারা পিতার লাভ কি ?

৩—ঐ, ৫ম অঙ্ক ;—আঃ দোষ-দর্শিনি ! এই জন্যই বিশেষ-পরীক্ষা-পূর্ব্বক প্রণয়-বিধান কর্ত্তব্য। অজ্ঞাত হৃদয়ে আত্ম-সমর্পণ ঐরূপ শত্রুতাতেই পরিণত হইয়া থাকে।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সৃষ্টি-কৌশল।

এতক্ষণে, সাধারণ ভাবে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষণে, আরও একটু গভীর ভাবে কবির সৃষ্টি-কৌশল বুঝিতে চেষ্টা করি। ইতিপূর্ব্বে কালিদাসের যে দুইখানি নাটকের সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত, শকুন্তলার একটি বিষয়ে যে পার্থক্য আছে, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং প্রথমতঃ তাহাই উল্লেখ্য।

মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক রাজা অগ্নিমিত্রের তিনটি মহিষী। ধারিণী, ইরাবতী ও মালবিকা। ধারিণীই প্রথম এবং প্রধান মহিষী। পরে ইরাবতী। তার পর মালবিকা। মালবিকাগ্নিমিত্র স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান কাব্য। কবি রঙ্গমঞ্চে তিন মহিষীকেই আনয়ন করিয়াছেন; একজন, পুরুষ, আর তাঁহার তিনটি স্ত্রী। যেন বঙ্গের কৌলীন্য! বিক্রমোর্ব্বশীতেও দেখি, কাব্যের প্রধান পুরুষ, রাজা পুরূরবা, আর তাঁহার প্রণয়িনী দুইটি, ঔশীনরী ও উর্ব্বশী। প্রধান ঔশীনরী আর অপ্রধান উর্ব্বশী। কবিগণ স্থলবিশেষে বিধাতৃ-সৃষ্টির অনুগামী, আবার স্থলভেদে, কবি-সৃষ্টি বিধাতৃ-সৃষ্টির অতিশায়িনী। তাই বিধাতৃ সৃষ্টির ন্যায়, কবি-সৃষ্টিতেও আজ যিনি প্রধান, কাল তিনি অপ্রধান। তাই প্রধান মহিষী ধারিণী ও ঔশীনরীর প্রাধান্য লোপ হইল, আর অপ্রধান ইরাবতী ও উর্ব্বশীর প্রাধান্য ঘটিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া প্রণয়ের হেমকান্তি, কবিগণ, সম্যক্ প্রকারে ফুটাইতে পারেন না। শ্রব্যকাব্যে কবিদিগকে এতটা নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না। কিন্তু দৃশ্যকাব্যে দর্শকদিগের অভিনয়-দর্শন করিয়াই মাধুর্য্যোপলব্ধি করিতে হয়, ধীরে ধীরে ভাবিয়া 'ভাবিয়া রসগ্রহ করিবার' অবসর তাঁহাদিগের ঘটিয়া উঠে না। তাই

দেখিতে পাই, শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যেই কবিগণ, এই নায়িকা-বাহুল্যের অনুসরণ করেন। নিকষোপলে কর্ষণ করিলে, যেমন কাঞ্চনের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া পড়ে, তদ্রূপ, প্রতিঘাতেও প্রণয়ের প্রকৃত রূপ, প্রকৃত লাবণ্য প্রকাশিত হয়। দর্শকগণ অতি সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

পূর্ব্বে—নাটক-রচয়িতা কবিগণের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে, সকল-লোক-মোহনের জন্য, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমূহ রচিত, পঠিত, কীর্ত্তিত ও গীত হইত। লোকে ভক্তির সহিত ঐ সকল বিরাট-সৃষ্টিময়ী ঋষিরচনা পাঠ করিত। ঐসকল পুরাতন কাব্যে কবিত্ব আছে, রচনা আছে, উপদেশ আছে, আনন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, অথবা এক কথায় বলিলে বলা যায় যে, সব আছে, কেবল একটি জিনিষ নাই। পাঠকের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই। পাঠক-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিমাণে ঐ সমুদয় কাব্য রচিত হয় নাই। গ্রন্থ-রচনার সময়ে, যদি পরের মুখের দিকে চাহিয়া, গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের সঙ্কোচ বা প্রসারণ করিতে হয়, তবে, তদপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনার বিষয় লেখকের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। ঋষিগণ লোকহিতার্থে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া, লোকের, তথা সমাজের শিক্ষার নিমিত্ত বিরাট মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেন, অমন পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তির সৃষ্টি-বিধান অন্যের পক্ষে,—অনার্য ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। ঋষিগণের রজোমুক্ত হৃদয়ে, যাহা লোকহিতানুকূল বোধ হইত, তাহাই, তাঁহারা প্রচারিত করিতেন। পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাদিগকে গ্রন্থ বিরচন করিতে হইত না। তাই ঋষিদিগের কাহাকেও কালিদাস বা ভবভূতির ন্যায়, 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং[১]'।

১—শকু, ১ম অঙ্ক ;—আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।

কিংবা 'যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং১' বলিয়া সমাজিকের হৃদয়াকর্ষণ করিতে হয় নাই। তাঁহাদের রচিত কাব্য, পাঠ্য, গেয়, এবং শ্রাব্য ছিল, অভিনেয় বা দৃশ্য ছিল না। ক্রমে পরে এমন সময় আসিল, যখন পড়িবা শ্রবণ করিবার সময় নাই, অথবা শুনিয়া শুনিয়া, সে কল্পনার অমৃতহ্রদে, সেই ভাবের সমুদ্রে ডুবিবার, এবং ডুবিয়া রসগ্রহ করিবার অবসর নাই, তখন দেখা আবশ্যক হইল, দেখিয়া বুঝা আবশ্যক হইল। এইরূপে, ক্রমে শ্রব্যকাব্যবহুল ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের অর্থাৎ নাটকের সৃষ্টি হইল। যে পদার্থ দেখিয়া দেখিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা যত ভাল করিয়া দেখান যায় ও দেখা যায়, ততই মঙ্গল। যিনি দেখিবেন এবং যিনি দেখাইবেন—সে উভয়েরই তৃপ্তির কারণ। তাই নাটককারদিগকে, দর্শকগণ কোন্ পদার্থ কি ভাবে দেখিতে চান্, তাহা বিবেচনা করিয়া নাটক প্রণয়ন করিতে হইল। শ্রব্যকাব্যে যে বস্তু অনুমানের সাহায্যে বুঝিতে হইত, দৃশ্যকাব্যে তাহা দেখিয়া বুঝিতে হইবে। অনুমানের শক্তি অসীম, আর দর্শনের শক্তি পরিমিত। যতটুকু দেখিবে, তদতিরিক্ত বোধ করাইবার ক্ষমতা দর্শনের নাই। তাই নাটককার কোথাও অনুযোগী কোথাও বা প্রতিযোগী পদার্থের সাহায্যে প্রতিপাদ্যের বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, একটি নায়ক বা নায়িকার চরিত্র ফুটাইতে যাইয়া, কবিদিগকে, আরও দুই তিনটি প্রতিনায়ক এবং প্রতিনায়িকার শরণ লইতে হইয়াছে। মাধবের প্রতিনায়ক নন্দনের এবং মালবিকার প্রতিনায়িকা ধারিণী ও ইরাবতীর সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

১—মালতীমাধব, ১ম, অঙ্কঃ—যে নামকেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোঽহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

বঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিক অমর বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসাবলীর কোনখানিতে দুইটি স্ত্রী, একটি পুরুষ, কোনখানিতে আবার একটি স্ত্রী, আর তাঁহার প্রণয়ার্থী পুরুষ দুই জন। কিন্তু ইহাই যে কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, এ কথা বলা যায় না। ফুল আপন সৌরভে যদি বন আমোদিত না করে, তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট ফুল বলিব কেন? রত্নের সৌন্দর্য্য যদি দীপের সাহায্যে দেখিতে হয়, তবে তাহাকে 'সর্ব্বোত্তম রত্ন'—এ আখ্যা দেওয়া যায় না। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচনের পর, শকুন্তলার প্রণয়নকালে, কালিদাস তাই, এক নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন। শকুন্তলার নায়ক একজন, নায়িকাও একাকিনী। প্রতিনায়ক বা প্রতিনায়িকার সাহায্যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার চরিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে হয় নাই। সুরভি কুসুম যেমন আপন সৌরভে সমস্ত বনস্থলীকে সৌরভময়ী করিয়া তুলে, তদ্রূপ, দুষ্যন্ত-শকুন্তলাও আপন চরিত্রসৌন্দর্য্যে সামাজিকদিগকে বিমুগ্ধ ও আত্ম-বিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই বলিয়াছি, অভিজ্ঞান-শকুন্তল কবি-সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। বীণাপাণির কমনীয় কণ্ঠহারের দ্যুতিময় মধ্যমণি।

তবে এই চরম উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, কবিকে দুর্ব্বাসার শাপ, দৈববাণী প্রভৃতি কতিপয় অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেই সেই উপায়, নাটকীয় বস্তুর অর্থাৎ অভিনেয় পদার্থের একান্ত অনুকূল হইয়াছে সত্য, কবির অনুপম কল্পনার প্রভাবে সে সমুদয় অতিশয় সুসংলগ্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু কবির কল্পনাকে স্বর্গমর্ত্তরসাতল পর্য্যটন করিতে হইয়াছে। কালিদাস স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল-ব্যাপিনী কল্পনার রাজা ছিলেন, তাই তিনি, অন্য-চরিত্র-নিরপেক্ষ হইয়াও, কেবল শকুন্তলার দ্বারা শকুন্তলার এবং দুষ্যন্তের দ্বারা

দুষ্যন্তের চরিত্র ফুটাইতে পারিয়াছেন। অন্যের পক্ষে ইহা অতীব দুষ্কর। এতক্ষণে বুঝিলাম, দুষ্যন্ত নিজের চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, আর শকুন্তলাও আত্ম-চরিত্রের প্রভাবে অনন্ত প্রভাব-সম্পন্না ইঁহাদের কেহই কখন সুখে, দুঃখে, মোহে আত্ম-চরিত্রের প্রভাব-বিচ্যুত হয়েন নাই। মহাভারতের দুষ্যন্ত বা শকুন্তলার চরিত্র এমন প্রভাবপূর্ণ বা সুদৃঢ় নহে।

মহাভারতে আছে,—একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, রাজা দুষ্যন্ত, অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন, কণ্ব অনুপস্থিত, আশ্রমে শকুন্তলা একাকিনী। শকুন্তলাকে দেখিয়াই দুষ্যন্ত অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি ভারতের অপ্রতিরথ সম্রাট্, তাঁহার অভিলাষ অপূর্ণ থাকিবার নহে। তিনি শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা নিজেই সে কাহিনী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুষ্যন্তকে বিবৃত করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, শকুন্তলা বলিলেন, 'রাজন্! আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমার পিতা ফলাহরণ করিতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন, তিনি আসিয়া আমাকে সম্প্রদান করিবেন।' অসহিষ্ণু দুষ্যন্ত শকুন্তলার এ নিষেধ শুনিলেন না। নানাবিধ প্রলোভন-বাক্যে শকুন্তলাকে বিমুগ্ধ করিয়া, রাজা তাঁহার পাণিপীড়ন করিলেন। কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়াই দুষ্যন্ত প্রস্থানোদ্যত হইলেন, এবং শকুন্তলাকে বলিলেন, 'আমি চলিলাম' শুচি-স্মিতে! সত্বরই বিপুল বাহিনী প্রেরণ-পূর্ব্বক, আমি তোমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া যাইব। এখন আমি যাই।'—এই বলিয়া, 'তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন কণ্ব যখন এই ব্যাপার বিদিত হইবেন, তখন কি হইবে?'—ভাবিতে ভাবিতে, দুষ্যন্ত বিরস-হৃদয়ে, প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তপরেই কণ্ব আসিলেন, কিন্তু সলজ্জ-হৃদয়া ভাবময়ী শকুন্তলা, আর পূর্ব্বের ন্যায় পিতা কণ্বের সম্মুখে

যাইতে পারিলেন না। দিব্য-চক্ষুঃ মহর্ষি সমস্তই বুঝিলেন, এবং শকুন্তলাকে অভয় দিলেন। যথাকালে শকুন্তলার একটি অমিততেজা কুমার ভুমিষ্ঠ হইল। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সেই কুমারকে লালনপালন করিয়া, মহর্ষি কণ্ব, পুত্রবতী শকুন্তলাকে শিষ্য-পরিবৃত করিয়া, দুষ্মন্তের নিকটে প্রেরণ করিলেন। হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং দুষ্যন্তের সেই সকল আশ্বাসবাণী, প্রলোভন-বাক্য, একে একে স্মরণ করাইয়া দিলেন। রাজার সকল কথাই মনে পড়িল। কিন্তু লোক-লজ্জা-ভয়ে সমস্তই অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলা রাজাকে অনেক প্রকারে স্মারিত করিতে প্রয়াস করিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা-বিস্মৃত রাজার কিছুই মনে পড়িল না। তখন শকুন্তলা একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া, রাজাকে নানা প্রকার কটূক্তি করিলেন। রাজাও শকুন্তলাকে অকথ্য ভাষায়, নানাবিধ তিরস্কার করিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। রাজা কিছুতেই যখন আত্মকৃত কার্য্য স্বীকার করিলেন না, তখন ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠী তাপসী-বেশ শকুন্তলা কহিলেন, 'আমি আশ্রমে ফিরিয়া চলিলাম, কিন্তু তোমার এই পুত্র রহিল, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তুমি ইহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য।' রাজা দেখিলেন—প্রমাদ! তিনি অমনি রাজনীতি-বিশারদের ন্যায় বলিলেন,—

> ন পুত্রমভিজানামি ত্বয়ি জাতং শকুন্তলে।
> অসত্য-বচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ?
> মেনকাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা, মহর্ষীণাং পিতা চ তে।
> তয়োরপত্যং কস্মাৎ ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে?
> অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে?
> বিশেষতো মৎসকাশে? দুষ্টতাপসি! গম্যতাম্।

সর্ব্বমেতৎ পরোক্ষং মে যৎ ত্বং বদসি তাপসি।
নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া[১] ॥

রাজার উক্তি শুনিয়া শকুন্তলার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি রাজাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। শেষে তিনি, যখন পুত্রকে রাজার নিকটে রাখিয়া, স্বয়ং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে, হঠাৎ আকাশবাণী হইল যে, শকুন্তলা রাজার পরিণীতা ভার্য্যা, এই পুত্র রাজার আত্মজ। রাজার সকল রহস্য উদ্ভিন্ন হইল। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া, পুত্রবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন। অনেক কটূক্তি করিয়াছেন, তাই লজ্জা হইল। তাঁহাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল, যে, শকুন্তলা যে তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা, এবং এই বালকও যে তাঁহারই পুত্র, ইহা তিনি জানিতেন, তবে লোক-লজ্জা-ভয়ে, এসমস্ত জানিয়াও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারতের এই উপাখ্যান-ভাগে, দুষ্যন্ত-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই; বরং তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দুষ্যন্ত একজন ঘোর প্রবঞ্চকও সাজিতে পারেন। এই মহাভারতীয় দুষ্যন্ত-চরিত্রের, অনেকে আবার অনেক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার

১—মহাভারত, আদি, অধ্যায় ৭৪। যথাক্রমে শ্লোক—

৭৩—শকুন্তলে! তোমার পুত্রকে আমি চিনি না। নারীজাতি মিথ্যাবাদিনী, সুতরাং কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে?

৭৬—তোমার মাতা মেনকা অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা, পিতা তোমার মহর্ষিবৃন্দের বরেণ্য। তাঁহাদের সন্তান হইয়া, কেন তুমি ব্যভিচারিণীর ন্যায় আলাপ করিতেছ?

৭৭—একেত মিথ্যা বাক্য, তাহাতে আবার আমার নিকটে? ছি? তোমার কি এই সকল কথা কহিতে লজ্জা হইতেছে না? দুষ্টতাপসি! যেথানে ইচ্ছা প্রস্থান কর।

৮১—তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, সে সমস্তই আমার পরোক্ষের ঘটনা, আমি তোমাকে চিনি না। যেথানে ইচ্ছা, যাইতে পার।

নিষ্কলঙ্কত্ব-প্রতিপাদনে যত্ন করিয়া থাকেন, এস্থলে তাহা অনালোচ্য। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস দেখিলেন, মহাভারতের দুষ্যন্ত-চরিত্রে, ইন্দ্রিয়েরই প্রবল প্রতাপ, মনের প্রতাপ তাহাতে একবারেই নাই। প্রবল ইন্দ্রিয়-শক্তির নিকট, দুষ্যন্তের মানসিক শক্তির বিকাশই হইতে পারে নাই। তাই তিনি, মহাভারতীয় উপাখ্যানে যাহা নাই, সেই দুর্ব্বাসার শাপের সৃষ্টি করিয়া, দুষ্যন্ত-চরিত্রের দূষণীয় ভাগের পরিহার করিলেন। মহাভারতের কবি যে চরিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন, শকুন্তলার কবি, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া, এক অপূর্ব্ব, সমাজ-হিতকর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিলেন। দুষ্যন্তের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ-কারের সময়ে, শকুন্তলার সঙ্গে দুইটি সখীর সৃষ্টি করিয়া, এবং হস্তিনাপুরে রাজার সম্মুখে যখন শকুন্তলা উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার সঙ্গে দুই জন শিষ্য ও 'আর্য্যা গৌতমীকে' প্রেরণ করিয়া, কবি, শকুন্তলার চরিত্র পরিমার্জ্জিত ও সর্ব্বাংশে নিরবদ্য করিয়া লইলেন। কোন সময়েই কালিদাসের শকুন্তলাকে, মহাভারতের শকুন্তলার ন্যায়, প্রগল্‌ভা, কটুভাষিণী, অপত্রপা, ক্রোধান্ধা বা বহুজল্পিনী হইতে হয় নাই। কালিদাসের শকুন্তলা প্রথমেও যেমন মঞ্জুভাষিণী, মুগ্ধ-হৃদয়া, সারল্যময়ী, শেষেও ঠিক সেইরূপ। মহাভারতে যেমন কলহ অমনিই প্রণয়, যেমন প্রত্যাখ্যান অমনিই স্বীকার। আর কালিদাসের শকুন্তলার কলহের পর প্রণয়ে, এবং প্রত্যাখ্যানের পর স্বীকারে—ব্যাপার অনেক। বৈচিত্র্য অনেক। মহাভারতে চমৎকারিতার যে অংশে ন্যূনতা, কালিদাসের চমৎকারিতা তথায় অসীম। মহাভারতে যে বিষয়ের ভূয়োবর্ণন, কালিদাসের তাহা এক কথায় সম্পূর্ণ। আবার মহাভারতে যে অংশ বর্ণনীয় সত্ত্বেও উপেক্ষিত, কালিদাস কর্ত্তৃক তাহা অতি সুচারু-ভাবে বর্ণিত। এই কারণেই বলিতে ইচ্ছা করে, কালিদাসের শকুন্তলা-সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরও অতিশায়িনী।

হিন্দু, উপাস্য দেবতার ধ্যান করিয়া পূজা করেন। যেরূপ মূর্ত্তিতে উপাসকের হৃদয় প্রসন্ন হয়, উপাসক মনে মনে, তাঁহার উপাস্যের সেইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লয়েন। ইহারই নাম উপাসনা। উপাসনার উদ্দেশ্য, দেবতার চিন্তাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিধান, চিত্তে ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ করিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে জগতের সকল জাতিই স্ব স্ব দেবতার রূপ-কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই কল্পিত রূপ যত সুন্দর হইতে পারে, সেই রূপের যিনি আধার, তাঁহাকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, উপাসক তাহা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিন্দু সন্তান, তাঁহারা আবার মনের মত সাজ-সজ্জায় পর্য্যন্ত আপন আপন ধ্যেয় দেবতাকে সাজাইয়া থাকেন। কখনো আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর, কখনো দয়াময়ী অন্নপূর্ণার, কখনো আবার রিপুদল-নাশিনী ভীমা মহিষ-মর্দ্দিনীর আকারে স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতাকে চিন্তা করেন। এই সকল চিন্তারই উদ্দেশ্য কিন্তু এক, চিত্তের শুদ্ধি-বিধান। কবির কবিতাও ঠিক এই প্রকার। কবির কাব্যের উদ্দেশ্য সমাজের শুদ্ধিবিধান ও লোকের শিক্ষাবিধান। কিন্তু কবি এমন ভাবে তাঁহার কাব্য সৃষ্টি করেন, এমন ভাবে তাহার সাজ-সজ্জা করেন যে, দেখিলেই মনঃপ্রাণ বিমুগ্ধ হয়, একবারে তন্ময় হইয়া পড়ে। যে মূর্ত্তি তন্ময়তা জন্মাইতে পারে না, যাহাকে দর্শন করিলে, হৃদয় বিষয়ান্তর-নিরক্ষেপ হইয়া, মাত্র তাহাকেই চিন্তা করে না, তাদৃশী মূর্ত্তির প্রভাব বা সংস্কার মানব-হৃদয়ে অতিঅল্পকাল-স্থায়ী। তাদৃশী মূর্ত্তির প্রদর্শনে সমাজের কোন প্রকার হিত-সাধন হয় না। যাহা সুন্দর, যাহার বহিঃ, অভ্যন্তর, উভয়ই সুন্দর, তাহারই প্রভাব বা সংস্কার হৃদয়ে পাষাণের রেখার ন্যায় দৃঢ় হইয়া থাকে। তাই যে কবির কাব্য যত সুন্দর, সেই কবির দ্বারা সমাজ তত উপকৃত। কালিদাস চরম সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া তাঁহার কাব্যোল্লিখিত পাত্রসমূহের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন! সমাজের অশেষ মঙ্গলকাম হইয়া কাব্য নির্ম্মাণ

করিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্যের যে স্থলেই একটু অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি করি, দেখি, সেই স্থলেই সমাজ-হিতৈষণা, লোক-হিতৈষণা, অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত।

স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি, শায়ক-সন্ধান করিয়া শরব্য মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান, এমন সময়ে, যেমন একজন চীরধারী বৈখানস আসিয়া বলিলেন—'ন হন্তব্যঃ'—'হনন করিও না', অমনি রাজা সংহিত শায়কের প্রতিসংহার করিলেন। পৃথিবী-পতির প্রতি পর্য্যন্ত একজন দীনহীন ব্রাহ্মণের কত আধিপত্য! ব্যাপারটি আপাততঃ অতি সামান্য বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিলে, ইহাতে দুষ্যন্ত-চরিত্রের মহনীয়ত্ব যে কত অধিক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর সেই সঙ্গে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও যে কি অপরিসীম ছিল, তাহারও কতকটা ধারণা হয়।

এইভাবে কালিদাস, তাঁহার চিরপ্রতিজ্ঞাত, দেব-দ্বিজে ভক্তি, কর্ত্তব্যের পালন, নারীর সম্মান-রক্ষা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, আত্ম-ত্যাগ, পরার্থ-প্রীতি, সংযম, ইন্দ্রিয়-বিজয়, অতিথি-পূজা প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য ও সমাজের হিতকর বহুবিধ বিষয়ের উপদেশে শকুন্তলা-কাব্য বিমণ্ডিত করিয়াছেন। মধুর মধ্যে নিমগ্ন করিয়া, অতি তিক্ত ঔষধও যেমন উদরসাৎ করিলে দেহ রোগমুক্ত হয়, অথচ ঔষধের তিক্তত্ব অনুভূত হয় না, তদ্রূপ, কালিদাস, তদীয় মাধুরীময়ী কল্পনার আবরণে আবৃত করিয়া, সমাজের হিতকর উপদেশগুলি সামাজিকের হৃদয়ে দৃঢ়-সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সামাজিকগণ, যখন কবির কল্পনার চমৎকারিতাময় লীলাতরঙ্গ দেখিতে দেখিতে, একবারে তন্ময় হইয়া পড়েন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে সংসারের অন্য সমস্ত বিষয়, সমস্ত সংস্কার কিয়ৎকালের জন্য, অন্তরিত হয়, তখন—সেই বিষয়ান্তরাস্পৃষ্ট নির্ম্মল হৃদয়ে, কবির উপদেশের সংস্কার চিরস্থায়িভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়। নির্ম্মল পট ব্যতীত যেমন আলেখ্য

চিত্রিত হইতে পারে না, তদ্রূপ, নির্ম্মল হৃদয় ব্যতীতও সদুপদেশ স্থায়ী হয় না। তাই কবি প্রথমে কল্পিত সৌন্দর্য্যের সুশীতল অমৃতধারায় সামাজিকদিগের অন্তঃকরণ প্রক্ষালিত করিয়া, পরে সেই নির্ম্মল ক্ষেত্রে উপদেশের বীজ, শিক্ষার বীজ বপন করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র বা বিক্রমোর্ব্বশীতে কবির ঐ উদ্দেশ্য, তত সুচারুরূপে সাধিত হয় নাই। শকুন্তলায় তাঁহার সে মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।

এই অধ্যায় এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমস্ত পাত্রেরই প্রায় কথঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, এইক্ষণে শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের চরিত্র একটু বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই, সেই সঙ্গে অপরাপর অপ্রধান পাত্রের চরিত্রও কিয়ৎ পরিমাণে পুনরালোচিত হইবে, সুতরাং অপ্রধান পাত্রের চরিত্রাবলীর আর পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাই সর্ব্বাগ্রে শকুন্তলা-চরিত্রের আলোচনা করা যাউক।

পঞ্চ-পঞ্চাশ অধ্যায়।

শকুন্তলা।

সংস্কৃত নাটকের নারীচরিত্রের নাম করিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে সীতা এবং শকুন্তলার কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। ভবভূতি সীতার এবং কালিদাস শকুন্তলার চরিত্র-চিত্রণে আপন আপন অলৌকিক কল্পনা-শক্তির চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রমণীদ্বয়ের চরিত্রের সৌসাদৃশ্য যেমন অনেক, বৈসাদৃশ্যও তেমনি অনেক। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়েরই অদৃষ্টচক্রের নিয়ন্তা যেন একই অদ্বিতীয় স্রষ্টিকর। বৈসাদৃশ্য এই যে, ভবভূতির সীতা রাজার কন্যা, বয়ঃপ্রাপ্তা রাজ-মহিষী, আর কালিদাসের শকুন্তলা আশ্রম-পালিতা বালিকা, তাপস-দুহিতা। নতুবা দুঃখিনী সীতার ন্যায় শকুন্তলাও পতিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা। বিপদের সময়ে সীতার যেমন বাল্মীকি, শকুন্তলারও তেমনি কণ্ব এবং মারীচ আশ্রয়দাতা। নির্ব্বাসিতা সীতাকে রামের সহিত পুনর্ম্মিলিত করিতে সংসার-বিরক্ত দয়ার্দ্র-হৃদয় বাল্মীকির যেমন প্রয়াস, যেমন উদ্বেগ, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের সহিত মিলিত করিতেও মারীচের সেইরূপ যত্ন। রাম গর্ভভরালসা সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, দুষ্যন্তও আপন্ন-সত্ত্বা কণ্ব-দুহিতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সীতার সহিত পুনর্ম্মিলনের পূর্ব্বে, তপোবনে তাপস-বেশী সীতাকুমারের সহিত রামের সাক্ষাৎকার হয়। শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলনের পূর্ব্বেও মারীচাশ্রমে, তপস্বি-কুমার-কল্প সর্ব্বদমনের সঙ্গে দুষ্যন্তের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। লবকুশকে রাম প্রথমে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই; দুষ্যন্তও সর্ব্বদমনকে না চিনিতে পারিয়া, 'তোমার পিতার নাম কি?'—বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; সীতা এবং শকুন্তলা উভয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় বনবাসে কাটাইয়াছেন। সে বনবাসের প্রথম অংশ

বড়ই সুখের। যখন রামের সহিত সীতা বনবাসে ছিলেন, তখন সীতার অপার সুখ; আবার শকুন্তলাও যখন নিতান্ত বালিকা, মুগ্ধ-প্রকৃতি, তখন কণ্বাশ্রমে, প্রথমে সখীদের লালন-পালনে এবং দয়াময় পিতার করুণ-স্নেহে, আর পরে দুষ্যন্তের সম্পর্কে পরম আনন্দে ছিলেন। রামকর্তৃক নির্ব্বাসনের পর সীতার বনবাস-কাল কাঁদিতে কাঁদিতে কাটিয়াছিল। দুষ্যন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া দুঃখিনী শকুন্তলাও, তাপসী-বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে বনবাস করিয়াছিলেন! বনের তরুলতা, ময়ূর-ময়ূরী, মৃগ-মৃগী দুইজনেরই জীবিত-নির্ব্বিশেষ ছিল। দুইজনেই বনবাসকালে, সমবয়স্কা সহচরীদিগের 'দ্বিতীয় উচ্ছ্বসিত'কল্প ছিলেন। উভয়েই মুগ্ধ হৃদয়া, সরলা, উভয়েই করুণরসের যেন শরীরিণী মূর্ত্তি, কোমলতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পতিদেবতা ললনা। তাই বলিতেছিলাম,—সংস্কৃত নাটকের নারীচরিত্রের নাম করিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে সীতা ও শকুন্তলার পবিত্র মূর্ত্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে।

শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা, বন-মধ্যে উপেক্ষিতা। তাঁহার জীবনের প্রথমে যেরূপ উপেক্ষা, পরিণত জীবনেও সেইরূপ উপেক্ষা। প্রথমবার মাতা কর্তৃক, দ্বিতীয়বার পতিকর্তৃক। কণ্ব মুনি তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সন্তানাধিক যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত মুগ্ধ-স্বভাবা সত্ত্বেও, অতি অল্প বয়সেই আশ্রম-কর্ম্মে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। সখীগণ বলিবামাত্রই, তিনি, হৃদয়ের কথা, দুই চারিটি অক্ষরে প্রকাশ করিয়া, কেমন সুন্দর একখানি পত্র লিখিলেন। আশ্রমের তরু লতিকা তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা। তিনি সখীদের সহিত কুসুম চয়ন করেন, আলবাল-পরিপূরণ করেন, আশ্রমতরু-স্খলিত লতাবধূকে ঈষদুত্তোলিত করিয়া, পুনরায় তরু-কণ্ঠে দোলাইয়া দেন। তিনি যখন বনদেবীর ন্যায় তপোবনে বিচরণ করেন, তখন কেসর-বৃক্ষ, 'বাতেরিত পল্লবাঙ্গুলির'

সঙ্কেতে, তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া লয়। নবমালিকা লতাকে, ভালবাসিয়া, তিনি 'বন-জ্যোৎস্না' বলিয়া ডাকেন, সহকার-তরুর সহিত তাহার বিবাহ দেন। তাঁহার প্রিয় বন-জ্যোৎস্নার প্রথম ফুল ফুটিলে, তিনি আনন্দ-ভরে তাহাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিয়া, 'নবকুসুমযৌবনা' বলিয়া, কতই না আদর করেন। যখন নব-পল্লবোল্লসিত-সহকার-কণ্ঠে বন-জ্যোৎস্না কুসুম-ভর-নতাঙ্গী হইয়া ধীর-সমীরণে দুলিতে থাকে, তখন তিনি অনিমেষ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, মনে মনে কত কি ভাবেন। তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয়ে অপার স্নেহ, অনন্ত ভালবাসা।

আশ্রমের কোনও মৃগের মুখ যদি কদাচিৎ 'কুশ সূচি-বিদ্ধ' হয়, তবে শকুন্তলা স্বহস্তে ইঙ্গুদী চূর্ণ করিয়া তৈল প্রস্তুত করেন, এবং মৃগের সেই ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেন। পিপাসায় মরিয়া গেলেও, তপোবন-তরুতে জলসেচন না করিয়া, তিনি নিজে জলবিন্দু পান করেন না। বন কুসুম-পল্লবের অলঙ্কার পরিতে তাহার বড়ই সাধ, কিন্তু তাহা হইলেও, স্নেহময়ী শকুন্তলা, আশ্রমের কোনো তরুর ফুল বা পল্লব, প্রাণ ধরিয়া, ছিঁড়িতে পারেন না। তাহাতে তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে[১]। তিনি সদ্যো-জাত মৃগশিশুকে কোলে বসাইয়া, শ্যামাধান্যের কোমল অগ্রভাগ খাইতে দেন। জননীর ন্যায় স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে, তাহার গাত্রে কর-সঞ্চালনা করেন। কণ্বাশ্রমের তিনি যেন মূর্ত্তিমতী দয়া, করুণাময়ী শান্তি-প্রতিমা। তাঁহার ন্যায় দয়াবতী বালিকা, কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতি-গোচরে কখনও পতিত হয় নাই। তাঁহার চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, বুঝি

১—শকু, ৪র্থ অঙ্কঃ—যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচি-বিদ্ধে।
শ্যামাক-মুষ্টি-পরিবর্দ্ধিতকো জহাতি সোঽয়ং ন পুত্র-কৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা।
নাদত্তে প্রিয়-মণ্ডনাঽপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্॥

দয়াবতী রমণীজাতিকে, অধিকতররূপে, স্নেহ, দয়া, কোমলতা, সরলতা ও মধুরতা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই কালিদাস শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে হয়—প্রতীচ্যের প্রধান সৃষ্টি মিরণ্ডা বা ডেস্‌ডিমনাও যেন হৃদয়ের কোমলতানুপাতে, প্রাচ্যের শকুন্তলার সমদেশ-বর্ত্তিনী নহেন।

তাঁহার সখীদিগের তিনি সর্ব্বস্বভূত। সখীগণের অন্য কার্য্য নাই, অন্য কার্য্য তাহারা জানে না। শকুন্তলাই যেন তাহাদের সব, ইহকাল ও পরকাল। তাহারা শকুন্তলার জন্য কুসুমচয়ন করে, শকুন্তলার জন্য মালা গাঁথে, শকুন্তলার আদরের লতাপাদপ নিচয়ে জলসেচন করে। কোমলাঙ্গী শকুন্তলার জল তুলিতে পাছে কোন কষ্ট হয়, তাই তাহারাই কলসে কলসে জল আনিয়া শকুন্তলাকে 'ধার' দেয়। যখন শকুন্তলার শরীর মন 'তপোবন-বিরোধী' তাপে ক্লিষ্ট হয়, তখন তাহারা আকুলমনে বসিয়া, শকুন্তলাকে কমলিনী-পত্রের বাতাস করে। শকুন্তলার মুখ অন্ধকার দেখিলে, তাহারা কাঁদিয়া ফেলে, শকুন্তলাকে ক্ষুন্নায়মানা দেখিলে, তাহাদের চিন্তার আর পরিসীমা থাকে না। শকুন্তলা নিজের ভাবনা করেন না, বা করিতে জানেনও না, তাহারাই শকুন্তলার ভাবনায় নিরন্তর অস্থির। যখন 'সুলভ-কোপ' দুর্ব্বাসা, দুঃখিনী শকুন্তলাকে, অজ্ঞাতসারে অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান, তখন তাহারাই যাইয়া ঋষির পায়ে পড়িয়া, কত অনুনয় করিয়া শাপমোচনের উপায় করিল। শকুন্তলাকে, সেই ঘোর বিপদের কথা কিছুই জানিতে দিল না বটে, কিন্তু নিজে নিজে তাহারা অতল বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। ভাবনায় আকুল হইল।

তাঁহারা তিন সখী সর্ব্বদাই একত্র থাকেন। কেহ কখনো কাহাকেও ক্ষণকালের জন্য নয়নের অন্তরালবর্ত্তিনী করেন না। তাঁহাদের তিন জনের শরীর পৃথক্ হইলেও মনঃপ্রাণ যেন একই সূত্রে গ্রথিত! এক লতিকার তাঁহারা যেন তিনটি শাখা, একবৃন্তে তাঁহারা যেন তিনটি ফুল। পরস্পরের সৌরভে, পরস্পরের সৌন্দর্য্যে, পরস্পরের মাহাত্ম্যে তাঁহারা বিমুগ্ধ।

মহর্ষি কণ্ব, শকুন্তলার দুর্দ্দৈব-প্রশমনের জন্য তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন; যাইবার সময়ে, আশ্রমের ভার শকুন্তলার উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, শকুন্তলা তাঁহার 'দ্বিতীয় উচ্ছ্বসিত'-স্বরূপ। কণ্ব যখন আশ্রমে থাকিতেন, তখন তিনিও অনেক বৃক্ষের 'আলবাল-পূরণ' করিতেন, অনেক আশ্রমতরুর সেবা করিতেন। আজ তিনি অনুপস্থিত। একা শকুন্তলাকেই আজ নিজের প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এবং তাত কণ্বের কার্য্য,—সমস্তই করিতে হইতেছে। সঙ্গে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, যখন যতটুকু পারিতেছেন, তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। শকুন্তলার জলসেচন দেখিয়া, শকুন্তলার পরিশ্রম দেখিয়া, তাঁহার অন্যতরা প্রিয়সখী অনসূয়ার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। অনসূয়া এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, কিন্তু এক্ষণে, আর থাকিতে পারিলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব তোমা অপেক্ষা, আশ্রম পাদপদিগকে অধিক ভালবাসেন; দেখ, তুমি 'নব-মল্লিকা-কুসুম-কোমলা,' তথাপি তাত কাশ্যপ তোমাকে আলবাল-জল-সেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।" কথাটা অনসূয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পরিহাস নহে; ইহা শকুন্তলার সমবেদনাময়ী প্রিয় সখীর মর্ম্মের কথা, গভীর স্নেহের কথা। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নহে; আমারও ইহাদের উপর সহোদর-স্নেহ আছে।' শকুন্তলার ইহাই দ্বিতীয় কথা। ইহার কিছু পূর্ব্বে একবার তিনি, 'ইতইতঃ সখ্যঃ' বলিয়া সখীদিগকে নিকটে ডাকিয়াছিলেন। শান্ত আশ্রমের শান্ত কুসুম-কানন চারিদিকে ফুলের শোভায় শোভমান। সখী-দ্বয়, হয় ত সেই কুসুমবীথিকার কোথায় একটু অন্তরিত হইয়াছেন মাত্র, আর শকুন্তলা অমনি, যেন পলকে প্রলয় গণিয়া, 'এই দিকে এই দিকে, বলিয়া, তাঁহাদিগকে ডাকিতেছেন।' সেই একবার প্রথম তাঁহার

কোমল হৃদয়ের, স্নেহময় হৃদয়ের, মধুর ঝঙ্কার শুনিয়াছি, আর এই আর একবার শুনিলাম। 'ইত ইতঃ সখ্যঃ', বলিয়া প্রথম যাহার মধুর ঝঙ্কার শুনিয়াছিলাম, এইবার স্নেহময়ী শকুন্তলার সেই অনুপম স্নেহের পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই একটি কি দুইটি কথার দ্বারাই, কবি, শকুন্তলার গভীর হৃদয়ের স্নেহ যে কত অগাধ, কত অপরিমিত, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা দুষ্মন্ত অনেকক্ষণ আশ্রমে আসিয়াছেন। বৈখানস যখন তাঁহাকে আশ্রমে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তাঁহার মুখে, রাজা কণ্বদুহিতা শকুন্তলার নাম শুনিয়াছিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, দূরে—নিশীথবীণাধ্বনিবৎ, কার যেন কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, 'তিনটি অল্পবয়স্ক তপস্বি-কন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। পাদপান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া, অনিমিষনয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন[১]।' অদূরে, বৃক্ষের অন্তরালে যে কে দণ্ডায়মান, তাহা, মুগ্ধা তপস্বি-কন্যকারা জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা তিন সখীতে, সেই নির্জ্জন তপোবনে, কত প্রাণের কথা কহিলেন। নিকটে, গ্রীষ্মের মৃদু-মন্দ সমীরণে বকুলের নবীন কিসলয় কাঁপিতেছিল, যেন বনদেবতা তাঁহার চম্পকাভ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শকুন্তলাকে ডাকিতেছেন। মুগ্ধ-হৃদয়া কণ্ব-দুহিতা তাহা দেখিলেন, তিনি বকুলের এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাহাকে আদর করিতে দ্রুত-পদে সেই দিকে চলিলেন। কবি, ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, যেন এক এক খানি করিয়া, শকুন্তলার হৃদয়স্তর গুলি তুলিয়া ধরিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইতেছেন যে, সে বালিকা-হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্নেহের সুধাধারা কিরূপ খরভাবে প্রবাহিত।

১—বিদ্যাসাগর।

প্রাবৃট্‌কালের নবজল-সম্পাতে, বন-লতা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, নবযৌবনের আবির্ভাবে, কৃশাঙ্গী শকুন্তলার দেহযষ্টিও তদ্রূপ পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতেছিল। শকুন্তলা নিজে কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। কেন যে তাঁহার পরিহিত বল্কল 'অতিপিনদ্ধ' বোধ হয়, ইহার কারণ আশ্রম পালিতা কুমারী জানেন না। তাই তিনি, যে তাঁহাকে বল্কল পরাইয়া দিয়াছিল, সেই প্রিয়ংবদাকেই দোষ দিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদাও মুখের উপর বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়া, বলিল, যে, দোষ তাহারও নয়, বল্কলেরও নয়, দোষ শকুন্তলার নিজের, আর তাহার নবাগত সখা যৌবনের। শকুন্তলা যখন বকুলপাদপের দিকে যান, তখন তাঁহার পথিমধ্যে,—এক সহকার বৃক্ষকে একটি নব মালিকা লতিকা যে বেষ্টন করিয়াছিল, আর ফুলের ভারে, ঐ লতিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি যে, হেলিয়া, বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া খেলা করিতেছিল,—দ্রুত গতি-নিবন্ধন শকুন্তলা তাহা দেখিতে পান নাই। সহচরী অনসূয়া কিন্তু সেটি দেখিলেন। নির্ম্মল সুনীল গগনে তারারাজির ন্যায়, সেই শ্যামল কাননে নবমালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমরাশি ফুটিয়া, বনের শ্যামাঙ্গ যেন আলোকিত করিয়াছে,—অনসূয়ার বড় ভাল লাগিল, তিনি তাঁহার প্রিয়সখী শকুন্তলাকে তাহা দেখাইলেন। শকুন্তলা দেখিলেন। কিন্তু অনসূয়া যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, সে ভাবে নহে, তদপেক্ষাও মধুরতর ভাবে নবমালিকার ঐ কুসুমশ্রী সন্দর্শন করিলেন। তিনি স্বহস্তে লতাটি উত্তোলিত করিয়া, একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, কহিলেন 'সখি! দেখ, কি রমণীয় সময়েই এই লতাপাদপ দম্পতির মিলন ঘটিয়াছে; দেখ, নবমালিকার নবকুসুম রূপী পূর্ণ যৌবন, আর সহকারও নব-কিসলয়-সম্ভারে সমলঙ্কৃত, পরম উপভোগ-ক্ষম'—এই বলিয়া, শকুন্তলা মুগ্ধ-নয়নে, সেই লতা-পাদপ-মিথুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেন যে সেই লতাপাদপের প্রতি তাঁহার

এত প্রীতি, কেন যে, তাঁহাদের দিকে নিমেষবিধুর লোচনে সে চাহিয়া আছে, তাহা তিনিও জানেন না, অনসূয়াও জানেন না। ঐ পাদপকে অনসূয়াই প্রথমে দেখিয়াছিলেন, পরে শকুন্তলাকে তিনিই দেখাইয়াছেন। যিনি প্রথম দেখিয়াছেন, তিনি বনের শোভা বলিয়া দেখিয়াছেন। যাঁহাকে তিনি দেখাইলেন, তিনি কেবল বনের শোভা নহে, তদপেক্ষা আরও অতিরিক্ত কিছুও যেন তাহাতে দেখিতে পাইলেন। অনসূয়ার মনে যে শোভার অনুভবের সামর্থ্য নাই, অথবা সামর্থ্য জন্মে নাই, শকুন্তলা সেই শোভা দেখিলেন। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা, তিন সখীই সমবয়স্কা বটেন, কিন্তু সম হৃদয়া নহেন। অনসূয়া প্রিয়ংবদার উৎপত্তি পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু শকুন্তলার জানি। কবি বলিয়াছেন যে, তিনি স্বর্গের অপ্সরার কন্যা, জন্মাবধি আশ্রমে প্রতিপালিতা। তাঁহার হৃদয়, আশ্রমমাহাত্ম্যে, সম্পূর্ণভাবে তপস্বি-জনোচিত হইলেও, বংশের প্রভাব, বিশেষতঃ কন্যার উপর মাতার প্রভাব যে একবারেই ছিল না, একথা বলিলে, একান্ত অস্বাভাবিক হয়; তাই কবি, অত কৌশলে, ক্রমে শকুন্তলার হৃদয়ের অল্প অল্প পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি অপ্সরার কন্যা অথচ আশ্রম-পালিতা। তাঁহার দেহ অপ্সরার সৌন্দর্য্যে আলোকিত, আর তাঁহার হৃদয় 'শম-প্রধান' আশ্রমের শান্তোজ্জ্বল-প্রভায় পরিশোভিত, কিন্তু তথাপি, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের উপাদান যে ঈষদ্ অন্য-বিধ ছিল, ইহা কবি, এই লতা-পাদপ-দর্শন-বৃত্তান্তে বুঝাইয়া দিলেন।

'লতা-পাদপ-মিথুনের' মূলে দাঁড়াইয়া, অনসূয়া এবং শকুন্তলায় এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা, সহাস্যবদনে, অনসূয়াকে কহিলেন, 'অনসূয়ে! কেন শকুন্তলা সর্ব্বদাই এই বন-জ্যোৎস্নাকে উৎসুকনয়নে নিরীক্ষণ করে, জান?' অনসূয়া অত বাক্‌চাতুর্য্য জানেন না, প্রিয়ংবদার ন্যায় অত রস-ভাবময়ী নহেন,

তিনি সরল-ভাবে বলিলেন ‘না, জানি না, বল দেখি।’ অমনি মঞ্জুভাষিণী প্রিয়ংবদা কহিলেন, ‘শকুন্তলা মনে করে যে, বন-জ্যোৎস্না যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন সেই প্রকার আপন অনুরূপ বর পাই—।’ শকুন্তলা কহিলেন, ‘এটি তোমার নিজের মনের কথা।’ সত্য সত্য এটি কার মনের কথা, শকুন্তলার না প্রিয়ংবদার, তাহা কবি খুলিয়া বলিলেন না। রসজ্ঞ সামাজিক-দিগের উপর সে মীমাংসার ভার দিলেন। তবে কবি, সে মীমাংসার অনুকূল প্রমাণ-প্রয়োগের উপন্যাসে কৃপণ হয়েন নাই। তিনি প্রথমে, লতা-পাদপ-মিথুনের পার্শ্বে নিরীক্ষমাণা শকুন্তলাকে অবস্থাপিত করিয়া, শকুন্তলা-হৃদয়ে যে ভাবোন্মেষের রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রিয়ংবদার কথায়, সেই ভাব একপ্রকার পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া দিলেন। কালিদাস এবং ভবভূতির এই এক অদ্ভুত কৌশল। এ কৌশল অন্যত্র এমন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় না। ইহারা প্রথমে অতি গভীরভাবে বক্তব্যের আভাস দেন; ‘অভিরূপ’ (expert) সামাজিক, সেই আভাসেই কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়েন। পরে, কবি, সকল শ্রেণির সামাজিকদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত, ঐ আভাসিত বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলেন। প্রথমে সামান্যতঃ প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করিয়া, পরে বিশেষ-ভাবে উহার ব্যাখ্যা করেন।

সখীত্রয় এইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, আর অদূরে, পাদপান্তরিত রাজা দুষ্যন্ত তাহা শুনিতেছেন। শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা—তিনজনেরই কথা, একটি একটি করিয়া রাজা মনে গাঁথিয়া লইতেছেন। বৈখানসের মুখে যে কণ্ব দুহিতার নাম শুনিয়াছিলেন, এতক্ষণ স্থির-নয়নে তাঁহাকে দেখিলেন। রাজা নিজে তাঁহার বহিঃসৌন্দর্য্য দেখিলেন, আর সখীদ্বয়, নানাবিধ কথোপকথনে, রাজাকে শকুন্তলার অন্তঃ-সৌন্দর্য্য দেখাইলেন।

অনসূয়া-প্রদর্শিত বন-জ্যোৎস্নানাম্নী সেই নবমালিকা লতিকায় যেমন শকুন্তলা কলস আবর্জ্জিত করিলেন, অমনি লতা-নিষণ্ণ একটি ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া, তাঁহার বদন-কমলে পতিত হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা যে দিকে যান্, যে দিকে মুখ ফিরান্, দুষ্ট ভ্রমরও ততক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবিত হয়। গুণ্ গুণ্ করিয়া, তাঁহার 'কর্ণান্তিকে' কূজন করে। তিনি কর-পল্লব আনর্ত্তিত করিয়া যত বাধা দেন, অবিনীত ভ্রমরের পতন-লিপ্সা ততই বর্দ্ধিত হয়। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শকুন্তলা সেই অনর্থকারিণী নবমালিকার সন্নিধি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিলেন। চলিতে চলিতে দেখেন, ভ্রমরও তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তখন তিনি সত্য সত্যই অতি কাতর হইয়া বলিলেন, 'সখী-গণ! দুর্ব্বিনীত মধুকরের হস্ত হইতে তোরা আমাকে রক্ষা কর্।' সখীদ্বয়, এতক্ষণ ভ্রমর-শকুন্তলার এই ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, শকুন্তলাকে এইক্ষণ, পরিত্রাণ প্রার্থিনী দেখিয়া, তাঁহারা সহাস্যবদনে কহিলেন—'আমরা পরিত্রাণ করিবার কে? তপোবন রাজার রক্ষিত, সুতরাং সেই রাজা দুষ্যন্তকে ডাক।' শকুন্তলার এবার অনুপায়! তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ দিকে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, সেই ভ্রমর-বাধা-রমণীয়া কণ্ব-দুহিতার, চঞ্চল নয়ন, কমলাভ গণ্ডস্থল, বাত-বিকম্পিত চম্পক-কলিকাবৎ ইতস্ততঃ বিস্ময় অঙ্গুলির প্রভা, ত্রাসার্ত্ত অধর-কান্তি প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন। শকুন্তলাকে এত সুন্দরী তাঁহারা আর কখনো দেখেন নাই। শকুন্তলা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাণাধিকা। তাঁহারা ক্লেশ-বহুল আশ্রমে বসতি করেন সত্য, কিন্তু শকুন্তলার সাহচর্য্যে তাঁহাদের কোন ক্লেশেরই অনুভূতি হয় না। তাঁহারা আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে 'ভ্রমরাভিলঙ্ঘন'-ভীতা শকুন্তলার মুগ্ধ-সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন শকুন্তলা এই ভাবে ভ্রমর-সম্বাধ-বিধুরা, যখন সখীদ্বয় বলিলেন, "'আমরা পারিব না, যাঁহার অধিকারে এই তপোবন, তাঁহাকে

ডাক, সেই দুষ্যন্ত পারেন ত পরিত্রাণ করুন', ঠিক সেই সময়ে, বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী রাজা দুষ্যন্ত,—যিনি এতক্ষণ তিরোহিতমূর্ত্তি হইয়া শকুন্তলার এই সব দেখিতেছিলেন, জীবনে যাহা কখনো দেখেন নাই, যে সৌন্দর্য্য কখনো কল্পনাও করেন নাই, সেই সৌন্দর্য্য, সেই চকিতমধুরা 'লোলদৃষ্টি' ভ্রূলতিকার বিভ্রম প্রভৃতি যিনি দেখিতেছিলেন, আর দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া বিস্ময়-বিমোহিত হইতেছিলেন,—সেই রাজা দুষ্যন্তও অমনি চকিতচকিতা মুনি-তনয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যেমন বলিয়াছেন, 'রাজাকে ডাক'—অমনি কে এ রাজাকৃতি পুরুষ সহসা আবির্ভূত হইলেন? আর শকুন্তলার ত কথাই নাই, তিনি ভয়ে, সঙ্কোচে, যেন 'এতটুকু' হইয়া গেলেন।

অনসূয়া যখন, 'আমাদের এই সখী ভ্রমরের যাতনায় বড়ই কাতরা' বলিয়া, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক, দুষ্যন্তকে শকুন্তলা-প্রদর্শন করিলেন, এবং রাজাও শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেমন তপশ্চরণের কোন বিঘ্ন নাই ত?—তখন শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূত ও আনত-বদনা হইয়া রহিলেন। রাজাকে কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু উত্তর না দিলে কি হইবে? আশ্রমের সমস্ত ভারই ত তাঁহার উপর ন্যস্ত। বিশিষ্ট অতিথির শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহাকেই ত অতিথি সৎকার করিতে হইবে। এইক্ষণে যাঁহার দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছেন না, ক্ষণকাল পরেই ত পাদার্ঘ্য দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থিত করিতে হইবে। শকুন্তলা মহা সঙ্কটে পড়িলেন। মহাকবি, এইভাবে, দুষ্যন্তকে শকুন্তলা দর্শন করাইলেন।

দুষ্যন্ত পৌরবকুলের যশস্বী অবতংস, ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্, সৌন্দর্য্য বল, বিলাস বল, তাঁহার রাজধানীতে কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি নিদাঘের দিবাবসানে সঙ্কুচিতকায়া লজ্জালতিকা এবং ভ্রমর-পদ দুঃসহা শিরীষ-যষ্টি দেখিয়াছেন, বর্ষার নীপরোমাঞ্চিতা শ্যামা বনস্থলী

এবং শারদী উষার মন্দানিলাহতা পতনোন্মুখী শুভ্র-দ্যুতি সেফালিকা দেখিয়াছেন, তিনি হেমন্ত-রজনীর প্রভাতে 'শিশির-মথিতা' পদ্মিনী দেখিয়াছেন, তিনি বসন্তে মন্দ মন্দ মরুদান্দোলিত বনশোভিনী মাধবী দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সদ্যঃস্নাতা, ভ্রমরাহতা, বহিরন্তঃশুভ্রা, 'বন-তোষিণী' নবমালিকা, তিনি জীবনে আর কখনও দর্শন করেন নাই। মহাকবি, তাঁহাকে এ সৌন্দর্য্য দেখাইলেন। অকস্মাৎ পুরুষ-শ্রেষ্ঠের অভ্যাগমে, সখীদ্বয় কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতাসহকারে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিলেন। সরল-হৃদয়া অনসূয়া কহিলেন, 'শকুন্তলে! অতিথির অভি-লাষানুবর্ত্তন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রিয়ংবদার কথায়, তিনি ত বসিয়াছেন, এস, আমরাও তাঁহার নিকটে উপবেশন করি।'

তাঁহারা সকলেই সেই 'প্রচ্ছায়-শীতল' 'সপ্তপর্ণ-বেদিকায়' উপবিষ্ট হইলেন। উপবেশনানন্তর, শকুন্তলা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেন এই অপরিচিত ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াই আমার হৃদয়ে এমন 'তপোবন-বিরুদ্ধ' ভাবের উদয় হইল?" জন্মাবধিই শকুন্তলা আশ্রম-বাসিনী। তরু-লতা, ফুল-ফল, পত্র পল্লব, ময়ূর-হরিণ—এই সমুদয়ই তিনি জানেন, ইহাদের কাছেই বসেন, উঠেন, খেলা করেন, আর যখন শ্রান্তি হয়, তখন দয়াময় পিতা কণ্বের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া সুখে নিদ্রা যান। এভাবে ত তিনি কখনো বসেন নাই, বসিতে জানেনও না। এভাবে এই তাঁহার নূতন উপবেশন। এই 'সপ্তপর্ণ-বেদিকার' মূলে, এই অনসূয়া এবং এই প্রিয়ংবদার সহিত, এমনি ভাবে, শকুন্তলা আরও কতবার বসিয়াছেন, উঠিয়াছেন, কৈ? আর কখনও ত তাঁহার মন এমন করে নাই! এখন তাঁহার মনের যে অবস্থা, তাহার যে কি নাম, কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন না। তিনি মাত্র জানিয়াছেন যে, তপোবনে যাহারা বাস করে, এ অবস্থা তাহাদের অনুপযুক্ত—ঘোর বিরোধী। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা কিছুই

জানিলেন না, কিন্তু শকুন্তলার হৃদয়াকাশে, এই ভাবে, একটা নূতন গ্রহের—অদৃষ্টচর পরম জ্যোতিষ্মান্ গ্রহের ছায়াপাত হইল। কাহারও অদৃষ্টে এই গ্রহ ধ্বংসকারী উল্কার আকার ধারণ করে, কাহাকেও আবার, শরদিন্দুকান্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক, ইহলোকেই স্বর্গের ছবি সন্দর্শিত করে।

সমাগত অতিথিকে একটু বিশেষভাবে জানিবার জন্য শকুন্তলার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। তিনি মনের ঔৎসুক্য মনেই রাখিলেন। আর কেই বা তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিবে? এমন সময়ে অনসূয়া স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা বাঁচিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'হৃদয়! উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার আকাঙ্ক্ষা অনসূয়াই পূরণ করিতেছে।'

রাজার প্রদত্ত পরিচয় শ্রবণ করিয়া, হর্ষিত-হৃদয়ে, যখন অনসূয়া বলিলেন, 'আজ তপস্বীদিগের পরম সৌভাগ্য, আপনার আগমনে, এত দিনে তাঁহারা স-নাথ হইলেন,'—তখন 'স-নাথ'—এই কথাটি শ্রবণ করিবা মাত্রই, শকুন্তলার বদন-কমল লজ্জার অরুণরাগে রঞ্জিত হইল। রাজাও পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষদাগ্রহ-সহকারে লজ্জানম্র-মুখী, আরক্ত-গণ্ডস্থলী শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। রাজাকে দর্শন করা অবধি শকুন্তলার 'অবিদিত সংসার-বৃত্তান্ত' নির্ম্মল হৃদয়ে যে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, যে পূর্ব্বরাগের সম্মোহন-মন্ত্রের প্রভাবে, শকুন্তলা জানিয়া শুনিয়াও, অবশ-চিত্তে 'তপোবন-বিরোধী' ভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, যে পূর্ব্বরাগের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার কোমল হৃদয় রাজার পরিচয় জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এতক্ষণে, হৃদয়-কন্দর-গুপ্ত সেই পূর্ব্বরাগ লজ্জাভূষণে বিভূষিত হইয়া, শকুন্তলার অমল কপোল-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। উদয়োন্মুখ অরুণের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে, শকুন্তলার অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়াকাশে প্রণয়রবি স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। কর্ম্মঠ ভ্রমর যে শুভকার্য্যের 'ঘটকালি' করিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার 'পাকা দেখা' বা 'আশীর্ব্বাদ' সম্পন্ন হইল।

রাজার এবং শকুন্তলার আকার-প্রকার দর্শন করিয়া, সখীদ্বয়, প্রণয়-স্নিগ্ধ-কণ্ঠে, শকুন্তলাকে জনান্তিকে কহিলেন, 'প্রিয়সখি! আজ যদি তাত আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে,—তাহা হইলে, তাঁহার জীবিত-সর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথি-শ্রেষ্ঠের সম্মান-রক্ষা করিতেন।' শকুন্তলার মহা সঙ্কট। তিনি হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে কথা লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার বুঝি বা উদ্ভেদ হয়, ভাবিয়া, তিনি একান্ত অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু প্রণয়-দূতিকা চাতুরী অমনি তাঁহার দ্বারা বলাইল যে, তোমাদের অভিসন্ধি ভাল নয়, আমি আর তোমাদের কথা শুনিতে চাহি না। মহাকবি কেমন সতর্কহস্তে, ধীরে ধীরে শকুন্তলার হৃদয়রূপ রহস্য-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিলেন।

রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার পরিচয়-শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করিলে, অনসূয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। স্বর্গের অপ্সরাদিগের প্রধান মেনকা তাঁহার মাতা,—এই কথা শুনিয়া রাজার সন্দেহ দূর হইল। আশ্রম-বাসিনী তপস্বিনীর গর্ভ-সম্ভবা কুমারীর যে এত রূপ কদাচ সম্ভবিতে পারে না, ইহা রাজা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার সে অনুমান সত্য হইল—ভাবিয়া, তিনি শতমুখে শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় আরও অধোমুখী হইলেন। সংসারে, রূপের প্রিয়কৃত প্রশংসা রমণীকুলের একান্ত হৃদয়ানন্দিনী। কবি, শকুন্তলাকে সম্মুখবর্ত্তিনী করিয়া, তাঁহারই সমক্ষে, রাজার দ্বারা তদীয় রূপের কত প্রশংসা করাইলেন। শকুন্তলা এত দিনের পর বুঝিতে পারিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে কত রূপ দিয়া গঠন করিয়াছেন। বুঝিতে পারিলেন যে, যথার্থই তাঁহার দেহ-লতিকার 'প্রভাতরল-(
'বসুধাতলে' অসম্ভব, তিনি অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের আধার[১]।

১—শকু. ১ম অঙ্ক,—মানুষীভ্যঃ কথং নু স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভা-তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ॥

শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজা, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে, এতক্ষণ, যে আশা-লতিকা অঙ্কুরাবস্থায় ছিল, এক্ষণে তাহা পল্লবিত হইল। তিনি বুঝিলেন—'শকুন্তলা তাপস-কুমারী নহেন, তিনি ক্ষত্রিয়-কুমারী সুতরাং ক্ষত্রিয়-নরপতির বিবাহ-যোগ্যা।' রাজার মৌনাবলম্বনে শকুন্তলা নিঃশ্বাস ছাড়িবার অবসর পাইলেন। তাঁহার মুখের উপর, সখীদের সমক্ষে, তাঁহারই প্রিয়তম, তদীয় অলৌকিক লাবণ্যের গুণ-গান করিতেছিলেন, তিনি ইহাতে লজ্জায় যেন মরিয়া ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্বস্তি হইল। প্রিয়ংবদা এটুকু বুঝিলেন, অমনি সস্মিত-বদনে একবার স্মিত-পূর্ব্ব-ভাষিণী শকুন্তলার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই, রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, 'আর্য্য! আপনি যেন আরও কি বলিতেছিলেন,—' শকুন্তলা এবার প্রমাদ গণিলেন। রাজা হয়ত আবার সেই রূপগাথার সঙ্গীত করিবেন, সেই বিশ্রান্ত-প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করিবেন,—ভাবিয়া শকুন্তলার অতিশয় সঙ্কোচ-বোধ হইল। তিনি তখন রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিলেন। শকুন্তলার হৃদয়-নিহিত ভাব, এতক্ষণে, আরও কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রকাশ করিল। তিনি প্রথমে, 'তপোবন বিরুদ্ধ' বলিয়া, যে ভাবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে আবার যে ভাব, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহারই কপোল-পদ্ম রক্তাভ করিয়াছিল, এইক্ষণে, সে-ই ভাব—হৃদয়ের সেই প্রথম বিক্রিয়া,[১] পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্টাকারে, শকুন্তলার তর্জ্জনী আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল। প্রথম যাহার বীজ বপন হইয়াছিল, পরে যাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণে, ক্রমে, সেই ভাব, তরুর আকার ধারণ করিল। অচিরেই পল্লবিত হইবে। রাজা অনসূয়াকে বলিলেন—'আমার বক্তব্য এই যে, তোমাদের সখীর এই

১—'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-বিক্রিয়া।' অলঙ্কার।

তাপস-ব্রত কি বিবাহ-কাল পর্য্যন্ত, না চিরজীবন-ব্যাপী[১]?' অনসূয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা বলিলেন, 'আমাদের তাত কণ্বের সঙ্কল্প এই যে, অনুরূপ বর পাইলেই, ইহাঁকে সম্প্রদান করিবেন।' শকুন্তলা দেখিলেন—এতদিন যে প্রিয়ংবদা তাঁহার একান্ত অনুকূল-চারিণী ছিল, আজ রাজার সম্মুখে, সে যেন সত্য সত্যই প্রতিকূল-কারিণী হইয়াছে। নতুবা যে যে কথায়, তাঁহার লজ্জার সীমা থাকে না, বুক ফাটিয়া যায়, প্রিয়ংবদা যেন বাছিয়া বাছিয়া, সেই কথাগুলিই প্রকাশ করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তিনি অলীক কোপের সহিত বলিলেন—'অনসূয়ে! তোমরা থাক, আমি চলিলাম। প্রিয়ংবদার যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছে, আমি যাই, পিসিমার নিকটে যাইয়া উহার এই সকল ধৃষ্টতার কথা বলিয়া দিই।' চামরিণী মৃগী যেমন অতি যত্নে, অতি সতর্কতার সহিত, নিজের চামরটি রক্ষা করে, অপরকে দেখিতে দিতে চায় না; মণিভূষণা ফণিনী যেমন, শিরোমণিটি সতত স-যত্নে ধারণ করে, গন্ধ-হরিণী যেমন নাভি-স্থিত কস্তূরিকার নিয়ত সংগোপন করে, তদ্রূপ, শকুন্তলাও, তাঁহার হৃদয়োল্লসিত স্নিগ্ধ ভাবটিকে, অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিতেছিলেন। মানুষ ত দূরের কথা, আকাশের বায়ুতে পর্য্যন্ত ইহা জানিতে পারে,—তাঁহার তাহা বাঞ্ছিত নহে। তাই, প্রিয়ংবদা যত তাঁহার হৃদয়ের আবরণ উন্মোচিত করিতে লাগিলেন, তত, তিনিও, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নে, আদরে, সন্তর্পণে, হৃদয়ের সেই অযাচিতোপনীত অতিথিকে লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া নিষেধ করিলেন, কিন্তু শকুন্তলা উক্তি-প্রত্যুক্তি না করিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন

১—শকু, ১ম অঙ্ক। রাজা—বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ ব্যাপার-রোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্?
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণ-বল্লভাভিরাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ?

প্রিয়ংবদা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, 'সখি! যাও কি বলিয়া? তুমি আমার দুই কলসী জল ধার, অগ্রে তাহা শোধ কর, পরে যাইও'—বলিয়াই বলপূর্ব্বক গমনোন্মুখী বালিকাকে নিবর্ত্তিত করিলেন। শকুন্তলার কোপ আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি ভ্রূ-লতা ঈষদাকুঞ্চিত করিয়া, বার বার প্রগল্‌ভা প্রিয়ংবদার দিকে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদার এ অত্যাচারে দয়াময় ভারতেশ্বরের প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি স্বকীয় অঙ্গুলি হইতে, অঙ্গুরীয়ক উন্মুক্ত করিয়া, ধারিত জল-কলসের মূল্যরূপে, প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন। প্রিয়ংবদা তখন সস্মিত-বদনে শকুন্তলাকে কহিলেন, 'সখি! এই অতিথি—অথবা অতিথিবেশী মহারাজ তোমার উপর একান্ত সদয় হইয়া, আমার নিকট হইতে তোমাকে ঋণ-মুক্ত করিলেন, এইক্ষণে, যেথানে ইচ্ছা, যাইতে পার।' শকুন্তলার তখন আর এমন সামর্থ্য নাই যে, সে স্থান হইতে পদ-মাত্রও গমন করেন। তিনি যাহাকে এতক্ষণ অতিথিজ্ঞানে, হৃদয়ের সমস্ত সম্পদে সৎকার করিতেছিলেন, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, তদ্দত্ত-অঙ্গুরীয়ক-খোদিত-নামাক্ষর-পাঠে বলিয়াছে যে, তিনি সামান্য অতিথি নহেন, তিনি পুরু বংশের অবতংস, ভারতের সম্রাট, মহাবীর দুষ্যন্ত। তাই প্রিয়ংবদার কথার উত্তরে, শকুন্তলা মনে মনে কহিলেন, 'আর গিয়াছি!'—শকুন্তলার এখনও বিশ্বাস যে, 'তাঁহার এ ভাব সখীরা জানিতে পারে নাই, তিনি প্রাণান্তেও, ইহা, পরিহাস-প্রিয়া সখীদিগকে জানিতে দিবেন না। তিনি প্রিয়ংবদাকে কিঞ্চিৎ কুপিত-কণ্ঠে কহিলেন 'আমি যাই আর না যাই, তাহাতে তোমার কি! আমাকে যাওয়াইবার বা রাখিবার তুমি কে?' পুরোবর্ত্তী পৌরব-শ্রেষ্ঠ দুষ্যন্ত কোপারুণ-কণ্ঠী শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে, অদূরে মহান্ কোলাহল শ্রুত হইল। তাহাতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। অনুচর-গণ কর্ত্তৃক বুঝি বা তপোবনের কোন বাধা ঘটিয়াছে,—ভাবিয়া, রাজা ব্যগ্রভাবে সেই দিকে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন

বিনীতবচনে কহিলেন—'আর্য্য! আপনি অতিথি, আমরা আপনার যথোচিত সৎকার করিতে পারি নাই। সুতরাং বলিতে লজ্জা করে, যে, আপনি আর একবার, অনুকম্পাপূর্ব্বক, আমাদিগকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন।' রাজা কহিলেন—'সে কি! তোমাদের দর্শনেই আমি যথেষ্ট সৎকৃত ও পুরস্কৃত হইয়াছি[১]।'

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা দুই চারি পা চলিয়াই কহিলেন 'অনসূয়ে! অভিনব কুশাগ্রে আমার চরণ-তল ক্ষত হইয়াছে, তোমরা একটু ধীরে চল। আর এই দেখ, কুরুবক-শাখায় আমার পরিহিত বল্কল সংলগ্ন হইয়াছে, একটু না হয় দাঁড়াও, ছাড়াইয়া লই।' এই বলিয়া, বল্কল-বিমোচনচ্ছলে, শকুন্তলা সাচীকৃতকণ্ঠে ও সতৃষ্ণ-নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সখীদিগের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন[২]।

সেই প্রথমে—তপোবন-পাদপে জল-সেচনের সময়ে, একবার শকুন্তলাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। নব-কিসলয়-শোভী সহকারের সহিত বন-তোষিণী মিলিত হইয়াছে, আর শকুন্তলা তথায়, অনিমেষ-লোচনে, তাহাদের সেই শুভ সম্মিলন দেখিতেছেন—দেখিয়াছি। তখন শকুন্তলার হৃদয় মিলনের স্বপ্নময়ী কল্পনায় পরিপূর্ণ, মিলনের মধুর বীণা-ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত। তাই তিনি, প্রথমে তাঁহাকে যে বকুল-পাদপ 'বাতেরিত-পল্লবাঙ্গুলি-

১—শকু, ১ম অঙ্ক—সখ্যৌ। আর্য্য! অসম্ভাবিতাতিথি-সৎকারা ভূয়োঽপি প্রেক্ষণ-নিমিত্তং লজ্জামহে আর্য্যং বিজ্ঞাপয়িতুম্।"
রাজা। মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি।

২—শকু, ১ম অঙ্ক। শকুন্তলা। অনসূয়ে! অভিনব কুশ-সূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণম্, কুরুবক-শাখা-পরিলগ্নং চ বল্কলং। তাবৎ পরিপালয়তং মাং, যাবৎ এতৎ মোচয়ামি।'
(রাজানমবলোকয়ন্তী, সব্যাজং বিলম্ব্য, সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা)।

সঙ্কেতে' নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যে ডাকে নাই, সেই 'লতাপাদপ-মিথুনের' নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার শোভা দেখিতেছিলেন। বনতোষিণীর প্রস্ফুটিত কুসুম-রাশি, বা সহকারের আতাম্র কিসলয়-কলাপ তাঁহার দ্রষ্টব্য নহে, তাহাদের মিলনই তাঁহার দ্রষ্টব্য ছিল। তিনি দাঁড়াইয়া, অনন্য-মনে সেই জড়ের মিলন দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছিলেন, আর তাঁহার অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়ে বাস্তব মিলনের অস্পষ্ট ছায়া ক্রমে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিতেছিল। 'শকুন্তলার অনুরূপ বর-লাভের বাসনা জন্মিয়াছে'—বলিয়া বিদগ্ধ প্রিয়ংবদা যখন শ্লেষচ্ছলে শকুন্তলার মনের কথাটি বলিয়া দিল, আর শকুন্তলাও তাহা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে গেলেন, তখনই বুঝিয়াছি যে, শকুন্তলার হৃদয়-বর্ত্তিনী সেই মিলনের ছায়াময়ী মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন আর সে যথেচ্ছ-স্পৃশ্য নহে, এখন সে উপাস্য প্রতিমা।

শকুন্তলা আর্য্য ঋষির দুহিতা, আর্য্যভাবময়ী। হৃদয়ের অমূল্য রত্ন প্রেম কথায় প্রকাশ করা আর্য্যহৃদয়ের বাঞ্ছিত নহে। প্রেমের পণ্যচর্চ্চা একান্ত গর্হণীয়। তাই প্রিয়ংবদা বা অনসূয়া শত চেষ্টা করিয়াও, শকুন্তলার মনের একটি কথাও, তখন, জানিতে পারেন নাই। সেই বন-তোষিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যে শকুন্তলা একবার, তাঁহার হৃদয়ের মিলনাশাময়ী পবিত্র কল্পনার ঈষদুন্মেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই ক্ষণে সেই শকুন্তলাই, কুশক্ষত-চরণা এবং কুরুবক-শাখা-লগ্ন-বল্কলা হইয়া, রাজাকে বক্রকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিয়া, অপ্রবুদ্ধ-ভাবে, আত্ম-হৃদয়ের সেই মধুর মিলন-কল্পনার পূর্ণ মূর্ত্তি দেখাইলেন। জড় বনতোষিণী-সহকারের সমীপে, তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজ চেতন দুষ্যন্তের সম্মুখে, তাহা বর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পূর্ণায়ত হইল। বহির্জ্জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগতেও জড়ের আশ্রয়ে চৈতন্যের আবির্ভাব হইল।

শকুন্তলা আশ্রম-বাসিনী তাপস-কন্যা, তপশ্চর্য্যাই তাঁহার প্রধান

ব্রত।° তিনি কোনও ফল-কামনায় তপশ্চর্য্যা করেন না. ধর্ম্মসঞ্চয়-মানসে লতাপাদপে জল-সেচন বা হরিণ-শিশুকে আহার দান করেন না। আশ্রমে থাকিলে, এ সকল করিতে হয়, সকলে করে, তিনিও করেন। হিন্দু গৃহস্থ নির্লিপ্তভাবে সংসারাশ্রমের নিত্য-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। নিঃস্বার্থ-ভাবে কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই হিন্দুর সকল আশ্রমের তুল্য উপদেশ। কি পর্ণকুটীরবাসী ফলমূলাশী তপস্বী, কি সৌধতল-নিবাসী গৃহী—সকলেই, এইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে, আপনাকে ধন্য মনে করেন। আপনার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নহেন, পরের ভাবনাই তাঁহাদের অধিক। তাই তাঁহাদের হৃদয়ে, যদি কখনো আপনার ভাবনা জাগিয়া উঠে, তবে, তখনই তাঁহারা বিচলিত হয়েন। এ ভাব হিন্দুর মজ্জাগত। মজ্জাগত বলিয়াই, রাজা দুষ্মন্তকে প্রথম দেখিবার পর, যখন শকুন্তলার হৃদয়ে আপনার ভাবনা উদিত হইয়াছিল, তখন তিনি, সেই অপরিচিত ভাবের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও, কিন্তু, ঐ ভাব যে আশ্রমবাসীর হৃদয়ের 'বিরুদ্ধ,' ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না। শকুন্তলা যদি 'শকুন্তলা' না হইতেন, তবে তাঁহার হৃদয়ে, হয়ত, ঐ প্রকার 'বিরুদ্ধত্ব'-জ্ঞানের উদয়ই হইত না, তিনি প্রথম হইতেই ঐ ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতেন, তিনি প্রতিপদে আত্ম-গোপনের প্রয়াস করিতেন না, আপনাকে জগতের অন্তরালে রাখিতে অত আগ্রহবতী হইতেন না। কিন্তু প্রেমে হউক, শোকে হউক, স্নেহে হউক, মানুষের মন যখন মাতিয়া উঠে, তখন তাহার আত্ম-ধারণ-ক্ষমতার ক্রমে হ্রাস হয়। মানুষ ত চেতন জীব, অচৈতন্যা পৃথিবী পর্য্যন্ত, নব-জল-সম্পাতে, বক্ষের দ্বার উন্মোচন-পূর্ব্বক, হৃদয়-নিহিত সৌরভ বিকীর্ণ করেন, অচেতন জলদের আগমন-ধ্বনি-শ্রবণে, বক্ষের লুক্কায়িত বৈদুর্য্যরত্নে, সেই নবীন মেঘের সংবর্দ্ধনা করেন। মানুষের ত কথাই নাই। সেই মানুষের মধ্যে আবার যাঁহারা সংসারো-

দ্যানের শিরীষবৎ কোমল-হৃদয়া রমণী, যাঁহাদের হৃদয়, কেবল প্রেম, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি স্বর্গীয় উপাদানেই গঠিত, তাঁহাদের হৃদয় যখন, সাগর-গামিনী স্রোতোবহার ন্যায়, অবাধগতি সম্পন্ন হয়, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহার গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? তাই শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তকে দেখিলেন, দেখিয়াই সাগরোন্মুখী তরঙ্গিণীর ন্যায়, সেই দিকে যাত্রা করিলেন, অবশ-হৃদয়ে, যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত চলিতে লাগিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে, তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার, হৃদয়ে উদিত হইয়াও, আর তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে পারিল না। তাই, দুষ্যন্ত যেমন তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি পরিণয়-যোগ্যা কি না, সদ্বংশ-সম্ভবা কি না,—প্রভৃতি কত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সেরূপ কিছুই করেন নাই, করিতে পারেনও নাই। তিনি দুষ্যন্তকে দেখিয়াই আত্ম-বিস্মৃত হইলেন! দুষ্যন্ত যে পুরুবংশের প্রধান পুরুষ, ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি, ইহা জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আত্ম-ভ্রম ঘটিল। শকুন্তলার যেমন দুষ্যন্ত-দর্শন, অমনিই আত্মবিস্মৃতি, দুষ্যন্তকে আত্ম-সমর্পণ। আর দুষ্যন্তের শকুন্তলা-দর্শনের পর, কত বিচার, মনে মনে কত বিতর্ক, সংশয়, পরে—নিশ্চয়-জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, তার পর আত্ম-দান।

দুষ্যন্তকে সেই স্থানে,—যে স্থানে ভ্রমরের আক্রমণে শকুন্তলার বিভ্রম ঘটিয়াছিল, অনসূয়া প্রিয়ংবদার সহিত শকুন্তলার কত প্রণয়ের কোপ, কলহ, বাদানুবাদ হইয়াছিল, যে স্থানে গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে প্রিয়ংবদা বাহু-লতাবেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর দয়ার্দ্র দুষ্যন্ত স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক-প্রদানে অবরুদ্ধার মোচন করিয়াছিলেন,—দুষ্যন্তকে সেই স্থানে, সেই বন-তোষিণীর পার্শ্ববর্ত্তিনী, প্রচ্ছায়-শীতলা, সপ্তপর্ণ বেদিকায় রাখিয়া, শকুন্তলা সখীদিগের সহিত চলিয়া গেলেন। সখীরা আশ্রম-বাসিনী, জগতের কোন জটিল ভাবনাই তাঁহাদের নাই, মনে কখনো

উদিতও হয় না। তাঁহারা একান্ত সরল-হৃদয়া। তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিভাবলে উপস্থিতমতে, দুষ্যন্তের কথাবার্ত্তার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন। কোন মৃগ পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিলে, যেমন তাঁহারা তাহাকে জলদান করেন, আশ্রমের আতপ-দগ্ধ পাদপ-নিচয়ে, যেমন তাঁহারা জলসেক করেন, শুক-ময়ূরদিগকে যেমন তাঁহারা আহার দান করেন, ঠিক সেই বুদ্ধিতে দুষ্যন্তের তাঁহারা আতিথ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের হৃদয় যেমন মুক্ত গগনের ন্যায় নির্ম্মল, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ নির্ম্মল। রাজাকে সেই লতা-কুসুম-পরিবেষ্টিত সপ্তপর্ণকুঞ্জে বিসর্জ্জন করিয়া, তাহারা, অন্যান্য দিনের ন্যায়, অদাও প্রসন্ন-হৃদয়ে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর শকুন্তলা,—

তিনি কণ্বের তথা কণ্বাশ্রমের যথাসর্ব্বস্বভূত। তাঁহার উপর আশ্রমের ভার ন্যস্ত করিয়া, মহর্ষি নিশ্চিন্ত মনে, তাঁহারই দুর্দ্দৈব-প্রশমনের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। অতিথি-সৎকার তাঁহারই করিবার কথা। অনসূয়া প্রিয়ংবদা, বার বার তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। অতিথির অর্চ্চনার নিমিত্ত, উটজ হইতে 'ফল মিশ্রিত' অর্ঘ্য আনিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি তাহা করেন নাই। করিতে পারেন নাই। মহর্ষির সন্ন্যস্ত ভার যে ভাবে বহন করা উচিত, তাহা করিতে পারেন নাই। ইহাতে আশ্রম-ধর্ম্মের কোন হানি না হইলেও, শকুন্তলার আত্মকর্ত্তব্যের বুঝি সম্যক পালন করা হয় নাই। যে প্রণয়ের অঙ্কুরেই এই প্রকার আত্ম-বিস্মৃতি, কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি, সে প্রণয়ের পূর্ণাবস্থার মূর্ত্তি যে কীদৃশী, তাহা ভাবিবার বিষয়, পরিণামে যে ঘোর আত্মবিস্মৃতির ফলে, অতিথিরূপী দুর্ব্বাসার অভিশাপ পতিত হইবে, কবি, এই প্রথম-সন্দর্শনেই বুঝি তাহার রেখাপাত করিলেন। যে সম্মোহ, এই প্রথম-দর্শনে শকুন্তলাকে, অতিথির অর্ঘ্যানয়নে বিস্মৃত করিল, সেই সম্মোহই পরে, পরিণতাকারে, কুটীরদ্বারোপনত দুর্ব্বাসাকেও শকুন্তলা কর্ত্তৃক

বিস্মারিত করিবে। শকুন্তলা কর্ত্তৃক অতিথির অপরিজ্ঞান এবং তাহার ফলে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত—এই সমুদয়ের জন্য, কবি যেন সামাজিকদিগকে প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা সমবয়স্কা সখীদিগের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া, তপোবনের কোন্ গাছটিতে পল্লব বাহির হইল, কোন্ লতিকায় ফুল ফুটিল, কোন্ লতা কোন্ তরুকে স্বয়ং বরণ করিল,—এই সমুদয় নির্ম্মল দৃশ্য দেখিয়া দিন কাটাইতেন! দিন-যামিনী তরুলতার সহবাসে তাঁহার অন্তঃকরণও যেন তরুলতিকার ন্যায় নির্ম্মল সৌন্দর্য্যময় হইয়া গিয়াছিল। যখন তিনি জল-সেচনের জন্য উপস্থিত, সখীদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত, দেখিয়াছি, তখন তাঁহার সবই সুন্দর, সবই নির্ম্মল। অনসূয়া বলিল, "তুমি এই লতাটিকে বুঝি বিস্মৃত হইয়াছ?" তিনি অমনি বলিলেন—'উহাকে যে দিন ভুলিব, সে দিন নিজেকেও ভুলিয়া যাইব।'—এত সুন্দর, এত কোমল, এত নির্ম্মল তাঁহার হৃদয়। কবি, প্রথমতঃ, সখীদের সহিত দুই-চারিটি কথাবার্ত্তা বলাইয়া শকুন্তলার হৃদয়খানি যেন খুলিয়া দেখাইলেন যে, দেখ, সে বালিকা-হৃদয়ের কোথাও কোন প্রকার রেখা বা বিন্দুটি পর্য্যন্ত নাই, সে হৃদয়ের সমস্তই স্নেহ, সমস্তই প্রীতি। সে হৃদয় বর্ষার জলদাবৃত বা হেমন্তের শিশিরাবৃত গগনবৎ নহে, সে হৃদয় শারদ-গগনবৎ নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত। শরতের তটিনীর ন্যায় সে হৃদয় নির্ম্মল স্নেহ-প্রীতির মন্দ-প্রবাহ-পূর্ণ, বর্ষার নদীর ন্যায় কূলপ্লাবী নহে। যখন শকুন্তলার হৃদয় এমনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, কুসুমিত লতিকার সহবাসে সৌরভময়, সেই সময়ে কবি, সেই নির্ম্মল, সংসার-বৃত্তান্তানভিজ্ঞ, সরল হৃদয়ে প্রণয়ের অরুণ-কিরণপাত করিলেন। ঈষৎ পরিণত কমলের উপর বালার্কমরীচি পতিত হইয়া যেমন, তাহাকে সহসাই রূপান্তরিত করে, তাহার অস্ফুট কোরকাকৃতি প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত করে, কবিও তদ্রূপ, শকুন্তলার অস্ফুট হৃদয়-কুসুম প্রণয়ের প্রভাতরাগে

প্রস্ফুটিত করিলেন। সেই কাননের প্রান্তদেশে, সপ্তপর্ণ-বেদিকায়, শকুন্তলার হৃদয়-গগনে, এই যে নবীন তরণি-রাগ উদ্ভাসিত হইল, সখীরা ইহার কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না, শকুন্তলা বুঝিলেন। কিন্তু তিনি তাপস-দুহিতা, সংযমশীল আশ্রমের অধিদেবতারূপিণী, তাঁহার হৃদয়ের পরিমাণ অনেক, তাহা সহজে পরিজ্ঞাত হইবার নহে। তিনি নিজের মনের মধ্যে যেমন, তাহার মধ্যে ঐ নবোদিত আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত করিলেন।

ষট্-পঞ্চাশ অধ্যায়।

সতীর আত্মমর্য্যাদা।

বসন্তের সমাগমে, উদ্যানের তরুলতা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। তুমি জল-সেচন কর না কর, উদ্যানে যাও না যাও, তাহার লতা-পাদপে ফুল আপনিই ফুটিবে। বসন্তের মলয়-পবনে হেলিয়া দুলিয়া, সে ফুল আপনিই কত খেলা খেলিবে। ফুলের খেলা তোমাকে দেখাইবার জন্য নহে, তোমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য নহে, সে প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি আপনিই খেলেন। কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না, কোকিল ভ্রমর প্রভৃতি, তখন আপনিই আসিয়া সে উদ্যানে উপস্থিত হয়।

শকুন্তলার হৃদয়ে, বসন্ত-সমাগমে উদ্যান-কুসুমবৎ, প্রেমকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী-প্রভৃতি আশ্রমের আর কেহ তাহা জানিলেন না বটে, কিন্তু সে কুসুমের নর্ত্তনে, সে কুসুমের সৌরভে, শকুন্তলার হৃদয়োদ্যান পরিপূর্ণ হইল।

যে দিন, সেই ভ্রমর বাধার সময়ে, রাজার প্রথম-সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, তারপর সপ্তপর্ণ-বেদিকায়, সেই প্রসন্ন-গম্ভীরা রাজ-মূর্ত্তির ছায়ায় বসিয়া, আত্মার অপরিজ্ঞেয় কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে, শকুন্তলার স্বস্তি, চিত্ত-প্রসাদ প্রভৃতি, একটি একটি করিয়া, প্রস্থান করিয়াছে। তাঁহার স্নিগ্ধ হৃদয়ে এতদিন যাহারা সুখে বাস করিতেছিল, আপনাদের ক্রীড়োদ্যানের ন্যায়, যে হৃদয় তাহাদের লীলাতরঙ্গের ক্ষেত্র ছিল, এখন তাহাতে অন্যের অধিকার দেখিয়া, তাহারা—সেই স্থির-প্রসাদ, উৎসাহ, উল্লাস, শান্তি প্রভৃতি চিরপরিচিত বৃত্তিগুলি কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। দিনে দিনে, গ্রীষ্মের লতিকার ন্যায়, শকুন্তলার দেহ-যষ্টি ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আশ্রমের তিনি জীবন-প্রতিমা। তাঁহারা দিন-যামিনী শকুন্তলাকে

লইয়াই থাকেন। তাঁহারা বুদ্ধিমতী সত্য, কিন্তু তাপস-কন্যা, তপোবনের শান্তি-ধারা-বর্দ্ধিতা লতিকা, গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ তাঁহারা বিদিত নহেন। তাঁহারা শরতের কৌমুদীই জানেন, বসন্তের পবনই চিনেন, নিদাঘ-রবির প্রখর-কিরণ তাঁহারা জানেন না, তাহার প্রভাব যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। শকুন্তলা যে, দিনে দিনে কাতর হইয়া পড়িতেছেন, প্রতি-ক্ষণেই তাঁহার কাতরতা যে বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন, কিন্তু ইহার নিদান তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সরল হৃদয়ে, এই কার্য্য-কারণ-ভাবের নির্দ্ধারণ-প্রবৃত্তি আদৌ উদিতই হয় নাই। কালিদাস এই একই স্থলে, পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দুই শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একখানি সখীদ্বয়ের, অপর খানি শকুন্তলার। স্ব স্ব চমৎকারিতায় দুইখানিই মনোরম, দুইখানিই নিরবদ্য, দুইখানিই নিরুপম!

শকুন্তলার কাতরতা-দর্শনে সখীদ্বয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কি করিলে, শকুন্তলার এ অবস্থার প্রশমন হইবে, ভাবিয়া তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কখন কুটীর মধ্যে রাখিয়া শকুন্তলার কত প্রকার শুশ্রূষা করেন, কখন শীতল শিলাতলে নব পল্লব ও নলিনী-দল-প্রভৃতি দ্বারা শয্যা-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক, তাহাতে শয়ন করাইয়া নানাবিধ উপায়ে, ক্লশাঙ্গী শকুন্তলার হৃদয়-নির্ব্বাণের প্রয়াস করেন। তাঁহারা তাপসী, 'তপোবন-বিরুদ্ধ-বিকার' তাঁহাদের নিকট অপরিচিত।

শকুন্তলাকে দর্শন করা অবধি, রাজা দুষ্যন্তেরও অতিশয় ভাবান্তর ঘটিয়াছে। সপ্তপর্ণ-বেদিকা-মূল পরিত্যাগের পর হইতেই, তাঁহারও প্রাণ অস্থির। কিন্তু শকুন্তলার ন্যায়, একবারে, তাঁহার আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে নাই। অন্তর্লীন অনল-শিখায় শমীতরুর ন্যায়, তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু তদীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের তাহাতে কোন প্রকার বাধা জন্মিতেছে না। যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তিনি তখনই তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করেন।

কবি এই স্থলে অতিস্ফুটভাবে দেখাইলেন যে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা—ইহাঁদের কাহার হৃদয় কোন্ অংশে কীদৃশ। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভাবেন, নিয়ত শকুন্তলাময় হইয়াই থাকেন, কিন্তু তাহার মধ্যেও তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অতি দৃঢ়, কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি তাঁহার একবারেই নাই। আর শকুন্তলার অন্য কোন জ্ঞান নাই, সকলই তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় সেই দুষ্যন্ত। আপনার দুষ্যন্তময় হৃদয়ের মধ্যে তিনি যেন নিমগ্না। তিনি বহির্ব্যাপার পরিজ্ঞানে এমনই বিমূঢ়া যে, সখীদ্বয় তাঁহাকে পল্লব-শয্যায় শায়িত করিয়া, সলিল-সিক্ত শতদল-পত্রে বাজন করিতে করিতে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সখি শকুন্তলে! কেমন, এ নলিনী-দল-বায়ুতে তোমার তৃপ্তি হইতেছে ত?'—তখন বিস্মৃতিময়ী তাপস বালা উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে কহিলেন, 'সখি! তোমরা কি বাতাস করিতেছ?' তাঁহার এই উত্তরে সখীদ্বয়ের মুখ বিবর্ণ হইল, নয়ন স-জল হইল।

দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা—এই উভয়ের বিষয় পর্য্যালোচনায় এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা দুইজনেই দুই জনের প্রেমে উন্মত্ত বটে, তবে রাজার সে উন্মাদ জ্ঞানের অমোঘ অঙ্কুশে নিয়তই সংযত। তাহা কখনও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে নাই। আর শকুন্তলার উন্মাদের নিকট জ্ঞান পরাহত। রাজার হৃদয় শকুন্তলাগত হইয়াও কার্য্যান্তর-দক্ষ, আর শকুন্তলার হৃদয় একবারে রাজানুগত, রাজ-চিন্তা-নিমগ্ন, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যান্তর-বিমূঢ়। দুষ্যন্তের নিকট হৃদয় পরাজিত, আর শকুন্তলা নিজেই নিজের হৃদয় কর্ত্তৃক অপহৃত। দুষ্যন্ত পুরুষ, তিনি আত্মধারণে সমর্থ, শকুন্তলা রমণী, তিনি তাহাতে অসমর্থা। দুষ্যন্তের দাতব্য-বিষয় বিচার-প্রধান, আর শকুন্তলা অত বিচার-বিতর্ক করেন না, যাহা দিবার, তাহা একপদেই দিয়া ফেলেন, দানের অবশিষ্ট কিছুই রাখেন না। পুরুষ এবং রমণীর হৃদয়ে এই প্রভেদ। এই প্রভেদ আছে বলিয়াই হৃদয়-সম্পদে রমণী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গরীয়সী।

এইস্থলে দুষ্যন্ত যদি শকুন্তলার ন্যায়, আর শকুন্তলা দুষ্যন্তের ন্যায় হইতেন, তাহা হইলে, উভয়েরই চরিত্র-ক্ষতি হইত। মহনীয়ত্বের ব্যাঘাত ঘটিত। সেইরূপ নহেন বলিয়াই, দুষ্যন্ত পুরুষ-প্রধান, আর শকুন্তলা অদ্বিতীয়া রমণী।

দুষ্যন্ত অদ্বিতীয় পুরুষ এবং অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই, সেই প্রথম-সন্দর্শন-কালে, শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার গ্রাহ্যাগ্রাহ্যত্বের বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। সখীদ্বয়ের নিকটে শকুন্তলা-বিষয়ক কত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আর শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়াই একেবারে বিমুগ্ধ হইলেন, পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়াই তাঁহাকে আত্মদান করিলেন। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ ইহাও বুঝা গেল যে, পুরুষ অনেক ভাবিয়া, আপনার লাভালাভ বিচার করিয়া দান করেন, আর রমণী, উন্মুক্ত-হৃদয়ে, আত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া, আপনার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, দানীয়পাত্রে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলেন। এ অংশেও পুরুষ অপেক্ষা রমণীর শক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়া। রমণী স্বভাবতই কোমল-প্রাণা, তাহার মধ্যে আবার শকুন্তলার প্রাণ যে কত কোমল, কত সুন্দর, তাহা কবি, এই স্থলে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

শকুন্তলার হৃদয় এত একাগ্র, এত একমুখীন, এত নির্ভরদক্ষ যে, সেই উদ্যান-বাটিকায়, তিনি নিমেষের মধ্যে, নিজের হৃদয়-পুষ্পটির দ্বারা যে অতিথির আতিথ্য করিয়াছিলেন, যে অতিথির চরণে অর্ঘ্যরূপে স্বকীয় সমগ্র হৃদয়খানি উপহার দিয়াছিলেন, সেই অতিথি, ক্ষণকাল পরে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেও, বহুদিন পরে পরিদৃষ্ট ও তাদৃশ প্রত্যাখ্যান পর হইলেও কিন্তু, শকুন্তলার সেই প্রদত্ত হৃদয় কুসুম, তেমনি ভাবে, তাঁহারই উদ্দেশে পড়িয়া ছিল। নলিনী যেমন যামিনীযোগেও, ভবিষ্যৎ দিবসের আশায়, ঊর্দ্ধনয়নে চাহিয়া থাকে, মুগ্ধা তাপস-বালার হৃদয়ও তদ্রূপ, শতপ্রত্যাখ্যান-প্রাপ্ত হইয়াও, সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতার ধ্যানেই নিমগ্ন ছিল।

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, যখন উত্থান-শক্তি-বর্জ্জিতা, দুষ্যন্তগত-হৃদয়া, শকুন্তলাকে সুশীতল শিলাতলে শয়ন করাইয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তখন পর্য্যন্তও কিন্তু তাঁহারা শকুন্তলার মানসী বেদনার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই। শকুন্তলা অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা। আর তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদা কখন নিমীলিতাক্ষী শকুন্তলার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, কখন বা, পরস্পর 'মুখ চাওয়া চায়ি' করিতেছেন। আশ্রম-পতি কণ্ব অনুপস্থিত। তাঁহাদের বিপদের সীমা নাই। অনসূয়া নিতান্ত মুগ্ধ-প্রকৃতি, শকুন্তলার তাদৃশী অবস্থায়, তিনি এক প্রকার হতচৈতন্যা। তিনি মধ্যে মধ্যে শকুন্তলার এ বিপদের কারণ নির্ণয় করিতে যান্, কিন্তু পরক্ষণেই, শকুন্তলার দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার বুদ্ধিধারা বিচ্ছিন্ন হয়, এক প্রকার লুপ্ত হয়, তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। প্রিয়ংবদা ভাবিয়া ভাবিয়া, কুসুমশয্যাশায়িনী শকুন্তলার অগোচরে, তাঁহাকে বলিলেন, 'অনসূয়ে! সেই রাজর্ষির প্রথম-দর্শন-দিন হইতেই, শকুন্তলার এই ভাব, সেই রাজাই কি, আমাদের সখীর এই দুরবস্থার কারণ?' সুপ্তোত্থিতার ন্যায় অনসূয়ার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তখনই শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—'কিছুতেই বলিব-না, আর সহসা বলিবার শক্তিও আমার নাই।'

পুরুষ এবং রমণীর হৃদয়-গত গাম্ভীর্য্যের তারতম্য, কবি এই স্থলে অতি প্রাঞ্জল-ভাবে প্রদর্শন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ দুষ্যন্ত, তাঁহার হৃদয়ের শকুন্তলাগত উন্মাদের কথা গোপন করিতে পারেন নাই। চঞ্চলমতি বয়স্য বিদূষককে সব বলিয়া ফেলিয়াছেন। বলিবার পর বুঝিয়াছেন যে, কাজটা ভাল করেন নাই। তাই আবার তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আর শকুন্তলা সখীময়-জীবিতা। তাঁহারা যেন একই বৃন্তের তিনটি ফুল। তবুও কিন্তু শকুন্তলার হৃদয়ের লুক্কায়িত কুসুমের সৌরভ সখীদ্বয় জানিতে পারেন নাই। ইচ্ছা করিয়া, অতি

যত্নে, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়াছেন। পুরুষ অপেক্ষা নারীহৃদয় যে ভাব-প্রধান, পুরুষ অপেক্ষা নারী-হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য যে অনেক অধিক, এ অংশেও পুরুষ অপেক্ষা রমণী যে অধিকতর বলশালিনী, তাহা এই বৃত্তান্তে অতি-সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল।

সখীদ্বয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, শকুন্তলা মনোবেদনার কারণ বলিতে, অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার তাদৃশ যাতনাপূর্ণ হৃদয়েও সখীদিগের ভাবনা জাগিল। তাঁহার দুঃখের কথা শুনিলে যে সখীদেরও দুঃখের অবধি থাকিবে না, তাঁহারাও যে তাঁহার ন্যায় বেদনায় অতীব কাতর হইবেন, এই ভাবনায় তিনি আরও চঞ্চল হইলেন। যে সমবেদনার বৈদ্যুতবলে, সখীদ্বয় শকুন্তলার দুঃখের কারণ পরিজ্ঞানের জন্য অস্থির, তাহারই প্রভাবে শকুন্তলা বেদনার হেতু-প্রকাশে অস্বীকৃতা। যে বৃত্তিতে শকুন্তলাকে, এই প্রকারে, প্রিয়-সখীদের নিকটে, দুঃখ-হেতু-প্রকাশে পরাঙ্মুখী করিয়াছে, সেই বৃত্তির উৎপত্তিস্থল রমণীরই হৃদয়-স্বর্গ। পবিত্র নারীহৃদয়ের ইহা একটি চিরসুন্দর অলঙ্কার। ক্রমে অনেক অনুরোধের পর, শকুন্তলা সখীদের নিকটে, আপন বেদনার কারণ প্রকাশ করিলেন। সখীরাও তাঁহার গুণাভিমুখী চিত্তবৃত্তির শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনেক কথার পর, প্রিয়ংবদার আগ্রহানুসারে, স্থির হইল যে, শকুন্তলা একখানি পত্র লিখিবেন, আর সেই পত্র কুসুমের দ্বারা আবৃত করিয়া, গুপ্তভাবে, আশ্রম-প্রান্তবর্ত্তী রাজার নিকটে প্রেরণ করা যাইবে। শকুন্তলার কিন্তু, এই প্রস্তাবে, বুক কাঁপিয়া উঠিল। সৎকুল-সম্ভবা সতী ললনার আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান অতি প্রবল। তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য সহাস্যবদনে মরিতে পর্য্যন্তও প্রস্তুত। আত্ম-সম্মান-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের অদেয় কিছুই নাই। যে রমণীর হৃদয় এই মর্য্যাদায় শিথিল-প্রযত্ন, সে রমণী নহে, সে পিশাচী।

শকুন্তলা পত্র লিখিবেন, রাজা যদি তাহাতে আস্থা-প্রদর্শন না করেন, অবজ্ঞা করেন, তখন উপায়? একেই ত শকুন্তলার এই কষ্ট, এই যাতনা, তখন যে আবার ইহা অপেক্ষাও বিপদ, মৃত্যুতে এ যাতনার শেষ আছে, কিন্তু সে যাতনার বুঝি মরণেও শেষ নাই। রমণী সব সহিতে পারেন, কিন্তু পতি-কৃত-অবজ্ঞা, উপেক্ষা প্রভৃতি সহিতে পারেন না। তাই কল্পিত রাজকৃত উপেক্ষা স্মরণ করিয়া, মহর্ষি-দুহিতার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

মহাকবি, নিপুণ মণিকারের ন্যায়, শকুন্তলার হৃদয়াকর হইতে মণিরত্নগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, সামাজিকদিগকে যেন দেখাইতে লাগিলেন যে, সে তাপস-কুমারীর হৃদয় কত অপার্থিব রত্নের আধার, সে হৃদয়ের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে কি শোণিত প্রবাহিত। প্রকৃতি যেমন প্রভাতে স্বকীয় উদ্যান-রূপ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া, পথিকের সমক্ষে আপনার শিশির-বিন্দু-খচিত কুসুম-রাশির ডালা সাজাইয়া তুলিয়া ধরেন, কবিও তদ্রূপ, শকুন্তলার হৃদয়খানি যেন একেবারে খুলিয়া, তুলিয়া ধরিয়া, দর্শকদিগকে সে হৃদয়ের গুণ-সম্পৎ-সমূহ দেখাইতে লাগিলেন।

হায় শকুন্তলে! আজ লিখিত পত্রের উপেক্ষা কল্পনা করিয়াই তোমার মুগ্ধ হৃদয় এত অধীর, আর যখন তোমার সমক্ষে, ত্বদীয় হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা তোমাকে উপেক্ষা করিবেন, তখন তোমার এই অভিমানী হৃদয়ের যে কি অবস্থা হইবে—তাহা ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়! চক্ষে জল আসে!

পত্রের উপেক্ষা-কল্পনায় শকুন্তলার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শুনিয়া—সখীদ্বয় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'আত্ম-গুণাবমানিনি! কোন্ মূর্খ আতপত্রের দ্বারা শরীর-নির্ব্বাপিকা শারদী জ্যোৎস্না নিবারণ করিয়া থাকে?'

"'আত্ম-গুণাবমানিনী' নহেন, শকুন্তলা আত্ম-গুণানভিজ্ঞা। যিনি আত্ম-গুণের পরিমাণ জানেন, তিনি সেই গুণের গণনা না করিলেই, 'গুণাবমানিনী' হইতে পারেন, কিন্তু শকুন্তলা ত জানেন না যে তাঁহার কত গুণ, বিধাতা তাঁহাকে কত রূপ—কত গুণ দিয়া ধরায় পাঠাইয়াছেন। তিনি ত বিদিত নহেন যে,—'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ—।' যদি জানিতেন,—যদি তাঁহার আত্ম-গুণের একটা সামান্য ধারণাও থাকিত, তাহা হইলে, সখীদের উক্তিই ঠিক হইত, তাঁহার মনে, হয়ত, তাদৃশ আশঙ্কার উদয়ই হইত না। যে নির্গুণ, যাহার কিছুই নাই, বিধাতার কৃপায় যে বঞ্চিত, সেই আত্ম গুণের অনুসন্ধান করে, যাঁহার গুণ আছে, সেই গুণবান কখনো আত্ম গুণের কথা ভাবেন না। ওদিকে তাঁহার লক্ষ্যই থাকে না! বিশেষতঃ রমণী-জাতি। যে রমণী যত অধিক আত্ম-বিস্মৃত হইবেন, তাঁহার তত সুখ, তাঁহার হৃদয় তত মধুর, তত উচ্চ, অথবা রমণীর তত দিনই রমণীয়ত্ব। রমণী যদি কদাচ মনে করিলেন যে, তাঁহার এত সৌন্দর্য্য, এত রূপ, এত গুণ, এত সম্পদ,—তবে জানিও, সেই দিন হইতে, সে রমণীহৃদয়ে ঘুণ ধরিল, তাঁহার দেবত্বের অন্তর্ধানের আর অধিক বিলম্ব নাই।

প্রিয়ংবদা কর্তৃক উপহৃত, 'শুকোদরবৎ সুকুমার নলিনী পত্রে' প্রিয়ংবদারই আগ্রহাতিশয়ে, শকুন্তলা, নখ দিয়া, একটি গান লিখিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা দুষ্যন্ত, অনেকক্ষণ হইতে—যখন সখীদ্বয় শকুন্তলাকে শিলাশয়নে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে, বিমনায়মান হৃদয়ের সান্ত্বনার আশায়, কাননে প্রবেশ করিয়া, বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া—সখীদ্বয়ের এই সকল কথোপকথন শুনিতেছিলেন।

শকুন্তলার গান রচিত ও লিখিত হইলে পর, যখন শয়ানা তন্বী

শকুন্তলা, তাহা পাঠ করিয়া সখীদিগকে শুনাইলেন[১], তখন অমনি রাজাও, সেই সঙ্গীত-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সহসা আত্ম-প্রকাশ করিলেন। সখীদ্বয় তদ্দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন। শকুন্তলার প্রাণ বাঁচিল. ভাবিয়া, তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। শয়ানা ক্ষীণাঙ্গী শকুন্তলা, অকস্মাৎ সেই চিরধ্যাত মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু কৃশতা-নিবন্ধন পারিয়া উঠিলেন না। আর দয়ার্দ্র দুষ্যন্তও নিষেধ করিলেন। অনসূয়া রাজাকে সেই কুসুম-বাসিত শিলাতলে উপবেশন করাইলেন। প্রিয়ংবাদিনী প্রিয়ংবদা ধীরে ধীরে, শকুন্তলার মনোবেদনার কথা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন।

শকুন্তলার এখন আর সে তাপসীভাব নাই। তিনি বধূভাবে সলজ্জ-বদনে অধোমুখী হইয়া রহিলেন। এতদিন যে যাতনায়, যে দুঃখে, হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছিল, হঠাৎ তাহা যেন কার মন্ত্রবলে অপসৃত হইল।

'আমরা বাঁচিলাম'—বলিয়া প্রতিভাময়ী প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে লইয়া হরিণশিশু ধরিতে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা কহিলেন—'সখি! আমি নিরাশ্রয়া, তোমাদের একজন ফিরিয়া আইস।' তখন সখীদ্বয় সমকণ্ঠে বলিলেন, 'পৃথিবীর যিনি নাথ, তিনি তোমার নিকটে, আর তুমি নিরাশ্রয়া?—'

রাজা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু রাজার সম্মুখে থাকিতে মুগ্ধা শকুন্তলার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিল। তিনিও গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা তাঁহাকে যাইতে দিলেন না, গতিরোধ করিলেন।

অনেক কষ্টের পর, অনেক বেদনার পর, শকুন্তলা বাঞ্ছিত-সন্দর্শন

১—শকু, ৩য় অঙ্ক। শকুন্তলা বাচয়তি।

'তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামঃ দিবা অপি, রাত্রৌ অপি।
নির্ঘৃণঃ তপতি বলীয়ঃ ত্বয়ি বৃত্ত মনোরথানি অঙ্গানি।

পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি বিনয়ের মর্য্যাদা বিস্মৃত হইলেন না। ক্ষীণ-কণ্ঠে,—স্খলিত-কণ্ঠে,—রাজাকে কহিলেন, 'পৌরব! আমার আত্মার আমি প্রভু নহি।' তিনি জানেন, পবিত্র আশ্রমের তিনি অধিবাসিনী, পবিত্রমনাঃ কণ্বের তিনি দুহিতা। পবিত্রতা-রক্ষা করিতে যদি মরিতেও হয়, তবে তাহাও তিনি পারেন। দুষ্যন্তকে ভাবিতে ভাবিতে জীবন-পাত করাও বরং ভাল, তথাপি, গোপনে, আশ্রম-বিরোধী উপায়ে, ঋষিদুহিতা বাঞ্ছিতলাভ করিতে অভিলাষিণী নহেন!

রাজা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, রাজর্ষি-কন্যাদের চিরদিনই গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত, শকুন্তলা রাজর্ষি-কন্যা, সুতরাং ঐ বিবাহই তাঁহার প্রশস্ত।

কিয়ৎকাল পরেই, প্রিয়ংবদা দূর হইতে সঙ্কেতে জানাইলেন—গৌতমী আসিতেছেন। শকুন্তলার ত্রাস হইল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিবার জন্য অত আকুলতা, এক্ষণে, নিজেই তাঁহাকে কহিলেন 'আর্য্যা গৌতমী আগতপ্রায়, রাজন্! তুমি বিটপান্তরিত হও।'

দুষ্যন্তকে শকুন্তলা মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বৈধ গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তবুও কিন্তু লজ্জাবতী শকুন্তলা, তাঁহার প্রবীণা পিসিমাতার সমক্ষে, তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সমীপে অবস্থানে অভিলাষিণী হইলেন না। এই লজ্জা ভারত-কামিনীর আভরণ। এই আভরণে যিনি বিমণ্ডিতা, তিনিই হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া, ললনা-ধর্ম্মের পালন করিতে পারেন। নিজের কষ্ট গণনা না করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে জীবন-সর্ব্বস্বকেও বিদায় দিতে পারেন। শকুন্তলা আত্ম-বিস্মৃতা ছিলেন বটে, কিন্তু আত্ম-বিমূঢ়া ছিলেন না। ক্ষণমধ্যেই গৌতমী উপস্থিত হইলেন। সখীদ্বয়ও বিদ্যুদ্বেগে শকুন্তলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৌতমী শান্তিজলে শকুন্তলার মস্তক অভ্যুক্ষিত করিয়া, সকলকে লইয়া উটজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রা-কালে, শকুন্তলা পদমাত্র পশ্চাদ্-

বর্ত্তিনী হইয়া, যে লতাবলয়ে রাজা তিরোহিত ছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'সন্তাপহর! লতা-বলয়! প্রার্থনা করি, আবার যেন তোমাকে পাই।'—

সেই শকুন্তলা,—যিনি বনতোষিণীর পার্শ্ববর্ত্তিনী সপ্তপর্ণ-বেদিকায় বসিয়া প্রিয়ংবদার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন, অভিন্ন-হৃদয়া সখীর নিকটেও আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলা আজ বিটপান্তরিত দুষ্যন্তের নিকটে সেই প্রিয়ংবদারই সমক্ষে, হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। সপ্তপর্ণ-বেদিকামূলে শকুন্তলার হৃদয়ে, যে প্রণয়-সরস্বতী অপ্রকাশিত ছিল, এতদূরে বহিয়া আসিয়া, তাহার ধারা প্রকাশ পাইল। 'যুক্তবেণী' এত দিনে 'মুক্তবেণী' হইল। এত দিন তিন সখীতে এক মূর্ত্তিবৎ ছিলেন। এক্ষণে শকুন্তলার যেন একটা পৃথক্ সত্তা জন্মিল। সে সত্তা আর কিছুই নহে, দুষ্যন্তের ছায়া মাত্র। কণ্বের তাপসী কন্যা, এত দিনে, ক্রমে দুষ্যন্তের ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন।

সপ্ত-পঞ্চাশ অধ্যায়।

শাপ না শাসন?

রাজা দুষ্যন্ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনই সংবাদ নাই। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার প্রাণ অস্থির হইয়াছে। তাহারা নিজের ভাবনা জানে না। দিবারজনী শকুন্তলার কথাই ভাবে। 'কেন রাজা কোন সংবাদ দেন না, তিনি কি ভুলিয়া গেলেন'—এই ভাবনায়, তাহাদের আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে। 'কি করিলে শকুন্তলার এ দুরদৃষ্ট খণ্ডিত হয়'—, নিরন্তর তাহাদের এই চিন্তা। অনসূয়া আজ প্রিয়ংবদাকে লইয়া আশ্রমোপান্তে কুসুম চয়ন করিতেছে, বাসনা,—ডালা ভরিয়া ফুল তুলিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি ফুলের দ্বারা, আজ দুঃখিনী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চ্চনা করিবে,—ইহাতে যদি তিনি প্রসন্ন হয়েন, এই শুভানুষ্ঠানের ফলে, রাজার যদি শকুন্তলাকে মনে পড়ে। হিন্দু সংসারে যখনই কোন দৈবদুর্ব্বিপাক আপতিত হয়, বিপদ্ ঘটে, তখনই আমরা এই সুন্দর দৃশ্যটী দেখিতে পাই। সংসারের যাঁহারা প্রাণ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সেই রমণীরা অনন্য-হৃদয়ে, আপৎ-প্রশমনের জন্য, দেবতার অর্চ্চনা করেন, কত ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন। রমণী-জাতির মজ্জায় মজ্জায় যদি এইরূপ ধর্ম্মভাব আবহমান কাল হইতে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, হয়ত, এতদিনে হিন্দুধর্ম্মের আরও কত অধঃপতন ঘটিত। কবি, কেমন সুন্দর করিয়া, ধর্ম্ম-প্রভাব-পূর্ণ হিন্দু-সমাজের তথা হিন্দু-রমণীর হৃদয়ে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিলেন।

অনসূয়া প্রিয়ংবদা এইরূপে কুসুম-চয়নে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এ দিকে আশ্রমে শকুন্তলাও একাকিনী, তাঁহার আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্না! তিনি এক দিকে, অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়া আছেন। কিন্তু সে দৃষ্টির দৃষ্টিশক্তি নাই। সে দৃষ্টি বহিঃস্থ হইয়াও বাহ্যবস্তুর দর্শন করিতে

পারিতেছে না। সে দৃষ্টি, শকুন্তলার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার ধ্যেয়, হৃদয়াঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিতেছে। পুত্তলিকার নয়নের ন্যায়, সে নয়ন যেন চিত্রিত, নিষ্পন্দ, বস্তুস্বরূপ-পরিগ্রহে অসমর্থ!

সেই বনতোষিণী, সপ্তপর্ণবেদিকা, ভ্রমর-বাধা,—সেই অতিথির আবির্ভাব, প্রিয়ংবদার রহস্যোক্তি, শকুন্তলার আত্মগোপন,—সেই শিলাতলে কুসুম-শয়ন, পত্র-লেখন, সহসা রাজার অভ্যুপ-পতন, আর তার পর আবার, সেই—সখীদ্বয়ের অন্তর্ধান, দুষ্যন্ত শকুন্তলার পরস্পর আত্ম-সমর্পণ, শকুন্তলার কাতরতা, রাজার অনুনয়,—হঠাৎ বিঘ্নরূপিণী গৌতমীর আগমন,—আজ একে একে সব শকুন্তলার মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা আজ বহির্জগৎ ছাড়িয়া, অন্তর্জগতের মধ্যে একবারে বিলুপ্ত, মিশ্রিত। জীবের স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ চলিয়া যায়, আজ শকুন্তলারও স্থূলদেহ মালিনী-তটের কুটীর-দ্বারে পতিত, আর তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ কোথায় অন্তর্হিত! অনশ্বর প্রেম, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি এই লোকের সামগ্রী নহে, লোকান্তরের পবিত্র বস্তু, তাই আজ প্রেমময়ী শকুন্তলার প্রাণও যেন লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহার নশ্বর দেহ এই নশ্বর লোকে পড়িয়া আছে।

করুণাময় পিতা কণ্ব, দ্বিতীয়-হৃদয়-সদৃশী অনসূয়া, প্রাণতুল্যা প্রিয়ংবদা, স্নেহময়ী আর্য্যা গৌতমী—এ সকলকেই আজ শকুন্তলা ভুলিয়াছেন। কণ্বের বড় আদরের আশ্রম, আশ্রম তরুলতা, বড় আগ্রহের আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন, অতিথির অর্চ্চনা প্রভৃতি, তিনি, তীর্থ-গমন-কালে, শকুন্তলার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। শকুন্তলা আর এখন সেই আশ্রম-বাসিনী নহেন, পার্থিব আশ্রমের অনেক দূরে, অনেক উচ্চে যে আশ্রম, সেই আশ্রমের যে সর্ব্বপ্রধান সঞ্জীবন তরু, সেই তরুর সর্ব্বপ্রধান সম্মোহন ফলের আস্বাদনে শকুন্তলা এখন উন্মাদিনী। কণ্ব তাপস, চির দিন তপস্যা করেন, বনে থাকেন, ফলমূল আহরণ করেন।

হৃদয়ের বেগ বা প্রেমের প্রতাপ যে কত প্রবল, জীবের উপর তাহার যে কত আধিপত্য, তাহা বুঝি সংসার-বিরক্ত বনবাসী ঋষি বিদিত নহেন। তাই তিনি বিস্মৃতময়ী মুগ্ধা শকুন্তলাকে, একটু কর্ম্মঠ, আত্ম-ধারণ-সমর্থ করিবার জন্য, তাঁহার উপর আশ্রমের ভার, অতিথি-সৎকারের ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের প্রভাব যদি তিনি বিদিত থাকিতেন, নারী-হৃদয়ের প্রকৃত পরিমাণের যদি তাঁহার জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, ক্রান্তদর্শী মহর্ষি, কদাচ মুগ্ধা, কোমল-প্রকৃতি, অপ্সরী কন্যার উপর এ গুরু-ভারের অর্পণ করিতেন না। তিনি স্নেহময় পিতার চক্ষেই শকুন্তলাকে দেখিতেন, পিতৃত্ব-নিরপেক্ষ হইয়া কদাচ তিনি শকুন্তলাকে দেখেন নাই। তাই শকুন্তলার হৃদয়ের সকল অংশ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

আশ্রম-পালিকা, মুগ্ধ-হৃদয়া শকুন্তলা এই ভাবে, বামহস্তে কপোল-বিন্যাস-পূর্ব্বক, কুটীর-দ্বারে, অন্তর্লীন-নয়না, স্পন্দহীনা, আলিখিতা প্রতিমার ন্যায় উপবিষ্টা, পতিধ্যান-তন্ময়ী, বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। আর এ দিকে, দৈবদুর্ব্বিপাকে, অতিথি-রূপী 'সুলভ-কোপ,' দুর্ব্বাসা ঋষি উপস্থিত। তিনি আসিয়াই ঐ চিত্রার্পিতাবৎ স্পন্দ-রহিতা বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—'আমি অতিথি।' দুষ্যন্ত-গত-হৃদয়া শকুন্তলার কর্ণে দুর্ব্বাসার সে নির্ঘোষ প্রবেশ করিল না। অমনি দুর্ব্বাসা, অতিথির অবজ্ঞা-দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, 'আঃ দুরাচারিণি! আমি অতিথি, তুই আমার অবমাননা করিলি! তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আজ আমার অবমাননা করিলি, আমার অভিশাপ,—তুই শত প্রকারে স্মরণ করাইয়া দিলেও, প্রমত্ত ব্যক্তির ন্যায় সে তোকে স্মরণ করিতে পারিবে না[১]।'

১—শকু, চতুর্থ অঙ্কের বিকম্ভক। দুর্ব্বাসা।

আঃ অতিথি-পরিভাবিণি!

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্য-মানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতং।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

কোমল-প্রাণা শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার মস্তকে, এই-ভাবে অভিসম্পাতরূপ বজ্রনিক্ষেপ করিয়া, দুর্ব্বাসা ত্বরিতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শকুন্তলা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। তাঁহার শুভ্র ললাটপট্টে একটি কাল রেখার পাত হইল।

মানুষের এমন এক একটা অবস্থা বা সময় আসে, যখন সে, লোক, লজ্জা, ভয়, সমাজ, সদাচার—সব ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। সে বিস্মৃতির ফল ভাল কি মন্দ, ভঙ্গুর কি অক্ষয়, অমৃত কি গরল, তাহা মানুষ তখন বুঝিতে পারে না। বুঝিবার সামর্থ্যও তাহার তখন থাকে না। তরণি যত ক্ষণ নিমগ্ন না হয়, ততক্ষণই তাহার বহন-যোগ্যতা, ততক্ষণই সে পারাপার করিতে সমর্থ, একবার নিমগ্ন হইলে, কোথায়—কতদূরে যে তাহার নিমজ্জনের শেষ, কতদূরে যে তাহার মৃত্তিকাস্পর্শ সম্ভাবনা, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? শকুন্তলাতরণি নিমগ্ন হইয়াছে, কতদূরে তাহার আশ্রয় মিলিবে,— কে বলিবে?

সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশেষ। পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল, প্রভৃতি লইয়া যেমন একটি তরু, প্রত্যেক মানব, ছোট বড় সকলকে লইয়া তেমনই এই সমাজ। এই বিশাল সমাজ-মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, মানব আত্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সংসারের তাপ-যাতনা বিস্মৃত হয়। সমাজ অনাথের নাথ, অপুত্রকের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের স্নেহময়ী মাতার স্থানীয়। হিন্দু সমাজ এমন ভাবে গঠিত যে, ইহাতে কাহাকেও একাকী থাকিতে হয় না, আত্মীয়-শূন্য থাকিতে হয় না। ইহাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয়। ইষ্টকের উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক রাখিয়া যেমন অভ্রভেদী সৌধ গ্রথিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক পরস্পরের সাহায্যে সংসক্ত, আবার সকলের সাহায্যে, সকলের সমবায়ে

সৌধ দণ্ডায়মান, ইষ্টকসমূহ খুলিয়া লইলে যেমন সৌধের সৌধত্ব ধ্বংস হয়, সেইরূপ, সকল মানুষ লইয়াই সমাজ। সমাজে প্রতিমানব পরস্পরের সাহায্যে সংসক্ত, সমাজের ক্রোড়ে সুখে অবস্থিত। ঐ পরস্পরাপেক্ষিণী মানব-বাহিনীর সমবায়ের নামই সমাজ। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু সমষ্টিভাবে আবার সকলেই সমাজের অধীন। সেই পরাধীনত্ব বা পরস্পরাপেক্ষিত্ব আছে বলিয়াই সমাজ সুখের সদন। যে সমাজে এই পরস্পরাপেক্ষিত্ব নাই, প্রত্যেকেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, পরের কথা যে সমাজের লোকে ভাবিতে জানে না, যে সমাজের সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, সে সমাজে সুখ নাই, তাহা উচ্ছৃঙ্খল না হইয়াই থাকিতে পারে না, তাহা মানব-সমাজ নহে, দানব-সমাজ। কেবল আত্মসুখের অন্বেষণে, তাদৃশ সমাজেই নিয়ত সুন্দ উপসুন্দের কলহ হয়, তারক-বৃত্র-প্রভৃতি অসুরের উৎপত্তি হয়।

সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে—সকল অবস্থাতেই তুমি সমাজের অধীন। কোন সময়ের কোন অবস্থাতেই তুমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহ। সমাজের নিকট তোমার অশেষ কর্ত্তব্য। সমাজের মঙ্গলামঙ্গল, —সুতরাং বিপুল জন-সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল, তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি শোকেই অধীর হও, আর সুখেই উন্মত্ত হও, কথনও সমাজকে বিস্মৃত হইও না, হইলে চলিবে না। তাহাতে তোমারও অমঙ্গল, সমাজেরও অমঙ্গল। তোমার সুখ-সম্পদ্ সমাজের সুখ-সম্পদ হইতে স্বতন্ত্র নহে। তুমি যখন তোমার আত্ম-সুখকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়া লইবে, কেবল নিজের সুখেরই স্বপ্ন দেখিবে, তখনই জানিও, তোমার পতন নিকটবর্ত্তী। তোমার সুখ-যামিনী অবসিত-প্রায়।

শকুন্তলা আপনার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, জগৎকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কণ্ব, কণ্বাশ্রম, আশ্রমতরু, আশ্রমমৃগ প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়াছিলেন। তিনি নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের ভাবনা,

সমাজের অঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন, সমাজের চির-সংসক্ত গ্রন্থি শিথিল করিয়াছিলেন, সমাজের অঙ্কশায়িনী থাকিয়াও, তিনি জ্ঞাত-সারেই হউক, আর অজ্ঞাত-সারেই হউক, সমাজকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি বহুজনমধ্যবাসিনী থাকিয়াও আপনাকে, তাঁহার ক্ষুদ্র নিজত্বকে, একাকী, অসহায়, অন্য-নিরপেক্ষ করিয়া লইয়াছিলেন, তাই সমাজের কঠোর শাসন তাঁহার উপর পতিত হইল। তিনি একাকিনীই সে দণ্ড ভোগ করিলেন। সমাজের অন্য কেহ তাঁহার ছায়াস্পর্শও করিল না। তিনি যতই ব্যাকুলা হউন, যতই আত্ম-বিস্মৃতা হউন, সমাজের নিকট তাঁহার যে কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহাকে পালন করিতে হইবেই হইবে। যদি তাহা না করেন, সমাজের তিনি ক্ষমার অযোগ্যা। সমাজের কঠোর শাসনবজ্র তাঁহার মস্তকে পতিত হইবে। প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, সে দণ্ডের পতন অনিবার্য্য। অতিথি-সেবা আশ্রমীর প্রধান কর্ত্তব্য, শকুন্তলা আপনার জন্য অন্ধ হইয়া সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই সমাজের কঠোর শাসনরূপী দুর্ব্বাসার নির্ম্মম অভিসম্পাত বিস্মৃতিময়ী শকুন্তলার উপর নিপতিত হইল। শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন, ধ্বংস নহে, তাই দুর্ব্বাসার কোপে শকুন্তলা ভস্মীভূত হইলেন না। সে অভিশাপ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনান্ত হইল একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, সমাজরূপী নৃপতির দণ্ডাজ্ঞা হইল। যে মোহে শকুন্তলার এই আত্ম-বিস্মৃতি, সে মোহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

মহাকবি, এই অভিশাপের সৃষ্টি-পূর্ব্বক, একদিকে, মহাভারতের কামুক দুষ্মন্তের কামুকত্ব নিরাস করিলেন, মহাভারতের পার্থিব দুষ্মন্তকে, অপার্থিব এবং অমর করিলেন; প্রাচীন কীট-দষ্ট, দারুময়ী, প্রতিমার পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন; নির্ম্মল শারদ-কৌমুদী দ্বারা আবার সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া লইলেন; আর অন্য দিকে, কবি, সমাজ এবং সমাজ-বাসীর সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, সমাজ এবং

সামাজিক—পরস্পরের পরস্পরাপেক্ষিতা তথা অন্যোন্য-কর্ত্তব্যতার জলন্তী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। নির্ম্মাণদক্ষতার প্রভাবে, কবি একই চিত্রপটে এমন মূর্ত্তি আঁকিলেন যে, দুই দিক হইতে দেখ, সেই একই মূর্ত্তিতে দুইটি সুন্দর ছবি দেখিতে পাইবে। সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ইহা পরাকাষ্ঠা, কবিত্বের ইহা চরম উৎকর্ষ!

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

বিদায়।

আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন। প্রবাস হইতে কণ্ব আসিয়াছেন, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন, তাঁহার প্রীতির পরিসীমা নাই। একজন শিষ্যকে বলিয়া রাখিয়াছেন 'অতি প্রত্যূষে উঠিও, সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে।' শিষ্য গুরুর আদেশমতে কুটীরের বহির্দ্দেশে আসিয়াই দেখিলেন —প্রভাত হইয়াছে। শিষ্যের সহসা চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইল। একদিকে রজনীপতির অস্তগমন, অন্যদিকে দিনপতির অভ্যুদয় দেখিতে দেখিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—'হায়! এই চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় মানুষেরও ত উদয় এবং অস্ত, উন্নতি এবং অধঃপতন নিয়ন্ত্রিত! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যিনি স্বকীয় অমৃত-ধারায় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই ওষধিপতি চন্দ্র ঐ একদিকে অস্তগতপ্রায়, আর সূর্য্যদেব ঐ অপর দিকে সমুদিত। চন্দ্রের এই বিপদের সময়, তাঁহার সঙ্গে আর কেহই নাই, তিনি একাকীই ডুবিতেছেন। আর দিনমণির এই অভ্যুদয়ের সময়, তাই তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, অরুণ অগ্রসর হইয়া, তাঁহার রাজ্যের তিমির নাশ করিতেছেন।'

'ঐ দূরে শশী অস্তমিত, কুমুদিনীর আর এখন সে শোভা নাই, তাহা এখন স্মৃতির বিষয় হইয়াছে। মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে, যে কুমুদিনী আনন্দ সাগরে নিমগ্ন ছিল, মুহূর্ত্তপরে, সেই কুমুদিনীরই এই দশা! ইহা দেখিয়া মনে হয়, অবলাজাতির বাঞ্ছিত-বিয়োগের দুঃখ বুঝি বা বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই অসহ্য!'

শকুন্তলার পতিগৃহ-প্রস্থানাভিনয় আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই, রঙ্গমঞ্চে কণ্ব-শিষ্যকে আনিয়া, চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তোদয় ও কুমুদিনীর অবসাদের বর্ণনচ্ছলে, কবি, দর্শকদিগের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবনার সঞ্চার

করিলেন। উদয়ের পর অস্ত, হর্ষের পর বিষাদ,—ইহা বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম;—এ কথাটা শতশঃ বিদিত থাকিলেও দর্শকদিগকে আর একবার, ঐ সত্য মনে করাইয়া দিলেন। বাঞ্ছিত-বিয়োগ-দুঃখ, অবলাদের,—যাহাদের হৃদয়ের পতিচিন্তা, পতিধ্যান ব্যতীত অন্য বস্তু নাই, সেই অবলাদের যে কি অসহ্য, কি যাতনা-প্রদ, তাহা কুমুদিনীর নিদর্শনে, দর্শকদিগকে অনেকটা বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। আর কিয়ৎকাল পরেই, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-সময়ে, যে হৃদয়-বিদারী শোকের,—যে ভয়ঙ্কর দুঃখের অভিনয় হইবে, তজ্জন্য, দর্শকদিগের হৃদয়-ক্ষেত্র, যেন কবি, এখন হইতেই প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই শিষ্য-বাক্য-শ্রবণে, দর্শকদিগের হৃদয়ে যে চিত্রের অস্পষ্ট ছায়া পতিত হইল, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান সেই চিত্রেরই সুস্পষ্ট মূর্ত্তি।

আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন প্রিয়ংবদা আসিয়া অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়া পরম আনন্দ হইল, কিন্তু শকুন্তলা আজই যাইবেন—ভাবিয়া, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রিয়ংবদা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, 'সখি! আমাদের উৎকণ্ঠার কথা আমি তত ভাবি না, আহা! দুঃখিনী শকুন্তলা ত নির্বৃতি লাভ করুক, তাহার কষ্ট আর দেখা যায় না[১]।' দুষ্যন্ত চলিয়া যাওয়ার পর, শকুন্তলার অবস্থা যে কীদৃশী শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কবি এই প্রিয়ংবদা-বাক্যে প্রকাশ করিলেন।

অনসূয়া, প্রিয়ংবদাকে লইয়া শকুন্তলার শুভযাত্রার উপকরণ কুসুমাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শুভ লগ্ন উপস্থিত। শকুন্তলা যাত্রা

১—শকু, ৪র্থ অঙ্ক। অনসূয়া। প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য। 'সখি! প্রিয়ং মে, কিন্তু অদ্য এব শকুন্তলা নীয়তে, ইতি উৎকণ্ঠা-সাধারণং পরিতোষং অনুভবামি।' প্রিয়ংবদা 'সখি! আবাং তাবৎ উৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ, সা তপস্বিনী নির্বৃতা ভবতু।'

করিবেন। অপরাপর আশ্রম হইতে তাপসীগণ আসিয়া, গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সখীদ্বয় তাঁহার কত সুন্দর বেশভূষা করিয়া দিলেন। সম্মুখে গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত দণ্ডায়মান, পার্শ্বে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, আর পশ্চাতে তাপসীগণ—সকলেই যেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে সজল-নয়ন কণ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলা তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। কণ্বের কম্পিত কণ্ঠ হইতে আশীর্ব্বচন উদীরিত হইল। শকুন্তলা যাত্রা করিলেন, সঙ্গে গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত। তরুশিরে কোকিলগণ কূজন করিয়া উঠিল, গৌতমী বলিলেন, 'বাছা! বনদেবতারা তোমাকে বড়ই ভালবাসিতেন, ঐ শুন, তাঁহারা কোকিল-কূজন-চ্ছলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম কর।' শকুন্তলা প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ও কাতর-বচনে কহিলেন, 'সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় একান্ত আকুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু তপোবন ছাড়িতে হইবে—ভাবিয়া আমার পা উঠিতেছে না!' তখন ম্লান-মুখী প্রিয়ংবদা বলিলেন, 'সখি! তপোবনের বিরহে কেবল যে তুমিই কাতর হইতেছ—এরূপ নহে, তোমার বিরহে আজ তপোবনেরও কি দশা ঘটিয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ,—ঐ দেখ, হরিণগণ আহার বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া—স্থির-নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছে, ঐ দেখ, তাহাদের মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে। ময়ূর-ময়ূরী, ঐ দেখ, নৃত্য ছাড়িয়া, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কোকিলগণ আম্র-মুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরবে বসিয়া আছে। ভ্রমর-ভ্রমরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুণ্ গুণ্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে[১]!',—শকুন্তলার চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার

১—শকু, ৪র্থ, অঙ্ক। প্রিয়ংবদা। 'ন কেবলং তপোবন-বিরহ-কাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিত-বিয়োগস্য তপোবনস্য অপি তাবৎ সমবস্থা দৃশ্যতে।'

সেই বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন—'বনতোষিণি! বনজ্যোৎস্নে! তোমার শাখা-বাহুদ্বারা আজ একবার আমাকে স্নেহের সহিত আলিঙ্গন কর, আজ হইতে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম,'—শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন, এই দৃশ্যে তাঁহার সখীরাও কাঁদিল। শকুন্তলা সেই লতাটিকে কাঁদিতে কাঁদিতে ধরিয়া সখীদ্বয়কে কহিলেন—'দেখ, তোমাদের হস্তে আমার এই বনতোষিণীকে সঁপিয়া গেলাম।' শকুন্তলার হৃদয়ের প্রকৃত স্বরূপ এতক্ষণে প্রকাশিত হইল। সে হৃদয় যে স্নেহ-মমতার একমাত্র আধার, তাহা, তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতিবর্ণে, প্রতিপাদবিক্ষেপে প্রকাশ পাইল। কোথায় কোন্ হরিণী আসন্ন-প্রসবা, তাহার জন্য শকুন্তলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বনের পশুগুলিও তাঁহার জন্য কাঁদিয়া ফেলিল! হরিণশিশু আসিয়া পায়ে পড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। তখন কোমলপ্রাণা তপস্বি-দুহিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাত কণ্বের দিকে চাহিলেন। সমীপে সরোবরে নলিনী-পত্রের অন্তরালে, চক্রবাক লুকাইয়া আছে, তাহাকে না দেখিয়া, চক্রবাকী করুণ-কণ্ঠে ডাকিতেছে,—শকুন্তলার সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। চক্রবাকী ক্ষণকালমাত্র প্রিয়তমের অদর্শনে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছে, আর তিনি এই দীর্ঘকাল প্রিয়-বিরহিতা, তবুও বাঁচিয়া আছেন! তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল।

কণ্ব যখন বলিলেন, 'বৎসে! আমাকে এবং তোমার সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন কর'—তখন শকুন্তলার চমক ভাঙ্গিল। তিনি এতদিন পরে আজ বুঝিলেন যে, তাঁহার গন্তব্য স্থান এক, আর সখীরা অন্য পথের যাত্রী। তখন তিনি, পিতার ক্রোড়ের মধ্যে যাইয়া সজলনয়নে ও গদ্‌গদবচনে কহিলেন, 'তাত! আপনাকে না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব?' দুই চক্ষের ধারায় তাঁহার বক্ষঃ প্লাবিত হইল। তিনি পরশু-নিকৃত্তা শালযষ্টির ন্যায়, কণ্বের পাদমূলে পতিত হইলেন। ক্রমে, সখীদের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন, তিন সখীতে মুক্তকণ্ঠে

রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, হৃদয়ের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন 'সখি! যদি রাজা সত্বর তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে, তাঁহাকে তাঁহার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়কটি দেখাইও।' সখীদের কথা শুনিয়া, শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে, একটা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ উঠিয়া, সমগ্র হৃদয়-খানিকে যেন একটা প্রবল আঘাত করিয়া গেল। সখীরা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তিনি কণ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'পিতঃ! আবার কবে আমি এ আশ্রম দেখিতে পাইব?'—সজল-নেত্র কণ্ব কহিলেন 'মা!—

ভূত্বা চিরায় চতুরন্ত-মহী-সপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিত-কুটুম্ব-ভরেণ সার্দ্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্[১] ॥

শকুন্তলা আবার কণ্বকে আলিঙ্গন করিলেন, কণ্বও আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দেখিতে দেখিতে, শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীর সহিত শকুন্তলা অনেক দূর চলিয়া গেলেন। ক্রমে শ্যামল বনরাজি তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সখীরা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া, গৃহস্থ যেমন সজল নয়নে ও শূন্য হৃদয়ে, শূন্য-মন্দিরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, অনসূয়া-প্রিয়ংবদাও শূন্যহৃদয়ে, শূন্য-তপোবনে কণ্বের সহিত প্রবেশ করিলেন।

শকুন্তলা আশ্রমবাসিনী ছিলেন, চিত্তসংযম যে স্থানের প্রধান ব্রত, সেইস্থানে তাঁহার বাস ছিল। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আকার-প্রকার-দর্শনে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কণ্বের কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু বাল্যাবধি শকুন্তলার

১ চতুঃসমুদ্র বেষ্টিতা ধরণীর সপত্নী হইয়া, অপ্রতিরথ পুত্রকে ভারতের সিংহাসনে নিবেশিত করিয়া, স্বামীর সহিত, পুনরায় এই আশ্রমে আসিও।

মুগ্ধভাব দেখিয়া, কণ্ব বুঝিয়াছিলেন যে, আমার এ মেয়ে আশ্রমের কঠোরতা বুঝি সহ্য করিতে পারিবে না। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন, অনুরূপ বর পাইলেই শকুন্তলাকে সম্প্রদান করিবেন। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, অথচ বরের সন্ধান নাই, তাই ঋষি, কন্যার দুর্দ্দৈব-শান্তির জন্য তীর্থে গমন করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহার যে আশঙ্কা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে! তখন মনস্বী মহর্ষি স্থির করিলেন, 'আর শকুন্তলাকে আশ্রমে রাখা সঙ্গত নহে।' তিনি শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন। তাঁহার ক্রোধের কোন কারণ ছিল না, তিনি ক্রোধ করেনও নাই। শকুন্তলা ক্ষত্রিয়-কন্যা, দুষ্যন্তও ক্ষত্রিয়-প্রধান। কণ্ব বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন! তবে এ প্রকার সম্মিলনের পরিণাম যে বড় সুখজনক নহে, এইরূপ অজ্ঞাত হৃদয়ের বিনিময় যে বড় শুভোদর্ক নহে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই দুইজন ব্যবহারজ্ঞ শিষ্য ও ভগিনী গৌতমীকে শকুন্তলার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুষ্যন্তকে কি কি বলিতে হইবে, কোন্ কোন্ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। শিষ্যগণ শকুন্তলাকে লইয়া বিদায় হইলেন, মহর্ষি কণ্বও যেন পুনর্জীবন-লাভ করিলেন[১]। তাঁহার হৃদয়ের ভার লঘু হইল। স্নেহের প্রভাবে, তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইল বটে, কিন্তু তিনি মনস্বী, মনের উপর তাঁহার প্রবল আধিপত্য, তিনি কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া সে কষ্ট সহ্য করিলেন।

১—শকু, ৪র্থ-অঙ্ক, কণ্ব।

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব, তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিত-ন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

অপরিচিতা।

শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমীর সহিত, শকুন্তলা, কত আশার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন। সেই মালিনীতীর, সেই উদ্যান, সেই অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, বনজ্যোৎস্না, সেই ময়ূর-ময়ূরী, মৃগ-মিথুন, চক্রবাক-চক্রবাকী, আর সেই দয়ার সাগর তাত কাশ্যপ—এই সমস্ত, কখনো একে একে, কখনো বা যুগপৎ, শকুন্তলার হৃদয়ে উদিত হইয়া, যেমন মুগ্ধা তাপস-দুহিতাকে বিমনায়মানা করিতেছিল, অমনি কুহকিনী আশা কত ঐন্দ্রজালিক ছবি দেখাইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল। অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া মায়াবিনী আশা, তাঁহাকে কত সুখের স্বপ্ন দেখাইতেছিল! শকুন্তলা সেই অলীক স্বপ্ন বাস্তববস্তুবৎ দেখিতে দেখিতে, তাঁহার কল্পিত-স্বর্গ হস্তিনাপুরে, দুষ্যন্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বামেতর নয়ন ঘন ঘন বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজা, সেই অকস্মাদুপনতা, 'অবগুণ্ঠনবতী,' 'নাতিপরিস্ফুট-শরীর-লাবণ্যা,' পুরোবর্ত্তিনী ললনার দিকে একবার চাহিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দৃষ্টিসংযম করিয়া লইলেন। প্রতিহারী কহিল 'কি সুন্দর আকৃতি? ইনি কে মহারাজ?' রাজা অমনি নয়ন পরাবৃত্ত করিয়া রুষ্টস্বরে কহিলেন 'হউক সুন্দরী, পরস্ত্রী-দর্শন অসঙ্গত!' শকুন্তলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি মনে মনে কহিলেন, 'হৃদয়! কেন কাঁপিতেছ? আর্য্যপুত্রের সেই সব ভাব কি তুমি ইহারই মধ্যে বিস্মৃত হইলে? স্থির হও।'

ক্রমে রাজা ও শিষ্যগণের স্বাগত-জিজ্ঞাসা শেষ হইলে, শার্ঙ্গরব বলিলেন 'রাজন্। আমাদের গুরুদেবের প্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করুন,—তিনি বলিয়াছেন, আপনি আমার অজ্ঞাতসারে মদীয় দুহিতা শকুন্তলার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, আমি সন্তোষ সহকারে তাহা অনুমোদন

করিলাম। আমার কন্যা এক্ষণে আপন্ন-সত্তা, আপনি ইহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করুন।' বর্ষীয়সী গৌতমী কহিলেন, 'মহারাজ! আমারও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি বলিব? শকুন্তলা গুরুজনের কোনই অপেক্ষা রাখে নাই। আর তুমিও শকুন্তলার বন্ধুবান্ধবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর নাই। সুতরাং তোমরা দুইজনে, দুইজনের মতানুসারে যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে অপরের আর কি বক্তব্য আছে?'

শকুন্তলা শঙ্কিত-হৃদয়ে কাণ পাতিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন! দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে রাজা শকুন্তলা-গত তাবৎ বৃত্তান্তই একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার কিছুই মনে পড়িল না। তিনি সমস্ত অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলার সেই বামেতর নয়ন-স্পন্দন সফল হইল। ক্রমে, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী এবং রাজায় অনেক কথোপকথন হইল। রাজা স্পষ্টতঃ বলিলেন, 'তাপসগণ! আমি যে এই রমণীকে কোন দিন গ্রহণ করিয়াছি, ইহা ত কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না, সুতরাং আমি কি করিয়া, এই 'অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণা' রমণীর পরিগ্রহ করিব?' এতক্ষণ শকুন্তলা, বাতাহত কদলীর ন্যায়, কম্পিতদেহে, ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, যখন রাজার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য, গৌতমী, আনত-বদনা সজল-নয়না শকুন্তলার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছিলেন, তখনও শকুন্তলার চিত্তে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ছিল, কেন না, তখনও আশা ছিল যে, তাঁহার আর্য্যপুত্রের হয়ত ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, অচিরেই তাহা অপনোদিত হইবে; কিন্তু এক্ষণে রাজার এই কথার পর, অভাগিনীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, শরীর অবসন্ন হইল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। 'হায়! পরিণয়ে পর্য্যন্ত সংশয়! কোথায় আমার সে দুরাশা? আমি হস্তিনাপুরে আসিয়া আমার চিরধ্যাত দেবতার চরণে স্থান পাইব, আমার এই দীর্ঘ যাতনার অবসান হইবে, আমার হৃদয়ের শত বৃশ্চিক-দংশন প্রশমিত হইবে!

কোথায় আমার এই সকল দুরাশা ?'—ভাবিতে ভাবিতে, শকুন্তলা মন্ত্র-বিমূঢ়ার ন্যায়, হত-চৈতন্যার ন্যায়, বজ্রাহতার ন্যায়, চিত্রার্পিতার ন্যায়, নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতির যে গম্ভীর অবস্থা, অগ্ন্যুদ্‌গমের পূর্ব্বে পর্ব্বতবক্ষের যে অবস্থা, প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে ধূমায়মান অনলকুণ্ডের যে অবস্থা, শকুন্তলা তদবস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময়ে শারদ্বত, শব্দবনবৎ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—'শকুন্তলে! আমাদের যাহা বক্তব্য, বলিয়াছি, রাজারও প্রত্যুত্তর শুনিলে, এখন তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বলিতে পার।'

শকুন্তলা রাজার অগোচরে কহিলেন, 'তাদৃশ অসীম অনুরাগের যখন এই পরিণাম, তখন আর বলিব কি ? তবে রাজার সংশয়ে আমার সর্ব্বনাশ, আমার অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, আমি ব্যভিচারিণী-রূপে প্রমাণিত হইতে যাইতেছি, সুতরাং এক্ষেত্রে, যে ভাবেই হউক, আমার যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা করিতে হইবে, আত্ম-শুদ্ধির প্রমাণ করিতে হইবে।' ভগ্নহৃদয়া তখন ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—'আর্য্যপুত্র!'—'আর্য্যপুত্র' বলিয়াই শকুন্তলার চমক ভাঙ্গিল। মনে পড়িল যে, এখন আর সে দিন নাই, এস্থান সেই মালিনীতীরবর্ত্তী তপোবন নহে,—ইহা হস্তিনাপুর, আর ইনিও সেই মৃগয়াবেশী অতিথি নহেন,—ইনি ভারত-সম্রাট্; এখন পরিণয়ে পর্য্যন্ত সন্দেহ, সুতরাং ওরূপ সম্বোধন আর শোভা পায় না। এই ভাবিয়া অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ নিরুদ্ধ করিয়া বলিলেন—'পৌরব! সেই জনহীন আশ্রমে, সেই শতবার শপথ-পূর্ব্বক, এই প্রকৃতি-সরলা তপস্বি-কন্যাকে প্রতারিত করিয়া, এইক্ষণে, এইরূপ পরুষবাক্যে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হওয়া আপনার ন্যায় নৃপতির কর্ত্তব্যই বটে। যদি আমার মুখের কথায় আপনার প্রত্যয় না জন্মে, তবে আমি আপনাকে উপযুক্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিতেছি'—বলিয়াই শকুন্তলা আপন অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক মোচন করিতে গেলেন। কিন্তু কোথায় সে অঙ্গুরীয়ক!

শকুন্তলা 'হা ধিক্! হা ধিক্!' বলিয়া বিষণ্ণ বদনে ও কাতর-নয়নে গৌতমীর দিকে চাহিলেন।

আসিবার কালে, এই অঙ্গুরীয়কের কথাই সখীরা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল। ইহার আবশ্যকতা যে কত, তাহা তাহারা জানিত, শকুন্তলা জানিতেন না। তবে তাহারা শকুন্তলাকে জানাইয়াছিল সত্য, কিন্তু শকুন্তলা তাহা বুঝেন নাই। বুঝিলে, সে অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুলী-চ্যুত হইত না। বুঝিলে, অঙ্গুরীয়ক থাকিত বটে, কিন্তু শকুন্তলার চরিত্র-ক্ষতি হইত। আমার প্রণয় অভিজ্ঞান সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি, সেই অভিজ্ঞানের রক্ষা করে, এবং তাহারই সাক্ষ্যে প্রণয়ের মোকদ্দমায় ডিক্রী পাইতে চায়, তাদৃশ প্রণয়ী, কবির তথা কবিতা-রসামোদীর করুণার পাত্র। কালিদাস অন্য কেহ নহেন, তিনি 'কালিদাস', সুতরাং তাঁহার কল্পিত প্রণয়ে, ওরূপ অভিজ্ঞান-রক্ষা-প্রবৃত্তি কদাচ বর্ণিত হইতে পারে না।

গৌতমী কহিলেন, 'শচীতীর্থে অবগাহনকালে তাহা নিশ্চয়ই স্খলিত হইয়াছে।' অমনি রাজা দুষ্মন্ত সস্মিতবদনে বলিলেন, 'লোকে স্ত্রী-জাতির যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকে, ইহা সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! অন্য জাতির ইহা নাই।' তখন শকুন্তলা আরও কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করিলেন। রাজা স্থির-ভাবে সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'কামিনীগণ এই প্রকার মধুমাখা কথা দ্বারাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া, আত্ম-কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লয়।' আজন্ম-শুদ্ধা মুগ্ধা শকুন্তলার প্রতি রাজার এই কটূক্তিবর্ষণে গৌতমীর প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি কহিলেন 'রাজন্! শকুন্তলা জন্মাবধি আশ্রমে প্রতিপালিতা, প্রবঞ্চনার লেশও সে জানে না।' তচ্ছ্রবণে, সমস্ত স্ত্রীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা আরও কতকগুলি কটূক্তি করিলেন। রমণী জাতির স্বভাবের উপর কটাক্ষ করায়, সাধ্বী তপস্বি-দুহিতার

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রোষ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, 'অনার্য্য! তুমি নিজের হৃদয়ানুসারে জগৎ দেখিতে চাও? তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ধর্ম্ম-কঞ্চুকে তুমি বহিরাবৃত, তোমার অন্তরে প্রবঞ্চনা! তোমার যে আচরণ, তাহাতে অন্য কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। নারীজাতিকে তোমার নিজের মত ভাব? ইহা তোমার বিষম ভ্রম!' পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় শকুন্তলার গর্জ্জনে, সম্মুখবর্ত্তী ভারতেশ্বরেরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন—'তাইত, এ কোপ ত কৃত্রিম নহে, এ যে সতী রমণীর কোপ, তবে কি এই রমণী যথার্থই আমার পরিণীত-পূর্ব্বা?' শকুন্তলা মর্ম্মান্তিক-বেদনাভরে স্খলিত-কণ্ঠে আবার বলিলেন 'তুমি আমায় ব্যভিচারিণী প্রতিপন্ন করিলে? তুমি পুরুবংশীয় নৃপতি, আমি তোমার ওকথায় বিশ্বাস করিয়া, তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম না যে, তোমার মুখে মধু আর হৃদয়ে কালকূট!' বলিতে বলিতে, অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া, হতভাগিনী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শার্ঙ্গরবের আর সহ্য হইল না। তিনি সক্রোধে শার্ঙ্গধ্বনিবৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—'পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, কার্য্য করিলে, তাহার পরিণাম এইরূপ হয়। এই নিমিত্তই সমস্ত কার্য্য, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, বিশেষভাবে পরীক্ষা-করিয়া করাই কর্ত্তব্য। 'অজ্ঞাত-হৃদয়ে' বন্ধুতা স্থাপন করিলে, তাহা এই প্রকার শত্রুতায় পরিণত হয়[১]।

শার্ঙ্গরব যথার্থই বলিয়াছেন. বন্ধুতা, বিশেষতঃ পরিণয়, ইহা কদাচ গোপনে করণীয় নহে। পরিণয় যে কেবল দম্পতিরই সুখের কারণ, তাহা নহে; সমাজেরও অশেষ সুখ, অশেষ মঙ্গল, ব্যক্তিগত

১—শকু, ৫ম অঙ্ক। শার্ঙ্গরব। ইদমাত্মকৃতং প্রতিহতং চাপলং দহতি।

অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।

অজ্ঞাত-হৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্॥

দাম্পত্য-সুখের উপর নিহিত, দাম্পত্য-মঙ্গলের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। পরিণয় মানব-জীবনের একটি প্রধান সংস্কার, সমাজের হিতজনক কার্য্য। যাহা সমাজের হিতজনক, যাহার মঙ্গলামঙ্গলের ফলভোগ শেষে সমাজকেই করিতে হইবে, তাহা, তুমি একাকী, নির্জ্জনে, অপ্রবুদ্ধভাবে করিবার কে? তুমি বিস্মৃত হইও না যে, তুমি স্বতন্ত্র হইয়াও কিন্তু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র। তুমি সমাজেরই অন্যতম অঙ্গ। সুতরাং যাহাতে সমাজের অঙ্গহানি ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কার্য্য তোমার করা উচিত নহে। করিতে পার না। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ পার না। তোমার নিজের মঙ্গলামঙ্গল তুমি স্বয়ং যতটা বুঝিবে, তোমার উপর যাঁহারা স্নেহ-শীল, তোমার সুখে যাঁহাদের সুখ, তোমার দুঃখে যাঁহাদের দুঃখ, তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতে পারেন; সুতরাং তুমি নিজের জন্য, নিজেই অত উদ্বিগ্ন হইও না। উহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক।

শারদ্বত বলিলেন 'রাজন্! শকুন্তলা আপনার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, না হয় পরিত্যাগ করুন'। আমরা চলিলাম। গৌতমি! আগে আগে চলুন।' 'ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া চলিলে?' বলিয়াই রোরুদ্যমানা শকুন্তলা উঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তখন অনুগামিনী শকুন্তলার দিকে চাহিয়া, কোপারুণলোচন শার্ঙ্গরব কহিলেন—'শকুন্তলে! তুমি এখনও স্বেচ্ছাচার করিতে চাও? এতকাণ্ডেও তোমার শিক্ষা হইল না? তুমি জান না যে, রাজার কথা যদি সত্য হয়, তবে কুলটা তুমি, পিতার গৃহে তোমার স্থান হইতে পারে না। আর যদি তোমার আত্ম-পবিত্রতায় সন্দেহের কিছু না থাকে,

—শকু, ৫ম অঙ্ক। শারদ্বত। 'রাজন্!—
'তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী॥

আপন চরিত্রে যদি তোমার আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে পতি-গৃহে দাসীবৃত্তিও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য! তুমি থাক, আমরা চলিলাম[১]।

ভীতা শকুন্তলা থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। দুষ্যন্তের সহিত তাঁহার যে পরিণয়, কণ্বাশ্রমের একটি প্রাণীও তাহা জানিতে পায় নাই। তাহারই ফলে, আজ শার্ঙ্গরব, 'রাজার কথা যদি সত্য হয়'—এই বাগ্‌বজ্র-নিক্ষেপের অবসর পাইলেন। পরিণয় একটা প্রধান বন্ধন। সে বন্ধনের কোন স্থলে, যদি কোনও ত্রুটি থাকে, তবে আজ হউক, কাল হউক বা দশ বৎসর পরে হউক, সে বন্ধনের দৃঢ়তার হ্রাস হইবে। গ্রন্থি শিথিল হইবে।

তাপসগণ চলিয়া গেলেন। নিরাশ্রয়া শকুন্তলা, 'বসুধে! আমায় স্থান দাও' বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবীণ দুষ্যন্ত-পুরোহিতের নির্দ্দেশ-ক্রমে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

শকুন্তলা গহনবনে একাকিনী আত্মবিস্মৃত হইয়া, গুরুজনের পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া 'অবিজ্ঞাত-হৃদয়ে' আত্মদান করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র আপনার জন্য বিরাট বিশ্বকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাই আজ, তাঁহার এই দুঃখের দিনে আর কেহই আসিল না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভারবাহী যেমন মস্তকের ভার অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে লঘু বোধ করে, তদ্রূপ তাহারাও যেন তাহার ভার অবতীর্ণ করিয়া পরিত্রাণ পাইল। শকুন্তলার সুখের সময়েও তিনি একাকিনী ছিলেন। তাঁহার সুখ দেখিলে যাঁহাদের সুখ, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত তিনি সুখী হইতে দেন নাই। আজ দুঃখের সময়েও, তিনি একাকিনীই সমস্ত দুঃখটা ভোগ করিলেন। একটি সমবেদনার কথা বলে, এমন একজন লোকও তাঁহার নিকট আসিল না। যাহারা বা আসিল,

১—শকু, ৫ম অঙ্ক। শার্ঙ্গরব। শকুন্তলে!—

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্॥

তাহারা সত্য-প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল, বলিল, 'এরূপ ব্যাপারের পরিণাম এই প্রকারই হইয়া থাকে।' অভাগিনী শকুন্তলার ক্রন্দন ব্যতীত আর গতি রহিল না। সেই বনতোষিণী-মূলের অনুরাগের— সেই মালিনী-তটবৃত্ত মহাযজ্ঞের পরিণাম যে এই প্রকার হইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ব্রহ্মাণ্ডের তিনি কিছুই চিনিতেন না। তাঁহার কিছুই ছিল না; কেবল সম্বলের মধ্যে ছিল, তাঁহার একখানি অগাধ প্রেমময় হৃদয়। সেখানিও তিনি পূর্ব্বেই দান করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন তাঁহার কোন সম্বলই নাই। মহর্ষি কণ্বের আদরের কন্যা নিরাশ্রয়ে নিঃসম্বলে কোথায় চলিয়া গেলেন!

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সতীত্বের জয়।

শকুন্তলার আর কোন সংবাদ নাই। তিনি কোথায় গেলেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিল,—কেহই কিছু জানে না। যখন শার্ঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতমী চলিয়া গেলেন, বোরুদ্যমানা কণ্বদুহিতা দুষ্যন্ত-পুরোহিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, সেই সময়ে, হঠাৎ স্বর্গ হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আসিয়া, তাঁহাকে উপরে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সে যে কে, কাহার মূর্ত্তি, কোথায় তাহার স্থান, কোন্ জগতে তাহার বাস,—কেহই জানে না। অমন অসামান্য রূপ, অমর-দুর্লভ গুণ, অনুপম হৃদয় যাঁর, তাঁহার যে এই পরিণতি, ইহা ভাবিয়া সামাজিকগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবার সম্ভাবনা। চঞ্চল-চিত্তে রসোৎপত্তি অসম্ভব। তাই কবি, শকুন্তলা-সংবাদোৎসুক সামাজিকদিগকে শকুন্তলার একটু সংবাদ দিলেন। শাপ-ব্যবহিত-স্মৃতি দুষ্যন্তের সমীপে ছায়াময়ী সানুমতীকে পাঠাইয়া, কবি জানাইলেন যে, শকুন্তলা মরেন নাই, সে অমরী মূর্ত্তির,—সে মানবী দেবীর একেবারে তিরোধান হয় নাই। তিনি এখনও জীবিত আছেন। এখনও দুষ্যন্তের উদ্দেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিনপাত করিতেছেন।

ধীবরানীত অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর, শাপ-মুক্ত-স্মৃতি হইয়া, রাজা শকুন্তলার জন্য আবার উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। আর 'তিরস্করিণী-প্রতিচ্ছন্না' ছায়াময়ী অপ্সরা সানুমতী, রাজার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্যাবলী দেখিতেছে। শকুন্তলার জন্য রাজার আকুলতা, উন্মাদ প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া, সে মনে মনে শকুন্তলার সৌভাগ্যের কত প্রশংসা করিতেছে। সে মেনকার সখী, মেনকা শকুন্তলার মাতা। সুতরাং শকুন্তলা তাহারও এক প্রকার 'শরীরভূতা।' শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজা সুখে আছেন, না দুঃখে আছেন, তাহা দেখিবার জন্যই সানুমতীর আগমন।

সে যদি বুঝিতে পারে যে, রাজার পশ্চাৎতাপ জন্মিয়াছে, শকুন্তলার কথা রাজার মনে পড়িয়াছে, রাজা শকুন্তলা-প্রাপ্তির জন্য একান্ত উৎসুক, তাহা হইলে, সে, এই সকল বৃত্তান্ত, যাইয়া সেই দুঃখিনী সতীর সকাশে বর্ণন করিবে। তাহাতে হয় ত শকুন্তলার প্রজ্বলিত হৃদয়ানলের কিয়ৎপরিমাণেও উপশম হইবে। কবি এই সানুমতী সৃষ্টি করিয়া, এই ভাবে দর্শকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে বিষাদিনী শকুন্তলার আশ্বাসেরও কথঞ্চিৎ উপায় করিলেন।

একদিন কুঞ্চুকী, দূর হইতে, অনুতাপ-বিমনা বিরহ-ক্ষাম রাজার দিকে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছিলেন—'আহা! এমন উৎকণ্ঠার মধ্যেও রাজা কি প্রিয়দর্শন! এখন আর ইঁহার পূর্ব্বের ন্যায় বেশ ভূষা নাই, দেহ এত ক্ষীণ হইয়াছে, যে, দক্ষিণ হস্তের কাঞ্চন-বলয় কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে, তাহা পর্যান্ত জ্ঞাত নহেন; নিয়ত উষ্ণ-শ্বাস-নির্গমে অধর রক্তাভ হইয়াছে, চিন্তিত-হৃদয়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটান বলিয়া, নয়নের গ্লানি যেন লাগিয়াই রহিয়াছে। দেহ শীর্ণ, তবুও কিন্তু শরীর-প্রভায়,—মনে হয়, যেন পূর্ব্ববৎই আছেন[১]।' সানুমতী কঞ্চুকীর এ কথা শুনিল, শুনিয়া একবার স্থিরনয়নে রাজার দিকে চাহিল, তাহার অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। সে বলিল, 'সার্থক শকুন্তলার ক্লেশ। ইনি প্রত্যাখ্যান করিলেও শকুন্তলা যে ইঁহারই জন্য অত ক্লেশ, অত দুঃখ সহ্য করিতেছে, দিন রাত্রি, ইঁহার ভাবনায় উন্মাদিনী হইয়া রহিয়াছে,—সে সব এরূপ প্রণয়ের অনুরূপই বটে! শকুন্তলা ধন্য!'

১—শকু, ৬ষ্ঠ, অঙ্ক; কঞ্চুকী—

'প্রত্যাদিষ্ট-বিশেষ-মণ্ডনবিধির্বাম-প্রকোষ্ঠার্পিতম্,
বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তা-জাগরণ-প্রতাম্র-নয়নস্তেজোগুণাদাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে॥'

এই স্থানে কালিদাস, সানুমতীর মুখ দিয়া, শকুন্তলার সংবাদ এবং শকুন্তলার দেবদুর্লভ হৃদয়ের সংবাদ প্রদান করিলেন। একদিন, এইরূপ দেবীহৃদয়ের পরিচয়, কালিদাসের রঘুবংশে সীতা-চরিত্রে পাইয়াছি। নির্ব্বাসিতা সীতার সেই—

ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা, নচ বিপ্রযোগঃ[১]।

অলৌকিক উক্তি শুনিয়াছিলাম। আর আজ, সানুমতীর মুখে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার কথা শুনিলাম। দুষ্যন্তের জন্য, তাঁহার যে কত ক্লেশ, তাহার আভাস পাইলাম। আসিবার কালে, কণ্ব বলিয়া দিয়াছিলেন যে, শকুন্তলে! যদি পতি-কর্ত্তৃক শতবিড়ম্বনাও প্রাপ্ত হও, তবুও কদাচ তাঁহার বিরুদ্ধচারিণী হইও না। পিতার এই আদেশ, পিতার এই শুভকামনা, দৈব-শক্তির ন্যায়, কন্যার হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজা ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে, মন্দ মন্দ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন বলিতে লাগিলেন, 'হায়! আমার হত-হৃদয় সেই তখন, মৃগলোচনা শকুন্তলা কর্ত্তৃক বার বার প্রতিবোধিত হইয়াও যেন নিদ্রিত ছিল, কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই, আর এখন, পশ্চাত্তাপ-জনিত দুঃখ ভোগের জন্যই বুঝি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছে! একে একে, সেই সব বিস্মৃত ঘটনাবলী মনে পড়িতেছে, কিন্তু আজ কোথায় শকুন্তলা?'—তখন রাজার এই কথা শ্রবণে সানুমতী বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা, কেন শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই; কেন বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেও স্মরণ করিতে পারেন নাই। সানুমতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন, 'আহা! হতভাগিনী শকুন্তলার কি দুরদৃষ্ট!'

শকুন্তলার সেই প্রস্থানোদ্যত কণ্বশিষ্যের অনুগমনচিকীর্ষা, তাঁহাদের তিরস্কার, দুঃখিনী শকুন্তলার অশ্রুবর্ষণ, রাজাকে আত্ম-পরিচয় দিবার

১—২৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সময়ে বিষাদিনীর সেই মলিন ও আশঙ্কাপূর্ণ মুখচ্ছবি, সজলনয়নে রাজার প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত—প্রভৃতি সব একে একে রাজার মনে জাগিতে লাগিল। রাজা একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজার ব্যাকুলতা যত বাড়িতে লাগিল, ছায়াময়ী সানুমতীর আনন্দও তত বৃদ্ধি পাইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয়-উচ্ছ্বসিত রূপিণী শকুন্তলা, সত্য সত্যই উপেক্ষিত নহে, একান্ত অপেক্ষিত। সানুমতী ভাবিতেছিলেন— 'এমন অগাধ প্রণয়ের বিস্মৃতিই বিস্ময়ের কারণ, স্মৃতিতে বিস্ময় নাই[১]।' যখন নিজের অপুত্রকতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, রাজা মোহ-প্রাপ্ত হইলেন[২], তখন ছায়াময়ী অপ্সরা আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হায়! দীপ প্রজ্বলিত, কেবল ব্যবধান-দোষে রাজা গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন! এ কষ্ট আর দেখিতে পারি না। যাই, আমিই গিয়া রাজাকে সান্ত্বনা করি। বলি গিয়া যে, রাজন্! তুমি অপুত্রক নও, তোমার দিব্য পুত্র বিদ্যমান। অথবা প্রয়োজন নাই। সে দিন তুষ্ণীমানা শকুন্তলাকে যখন মহেন্দ্রজননী সান্ত্বনা করেন, তখন বলিয়াছিলেন, 'দুষ্মন্ত সাক্ষাৎ স্বত্বই তদীয় ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে অভিনন্দন করেন, দেবগণ অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।' সুতরাং আর এস্থানে বিলম্ব করিব না। যাই, দুষ্মন্তের এই বিরহাকুল অবস্থার কথা বলিয়া আমার প্রিয়সখীকে আশ্বস্ত করি গিয়া।"—বলিয়াই সানুমতী উদ্ভ্রান্ত-গমনে অন্তর্হিত হইলেন।

সামাজিক-গণ এতক্ষণে বুঝিলেন যে, শকুন্তলা স্বর্গে—যে স্থানে শচী-

১—শকু, ৬ষ্ঠ অঙ্ক। সানুমতী। 'সম্মোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ঃ, ন প্রতিবোধঃ।'

২—শকু, ৬ষ্ঠ অঙ্ক। রাজা। 'অহো! দুষ্মন্তস্য সংশয়মারূঢ়া পিণ্ডভাজঃ,—কুতঃ'—

অস্মাৎপরং বত যথাশ্রুতি সম্ভৃতানি কো নঃ কুলে নিবপনানি করিষ্যতি।

নূনং প্রসূতি-বিকলেন ময়া প্রসিক্তং ধৌতাশ্রু-শেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥'

(মোহমুপগতঃ)

চপলা-প্রভৃতি অমরীগণ, পুত্রবতী শকুন্তলা সেই স্থানে আছেন। মহেন্দ্র-জননী স্বয়ং তাঁহার জন্য ব্যাকুল। তিনি শকুন্তলাকে আশ্বাস দেন, সান্ত্বনা করেন। দেবগণ পর্য্যন্ত শকুন্তলার দুঃখে দুঃখিত, শকুন্তলার যাতনা-নিরাসের জন্য ব্যস্ত। আর বিলম্ব নাই, সত্বরই দুঃখিনীর দুঃখের অবসান হইবে। কবি এই ভাবে, দর্শক-হৃদয়ে শকুন্তলার নিমিত্ত যে দুশ্চিন্তা জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিলেন। কবির এই অনুপম চিত্রে দেখিলাম,—স্বর্গে—সেই—চিরানন্দময় স্থানেও শকুন্তলার আনন্দ নাই। তাদৃশ দুঃখ-বিমুক্ত স্থলেও পতিব্রতা আপনার দুঃখে সর্ব্বদা দুঃখিনী। রাজকৃত প্রত্যাখ্যানে সে প্রণয়, অনল-দগ্ধ হেমের ন্যায়, যেন আরও অধিকতর উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! আদর অপেক্ষা উপেক্ষায়, সতীর সতীত্ব নিজের প্রকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সতীর সে মহনীয় মূর্ত্তি দর্শনে দেবতারাও বিস্মিত হইয়াছেন। সে মূর্ত্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাই তাঁহারা পর্য্যন্ত সতীর গৌরবরক্ষণে উদ্যত! সতীর হৃদয়-রঞ্জনে বদ্ধ-পরিকর! দেখিলাম, পতিবিরহিণী পতিব্রতার চক্ষে স্বর্গও অকিঞ্চিৎকর, নন্দনকাননও রুক্ষশ্মশানবৎ, জীর্ণ অরণ্যবৎ। দেখিলাম, সতীর হৃদয় আদরে উদ্বেল বা উপেক্ষায় চঞ্চল হয় না। দিগ্-দর্শন-যন্ত্রের শলাকার ন্যায়, সে হৃদয় সকল অবস্থাতেই স্থির-লক্ষ্য, পতির অভিমুখীন। একবার সেই কুমারসম্ভবে, মদন-ভস্মের পর, পিনাকপাণি কর্ত্তৃক অবজ্ঞাতা পার্ব্বতীর তপস্যা দেখিয়াছি; তার পর রঘুবংশে, রামকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা সাধ্বী জনকতনয়ার সেই—

তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া—

প্রভৃতি উক্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছি; আর এখন কবির সর্ব্বস্ব-ভূত এই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে সাধ্বী শকুন্তলার দেবীমূর্ত্তি দেখিলাম। যে পতি, কলঙ্কিনী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, না না, কেবল কলঙ্কিনী বলিয়া নহে, বিশুদ্ধ-চরিত্রাকে কলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,

সেই পতিরই উদ্দেশে, গত-জীবিত-কল্পা, 'পরিধূসর-বসন-বসনা,' 'নিয়ম-ক্ষাম-মুখী', 'এক-বেণীধরা,' 'শুদ্ধশীলা,' নিষ্করুণ পতির 'দীর্ঘ-বিরহ-ব্রত-ধারিণী' 'শরীরিণী' করুণার ন্যায়, শকুন্তলার মূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিলাম, রমণীহৃদয় অগাধ সমুদ্রবৎ অতলস্পর্শ, অনন্তরত্নের আকর। সেই সঙ্গে আরও দেখিলাম, রমণী সব সহ্য করিতে পারে, প্রিয়তমের প্রীত্যর্থে, সহাস্যবদনে মৃত্যুকেও ডাকিয়া লইতে পারে, চিরদিনের মত দুঃখের সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তাহার একমাত্র সম্বল সতীত্বের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ সহ্য করিতে পারে না। সতীত্বের মর্য্যাদারক্ষার জন্য, সে অসাধ্যও সাধন করিতে পারে, কুসুম-কোমলা হইয়াও ভীমা রণরঙ্গিণী সাজিতে পারে; জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, চিরধ্যেয়, প্রাণাধিকের হৃদয়েও 'অনার্য্য' বলিয়া বাক্যবাণ বিদ্ধ করিতে পারে। ত্রিজগতে এমন কিছুই নাই, যাহা সতী ললনা, সতীত্বের অনু-রোধে পরিত্যাগ করিতে না পারেন। দেখিলাম, পতির সেই শত কটূক্তি, শত প্রত্যাখ্যান সতী পতিমুখ-সন্দর্শন-মাত্রেই বিস্মৃত হইলেন। হৃদয়ের বলে হৃদয়কে ধারণ করিলেন। দেখিলাম, পতির উপর দোষারোপ করিতে সতী অভ্যস্ত নহেন। তিনি আপন দুরদৃষ্টকেই সকল দুঃখের হেতু বলিয়া মানিয়া লয়েন। আপনারই ত্রুটি দেখেন, পতির ত্রুটি তিনি দেখিতে চান্ না, বা দেখিতে পারেনও না। তিনি পতির মুখ দেখিয়া, নিমেষ-মধ্যেই সকল বিস্মৃত হইয়া, কেবল, 'জয়তু আর্য্যপুত্র!' বলিয়া, হৃদয়াসনে হৃদয়েশ্বরকে পুনঃস্থাপিত করেন! কোপ, অভিমান, আত্ম-শ্লাঘা প্রভৃতি, সতী, পতিমুখ-দর্শনে একপদে বিস্মৃত হয়েন। দেখিলাম, যখন্ আত্ম-কৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া পতি কাতর-হৃদয়ে সতীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া অনুনয় করিতে যান, তখন সাধ্বী, সমস্ত অপরাধ নিজেই

১—শকু, ৭ম অঙ্ক।—বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী,
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

স্বীকার করিয়া লইয়া, নিজকেই সকল দোষে দোষী করিয়া, পতি-দেবতাকে দোষ-নির্ম্মুক্ত করেন[১]। সতী পতির চরিত্রে কলঙ্কের ছায়াপাত সহ্য করিতে পারেন না।

মালিনীতটে, সত্ত্ব-প্রধান তপোবনে, সাত্ত্বিক-হৃদয়া শকুন্তলার যে প্রণয়ের উন্মেষ ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, রজঃপ্রধান হস্তিনাপুরের রাজ-প্রাসাদে তমঃপ্রভাব-বিকৃত দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলার যে উপযাচিত প্রণয়রত্ন উপেক্ষিত হইয়াছিল, এতদিনে সেই প্রণয়, আবার সত্ত্ব-গুণ-প্রধান দেব-সদনে আদৃত হইল। তপোবনে যে প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুরোৎপত্তি, তাপসা-কাঙ্ক্ষিত অমরভবনে বর্দ্ধিত পল্লবিত সেই প্রণয়তরু কুসুমিত ও ফলিত হইল। তপোবনে প্রথম মিলন, পরে লোকালয়ে বিচ্ছেদ, শেষে আবার তপোবনাধিক শান্তিময় স্বর্গে সেই তাপস-তনয়ার পুনর্মিলন। হিমালয়-দুহিতা ভাগীরথীর বিশ্রাম সাগর-সঙ্গমে। নগদুহিতা শকুন্তলার বিশ্রাম স্বর্গে। ভাগীরথীর পুত্র ভীষ্ম জগদ্বন্দিত। শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনও ত্রিলোক-বিখ্যাত। স্বয়ং উপনত সহধর্ম্মিণীকে যে রাজা চিনিতে পারেন নাই, প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আর সেই প্রত্যাখ্যাত সতীত্বমাত্র-পাথেয়া রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছিলেন, শেষে সেই রাজাকেই আবার সেই সতীর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতকল্প হইতে হইল। কত অন্বেষণ করিতে হইল। যত্ন করিয়া সেই 'অপ-রিচিতাকেই' চিনিয়া লইতে হইল। সতীর গৌরব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সে গৌরব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। মর্ত্ত্যে সে গৌরব আদৃত না হইলেও স্বর্গের দেবদেবী তাহার পূজা করেন। দুষ্যন্তও শকুন্তলার গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন। 'অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণা'

১—শকু, ৭ম অঙ্ক। শকুন্তলা। 'উত্তিষ্ঠতু আর্য্যপুত্রঃ। নূনং মে সুচরিত-প্রতিবন্ধকং ময়া কৃতং তেষু দিবসেষু পরিণাম-মুখং আসীৎ, তেন সানুক্রোশঃ অপি আর্য্যপুত্রঃ বিরসঃ সংবৃত্তঃ।'

এবং 'কলঙ্কিনী' বলিয়া একদিন যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, দুষ্যন্ত সেই পুত্রবতী শকুন্তলাকেই পবিত্র-হৃদয়া বলিয়া, স্বয়ং যাইয়া গ্রহণ করিলেন। একদিন পরকলত্র বলিয়া যাঁহার মুখের দিকে চাহিতেও কৃপণ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, ভারত সম্রাট সতীত্বের জয়-ঘোষণা করিলেন। আর ভারতের অদ্বিতীয় কবি, তাঁহার কল্পনার মোহন বাঁশরীতে সেই জয়-গীতিকার ঝঙ্কার করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

দুষ্যন্ত।

শকুন্তলার চরিত্র-প্রসঙ্গে দুষ্যন্ত-চরিত্রের অনেক কথাই বলা হইয়াছে। দুষ্যন্ত যে কি প্রকার অসীম-শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ, তাঁহার চরিত্রের বল যে কত অপরিমিত, হৃদয় যে কিরূপ উদার, নিষ্কলঙ্ক, তাহা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান পর্ব্বে অতি স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি হিমালয়বৎ সে বিশাল ও সমুচ্চ চরিত্রের মহত্ত্ব আরও একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে, প্রস্তাবনার শেষে, সূত্রধারের মুখে, আমরা দুষ্যন্তের প্রথম পরিচয় পাইতেছি। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সূত্রধার তাহার প্রিয়তমাকে গান গাহিতে বলিয়াছিল। সে গান করিয়াছে। সেই গানে, সূত্রধার এমনই আত্মবিস্মৃত ও তন্ময় হইয়াছে যে, সে যে অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটক অভিনয় করিতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ, এ কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে তাহার প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আর্য্যে! কোন্ নাটক আমাদের অভিনেয়?' সূত্রধার-পত্নী হাসিয়া বলিল—'সে কি? তুমিই ত এই মাত্র কহিলে যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল অভিনয় করিতে হইবে, তবে আবার এখন এরূপ বলিতেছ কেন?, তখন সূত্রধার সস্মিত-বদনে কহিল, 'ঠিক কথা, তুমি ঠিকই মনে করাইয়া দিয়াছ! তোমার মনোহর গীত-রাগে আমার অদ্যকার কর্ত্তব্য অভিনয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ঐ দেখ, ঐ যে আমাদের পুরোবর্ত্তী রাজা দুষ্যন্ত, দ্রুতগতি মৃগের দ্বারা, যেমন হঠাৎ কোথায় হৃত হইতেছেন, তদ্রূপ তোমার সঙ্গীতেও

আমার মন হৃত হইয়াছিল। তাই আমি ঐ রূপ অসংবদ্ধ কথা বলিয়াছি[১]।'

এই প্রথম দুষ্যন্তের নাম শ্রবণ করিলাম ও দুষ্যন্তকে দেখিলাম। অভিনয়ের নাটক আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই, প্রস্তাবনাতেই দেখিতেছি, যে জন্য সূত্রধার উপস্থিত, তাহা সে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার প্রধান কর্ত্তব্য যে অভিনয়, তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। তার পর দেখিতেছি দুষ্যন্তকে; তিনিও বিস্মৃত। বেগবান্ বন্যমৃগ, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কোথায় ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে, তিনি অবশহৃদয়ে মৃগের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, আত্ম-পরাবর্ত্তনের যেন শক্তি নাই। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং পরে, এই প্রকার বিস্মৃতি-বাহুল্য প্রদর্শন করিয়া কবি অতি-নিগূঢ় ভাবে ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে, এই নাটকে বিস্মৃতিরই প্রাধান্য! নাটকের যিনি প্রধান পুরুষ, তিনি বিস্মৃতিকে লইয়াই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করিলেন। ইহাতে বুঝিতেছি যে, তাঁহার জীবনে বিস্মৃতিরই অধিকার। বনচারী মৃগের দ্বারা, স-সাগরা ধরণীর অধীশ্বর 'প্রসভ-হৃত' হইলেন, তাঁহার জীবন যে কীদৃশ বিস্মৃতি-প্রধান, বনবাসীর আধিপত্য যে সে জীবনে কত অধিক, তাহার কতকটা আভাস এই প্রারম্ভেই বুঝিতে পারা গেল। বনবাসিনীর সন্দর্শনে একবার তিনি আত্মবিস্মৃত, বনবাসী তাপস দুর্ব্বাসার দুঃসহ অভিশাপে আর এক বার তিনি আত্ম-বিমূঢ়। হরিণ-দর্শনে তাঁহার যে বিস্মৃতির প্রথমোন্মেষ, হরিণাক্ষী শকুন্তলার সন্দর্শনে সেই বিস্মৃতির বহিঃপ্রকাশ, আর দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাহার পূর্ণত্ব। দুষ্যন্তের জীবন-ত্রিযামার তিনটি যামেই যেন, একই বিস্মৃতি তিন রূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। ইহা

১—শকু, ১ম অঙ্ক। সূত্রধারঃ।

'ভবাম্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ
এব রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥'

মহাকবির এক অপূর্ব্ব কৌশল। সমস্ত অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটকের ইহা এক বিশেষ রহস্য।

দুষ্যন্ত বিশাল পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। মৃগয়া করিতে, নির্গত হইয়াছেন। শরব্যমৃগ অদূরে ধাবমান। অব্যর্থ-সন্ধান রাজা বাণ-সন্ধান করিয়াছেন, বধ্যমৃগ বাণাহত হয় আর কি, এমন সময়ে সহসা একজন বনবাসী ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার বাণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণের আত্মসত্তায় অগাধ বিশ্বাস, আপন ব্যক্তিত্বে অপরিমিত নির্ভর। তাই অকুতোভয়ে, বীরশ্রেষ্ঠ দুষ্যন্তের বাণের পথে দাঁড়াইতে পারিলেন। আশ্রমের মৃগ আশ্রমবাসীর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, তাই আত্ম-প্রাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ব্রাহ্মণ মৃগের প্রাণরক্ষার্থে উপস্থিত। ইহা একটি বিরাট চিত্র। যে দেশের ব্রাহ্মণ, আত্ম-দেহের মাংস কাটিয়া দিয়া, শ্যেনপক্ষীর কবল হইতে আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, দুর্গত ইন্দ্রের প্রার্থনায়, যে দেশের ব্রাহ্মণ আপন অস্থি স্মিতমুখে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই দেশের ব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি।

বাণপথে ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান—শুনিয়াই, রাজা স-সম্ভ্রমে সারথিকে কহিলেন, 'সত্বর অশ্বের রশ্মি-সংযম কর।' রথ স্থির হইল। ব্রাহ্মণও অগ্রসর হইয়া কহিলেন, রাজন্, আশ্রমের মৃগ হনন করা অনুচিত। 'হনন করিও না'—এ কথা ব্রাহ্মণ বলিলেন না। 'হনন অনুচিত'—কেবল ইহাই বলিলেন। এই বাক্যেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিত। রাজা অমনি বলিলেন 'এই বাণ সংহার করিলাম।' আর দ্বিরুক্তি নাই। যেমন আদেশ, অমনি পালন। এই চিত্রে, শরব্য-বধে বাধা-প্রাপ্ত পৃথিবীপতি, ব্রাহ্মণের আদেশ পালন করিয়া, ব্রাহ্মণকে যত বড় করিলেন, নিজে তদপেক্ষা অনেক বড় হইলেন। দেবদ্বিজে ক্ষিতীশ্বরের যে ভক্তি-শ্রদ্ধা কত, তাহা এই সামান্য ঘটনাতেই বেশ অনুভব করা যায়।

বৈখানসের অনুরোধ ক্রমে, রাজা মালিনী-তীরবর্ত্তী, কণ্বের আশ্রমে

চলিয়াছেন। সে মৃগয়া-বেশ, সে বর্ম্ম, কবচ, শিরস্ত্রাণ, সে তূণীর, ধনুঃ, বাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্রমে 'বিনীত-বেশে' তিনি শান্ত আশ্রমের দ্বারে উপনীত হইলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। মনস্বী দুষ্যন্তের মনে, যেন একটি আশার বিদ্যুৎ, চকিতে খেলা করিয়া গেল। নিমেষের জন্য রাজা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া গেলেন।—এমনই সময়ে নেপথ্যে ধ্বনি হইল—'ইদো ইদো সহীয়ো।' শান্ত তপোবনের স্নিগ্ধ সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে সে ধ্বনি রাজার কাণে প্রবেশ করিল। না—না, কাণে নহে, 'কাণের ভিতর দিয়া' সে ধ্বনি, যেন রাজার 'মরমে' প্রবেশ করিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথম বুঝিতে পারিলেন না, যে উহা কিসের ধ্বনি? কাহার ধ্বনি? নিশীথরজনীতে সুপ্তোত্থিতের কর্ণে দূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায়, বহুকাল পরে প্রবাস-প্রত্যাগতের কর্ণে স্ব-জনালাপের ন্যায়, বসন্ত-যামিনীর শেষ-ভাগে, দূরোত্থিত অস্পষ্ট-শ্রুত কোকিল-ঝঙ্কারের ন্যায়, পিপাসার্ত্ত পথিকের কর্ণে সারস-কূজিতের ন্যায়, সে ধ্বনি কাননের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, পৃথিবী-পতিকে উন্মনা করিয়া তুলিল। রাজা দুষ্যন্ত একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে ও ব্যগ্র ভাবে কাণ পাতিয়া রহিলেন। নিমেষমাত্র পরে তাঁহার মনে হইল, যেন, দক্ষিণ দিগ্-বর্ত্তিনী বৃক্ষ-বাটিকায় ঐ 'আলাপ' শ্রুত হইতেছে। কাহার আলাপ? কিসের আলাপ? তিনি বীণার 'আলাপ' শুনিয়াছেন, ত্রিতন্ত্রীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, ভ্রমরীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, কোকিলার 'আলাপ' শুনিয়াছেন; তিনি চন্দ্রমা-শালিনী মধুযামিনীর অঞ্চলে বসিয়া, বীচিমালিনী তটিনীর কুল কুল 'আলাপ' শুনিয়াছেন,—কিন্তু এমন স্বপ্নময়—আবেশময়—'আলাপ' ত জীবনে আর কখনো শুনেন নাই! তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহা কি কোন মানবীর কণ্ঠধ্বনি? না কোন বনদেবতার অমৃতবর্ষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত রাগের 'আলাপন' সরসী-বক্ষো-বিহারী রাজ-হংসকে যেমন

তরঙ্গ-লেখা পদ্ম হইতে পদ্মান্তরের নিকটে ভাসাইয়া লইয়া যায়,সেই অবিজ্ঞাত-পূর্ব্ব স্বরতরঙ্গও তদ্রূপ রাজাকে সেই দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সে স্বর-লহরী তখনও যেন বাতাসে ভাসিতেছিল। তখনও তাহার লয় হয় নাই। রাজা সেই দিক ধরিয়া অবশ চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলেন,—অদূরে তিনটি তপস্বিকন্যা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া, তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। রাজা দূর হইতে সেই 'মধুর-দর্শনা' বালিকাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কন্যকাদিগকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাঁহার মনে হইল, 'বিধাতা যেন অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া উহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাজার অন্তঃপুরেও তাদৃশ সৌন্দর্য্য দুর্লভ। যদি সত্য সত্যই ইঁহারা আশ্রমবাসিনী এবং তপস্বিদুহিতা হয়েন, তাহা হইলে, এতদিনে, অযত্ন-বর্দ্ধিতা বন-লতিকার নিকটে যত্ন-রক্ষিতা উদ্যান-লতিকা পরাজিত হইল'[১]।

সেই কন্যাত্রয়ের দর্শনে, ভারতেশ্বরের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবি, তাঁহারই মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন। এই একটি কবিতা দ্বারাই পুরুষপ্রধান দুষ্যন্তের হৃদয়-ভাণ্ডার কবি যেন উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

সৌন্দর্য্য লিপ্সা নিন্দার বিষয় নহে। জগতে এমন লোক অতি বিরল, যিনি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহেন। যদি কেহ থাকেন, তিনি করুণাময়ের অনুগ্রহে বঞ্চিত, কৃপার পাত্র। কেহ বহিঃসৌন্দর্য্য ভাল বাসেন, কেহ অন্তঃসৌন্দর্য্য ও বহিঃসৌন্দর্য্যের সমবায়ে প্রীত হয়েন। কেবল মানুষের নহে, সৌন্দর্য্য জীবমাত্রেরই অভিপ্রেত, তৃপ্তিপ্রদ। সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইয়াই মৃগ, চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া, ঊর্দ্ধকর্ণে, ভ্রমরের

১—শকু, ১ম অঙ্ক। রাজা।

'শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যান-লতা বন-লতাভিঃ ॥'

গুণ্ গুণ্ ঝঙ্কার শ্রবণ করে। সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইয়াই ফণী, বাঁশরীর রবে ফণা উত্তোলন করিয়া নাচে। সৌন্দর্য্য-লোভেই চকোর শীতদ্যুতি চন্দ্রের দিকে ধাবমান হয়। সৌন্দর্য্য-লোভেই পতঙ্গ অনলে প্রাণ-পাত করে। যে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা নাই, তাহা ক্ষার-দগ্ধ, অনুর্ব্বর উষর ক্ষেত্রের তুল্য। বিধাতার এই সুন্দর বিশ্ব তাহার জন্য নহে, সে হতভাগ্য। দুষ্যন্তের সৌন্দর্য্য-প্রীতি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। তিনি সুন্দরী ধরণীর অধিপতি, সুন্দর বিশ্বের নিয়ন্তা, নীল-পয়োনিধির নীলাম্বরে তাঁহার বসুন্ধরা সুশোভিতা। তাঁহার হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের অতিপ্রিয়তা না থাকাই দোষের বিষয়। নীল গগনের নবোদিত শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য লোকে যে ভাবে দেখে, তিনি তাপসকুমারীদিগের সৌন্দর্য্যও যদি সেই ভাবে দেখিতেন, তবে, তাহাতে বলিবার কিছুই থাকিত না। তিনি তাহা দেখেন নাই। তিনি অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তিনি যে ভাবে, ধাবমান মৃগের 'গ্রীবা-ভঙ্গাভিরাম' মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে, 'নিরায়ত, পূর্ব্বকায়' 'নিস্পন্দ-চামর-শিখ' 'নিভৃতোর্দ্ধকর্ণ' প্লুত-গতি অশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন[১], যদি আজ সেই ভাবে, তাপস-দুহিতাদের সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তবে তাহা অধিকতর রুচিকর হইত। তিনি তাহা দেখেন নাই। তিনি 'স্বকীয়' অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদিগের সহিত তুলনা করিয়া, 'পরকীয়' কন্যকাগণের রূপদর্শন করিয়াছিলেন। আপনার সৌভাগ্যের সহিত অন্যের সৌভাগ্যের তুলনা করিয়াছিলেন। এতাদৃশী তুলনার পরিণাম সুফল-প্রদ নহে। যে স্থলে পরের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়া

১—শকু, ১ম অঙ্ক। রাজা।

গ্রীবা-ভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধ-দৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতন-ভয়াৎ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রম-বিবৃত-মুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি

পরকে বুঝিতে হয়, যে স্থানে পরের সমৃদ্ধি-দর্শনে আপনার ঋদ্ধি-চিন্তা মানসে উদিত হয়, জানিও, সেই স্থলে আত্ম-ভাবনা বড় অধিক। আত্মার্থই সে স্থলে মুখ্য, পরার্থ তথায় গৌণ। দুষ্যন্তের এই তাপস-দুহিতৃ-দর্শনও আত্মার্থ-মূলক। তাঁহার অজ্ঞাত-সারে, তদীয় হৃদয়ে, আত্মার্থ-পরতা প্রকট-রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তিনি তৎপরিচারিত হইয়া, তপস্বি-কন্যকাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই দিদৃক্ষা, তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্বরাগ নহে, তবে পূর্ব্বরাগ-রূপিণী উষার দ্যোতক প্রাভাতিক নক্ষত্র ইহাকে বলা যাইতে পারে।

দুষ্যন্ত দেখিতে লাগিলেন। অনসূয়ার কথার পর, যখন শকুন্তলা কথা কহিলেন, নবমালিকার শিরে জল-সেচন করিলেন, তখন দুষ্যন্ত মনে মনে কহিলেন,—

'কথমিয়ং সা কণ্ব-দুহিতা ?
অসাধু-দর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ,
য ইমাং আশ্রম-ধর্ম্মে নিযুঙক্তে[১]।'

দুষ্যন্ত অপ্রবুদ্ধ-হৃদয়ে আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তখন আর তাঁহার এমন সামর্থ্য নাই, যে, সে রূপ-দর্শন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, অথচ বয়স্থা ললনার নির্জ্জনে দর্শন দুষ্য, ইহাও তাঁহার রাজ-হৃদয়ের অবিদিত নহে। তাই তিনি 'পাদপান্তরিত' হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুষ্যন্ত এবার আরও অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন। যখন তুমি আত্ম-প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও, জানিও, তখন তোমার আত্মার উপর প্রভুত্বের হ্রাস হইয়াছে। আত্মা আর তোমার অধীন নাই, তখন তুমিই আত্মার অধীন

[১]—শকু, ১ম অঙ্ক। এই কি সেই কণ্বদুহিতা? মহর্ষি কণ্ব, দেখিতেছি, অসাধু-দর্শী, যেহেতু, তিনি এমন বালিকাকে কঠোর আশ্রম-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

হইয়া পড়িয়াছ। মহাকবি, এইভাবে, দুষ্যন্তকে, বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান করাইয়া, শকুন্তলা প্রদর্শন করিলেন।

বরপক্ষের লোক, যখন বিবাহের পূর্ব্বে, কন্যাকে দেখিতে যায়, তখন, তাহারা যেমন কন্যার নাক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, কর চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে দেখিয়া লয়; আবার সেই লোক চতুর হইলে, ঐ কন্যা হাসিলে কেমন দেখায়, দাঁড়াইলে কেমন দেখায়, চলিলে কেমন দেখায়, তাহাও কৌশলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লয়, দুষ্যন্তকেও যেন সেই ভাবে, কালিদাস শকুন্তলা-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কলস-কক্ষা আনত-নিতম্বা শকুন্তলার কেমন রূপ, শিথিলবল্কলা উন্নমিত-দেহা শকুন্তলার কেমন রূপ, ভ্রমর-বাধা-ব্যাকুলা আবর্ত্তিত-নয়না শকুন্তলার কেমন রূপ, কবি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা একটি একটি করিয়া, শকুন্তলার সেই রূপ লহরী দেখিলেন। আর আপনার মনে, আপনিই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, সেই রূপের বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন।

দুষ্যন্ত সেই রূপ তরঙ্গে যেন ডুবিয়া গেলেন। দুষ্যন্ত ডুবিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ডুবিল না। দুষ্যন্তের জড়দেহ তন্দ্রালস হইল বটে, কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞানময় দেহ জাগরূক রহিল। তাই দেখিতে পাই, জড়-দুষ্যন্তকে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ অবস্থাপিত ও পশ্চাৎপদ করিয়া, বিজ্ঞানময় দুষ্যন্ত বিচার করিতে লাগিলেন যে, "এই বালিকা কুলপতির 'অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না? জড়-চৈতন্যের এ সমবায় বড়ই সুন্দর। যে স্থলে জড়ত্ব প্রাধান্য, তথায় চৈতন্যের এ শক্তি মন্দীভূত। চৈতন্য দীপালোক সে স্থলে ক্ষীণ, অকর্ম্মণ্য। সে, একবার জড়ত্বের মধ্যেও হয়ত, আপনার অস্তিত্ব প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু তাহা, বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায়, জ্যোতিরিঙ্গন-প্রকাশের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাই দস্যুরও চিত্তে কদাচিৎ নিবৃত্তির ধ্বনি উঠিয়া থাকে। যিনি সত্য সত্যই মহাপুরুষ, তাঁহার হৃদয়ে এ চৈতন্য চির-প্রবুদ্ধ। সুখে, দুঃখে, সংযোগে, বিয়োগে, এ চৈতন্য সর্ব্বদাই

প্রথর। তাই দুষ্যন্ত তন্ময়-চিত্তে শকুন্তলা-সন্দর্শন-রত হইলেও, শকুন্তলা-গত নানাবিধ জিজ্ঞাসা তাহার মনে জাগিয়াছিল। তাই শকুন্তলাকে দেখিবার বাসনা তাঁহার মনে যত অধিক ভাবে জাগিতেছিল, ততই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, এ বালিকা নিশ্চয়ই-আমার পরিগ্রহণ-যোগ্যা, নতুবা আমার মন ইঁহার প্রতি এত আসক্ত হইবে কেন? দুষ্যন্তের চরিত্র এমনই দৃঢ়, এমনই সত্যপ্রবণ, যে, তাঁহাকে সত্যের নির্ণয়ে কোন প্রয়াসই করিতে হয় না। তিনি যাহা সত্য নির্ণয় করিবেন, তাহাই সত্য, তিনি যাহা অসত্য মনে করিবেন, তাহাই অসত্য। তাঁহার বংশ-পরম্পরা-ক্রমে, সত্য সেবিত হইয়া আসিতেছে, আদৃত হইয়া আসিতেছে; সে বংশীয়গণের হৃদয় এমনই উপাদানে গঠিত যে, যাহা সত্য, তাহাই তাহাদের সেব্য, সেই দিকেই তাহারা আসক্ত। যাহা অসত্য, যাহা নীচ, যাহা ঘৃণিত, তাহাতে তদ্বংশীয়গণের হৃদয় অনুরক্ত হয় না, হইতে পারে না। তাই দুষ্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন, 'সতাং হি সন্দেহ-পদেষু বস্তুষু, প্রমাণমন্তঃ-করণ-প্রবৃত্তয়ঃ[১]।' তাঁহার হৃদয় এত বলিষ্ঠ, এত জাগ্রত। তাঁহার হৃদয়োদ্যানের এক দিকে যেমন বসন্ত-মলয় প্রবাহিত, বসন্ত বনরাজি কুসুমিত, অন্য দিকে তেমনই চৈতন্যের স্নিগ্ধ শারদ-কৌমুদী উল্লসিত। সে উদ্যান যেন শরদ্-বসন্তের যুগপৎ লীলাক্ষেত্র! তাই শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাঁহার হৃদয় যখন একান্ত বিমুগ্ধ, তখনই আবার তাপস-তনয়া শকুন্তলার গ্রাহ্যাগ্রাহ্যত্ব-নির্ণয়ে নিযুক্ত, শকুন্তলার প্রকৃত স্বরূপাববোধের নিমিত্ত উৎসুক। মোহ-জ্ঞানের এই সমবেতভাবই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ। এই কারণেই মহাপুরুষকে কিছুতেই অপথে পরিচালিত করিতে পারে না। এই জন্যই রাজা, শকুন্তলার জাতি, কুল, উৎপত্তি বৃত্তান্ত প্রভৃতি অবগত হইবার উদ্দেশে অত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। রাজা আত্ম-মর্য্যাদার অনুকূল-

১—শকু, ১ম অঙ্ক। সজ্জনের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই সদসদ্ পদার্থের পরিচায়িকা।

ভাবে শকুন্তলাকে দেখিতে ও ভাবিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই আত্মমর্য্যাদার অনুরোধে মহাপুরুষ অতি প্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন, অতি হৃদ্যকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন। প্রাকৃত জনের তাহা অসাধ্য। প্রাকৃত আর মহাপুরুষে এই প্রভেদ। এই মর্য্যাদাজ্ঞান যত দিন থাকে, তত-দিনই মানুষ মানুষ-পদবাচ্য। ইহার অভাবে মানুষ পশুতুল্য।' এই জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষের হৃদয় যে মুহূর্ত্তে কুসুমবৎ কোমল তাহার পরক্ষণেই পাষাণবৎ কঠিন। দুষ্যন্তের এই দুর্লভ জ্ঞান অতি প্রখর ছিল। তাই, এই দেখিতেছি, তিনি নবনীতবৎ কোমল-হৃদয়, আবার পরক্ষণেই যেন বজ্রবৎ কঠোর! দেখিতেছি, যে মুহূর্ত্তে দুষ্যন্ত,—

'কিংনু খলু যথা বয়মস্যাম্, এবমিয়মপ্যস্মান্
প্রতি স্যাৎ। অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা[১]।'

বলিয়া, মনে মনে শকুন্তলার ভাবনা করিতে করিতে, একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আবার, তপস্বিগণের 'তপোবনসত্ত্বরক্ষা-ব্যগ্রতার' কথা এবং অনুচরবর্গের তপোবনোপরোধের কথা শ্রবণ করিয়া, তন্নিবারণে বীরের ন্যায় সন্নদ্ধ হইতেছেন। শকুন্তলার চিন্তা যেন দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক, 'প্রতিগমিষ্যামস্তবাৎ' বলিয়া সিংহের ন্যায় গাত্র-কম্পন করিয়া দাঁড়াইতেছেন। সে হৃদয় যেন সত্য সত্যই—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'।—

এ অংশে শকুন্তলা অপেক্ষা দুষ্যন্তের প্রাধান্য। শকুন্তলা স্রোতের ফুলের ন্যায়, হৃদয়খানিকে ঘটনা-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন। আর দুষ্যন্ত,

১—শকু, ৩য় অঙ্ক। ইহার সম্বন্ধে আমার চিত্ত যে প্রকার উৎসুক, ইনিও কি আমার সম্বন্ধে সেই প্রকার উৎসুক-হৃদয়া। অথবা আমার প্রার্থনা ত পরিপূর্ণপ্রায়।

আহিতুণ্ডিকের ন্যায়, তাঁহার তেজস্বী হৃদয়কে যখন যে দিকে ইচ্ছা প্রেরণ-সংহরণ করিতেছেন। দুষ্মন্ত আত্ম-হৃদয়ের দ্বারা বস্তুর গ্রাহ্যত্ব পরিহার্য্যত্বের বিচার করিতে পারিতেন, মুগ্ধ-হৃদয়া শকুন্তলার সে শক্তি ছিল না। শকুন্তলা রমণী। রমণী আপন হৃদয়কে অত কঠিন পথে, জটিল বিষয়ে পাঠাইতে চাহেন না। তাঁহারা বাহ্য জগতের মুখাপেক্ষিণী নহেন, সুতরাং বহির্জগতের রীতি-নীতি আইন-কানুনে, তাঁহারা দৃক্‌পাতও করেন না। অন্তর্জগৎ তাঁহাদের বিচরণ ক্ষেত্র। সে জগতে বহির্জগতের ন্যায়, এত লৌকিকতা, এত পরচিত্ত-বিনোদ-প্রিয়তা, এত আত্মার্থপরতা নাই। তাই শকুন্তলা, আপনার ভাবনা বা আপন জীবনের ভবিষ্য ভাবনা করিতে জানেন না। আর দুষ্মন্ত পুরুষ, একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। অনেক সময়ে, তাঁহাকে লোকানুরোধে, সমাজানুরোধে বা কর্ত্তব্যানুরোধে অন্তর্জগৎ অপেক্ষা বহির্জগতের অধিক মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হয়। স্বাধীন নৃপতি হইলেও এ অংশে তিনি পরাধীন। পরের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার উপর ন্যস্ত। সুতরাং তাঁহাকে, অনেক সময়ে, পরের ভাবনা চিন্তা করিতে হয়। তাই তাঁহার হৃদয় শকুন্তলার হৃদয়বৎ সবেগ নহে। দুষ্মন্তের হৃদয় কেবল জঙ্গম নহে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক। আর শকুন্তলার হৃদয় কেবল জঙ্গম। সে হৃদয় কেবল চলিতেছে, ফিরিতেছে না, দাঁড়াইতে পারিতেছে না। আর দুষ্মন্তের হৃদয় এই চলিতেছে, এই দাঁড়াইতেছে; যেমন গতি, তেমনই স্থিতি। যখন সে দুষ্মন্ত হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন তাহার রূপ সংক্ষোভিত সাগর অপেক্ষাও ভীষণ, আবার যখন সে হৃদয় নিস্তরঙ্গ, তখন প্রশান্ত বারিধিও তাহার প্রশান্ত-ভাবের নিকটে পরাজিত। এমনই বিচিত্র উপাদানে দুষ্মন্ত-হৃদয় গঠিত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধর্ম্মের জয়।

দুষ্যন্ত রাজা, কণ্বাশ্রম তাঁহারই অধিকার-গত। পবিত্র পৌরবকুলে তাঁহার জন্ম।" নিজে প্রথিত-যশা, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। শকুন্তলাও ক্ষত্রিয়-কন্যা, অবিবাহিতা। শকুন্তলার সখীদিগের মুখে রাজা শুনিয়াছেন যে, অনুরূপ পাত্রে, মহর্ষি কণ্বের শকুন্তলা সম্প্রদানের বাসনা। তাঁহার অপেক্ষা অনুরূপ বর, সুলভ কি দুর্লভ, সে কথা তিনি নিজেই বিচার করিয়া দেখিতে জানেন। 'পৃথিবী-পতি দুষ্যন্ত শকুন্তলার পরিণয়ার্থী',—এ কথা শ্রবণ মাত্রেই যে মহর্ষি কণ্ব প্রসন্ন হৃদয়ে তাঁহার করে শকুন্তলাকে অর্পণ করিবেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। তথাপি রাজা বিমনাঃ, শকুন্তলার জন্য উৎকণ্ঠিত। তিনি কণ্বকে এ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারিবেন না। তিনি নিজে আসমুদ্র-করগ্রাহী, অন্যত্র করপ্রদ হইতে তাঁহার হৃদয় প্রস্তুত নহে। তিনি ইঙ্গিত-মাত্রেই শকুন্তলাকে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা তাঁহার বাঞ্ছিত নহে। বরং শকুন্তলার কথা বিস্মৃত হওয়া ভাল, তবুও নিজের প্রার্থনা নিজে প্রকাশ করা ঈপ্সিত নহে। তাঁহার বিচার-শক্তি এতই গরীয়সী, এতই প্রখরা। তাই তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন,—

'সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্'—

'সেই বালা যে পরাধীনা, ইহা ত আমি জানি। কিন্তু,'—

'অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্ত্তয়িতুম্।'

'তথাপি সেই শকুন্তলা হইতে, আমি কিছুতেই আমার চিত্তকে নিবর্ত্তিত করিতে পারিতেছি না।'—তাহা হইলেই বুঝিতেছি যে, রাজা শকুন্তলা-গত সমস্ত বিষয় বিচার-পূর্ব্বক, হৃদয়-নিবর্ত্তন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। যদি আরও চেষ্টা করিতেন,

তাহা হইলে, হয়ত, পারিতেন। যদি সত্য সত্যই বুঝিতেন যে, শকুন্তলা অগ্রাহ্যা, রাজপরিগ্রহের অযোগ্যা, তাহা হইলে, তিনি যে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার চরিত্রের এ বড় কম মহত্ত্বের কথা নহে। এ বিচারশক্তি পৃথিবী-পতিরই অনুরূপ। যাঁহার বিশেষ জ্যোতিষ্মান্ জ্ঞান-চক্ষুঃ আছে, তিনিই এইভাবে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপদর্শনে সমর্থ হয়েন, তথ্য নির্ণয়ে পারগ হয়েন। রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের এমনই বৈচিত্র্য যে, অতিমোহের মধ্যেও অতিনিমজ্জনের মধ্যেও, সে হৃদয় সতত জাগ্রত। তিনি, একদিকে যখন চন্দ্র এবং কন্দর্পকে উদ্দেশ করিয়া, কত কথা কহিতেছেন, কত প্রলাপ বকিতেছেন, আবার, তখনই অন্যদিকে, শকুন্তলার গ্রাহ্যাগ্রাহ্যত্বের বিচার করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় যেন, তাঁহারই করস্থিত মোমের পুতুল। যখন যে ভাবে ইচ্ছা, তাহাকে ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন। তিনি যখন তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেন, তখন সে হৃদয়ের ভাবতরঙ্গে সমস্ত বিশ্ব যেন ভাসিয়া যায়। তিনি আপনার ভাবে, বিশাল ধরণীকে অনুপ্রাণিত করিয়া লয়েন। পর্ব্বত-নির্গত-নির্ঝরের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়ের ভাব-প্রবাহ, সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকেই আপনার সঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বলিষ্ঠ হৃদয়ের ইহা একটি বিশেষ ধর্ম্ম। যাঁহার হৃদয় বলিষ্ঠ, তিনি যখন হাসেন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সঙ্গে হাসিয়া উঠে, আবার তিনি যখন কাঁদেন, তখন তাহারই সঙ্গে কাঁদিয়া পড়ে।

যখন গৌতমী আসিয়া শকুন্তলাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তখন লতান্তরিত দুষ্যন্ত বাহির হইয়া, যে স্থানে শকুন্তলা বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া, উন্মুক্ত-হৃদয়ে, 'কোথায় যাই? অথবা এই লতাকুঞ্জে শকুন্তলা ছিলেন, সুতরাং এই স্থানেই ক্ষণকাল থাকি[১]।' —এই কথা

১—শকু, তন্ন অঙ্ক। ক নু খলু গচ্ছামি! অথবা ইহৈব প্রিয়া-পরিভুক্ত-মুক্তে লতা-বলয়ে মুহূর্ত্তং স্থাস্যামি—'

বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তখন দর্শকগণও যেন তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িলেন ; তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে সেই শকুন্তলা-প্রতিমা-শূন্য লতাকুঞ্জের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৈ শকুন্তলা, কোথায় শকুন্তলা, বলিয়া রাজার সঙ্গে তাঁহারাও যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। যখন বিরহ-কাতর ভূপতি,—

'তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীর-লুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথ-লেখ এষ নলিনী-পত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্‌ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতস-গৃহাৎ শক্নোমি শূন্যাদপি'[১] ॥—

বলিয়া, হৃদয়ের করুণ-ভাব-রসে সমগ্র বনভূমি পর্যন্ত করুণার্দ্র করিয়া তুলিলেন, তখন দর্শকগণও যেন তাঁহারই সঙ্গে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই শিলাশয্যা, সেই নলিনী-দল-লিখিত পত্র, সেই মৃণাল-বলয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সেই পৃথিবীপতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই করুণ-কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া, যেন সমগ্র সামাজিক-মণ্ডলী কাঁদিয়া ফেলিলেন। অভিনেতার সহিত দর্শকদিগকে এমন করিয়া মিশাইয়া ফেলিতে, এমন করিয়া, ভাবের সিমেণ্ট দিয়া, উভয়ের হৃদয় এক করিয়া গাঁথিতে কালিদাস সিদ্ধহস্ত।

দুষ্যন্তের দৃষ্টি-শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ! জগতের কোন বস্তু তাঁহার চক্ষু

১—শকু ৩য় অঙ্ক। 'এই তার কুসুমশয্যা, নলিনী পত্রে নখের দ্বারা লিখিত, এই তার ম্লান মন্মথ-লেখা, এই তার করকমল-স্খলিত মৃণালবলয়, হায়, এই সব দেখিতে দেখিতে আমি এতই উন্মনা হইয়াছি যে, এই বেতস-কুঞ্জ হইতে নির্গতও হইতে পারিতেছি না, ইহাতে থাকিতেও পারিতেছি না।

এড়াইতে পারে না। স্বচ্ছ দর্পণ-তুল্য তাঁহার নির্ম্মল-হৃদয়ে তাবৎ পদার্থই সুচারুরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। জড়তার বা অজ্ঞতার অধিকার সে হৃদয়ে নাই। সে হৃদয় সতত সোৎসাহ, সতত সতর্ক, সতত কর্ম্মঠ। আতুরের আর্ত্তনাদে সে হৃদয় কাঁদিয়া ফেলে, বীরের আহ্বানে সে হৃদয় তখনই সন্নদ্ধ হয়, আবার ভ্রমরের গুঞ্জনে বা কোকিলের ঝঙ্কারে সে হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। যখন রাজকার্য্যপর্য্যালোচনান্তে দুষ্যন্ত বয়স্তের সহিত বসিয়া, শ্রম-ক্লান্ত চিত্তের শ্রান্তি দূর করেন, তখন দূর হইতে যদি কাহারও বিষাদ-গীতিকা তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অমনিই তিনি আপনার শ্রান্তি ভুলিয়া যান। সেই বিষাদ-সঙ্গীতের করুণধ্বনিতে আত্ম-বিস্মৃত হন। তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। রাজা তিনি, তিনি শুধু পার্থিব জগতের রাজা নহেন, কেবল বাহ্যবস্তুর উপর রাজত্ব করেন না, লোকের হৃদয়ের উপরও যেন তাঁহার অটুট অধিকার। তাই পরের হৃদয়ের দুঃখ গীতিকায় তিনিও দুঃখিত হয়েন। পরের কাতরতায়, তিনিও কাতর হইয়া পড়েন।

অনেকদিন হইল, মালিনী-তীরে শকুন্তলাকে ফেলিয়া আসিয়াছেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে, তাঁহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন; কিছুই মনে নাই। জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। এমন বিলুপ্ত যে, উপেক্ষিতা হংসপদিকা যখন, তাঁহার হৃদয়ের গভীর দুঃখের ভার সহিতে না পারিয়া, নিজে নিজে গান করিতেছিলেন, তখন রাজা সেই গান শ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, 'একি? আমার ত কোন ইষ্টজন-বিরহ নাই, তবে এ গান শ্রবণ করিয়াই, আমি এত উৎকণ্ঠিত হইলাম কেন'[১]? দুর্ব্বাসার অভিশাপ তাঁহাকে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বলাইল—'ইষ্ট-জন-বিরহ নাই।'—তিনি এখন ইষ্টজন-সঙ্গত।

১—শকু, ৫ম অঙ্ক। রাজা। আত্মগতম্।
কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি?'

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বাংশে এখন পরিপূর্ণ, তাহার সকল স্থান অধিকৃত, তাহাতে এখন ইষ্টান্তরের স্থান নাই!

মানুষের হৃদয় আকাশ-কল্প। তাহাতে সর্ব্বদা বিমল কৌমুদী খেলা করে না, চকোরের নর্ত্তন হয় না। তাহাতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যও উদিত হয়, শ্যেনপক্ষীও বিচরণ করে। তাহাতে নিরন্তর নয়নরঞ্জিনী সুনীল-জলদমালার ক্রীড়া থাকে না, অগ্নিবর্ণ আবর্ত্তও উপস্থিত হয়। যখন সায়ংকালে, তটিনীর নির্জ্জন তটে বসিয়া, মানব সেই সাগর-গামিনীর উল্লসিত হৃদয়ের কুল-কুল-প্রণয়-গীতিকা শ্রবণ করে, যখন রজনী-যোগে, সৌধ-শিরে উপবেশন-পূর্ব্বক, সংসার-তাপ ক্লান্ত মানব, একাকী প্রশান্ত-গম্ভীর নৈশগগনের দিকে চাহিয়া থাকে, যখন মানব পর্ব্বতারোহণ করিয়া, অধোদেশ-বর্ত্তিনী তরুলতা-শোভিনী শ্যামায়মানা পৃথিবীর নয়ন-তর্পণ মূর্ত্তি দর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে, সে হৃদয় যতই রুক্ষ হউক, সরস হউক, মুগ্ধ হউক, দুঃস্থ হউক, বিযুক্ত হউক, ইষ্টজন-সঙ্গত হউক, তাহাতে কিন্তু কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতচর ভাবের উদয় হয়। ক্ষণকালের জন্য মানুষ সব ভুলিয়া যায়। সংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে ভুলিয়া যায়, বর্ত্তমান ভুলিয়া যায়। তখন তাহার হৃদয়ে অতীতের সুখদুঃখের ছায়া পতিত হয়, অতীতের স্মৃতি উদিত হয়। মানুষ তখন অতীতের মধ্যে ডুবিয়া পড়ে। তখন প্রাণের কত পুরাতন কথার অস্পষ্ট গীতি হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে। আজ হংসপদিকার গীতধ্বনিতেও রাজার হৃদয়ের অবস্থা সেইরূপ হইয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সত্ত্বেও, আপন হৃদয়ে তিনি যেন কি অপূর্ণতা অনুভব করিতে লাগিলেন। অতিশয় 'পর্য্যুৎসুক' হইলেন[১]। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে কত কথা জাগিতে লাগিল।

১—শকু, ৫ম অঙ্ক। রাজা।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

জগতের অন্যান্যের তুলনায়, তিনি যে কত ক্ষুদ্র, কত অসম্পূর্ণ, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি দিবা রজনী অক্লান্তভাবে, আত্মসুখ-নিরপেক্ষ হইয়া, জগতের পালন করেন। পরের চিন্তায় নিরুদ্বেগ-হৃদয়ে নিদ্রাও যাইতে পারেন না। কিন্তু কৈ? তাহাতেই বা সুখ কোথায়? লোকে প্রার্থিত-প্রাপ্তিতে সুখী হয়, তাঁহার ত সে সুখও নাই! অন্যে ভাবে, রাজার কতই সুখ। তিনি ত তাহা দেখেন না! সংসারে যাহারা তরুতলবাসী, দীন, তাহারাও বুঝি, প্রাসাদ-বিহারী দুষ্মন্ত অপেক্ষা অধিকতর সুখী! রাজা এই ভাবে কত কি ভাবিতেছেন। তাঁহার মহৎ হৃদয়ে মর্ত্তের অলীকত্ব, স্বপ্নময়ত্ব এই ভাবে আসিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে। তিনি একান্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিল, 'কাশ্যপাশ্রম হইতে তপস্বীরা আসিয়াছেন।' যেমন শ্রবণ, অমনি তাঁহার সেই বিমর্ষভাব যেন তিনি নিমেষে ভুলিয়া ঋষিদের অভ্যর্থনায় তৎপর হইলেন। কর্ত্তব্যের জন্য আত্মভাবনা, আত্ম-সুখদুঃখ মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইলেন। যেমন পূর্ব্বে ছিলেন, তেমনই হইলেন। চরিত্রের এ মহত্ত্বে তিনি অদ্বিতীয়! তিনি যেন সত্য সত্যই—

'অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।'

দুষ্মন্তের কোনরূপ ইষ্টজন-বিরহ ছিল না, তিনি পরমসুখে, প্রফুল্ল-হৃদয়ে ও নিশ্চিন্তভাবে, কালাতিপাত করিতেছিলেন।

অদূরে শকুন্তলা-সহযাত্রী ঋষিগণ উপনত-প্রায়। কবি সেই অভিশপ্তা শকুন্তলার প্রবেশের পূর্ব্বে, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গমঞ্চের প্রধান পুরুষ দুষ্মন্ত এবং রঙ্গ-প্রেক্ষক দর্শকগণ,—সকলের হৃদয়, একটা অস্পষ্ট কুহেলিকায় আবৃত করিয়া দিলেন। প্রসন্ন-হৃদয়ের সম্মুখে, অপ্রসন্ন হৃদয়ের উপস্থিতি সু-সমঞ্জস নহে। তাই অপ্রসন্নভাগ্যা, অভিশপ্তা, শকুন্তলাকে উপস্থিত

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ-পূর্ব্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥

করিবার পূর্ব্বেই, হংসপদিকার বিষাদ-গীতিকার ব্যপদেশে, অন্যান্য সকলকেও, একটা গভীর অবসাদের অস্পষ্ট ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন।

রাজা যখন ঋষিশিষ্যদিগের সম্মুখীন হইয়া দেখিলেন যে, কে একটি অবগুণ্ঠনবতী ললনা তাপসগণের সহিত উপনতা, তখন তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু দেখা হইল না। 'অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রং' বলিয়া নয়ন-পরাবর্ত্তন করিলেন। রাজার হৃদয় ভাণ্ডারের একটা প্রধান কক্ষ, যেন কবি, এই একটি কথায় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

ব্রাহ্মণগণ, আশীর্ব্বাদান্তে মহর্ষি কণ্বের, সেই প্রস্থান কালের উপদেশ-সংবলিত সংবাদগুলি একে একে রাজার গোচর করিলেন। কণ্বের সেই—

'অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযম-ধনান্ উচ্চৈঃকুলঞ্চাত্মনঃ
ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ তাম্।
সামান্য-প্রতিপত্তি-পূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্ বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ[১] ॥

বলিয়া যে শেষ কথা, তাহা রাজাকে শুনাইলেন। পরিশেষে কহিলেন, 'রাজন্! আপনার এই সহধর্ম্মিণী আপন্নসত্ত্বা, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।'

ঋষিদিগের উপর রাজার অগাধ বিশ্বাস, অসীম ভক্তি। ঋষিদিগের মাহাত্ম্য তিনি বিশেষরূপে বিদিত আছেন। 'স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্তের' ন্যায় ঋষিগণের তেজও যে, অন্যকৃত অভিভবে 'দাহাত্মক' হয়, ইহা,

১—শকু, ৪র্থ অঙ্ক। সংযম বিনা আমাদের যে অন্য সম্পদ্ নাই, তাহা, এবং তুমি যে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা, এবং বন্ধুবান্ধবের অগোচরে তোমার উপর এই সরলার যে অসীম স্নেহ-প্রবৃত্তি, তাহা চিন্তা করিয়া, রাজন্! তোমার ভার্য্যাগণের মধ্যে ইহাকেও অন্যতমারূপে দেখিও। তার পর ইহার অদৃষ্ট।

তিনি জানিতেন। ঋষিগণ স্ব স্ব তপস্যার যে ষষ্ঠাংশ রাজাকে দান করেন, সেই ষষ্ঠাংশের ফল যে অক্ষয়, ইহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন; ঋষিগণের সত্য-নিষ্ঠা, শম-প্রধান চরিত্র, ধর্ম্মভাব, কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং তাঁহারা যে অযথাভাবে, শকুন্তলাকে সাজাইয়া পাঠান নাই, রাজার বরং ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে অভ্রান্ত, এ কথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তবুও তিনি, আত্ম-চরিত্রের উপর তাঁহার যে অটল বিশ্বাস ও অপরিমিত আস্থা, তৎপ্রণোদিত হইয়া, কিছুতেই শকুন্তলাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না। আত্ম-সত্তায় তাঁহার এত অধিক বিশ্বাস, এত অধিক নির্ভর ছিল। তিনি আর্য্য নৃপতি। তাঁহার সিংহাসন বিলাসের সামগ্রী নহে। সে সিংহাসন ধর্ম্মাসন, আর রাজা ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। ধর্ম্মের জন্য তিনি ঋষিদিগের রোষানলে ভস্মীভূত হওয়াকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই তিনি কণ্ব শিষ্য-কর্তৃক বিশেষ অধিক্ষিপ্ত হইয়াও বলিয়াছিলেন 'আমার ত কিছুই মনে পড়ে না। আমি কি করিয়া, আমার আত্মাকে স্বৈত্রিত্ব দোষাপন্ন করিব?'—এই উক্তি রাজা দুষ্যন্তের নহে। যিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, ইহা তাঁহারই উক্তি। শকুন্তলা যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন-পূর্ব্বক, রাজাকে কত পুরাতন কথা স্মরণ করাইতে লাগিলেন, তখন, রাজা, নিজের অকলঙ্ক কুলের সর্ব্বনাশ-ভয়ে, একান্ত ভীত হইয়া, কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—'ভদ্রে! কূলঙ্কষা তটিনী যেমন, জল অপবিত্র এবং তট-তরুকে—পাতিত করে, তদ্রূপ, তুমি কেন আমার কুল এবং আমাকে নিরয়ে পাতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ? কেন তোমার এ প্রয়াস'? ঋষিগণ যখন ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন যে, হে সত্যবাদিন্! তুমি যে, শকুন্তলাকে

১—শকু, ৫ম অঙ্ক। রাজা।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমং চ পাতয়িতুম্।

কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুঞ্চ॥'

বঞ্চনা করিলে, স্থির জানিও, ইহার ফল ব পাত। তখন, সত্য-প্রিয় পৃথিবীপতি, ধীর-হৃদয়ে উত্তর দিলেন,—'পৌরবদিগের বিনিপাত অসম্ভব, এ কথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়।' রাজা তিনি, তাঁহার কি দৃঢ়তা, কি সহিষ্ণুতা, কি ধীরতা ?

একদিন সেই মালিনীতীরের বৃক্ষ-বাটিকাগত, পাদপান্তরিত মুগ্ধমূর্ত্তি দুষ্যন্তকে দেখিয়াছি, আর আজ আবার এই প্রশান্তগম্ভীর প্রশান্ত-বারিধিবৎ অকম্পিত-হৃদয়, ধীর দুষ্যন্তকে দেখিলাম। একবার তাঁহার মোহময়ী অবস্থা দেখিয়াছি, এইক্ষণে আবার তাঁহার জ্ঞানময়ী অবস্থা দেখিলাম। যখন মোহ, তখন তাহা জগতে অতুল। আবার যখন জ্ঞান, তখন, তাহাও জগতে অতুল! যিনি মহান্, তাঁহার সকলই মহান্, সকলই বিচিত্র। তাঁহার সম্পদ্ বিপদ্—সবই অদ্ভুত।

যখন, ঋষিগণ, শকুন্তলাকে রাজার সমীপে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন, সত্য সত্যই দুষ্যন্ত মহা বিপদে পড়িলেন। অশরণা রমণীর অপরাধ কি ? সে রমণীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রাণান্তেও প্রস্তুত নহেন সত্য, কিন্তু সেই কাতরলোচনার নয়নজলে, তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় চঞ্চল হইল। তাঁহার হৃদয়-বৃত্তি 'পর-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী' সত্য, তবুও কিন্তু সে দয়ার হৃদয় গলিল। তিনি তখন, অনন্যোপায় হইয়া, কাতরহৃদয়ে ও যুক্ত-করে, পুরোবর্ত্তী পুরোহিতের শরণাপন্ন হইলেন। 'আপনিই বলুন, এখন কর্ত্তব্য কি ?'—বলিয়া কুলপুরোহিতের উপদেশ-প্রার্থনা করিলেন। হায় ব্রাহ্মণ! একদিন ভারত-সম্রাটও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তোমার নিকটে কর্ত্তব্যোপদেশ চাহিতেন! দীন-হীন হইয়াও তোমার এত ক্ষমতা, এত আধিপত্য ছিল। আজ তুমি কোথায় ?

কবি, পুরোহিতের নিকট রাজাকে কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু করিয়া, রাজ-চরিত্রের আর একটি সম্পন্ন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

ক্রমে অঙ্গুরীয়ক-দর্শনে, রাজার শকুন্তলাকে মনে পড়িল। সেই মৃগয়া,

সেই মালিনীতীর, সেই বন-তোষিণী, সপ্তপর্ণ-বেদিকা, ভ্রমর-বাধা, সেই আত্ম-প্রকাশ, সখীদ্বয়ের অন্তর্ধান, শকুন্তলার বিনয়-ভূষিতা মূর্ত্তি, আর সেই—

'পরিগ্রহ-বহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্র-রশনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্'[২] ॥

বলিয়া, তপোবনে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা, একে একে রাজার মনে জাগিতে লাগিল। কিছু পূর্ব্বে যে রাজা কঠিন-কায় পর্ব্বতের ন্যায় অনভ্য-হৃদয় ছিলেন, তিনি একেবারে, শিথিল বৃন্ত-পল্লবের মত হইয়া পড়িলেন। 'ম্যাজিকলণ্ঠনে বা বায়স্কোপে' যেমন ক্ষণে ক্ষণে, নূতন নূতন, বিস্ময়-কর, প্রত্যক্ষ-প্রধান পদার্থ প্রদর্শিত হয়, মহাকবি, সেই ভাবে, প্রতিক্ষণেই দুষ্যন্তের নূতন নূতন বিস্ময়কর চরিত্রাংশ দেখাইতে লাগিলেন। দর্শকগণ দুষ্যন্তের যখন যে মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাঁহাদের মনে হইতেছে, যেন তাহার আর তুলনা নাই।

ক্রমে, দেবতাদের আগ্রহে স্বর্গবাসিনী শকুন্তলার সহিত, মর্ত্ত্যবাসী দুষ্যন্তের মিলন হইল। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার তাপিত হৃদয় নির্ব্বাপিত হইল। দর্শকগণেরও মনঃপ্রাণ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল। মহাকবি, অতি কৌশলে, এই মিলনোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

ইন্দ্র, স্বর্গ হইতে মাতলিকে দিয়া নিজের রথ পাঠাইয়া দিলেন, দানব-যুদ্ধ উপস্থিত, দুষ্যন্তকে স্বর্গে যাইতে হইবে। দুষ্যন্ত শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত বিমনায়মান ছিলেন। কিন্তু মাতলির আহ্বানে তাঁহার সে বৈমনস্য তিরোহিত হইল। তিনি যেন 'নবীভূত-বীর্য্য' হইয়া, স্বর্গে যাত্রা করিলেন। যাত্রা-কালে, বীর-শ্রেষ্ঠ বীরের ভাষায়, 'অমাত্য পিশুনকে' বলিয়া গেলেন—

২—শকু, ৩য় অঙ্ক। আমার বহু পরিগ্রহ থাকিলেও মদীয় কুলের প্রতিষ্ঠার কারণ মাত্র দুইটি,—একটি সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী, অন্যটি তোমাদের এই সখী।

'তন্‌-মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ[১] ॥'

ভারত সম্রাটের এই বীরোক্তি-বিদ্যুৎ-প্রভায় তদীয় সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর কিরীটমণি যেন একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বর্গের দানবযুদ্ধে জয়-লাভ করিয়া, দুষ্মন্ত, মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক অত্যধিক সম্মানিত ও আদৃত হইয়া, প্রসন্ন-হৃদয়ে, মাতলি-পরিচালিত ইন্দ্ররথে মর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। সমর-জয়ের উল্লাসে দুষ্মন্ত-হৃদয় সমুল্লসিত, তাহাতে আবার, মাতলি, সে উল্লাসের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতেছেন। স্বর্গরাজ্য নিরাপদ হইল, ইন্দ্রের সম্মান রক্ষিত হইল। মাতলির আনন্দের সীমা নাই। দুইজনে উন্মুক্ত-হৃদয়ে কত কথা কহিতেছেন, কত আলাপ করিতেছেন, আর মহেন্দ্র-রথ সেই নির্ম্মল উন্মুক্ত আকাশ-পথ বাহিয়া চলিতেছে। দুষ্মন্তের বিক্রম-কাহিনী স্বর্গরাজ্যের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগরূক। দেবগণ সুরসুন্দরীদের অঙ্গরাগান্তে, অবশিষ্ট বর্ণিকাদ্বারা, কল্প-লতাংশুকে দুষ্মন্ত চরিত্রের 'গীতক্ষম' পদাবলী রচনাপূর্ব্বক, লিখিতেছেন, অবসরক্রমে গান করিবেন। মাতলি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দুষ্মন্তকে তাহা দেখাইলেন[২]। দুষ্মন্ত প্রসঙ্গান্তরে সে আত্ম-প্রশংসা অন্তরিত করিলেন। যে দিন স্বর্গে আসেন, সে দিন, অসুর-যুদ্ধের জন্য মন অতিশয় উৎসুক ছিল, তাই স্বর্গপথের অতুল শোভা সে দিন রাজা ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আজ চিত্ত প্রসন্ন, দুষ্মন্তের সেই দিকে

১—শকু, ৬ষ্ঠ অঙ্ক। তোমার প্রজ্ঞা অনন্যপরতন্ত্রভাবে প্রজা পালন করুক। কেননা, আমার এই অধিজ্য ধনু, অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। রাজ-কার্য্য আর আপাততঃ আমি দেখিতে পারিব না।

২—শকু, ৭ম অঙ্ক। মাতলিঃ। আয়ুষ্মন্! ইতঃ পশ্য—

বিচ্ছিত্তি-শেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥

দৃষ্টি পড়িল। তিনি স্থির-নয়নে, স্বর্গ-পথের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। মেঘের উপর দিয়া রথ চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলদ-গাত্রে সৌদামিনী খেলা করিতেছে, আর তাহার সেই দেহ-জ্যোতিঃ আসিয়া রথের অশ্ব-গাত্রে পতিত হওয়ায়, অশ্বরাজি, এক এক বার জ্যোতির্ধারায় স্নাত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্যপ্রিয় রাজা, মাতলিকে তাহা দেখাইতেছেন। রথ অনেক ঊর্দ্ধে, পৃথিবী তাহার অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। পৃথিবীর কোন গন্ধও তত দূরে উঠিতে পারে না। মর্ত্তের ভাবনা, মর্ত্তের হর্ষ-বিষাদ, প্রণয়-বিরহ, দুঃখ-দারিদ্র্য—মর্ত্তের আত্মার্থ-প্রবৃত্তি, পরার্থ-বিদ্বেষ, পর শ্রী-কাতরতা,—যাহার হৃদয়ে বিরাজমান, তাদৃশ ব্যক্তি বুঝি, সে নির্ম্মল শান্ত আকাশমার্গের পথিক হইতে পারে না, তাই দুষ্মন্তের হৃদয় হইতে, মর্ত্তের সমস্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। মর্ত্তের কথা তিনি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ চৈতন্যময় পুরুষরূপে, ঊর্দ্ধে, অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ পথ দিয়া চলিয়াছেন, আর অচৈতন্য জড় জগৎ, তাঁহার নিম্নে, অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা এক বিরাট্ দৃশ্য! কবির কল্পনা যে কত ব্যাপিনী, কত শক্তিশালিনী, ইহা তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবিষ্ট-মনে ভাবিলে মনে হয়, মহাকবির শক্তিমতী কল্পনা-সুন্দরী যেন স্বর্গমর্ত্ত জুড়িয়া বসিয়া আছেন, স্বর্গমর্ত্ত ব্যাপিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যের মণি-মাণিক্য-খচিত চন্দ্রাতপ প্রলম্বিত করিয়াছেন, আর বিশ্বস্থ স্থাবর পদার্থ,—জীব, জন্তু, কল্পনা-সুন্দরীর সেই স্নিগ্ধ, কিরণমালী চন্দ্রাতপের অধোদেশে থাকিয়া, উদ্ভ্রান্ত-ভাবে, ঊর্দ্ধ-নয়নে, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে, কখনো পুলকিত, কখনো স্তম্ভিত, কখনো বিস্মিত, কখনো আবার বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হইতেছে। কবির স্বর্গ-পর্য্যন্তব্যাপিনী কল্পনার মোহন-মন্ত্র-প্রভাবে দর্শক-গণের হৃদয় যেন স্বর্গীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সে হৃদয় হইতে, মর্ত্তের ভাবনা, মর্ত্তের কল্পনা দূর হইয়া যাইতেছে। যখন দর্শকগণের হৃদয়, এই প্রকারে,

স্বর্গের বিমল-দীপ্তিতে দীপ্তিময়, সেই সময়ে, সেই নির্ম্মল-শান্ত হৃদয়ে, কবি, তাঁহার স্বীয় আধিপত্য, প্রভাব, বিস্তার করিয়া লইতেছেন। মনের মত শিক্ষা-দীক্ষায়, সে হৃদয় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিতেছেন। দর্শক বুঝিতেছেন না, যে, তাঁহার মর্ত্ত্য-হৃদয়, কবির অনুকম্পায় স্বর্গ্য-হৃদয়ে পরিণত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, ইহা মহাকবির এক বিরাট্ দৃশ্য! শক্তিমতী, স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপিনী কল্পনা সুন্দরীর প্রাঞ্জল মূর্ত্তি!

একবার রঘুবংশে, লঙ্কা-সমর-বিজয়ের পর রামসীতা যখন, পুষ্পকারোহণে আকাশপথে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তখন কবির কল্পনার এই প্রাঞ্জলমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। শত্রুক্ষয় হইয়াছে, সীতার উদ্ধার হইয়াছে, রাম-সীতা পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। সীতা সাধ্বী, পতিব্রতা, রামও নিষ্কলঙ্কচরিত, দয়াময়,—দুইজনে এক হইয়া, একপ্রাণ হইয়া মর্ত্ত্যের শোভা দেখিতে দেখিতে, স্বর্গপথে চলিয়াছেন, তাঁহারা অনেক উপরে,—আর পৃথিবী তাঁহাদের অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। সেই একবার দেখিয়াছিলাম, নিম্নে জড়জগৎ, আর উর্দ্ধে চৈতন্যময় পুরুষ। আর এই আর একবার দেখিলাম।

দেখিতে দেখিতে রথ অনেক দূরে আসিল। মর্ত্ত্যের অস্পষ্ট মূর্ত্তি দুষ্যন্তের নয়ন-গোচর হইল। দুষ্যন্ত, সেই দূরবর্ত্তিনী, ঈষৎ 'প্রতীয়মানা-বয়বা' ধরণীর 'উদাররমণীয়' মূর্ত্তি মাতলিকে দেখাইলেন। নিমেষমধ্যে, অদূরে, 'কনক-রস-নিস্যন্দী,' 'পূর্ব্বাপর-সমুদ্রাবগাহী,' 'সান্ধ্যমেঘ-পরিঘবৎ' এক রক্তবর্ণ পর্ব্বত পরিদৃষ্ট হইল। দুষ্যন্ত মাতলিকে ঐ পর্ব্বতের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি কহিলেন, আয়ুষ্মন্! ঐ পর্ব্বতের নাম হেমকূট, উহা কিংপুরুষবর্ষের সীমান্তবর্ত্তী। ঐ পর্ব্বত তপস্বিগণের প্রধান সিদ্ধিক্ষেত্র। ভগবান্ কশ্যপ দেবমাতা অদিতির সহিত, ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। রাজা কহিলেন 'পূজ্যের পূজাব্যতিক্রম অবিধেয়। রথ স্থির কর, ভগবান্ ও ভগবতীকে প্রণাম করিয়া যাই।' রথ স্থির হইল।

রাজা অবতীর্ণ হইয়া মাতলির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা ইন্দ্রের অমরাবতী দেখিয়াছেন, নন্দনবন দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন নির্বৃতিময় স্থান তিনি আর দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিতেছেন। মাতলি যাইতে যাইতে, কঠোর-তপস্যামগ্ন ঋষিদিগের তপোবন-ভূমি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা বিস্ময়-পূর্ণ-নয়নে দেখিলেন,—দেখিলেন, শ্রেণিবদ্ধভাবে কল্পপাদপ রাজি দণ্ডায়মান, কাহার কোন অভিলাষই তাহারা অপূর্ণ রাখে না, তবুও তাহাদের নিম্নে বসিয়া ঋষিগণ অনিলাশনে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কাঞ্চন পদ্ম-পরাগ-বাসিত সলিলে স্নানাদি করেন, রত্ন-শিলাতলে বসিয়া ধ্যান করেন, অপ্সরোমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী থাকিয়াও সংযম-রক্ষা করেন। দেখিলেন, অপরাপর মুনিগণ, যাদৃশ নির্বৃতিময়, সুখময়, পবিত্র স্থান লাভ করিবার বাসনায়, অনন্তকাল যাবৎ, কত কঠোর তপস্যায় শরীর-পাত করেন, এই সকল ঋষি তাদৃশ স্থানে থাকিয়াও তপস্যারত[১]। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মাতলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষগণের প্রার্থনা উত্তরোত্তর-পরিবর্দ্ধিনী ও ঊর্দ্ধগামিনী। সেই মর্ত্তে, মালিনীতটে, একদিন কণ্বাশ্রম দেখিয়াছিলেন, আর আজ কশ্যপাশ্রম দেখিলেন। কণ্বাশ্রমে গ্রীষ্মের বনতোষিণী দেখিয়াছিলেন, অথবা সুধু বনতোষিণী কেন, তথায় যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সে সমস্তই নশ্বর, মরণধর্ম্মা, আর এস্থানে যাহা যাহা দেখিলেন, সে

১—শকু, ৭ম অঙ্ক।

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্প-বৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চন-পদ্মরেণু-কপিশে ধর্ম্মাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্ন-শিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমঃ
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী।

সবই অবিনশ্বর, অমর। রাজার হৃদয় শান্তিরসে আপ্লুত হইল! তিনি, এক মহান্ আবেশময় ভাবস্রোতে ভাসিয়া গেলেন।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ভগবান্ কশ্যপ, মহর্ষিপত্নীগণ-পরিবেষ্টিতা দাক্ষায়ণী অদিতিকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেছেন। রাজা শুনিলেন, বুঝিলেন যে, পতিব্রতার মাহাত্ম্য কি অদ্ভুত। স্বয়ং দেবমাতা অদিতি পতিব্রতা ধর্ম্ম শুশ্রূষু, আর দেবপিতা ভগবান্ মারীচ সেই ধর্ম্মের বক্তা! এই স্বর্গাধিক-পবিত্রতর আশ্রমেও পাতিব্রত্যের এত আদর, এত পূজা! রাজা বুঝিলেন যে, পতিব্রতা কামিনী ধন্যা, পূজনীয়া। ক্রমে সেই আশ্রমের এক অশোকবৃক্ষের মূলে, রাজা দাঁড়াইলেন, আর মাতলি, ভগবান্ মারীচের দর্শন লাভের অবসর দেখিতে গেলেন।

—০—

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

পুনর্মিলন।

বহুকাল পূর্ব্বে, মর্ত্তে সেই কণ্বের আশ্রমে, এক দিন এমনি ভাবে, একাকী এক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া, রাজা শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তার পর কত কি হইয়া গিয়াছে! দুষ্যন্ত-জীবনের কত স্বপ্ন অতীত হইয়াছে! আজ কোথায় সে শকুন্তলা! সেই এক দিন দাঁড়াইয়াছিলেন, আর আজ আবার, ঠিক তেমনি ভাবে, একাকী আশ্রমের অশোকপাদপমূলে দাঁড়াইয়াছেন! রাজার হৃদয়ে, যেন কি একটা পুরাতনী ছায়া আসিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে। রাজা ভাল করিয়া, কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না, উদ্‌ভ্রান্তভাবে একাকী দাঁড়াইয়াই আছেন! এমন সময়ে আবার সেই দুষ্ট দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। সেই যখন, কণ্বাশ্রমে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখনও এই বাহু, এমনিই ভাবে কাঁপিয়াছিল! নিমেষমধ্যে রাজার হৃদয়ে যেন একটা তড়িৎ খেলা করিয়া গেল। তিনি সে তড়িদ্‌-বিলাসে প্রথমে চকিত, পরে কাতর হইয়া পড়িলেন। ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন, আর কেন? বাহু, কেন বৃথা স্পন্দন? আমার ত আর কোন অভিলাষই নাই, তুমি কি পূর্ণ করিবে? যাহার অভিলাষ ছিল, তাহাকে ত হারাইয়াছি! তুমি কি আমাকে সেই 'পূর্ব্বাবধীরিত' শ্রেয়ঃ মনে করাইয়া, অধিকতর দুঃখিত করিবার নিমিত্তই আবার স্পন্দিত হইতেছ[১]? রাজা মনে মনে, এই ভাবে, সেই অবধীরিতা শকুন্তলাকে স্মরণ করিতেছিলেন,—এমনই সময়ে, নেপথ্যে যেন কে

১—শকু, ৭ম অঙ্ক। মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো! স্পন্দসে মুধা!
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে!!

বলিয়া উঠিল 'চপলতা করিও না, ইহারই মধ্যে আপন স্বভাব পাইয়া বসিলে?' রাজা অবাক্ হইলেন! কে চপলতা করে? কে আপন স্বভাব পাইয়া বসিল? ইহা ত শান্ত আশ্রম, এ স্থানে ত কাহারও প্রকৃতি চপল হইতে পারে না। তবে কে কাহাকে এমন কথা বলিল? রাজা একান্ত উন্মনা হইলেন।

দুষ্যন্ত! আপনি পৃথিবীর রাজা, পরমজ্ঞানসম্পন্ন, শান্ত পুণ্য আশ্রমে উপস্থিত। আপনার বাহু স্পন্দিত হইল, তাহাতে আপনি বিস্মিত কেন? চাপল্য-প্রযুক্ত বাহুকে দোষারোপ কেন? প্রকৃতির নিয়মে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে কটাক্ষ কেন? আপনি স্বর্গে আসিয়াছেন, মর্ত্তের রীতি-নীতি ভুলিয়া যান, মর্ত্তের কথা ভুলিয়া যান, আসিতে না আসিতেই মর্ত্তের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন কেন?—এই ভাবে যেন, কবির বাক্য-ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল।

মালিনীতটে, পরমতপাঃ কশ্যপবংশীয় কণ্বের আশ্রমে বাহু-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা শুনিয়াছিলেন 'ইদো ইদো সহীয়ো।' সেই শকুন্তলার প্রথম কথা। আর আজও কশ্যপাশ্রমে বাহুস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলেন 'মাকৃখু চাপলং করস্থু' ইহাও শকুন্তলা-পুত্রের প্রথম পরিচয়-ধ্বনি। সে বারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ। এবারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ। তবে প্রভেদ এই, সে বার সে মধুর স্বরলহরী শকুন্তলার নিজের, আর এবার শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার। সে বার প্রথমোদ্যমেই শকুন্তলাসন্দর্শন, আর এবার, প্রথম শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার, পরে শকুন্তলা-তনয়ের, তার পর, অনেক দূরে, শকুন্তলার পুনঃসন্দর্শন লাভ। সে বার সাক্ষাৎ মর্ত্তে, এবার সাক্ষাৎ স্বর্গাধিক পবিত্রতর মারীচাশ্রমে। কণ্ব মহর্ষি কশ্যপের অর্থাৎ মারীচের সগোত্র, অধস্তন পুরুষ। সে বার যে বংশের অধস্তন পুরুষের আশ্রমে শকুন্তলা প্রাপ্তি হইয়াছিল, এবার সেই বংশের আদি ও প্রধান পুরুষের আশ্রমে তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিল। অধস্তনের আশ্রমে প্রথম মিলন,

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

উপসংহার।

"যখন দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত, তখন উভয়কেই আমরা বিকাসোন্মুখ মুকুলের মতন দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটি বিশেষ অবস্থার দিকে যাইতেছেন। যেন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন, পড়িলেন, যেন প্রণয়ানুরাগে মুগ্ধ হইলেন, হইলেন, যেন উষা ভাঙ্গিয়া দীপালোকে প্রকাশ হয়, হয়। দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া পড়ে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার সেই অস্ফুটরাগও তেমনি পূর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত হইল, যেন উষার অস্ফুটরাগ মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণ রূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা সেই বিষম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া, তৃণ-নির্ম্মিত পুত্তলির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছেন। যেন তাঁহাদের জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই; যেন তাঁহারা জড়জগতের জড়ত্ব-মাত্র! সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন। কোথা হইতে যেন এক অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন জ্ঞানময় অনন্তপুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন প্রলয় তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে শকুন্তলা কোথায়—তাহার ঠিকানা নাই; দুষ্যন্ত প্রলয়যন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রলয়াধীন! অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল! দুষ্যন্ত প্রলয় ভেদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভাসিত হইল। সেই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে, সেই হেমকূট শিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা পতিপত্নীভাবে দণ্ডায়মান,—উভয়েই পাণ্ডুবর্ণ, উভয়েই শীর্ণ-দেহ, বিমর্ষ, যেন অতি নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মস্থিত দুইখানি পবিত্র চেতনা-খণ্ড! কি দেখিয়া

ছিলাম, আবার কি দেখিতেছি! বসন্তের রাগ-গর্ভ মুকুল শরতের ম্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে! রাগময়ী জড়তা বিস্ময়-ভাবে পরিণত হইয়াছে! পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে! পৃথিবী হইতে স্বর্গ এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গভূমি! পৃথিবী হইতে স্বর্গ এই মহাকবির মহাস্বপ্নের আকার! পৃথিবী হইতে স্বর্গ এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ! এই জড়তাময় পৃথিবী, এবং এই আবার দিব্যালোক-পূর্ণ স্বর্গ! যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী চরণে দলিত করিতে পারেন, এই দিব্যালোক-পূর্ণ স্বর্গ তাঁহারই, তিনিই এই দিব্যালোক-পূর্ণ স্বর্গের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। যিনি এই জড়তাময় পৃথিবীর প্রতি আত্মাময় পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করেন! প্রকৃতি এবং পুরুষ, পরস্পর স্বাধীন। কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ। দুষ্যন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন। মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক্ নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, জর্ম্মাণ নাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা, এবং ইংরাজী নাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ, ভাব গম্ভীর, গূঢ়-রহস্য-ব্যঞ্জক মহাপটের নাম অভিজ্ঞান শকুন্তল[১]

[১]—বঙ্গদর্শন, আষাঢ়; ১২৮৮